নবী মুবাশ্‌শির ﷺ বলেন,

((وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ))

“তোমরা সেই মত নামায পড়, যে মত আমাকে পড়তে দেখেছ।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

প্রণয়নে ঃ-

আব্দুল হামীদ ফাইযী

كتاب الصلاة

(باللغة البنغالية)

تأليف : عبد الحميد الفيضي

মাওলানা মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক রিয়াযী সাহেবের অভিমত

হামেদাঁউ ওয়া মুসাল্লিয়ান, আম্মা বা'দ।

নামায ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম। ইসলামে তার গুরুত্ব চরম। তার গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের পাতা ভরপুর। নামায না পড়লে মুসলিম থাকা যায় না। আবার সঠিক পদ্ধতিতে তা আদায় না করলে জীবনের সব আমল পন্ড। সেই জন্য সঠিক পদ্ধতিতে নামায পড়া আমাদের সকলের কর্তব্য। এই উদ্দেশ্যে উপনীত হতে হলে সঠিক নামায শিক্ষার পুস্তকের প্রয়োজন।

বর্তমানে আমাদের সমাজে অধিকাংশ মানুষ নিজ নিজ কায়দায় নামায পড়ে; সুন্নতী তরীকার ধার ধারে না এবং জানেও না। এভাবে কত মানুষ কবরের পেটে চলে গেছে তার সংখ্যা আল্লাহই ভাল জানেন।

ভুল পদ্ধতিতে নামায পড়ার কয়েকটি কারণের মধ্যে নামাযের সঠিক তথ্য সম্বলিত পুস্তক না থাকা এবং অপর দিকে তথাকথিত বাজারী নামায শিক্ষা পুস্তকের অধিক প্রচলন একটি প্রধান কারণ। যেমন ফ্রেম, তেমনি ইঁট। সোজা ফ্রেমে সোজা ইঁট এবং বাঁকা ফ্রেমে বাঁকা ইঁট হওয়াটাই স্বাভাবিক। অবশ্য সঠিক নামায শিক্ষার পুস্তক একেবারে যে নেই, তা বলছি না। তবে তার সংখ্যা নগণ্য।

শ্রদ্ধেয় মাওলানা আব্দুল হামীদ আল-ফাইযীর বই 'স্বালাতে মুবাশ্‌শির' পাঠ করে উপলব্ধি করতে পারলাম যে, সেটি নামাযের সঠিক মাসায়েল সম্বলিত, কুরআন-হাদীসের দলীল সমৃদ্ধ, সুসজ্জিত, সুবিন্যস্ত এবং মার্জিত ভাষায় প্রণীত। আল্লার কাছে আমার আশা, এ ধরনের পুস্তক নামাযের সঠিক পথ ও তথ্য দানে, নামাযীদের চাহিদা এবং শূন্যস্থান পূরণে সহায়ক হবে - ইন শাআল্লাহ।

হে আল্লাহ! এ পুস্তকের প্রণেতাকে এবং যাঁরা এই পুস্তকের প্রকাশনার ব্যাপারে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকেই ইহ-পরকালে উত্তম বদলা দান কর। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক
উয়াইনাহ, সঊদী আরব

ভূমিকা

إنَّ الْحَمْدَ للّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}

নামায ইসলামের অন্যতম প্রধান ইবাদত। দ্বীনের দ্বিতীয় স্তম্ভ। এ ইবাদত কিভাবে শুদ্ধ হবে -সে চিন্তা প্রত্যেক নামাযীর। মুসলিম মাত্রই জানা দরকার যে, যে কোনও ইবাদত ও আমল কবুল হয় একটি ভিত্তিতে। আর সে ভিত্তি হল 'তাওহীদ'। সুতরাং যার তাওহীদ নেই, তার নামায নেই। সে নামাযী হলেও তার নামায মকবুল নয় আল্লাহর দরবারে। পক্ষান্তরে প্রত্যেক ইবাদত ও আমল কবুল হয় দুটি মৌলিক শর্ত পালনের মাধ্যমে; (১) ইখলাস (সে কাজ কেবল মাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হতে হবে। আর কারো উদ্দেশ্যে, অন্য কোন স্বার্থে সে কাজ করলে, তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়)। (২) রসূল ﷺ এর অনুসরণ। তাঁর নির্দেশ ব্যতীত অন্য কোন তরীকায় বা পদ্ধতিতে সে আমল করলে, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

((فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً))

অর্থাৎ, সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ কামনা করে, সে ব্যক্তি যেন নেক আমল করে এবং তার

প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে। *(কুঃ ১৮/ ১১০)*

নবী মুবাশ্শির ﷺ বলেন, (**صلوا كما رأيتموني أصلي**) অর্থাৎ, তোমরা সেইরূপ নামায পড়, যেরূপ আমাকে পড়তে দেখেছ। *(বুঃ, মিঃ ৬৮৩ নং)*

অনেক পাঠকের মনে শুরুতেই এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এ পুস্তক কোন্ মযহাবকে ভিত্তি করে লিখিত? এর উত্তরে বলা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এর উক্তি "হাদীস সহীহ হলেই সেটিই আমার মযহাব।" *(ইবনে আবেদীন, হাশিয়া ১/৬৩, সিসানঃ ৪৬পৃ)* অর্থাৎ, সহীহ হাদীস পাওয়া গেলে যয়ীফ হাদীস বা রায় ও কিয়াসকে বর্জন করে সেই অনুযায়ী আমল করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজেব। আর সেই কথার প্রতি বিশেষ খেয়াল রেখে এই পুস্তক লিখিত।

নামায শিক্ষার ব্যাপারে পাঠক হয়তো বিভিন্ন বই-পুস্তকে 'নানা মুনির নানা মত' লক্ষ্য করবেন। আর এমন মতবিরোধ যে অস্বাভাবিক তা নয়। এর কারণ অনেকটা এই যে, অনেকের নিকট সহীহ হাদীস অজানা। অনেকের নিকট হাদীস সহীহ বলে জানা থাকলেও আসলে তা যয়ীফ। আবার কোন হাদীস এক রিজাল-সুত্রে যয়ীফ হলেও তা যে অন্য রিজাল-সূত্রে সহীহ, তা অনেকের অজানা। সুতরাং যদি কোন মুজতাহিদ নিজ ইজতিহাদে কোন মাসআলা বলে থাকেন এবং দলীল সে কথার সমর্থন করে, অথবা কোন অমুজতাহিদ আলেম যদি কোন মুজতাহিদের কথা নিজ পুস্তকে বা ফতোয়ায় নকল করেন, তাহলে এমন আলেমের বিরুদ্ধে কূপমন্ডুকতার পরিচয় দিয়ে 'ভুঁই-ফোঁড়, কাঠমোল্লা' প্রভৃতি বলে বিরূপ মন্তব্য করা কোন বিজ্ঞ ও যশস্বী আলেমের জন্য শোভনীয় ও সমীচীন নয়।

যেমন পাঠকের উচিত, দলীলের স্বরূপতা দেখে যথাসাধ্য সঠিক কোন্‌টি তা নিরূপণ করতে চেষ্টা করা এবং সেই মতে আমল করা। এ ক্ষেত্রে তাঁর জন্যও উচিত নয়, কোন অভিজ্ঞ আলেমের বিরুদ্ধে কোন প্রকারের কটুক্তি করা। এমন ছোটখাট বিষয়ে ইজতিহাদী মতপার্থক্যকে বিভ্রান্তিকর মনে না করা। কারণ, এ সকল (সুন্নতী) বিষয়ে সঠিক ফায়সালা 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' যাই হোক, নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। অতএব উদার মনে পরস্পর-বিরোধী মতের মধ্যে যে কোন একটির উপর সঠিক জ্ঞানে আমল করলে তিনি সওয়াব-প্রাপ্ত হবেন। যেমন মুজতাহিদের ফায়সালা সঠিক হলে তিনি ২টি এবং বেঠিক হলে ১টি নেকী লাভ করবেন। আর তাঁর অনিচ্ছাকৃত ভুল ধর্তব্য হবে না।

পাঠকের হাতে অত্র পুস্তকটি আসলে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত 'সালাতে মুবাশ্শির'-এর বিস্তারিত ও বর্ধিত রূপ। হাওয়ালায় যে সংকেত ব্যবহার হয়েছে তার ব্যাখ্যা রয়েছে পুস্তকের শেষ অংশে। কলেবর বৃদ্ধি দরুন বইটিকে দুই খন্ডে বিভক্ত করা জরুরী ছিল। প্রত্যেক খন্ডে জুড়ে দেওয়া হবে সেই সংকেত-পরিচিতি ও প্রমাণপঞ্জী। আশা করি পাঠকের বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না।

পেশায় নয়, নেশায় ও প্রয়োজনের তাকীদে যা কিছু লিখি, যা কিছু বলি, আল্লাহ সবই তোমার সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে। অতএব তা আমার এবং প্রকাশকের কাছ থেকে কবুল করে নিও। আমীন।

আল-মাজমাআহ	বিনীত
রজব ১৪১৮হিঃ	*আব্দুল হামীদ মাদানী*

بسم الله الرحمن الرحيم

শুরুর কথা

মহান আল্লাহর অনুগ্রহে 'স্বালাতে মুবাশ্‌শির'-এর দ্বিতীয় খন্ড পাঠকের হাতে উপস্থিত হল। তার জন্য তাঁর দরবারে লাখো শুকরিয়া জ্ঞাপন করি।

দ্বীনের অন্যতম খুঁটির একটি কাঠামো পেশ করতে পেরে আমি নিজেকে যেমন ধন্য মনে করছি, তেমনি আশা করছি দুআ ও সওয়াব লাভের।

কেবল সহীহ হাদীসকে ভিত্তি করেই, অধিক ক্ষেত্রে কে কি বলেছেন তা উল্লেখ না করেই কেবল সহীহ দিকটা তুলে ধরেছি আমার এই পুস্তিকায়। মানুষের মনে সহীহ শিক্ষার চেতনা ও বাসনার কথা খেয়াল রেখেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আল্লাহ যেন তা কবুল করেন, তাই আমার কামনা।

বিভিন্ন বিতর্কিত মাসায়েলে আমি বর্তমান বিশ্বের প্রধান ৩টি রত্ন; বর্তমান বিশ্বের অদ্বিতীয় মুহাদ্দিস আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ নাসেরুদ্দীন আলবানী, আল্লামা শায়খ ইবনে বায এবং আল্লামা ও ফকীহ শায়খ ইবনে উষাইমীন (রাহিমাহুমুল্লাহু জামীআন)গণের হাদীসলব্ধ ও সহীহ দলীল ভিত্তিক মতকে প্রাধান্য দিয়েছি। আর এ কথা অবশ্যই প্রমাণ করে যে, আমি তাঁদের প্রত্যেকের; বরং প্রত্যেক হক-সন্ধানী রব্বানী আলেমের ভক্ত ও অনুরক্ত। তা বলে কারো অন্ধভক্ত নই। পক্ষান্তরে প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য অধিকারীর অধিকার সঠিকরূপে আদায় করা। উলামার যথার্থ কদর করা। প্রত্যেক হক-সন্ধানীর অনুরক্ত হওয়া; যদিও বা তাঁদের কোন কোন অভিমত আমার-আপনার বুঝের অনুকূল নয়। বলা বাহুল্য, খাঁটি সোনা স্বর্ণকারই চিনতে পারে; স্বর্ণ-ব্যবসায়ী নয়।

'নামায' ইসলামের প্রধান ইবাদত। 'নামায' শব্দটি ফারসী, উর্দু, হিন্দী ও আমাদের বাংলা ভাষায় আরবী 'সালাত' অর্থেই পরিপূর্ণরূপে ব্যবহৃত বলেই আমি 'সালাত'-এর স্থানে 'নামায'ই ব্যবহার করেছি। তাছাড়া বাংলাভাষীর অধিকাংশ মানুষ 'সালাত' শব্দটির সাথে পরিচিত নয়। তাই পরিচিত ও প্রসিদ্ধ শব্দই ব্যবহার করতে আমি প্রয়াস পেয়েছি। আর এতে শরয়ী কোন বাধাও নেই। সুতরাং এ বিষয়ে সুহৃদ পাঠকের কাছে আমার ইজতিহাদী কৈফিয়ত পেশ করে সুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রয়োজনের তাকীদে যা কিছু লিখি, সবই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায়। আল্লাহ যেন তা আমাকে দান করেন এবং কাল কিয়ামতে এরই অসীলায় আমাকে, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা ও ওস্তাযগণকে, আর এ বই-এর উদ্যোক্তা, প্রকাশক ও সকল আমলকারী পাঠককে তাঁর মেহমান-খানা বেহেশ্তে স্থান দেন। আমীন।

বিনীত

১৫/ ৪/ ১৪২৩হিঃ
২৬/৬/২০০২খ্রিঃ

আব্দুল হামীদ আল-মাদানী
আল-মাজমাআহ
সঊদী আরব

নিয়ত

আমল ও ইবাদত শুদ্ধ-অশুদ্ধ এবং তাতে সওয়াব পাওয়া-নাপাওয়ার কথা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। নিয়ত শুদ্ধ হলে আমল শুদ্ধ; নচেৎ না। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির তা-ই প্রাপ্য হয়, যার সে নিয়ত করে থাকে। যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব কোন বিষয় লাভের উদ্দেশ্যে হয়, সে ব্যক্তির তা-ই প্রাপ্য হয়। যার হিজরত কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হয়, তার প্রাপ্যও তাই। যে যে নিয়তে হিজরত করবে সে তাই পেয়ে থাকবে।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১নং)*

নাম নেওয়া লোক দেখানো, কোন পার্থিব স্বার্থলাভ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে কোন আমল করা এক ফিতনা; যা কানা দাজ্জালের ফিতনা অপেক্ষা বড় ও অধিকতর ভয়ঙ্কর। একদা সাহাবীগণ কানা দাজ্জালের কথা আলোচনা করছিলেন। ইত্যবসরে আল্লাহর রসূল ﷺ বের হয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন (ফিতনার) কথা বলে দেব না, যা আমার নিকট কানা দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে অধিকতর ভয়ানক?" সকলে বললেন, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তা হল গুপ্ত শির্ক; লোকে নামায পড়তে দাঁড়ালে তার প্রতি অন্য লোকের দৃষ্টি খেয়াল করে তার নামাযকে আরো সুন্দর বা বেশী করে পড়তে শুরু করে।" *(ইমাঃ, বাঃ, সতাঃ ২৭নং)*

বলাবাহুল্য, আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভ ছাড়া অন্য কোন স্বার্থলাভের উদ্দেশ্যে কোনও আমল করলে গুপ্ত শির্ক করা হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, "সুতরাং দুর্ভোগ সেই সকল নামাযীদের, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন। যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ে এবং গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সাহায্যদানে বিরত থাকে।" *(কুঃ ১০৭/৪-৭)*

জ্ঞাতব্য যে, প্রত্যেক ইবাদত কবুল হওয়ার মূল বুনিয়াদ হল তওহীদ।
অতএব মুশরিকের কোন ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন প্রত্যেক ইবাদত মঞ্জুর হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত হল দু'টি; নিয়তের ইখলাস বা বিশুদ্ধচিত্ততা এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তরীকা, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত।

নামাযের শর্তাবলী

১। নামাযীকে প্রকৃত মুসলিম হতে হবে। ২। জ্ঞানসম্পন্ন হতে হবে। (পাগল বা জ্ঞানশূন্য হবে না।) ৩। বিবেকসম্পন্ন হতে হবে। (সাত বছরের নিম্ন বয়সী শিশু হবে না।) ৪। (ওযু-গোসল করে) পবিত্র হতে হবে। ৫। নামাযের সঠিক সময় হতে হবে। ৬। শরীরের লজ্জাস্থান আবৃত হতে হবে। ৭। শরীর, পোশাক ও নামাযের স্থান থেকে নাপাকী দূর করতে হবে।
৮। কিবলার দিকে মুখ করতে হবে। ৯। মনে মনে নিয়ত করতে হবে।

নামাযের আরকানসমূহ

১। (ফরয নামাযে) সামর্থ্য হলে কিয়াম (দাঁড়ানোর সময় দাঁড়িয়ে নামায পড়া)। ২। তাকবীরে তাহরীমা। ৩। (প্রত্যেক রাকআতে) সূরা ফাতিহা। ৪। রুকু। ৫। রুকু থেকে উঠে খাড়া হওয়া। ৬। (সাষ্টাঙ্গে) সিজদাহ। ৭। সিজদাহ থেকে উঠে বসা। ৮। দুই সিজদার মাঝে বৈঠক। ৯। শেষ তাশাহহুদ। ১০। তাশাহহুদের শেষ বৈঠক। ১১। উক্ত তাশাহহুদে নবী (ﷺ) এর উপর দরূদ পাঠ। ১২। দুই সালাম। ১৩। সমস্ত রুক্‌নে ধীরতা ও স্থিরতা। ১৪। আরকানের মাঝে তরতীব ও পর্যায়ক্রম।

নামাযের ওয়াজেবসমূহ

১। তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া সমস্ত তাকবীর। ২। রুকুর তাসবীহ। ৩। (ইমাম ও একাকী নামাযীর জন্য) 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলা। ৪। (সকলের জন্য) 'রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দ্‌' বলা। ৫। সিজদার তাসবীহ। ৬। দুই সিজদার মাঝে দুআ। ৭। প্রথম তাশাহহুদ। ৮। তাশাহহুদের প্রথম বৈঠক।

নামায কখন ফরয হয়?

হিজরতের পূর্বে নবুঅতের ১২ অথবা ১৩তম বছরে শবে-মি'রাজে সপ্ত আসমানের উপরে সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রসূলের সাক্ষাতে (বিনা মাধ্যমে) নামায ফরয হয়। প্রত্যহ ৫০ অক্তের নামায ফরয হলে হযরত মূসা ﵇ ও হযরত জিবরীল ﵇ এর পরামর্শমতে মহানবী ﷺ আল্লাহ তাআলার নিকট কয়েকবার যাতায়াত করে নামায হাল্কা করার দরখাস্ত পেশ করলে ৫০ থেকে ৫ অক্তে কমিয়ে আনা হয়। কিন্তু আল্লাহর কথা অনড় বলেই ঐ ৫ অক্তের বিনিময়ে ৫০ অক্তেরই সওয়াব নামাযীরা লাভ করে থাকেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৫৮৬৪নং)*

নামায ফরয হওয়ার গোড়াতে (৪ রাকআতবিশিষ্ট নামাযগুলো) দু' দু' রাকআত করেই ফরয ছিল। পরে যখন নবী ﷺ মদীনায় হিজরত করলেন, তখন (যোহর, আসর ও এশার নামাযে) ২ রাকআত করে বেড়ে ৪ রাকআত হল। আর সফরের নামায হল ঐ প্রথম ফরমানের মুতাবেক। *(বুঃ, মুঃ, আঃ, মিঃ ১৩৪৮ নং)*
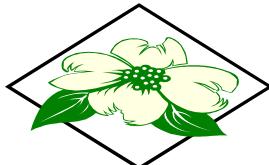
নামাযের মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اُتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ، إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَر﴾

অর্থাৎ, তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ পাঠ কর এবং যথাযথভাবে নামায পড়। নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। আর অবশ্যই আল্লাহর যিক্‌র (স্মরণই) সর্বশ্রেষ্ঠ। *(কুঃ ২৯/৪৫)*

নামায মুমিনের চক্ষুকে শীতল করে, তার যাবতীয় ছোট ছোট গোনাহ বা লঘু ও উপপাপকে মোচন করে দেয়। হযরত আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “কি অভিমত তোমাদের, যদি তোমাদের কারো দরজার সামনেই একটি নদী থাকে এবং সেই নদীতে সে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি? সকলে বলল, ‘না, তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না।’ তিনি বললেন, “অনুরূপই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উপমা। ঐ নামাযসমূহের ফলেই (নামাযীর) সমস্ত গোনাহকে আল্লাহ মোচন করে দেন।” *(বুখারী ৫২৮-নং, মুসলিম ৬৬৭নং, তিরমিযী, নাসাঈ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “কাবীরাহ গোনাহ না করলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআহ থেকে অপর জুমআহ -এর মধ্যবর্তীকালে সংঘটিত পাপসমূহের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)।” *(মুসলিম ২৩৩নং, তিরমিযী, প্রমুখ)*

হযরত আবু উসমান ﷺ বলেন, একদা একটি গাছের নিচে আমি সালমান ﷺ এর সাথে (বসে) ছিলাম। তিনি গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে ডালের সমস্ত পাতাগুলি ঝড়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, ‘হে আবু উসমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম?’ আমি বললাম, ‘কেন করলেন?’ তিনি বললেন, ‘একদা আমিও আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথে গাছের নিচে ছিলাম। তিনি আমার সামনে অনুরূপ করলেন; গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে তার সমস্ত পাতা খসে পড়ল। অতঃপর বললেন, “হে সালমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম?” আমি বললাম, কেন করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, “মুসলিম যখন সুন্দরভাবে ওযু করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে তখন তার পাপরাশি ঠিক ঐভাবেই ঝরে যায় যেভাবে এই পাতাগুলো ঝরে গেল। আর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّآتِ، ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِيْنَ﴾

অর্থাৎ, আর তুমি দিনের দু’ প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথামাংশে নামায কায়েম কর। পুণ্যরাশি অবশ্যই পাপরাশিকে দূরীভূত করে দেয়। (আল্লাহর) স্মরণকারীদের জন্য এ হল এক স্মরণ।

(সূরা হূদ ১১৪ আয়াত) (আহমদ, নাসাঈ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৩৫৬নং)

মহানবী ﷺ বলেন, “বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন তার সে তার সমস্ত গোনাহকে নিয়ে তার মাথায় ও দুই কাঁধে রাখা হয়। অতঃপর সে যখনই রুকূ ও সিজদা করে, তখনই একটি একটি করে সমস্ত গোনাহগুলি ঝরে পড়ে যায়।” *(বাইহাকী, সঃজাঃ ১৬৭১নং)*

নামাযের গুরুত্ব

নামায ও তার গুরুত্বের কথা কুরআন মাজীদের বহু জায়গাতেই আলোচিত হয়েছে। কোথাও নামায কায়েম করার আদেশ দিয়ে, কোথাও নামাযীর প্রশংসা ও প্রতিদান এবং বেনামাযীর নিন্দা ও শাস্তি বর্ণনা করে, আল্লাহ তাআলা নামাযের প্রতি বড় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এক স্থানে তিনি বলেন,

﴿فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ﴾

অর্থাৎ, তারপর তারা যদি তওবা করে নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। (নচেৎ নয়।) *(কুঃ ৯/ ১১)*

অন্যত্র বলেন,

﴿ مُنِيْبِيْنَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَلاَ تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

অর্থাৎ, বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর অভিমুখী হও; তাঁকে ভয় কর, যথাযথভাবে নামায পড়, আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। *(কুঃ ৩০/৩১)*

কুরআন মাজীদে নামাযকে মহান আল্লাহ ‘ঈমান’ বলে আখ্যায়ন করেছেন, তিনি বলেন,

{وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} (١٤٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের (কা’বার দিক ছাড়া বায়তুল মাকদেসের দিকে মুখ করে আদায়কৃত পূর্বের) ঈমান (নামায)কে বরবাদ করবেন না। *(কুঃ ২/ ১৪৩)*

নামায মু’মিনের ঈমান ও মুসলিমের ইসলামের নিদর্শন। মহানবী ﷺ বলেন, “ইসলাম ও শির্ক এবং কুফরের মাঝে পার্থক্য নির্বাচনকারী হল এই নামায।” *(মুঃ ৮২নং, মিঃ ৫৬৯নং)*

কোন আমল ত্যাগ করার ফলে কেউ কাফের হয়ে যায় না। কিন্তু সাহাবাগণ নামায ত্যাগ করাকে কুফ্‌রী মনে করতেন। *(তিঃ, মিঃ ৫৭৯নং)*

হযরত ইবনে মাসউদ ؓ বলেন, “যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করে তার দ্বীনই নেই।” *(ইবনে আবী শাইবাহ, ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৫৭১নং)*

হযরত আবূ দারদা ؓ বলেন, “যার নামায নেই তার ঈমানই নেই।” *(ইবনে আব্দুল বার্র, প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৫৭২নং)*

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন, “আমাদের ও ওদের (কাফেরদের) মাঝে চুক্তিই হল নামায। সুতরাং যে ব্যক্তি তা ত্যাগ করবে, সে কাফের হয়ে যাবে (বা কুফরী করবে।) *(তিঃ ২৬২১, ইমাঃ ১০৭৯ নং)*

তিনি আরো বলেন, “পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ বান্দাগণের উপর ফরয করেছেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি তা যথার্থরূপে আদায় করবে এবং তাতে গুরুত্ব দিয়ে তার কিছুও বিনষ্ট করবে না, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি আছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি তা আদায় করবে না, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন, নচেৎ ইচ্ছা হলে জান্নাতেও দিতে পারেন।” *(মাঃ, আদাঃ, নাঃ, ইহিঃ, সতাঃ ৩৬৩ নং)*

পূর্বোক্ত আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে বড় বড় বহু উলামাগণ বলেছেন যে, বেনামাযী কাফের। কোন মুসলিম (নামাযী) নারীর সাথে তার বিবাহ হতে পারে না, তার যবাইকৃত পশুর মাংস হালাল হয় না, সে মারা গেলে তার জানাযা পড়া হবে না, মুসলিম (নামাযী) ছেলেরা তার ওয়ারিস হবে না বা সেও নামাযী বাপের ওয়ারিস হবে না এবং তাকে মুসলিমদের কবরস্থানে দাফন করা হবে না --- ইত্যাদি।

অবশ্য শেষোক্ত হাদীস এবং অনুরূপ অন্যান্য হাদীসের ভিত্তিতে অন্যান্য আলেমগণ বলেন যে, ‘বেনামাযী কাফের নয়, তবে নামায ত্যাগ করা কাফেরের কাজ বটে।’ *(ইবনে বায, ইবনে উসাইমীন ও আলবানীর ফতোয়া দ্রষ্টব্য)*

যাইবা হোক উক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহে নামাযের বিরাট গুরুত্ব স্পষ্ট। নামায হল দ্বীনের খুঁটি। *(সতিঃ ২১১০, সইমাঃ ৩৯৭৩ নং)* দ্বীনের পাঁচটি বুনিয়াদের মধ্যে এটাই হল দ্বিতীয় বুনিয়াদ। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৪নং)* তাই তো প্রিয় নবী ﷺ জীবনের শেষ মুহূর্তে মরণ-শয্যায় শায়িত অবস্থাতেও নামাযের জন্য ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। ইন্তেকালের পূর্বে শেষ উপদেশে তিনি নামাযের গুরুত্ব সম্বন্ধে উম্মতকে সচেতন করে গেলেন। বললেন, “নামায! নামায! আর ক্রীতদাস-দাসী (এর ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থেকো।) *(সজাঃ ৩৮৭৩ নং)*

সাবালক হলেই মুসলিমের উপর নামায ফরয হয়। তবুও অভ্যস্ত করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, “তোমরা তোমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে তাদের বয়স ৭ বছর হলেই নামাযের আদেশ দাও। ১০ বছর বয়সে নামাযে অভ্যাসী না হলে তাদেরকে প্রহার কর। আর তাদের প্রত্যেকের বিছানা পৃথক করে দাও।” *(আদাঃ, মিঃ ৫৭২নং)*

সব অক্তের নামায নয়, কেবলমাত্র এক অক্তের আসরের নামায ছুটে গেলে বা না পড়া হলে তার ক্ষতির পরিমাণ বুঝাতে প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করে, সে ব্যক্তির আমল পন্ড হয়ে যায়।” *(বুখারী ৫৫৩, নাসাঈ)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন-মাল লুণ্ঠন হয়ে গেল।” *(মালেক, বুখারী ৫৫২, মুসলিম ৬২৬ নং প্রমুখ)*

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فخلفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾

অর্থাৎ, ওদের পর এল এমন (অপদার্থ) পরবর্তীদল; যারা নামায নষ্ট করল ও কুপ্রবৃত্তি-পরবশ হল। সুতরাং ওরা অচিরেই কঠিন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। *(কুঃ ১৯/৫৯)*

আল্লাহ তাআলা বলেন,

(فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاؤُوْنَ)

অর্থাৎ, সুতরাং দুর্ভোগ সেই সকল নামাযীদের, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন। যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামায পড়ে। *(কুঃ ১০৭/৪-৬)* বলা বাহুল্য, নামাযী হয়েও নামাযে গাফলতি করার কারণে যদি দোযখের দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়, তাহলে বেনামাযী হয়ে কত বড় দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে তা অনুমেয়।

মরণের পরপারে মধ্যজগতে নামাযে উদাসীন ও শৈথিল্যকারী ব্যক্তির মাথায় কিয়ামত অবধি পাথর ঠুকে ঠুকে মারা হবে। *(বুঃ ১১৪৩নং)*

নামায আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সম্পর্কের এক সেতুবন্ধ। "কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট থেকে সর্বাগ্রে যে আমলের হিসাব নেওয়া হবে তা হল নামায। সুতরাং তা সঠিক হয়ে থাকলে তার অন্যান্য আমলও সঠিক বলে বিবেচিত হবে। নচেৎ অন্যান্য সকল আমল নিষ্ফল ও ব্যর্থ হবে।" *(ত্বাবঃ, সতাঃ ৩৬৯নং)*

নামায এত গুরুত্বপূর্ণ যে, তার শর্তাবলী বর্তমান থাকা কালে তা (নাবালক শিশু, পাগল ও ঋতুমতী মহিলা ছাড়া) কারো জন্য কোন অবস্থাতেই মাফ নয়। এমন কি যুদ্ধের ময়দানে প্রাণহন্তা রক্ত-পিপাসু শত্রুদলের সামনেও নয়! *(কুঃ ৪/১০২)* অসুস্থ অবস্থায় খাড়া হয়ে না পারলে বসে, বসে না পারলে কাৎ হয়ে শুয়েও নামায পড়তেই হবে। *(বুঃ, মিঃ ১২৪৮ নং)* ইশারা-ইঙ্গিতে রুকু-সিজদা না করতে পারলে মনে মনে নিয়তেও নামায পড়তে হবে। চেষ্টা সত্ত্বেও পবিত্র থাকতে অক্ষম হলেও ঐ অবস্থাতেই নামায ফরয। *(ইবনে উসাইমীন, কাইফা য়্যাতাত্বাহ্‌হারুল মারীযু অয়্যুসাল্লী দ্রষ্টব্য)*

পবিত্রতা

নামায কবুল হওয়ার জন্য যেরূপ বিশুদ্ধ ঈমান এবং হৃদয়কে শির্কী ও কুফরী ধারণা ও বিশ্বাস থেকে পবিত্র রাখা জরুরী শর্ত, তদ্রূপ নামাযীর বাহ্যিক দেহ ও পোশাক-আশাককে পবিত্র রাখাও এক জরুরী শর্ত। যেহেতু "নামাযের চাবিকাঠিই হল পবিত্রতা।" *(আদাঃ, তিঃ, দাঃ, মিঃ ৩১২ নং)* তাছাড়া এই পবিত্রতা হল অর্ধেক ঈমান। *(মুঃ, মিঃ ২৮১নং)*

(বিশেষ করে পানি দ্বারা অর্জিত) পবিত্রতায় বৃদ্ধি হয় মনোযোগ, দূর হয় আলস্য, তন্দ্রা ও নিদ্রা, স্ফূর্তির সাথে ইবাদতে মন বসে অধিক।

মযী বা মলমূত্র থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি বা (যথেষ্ট পানি না পাওয়া গেলে) মাটির ঢেলা ব্যবহার করে তা দূর করা এবং ওযু করাই যথেষ্ট। অবশ্য কোন প্রকারের মৈথুন দ্বারা বা স্বপ্নে অথবা যৌনচিন্তায় উত্তেজনা ও তৃপ্তির সাথে বীর্যপাত করলে বা হলে গোসল ফরয। যেমন সঙ্গমে যোনীপথে লিঙ্গাগ্র প্রবেশ করিয়ে বীর্যপাত না করলেও গোসল ফরয। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৪৩০নং)* অনুরূপ মহিলাদের মাসিক ও নেফাস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যও গোসল ফরয।

ওযু ও গোসলের জন্য ব্যবহার্য পানিও পবিত্র তথা পবিত্রকারী হওয়া জরুরী। সাধারণতঃ পুকুর, নদী, নালা, সমুদ্র, প্রভৃতির পানি পবিত্র ও পবিত্রকারী। যে পানিতে পবিত্র কোন

জিনিস -যেমন আটা, সাবান, জাফরান ইত্যাদি মিশ্রিত হয়, সে পানির রং, গন্ধ বা স্বাদ পরিবর্তন না হলে তাতে ওযু-গোসল চলবে।

পানিতে কোন অপবিত্র জিনিস পড়ে যাওয়ার ফলে অথবা অন্য কোন কারণে যদি তার রং, স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে তা নাপাক গণ্য হবে। পরিবর্তন না হলেও যদি পানি ২ কুল্লাহ (প্রায় ২৭০ লিটার, মতান্তরে ১৯১ থেকে ২০০ কেজি) এর চেয়ে কম হয়, তাহলেও তা নাপাক। এর বেশী হলে সে পানি পাক। তাতে ওযু-গোসল চলবে। *(আঃ, আদাঃ, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ, দাঃ, মিঃ ৪৭৭নং)*

যে পানি একবার ওযু-গোসলে ব্যবহার হয়েছে, সে পানি পাক। কিন্তু তাতে আর ওযু-গোসল হবে না।

মানুষ, গাধা, খচ্চর, পাখী, হালাল পশু, বিড়াল প্রভৃতির এঁটো পানি পাক; তাতে ওযু-গোসল চলবে। অবশ্য শূকর ও কুকুরের এঁটো পানি নাপাক। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য ফিসুঃ উর্দু ৩৩-৩৭পৃঃ)*

গোসল করার নিয়ম

নাপাকীর গোসল করতে হলে গোসলের নিয়ত করে মুসলিম প্রথমে ৩ বার দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুবে। অতঃপর বাম হাতের উপর পানি ঢেলে দেহের নাপাকী ধুয়ে ফেলবে। তারপর বাম হাতকে মাটি অথবা সাবান দ্বারা ধুয়ে নামাযের জন্য ওযু করার মত পূর্ণ ওযু করবে। অবশ্য গোসলের জায়গা পরিষ্কার না হলে পা দুটি গোসল শেষে ধুয়ে নেবে। ওযুর পর ৩ বার মাথায় পানি ঢেলে ভাল করে চুলগুলো ধোবে, যাতে সমস্ত চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর সারা দেহে ৩ বার পানি ঢেলে ভালরূপে ধুয়ে নেবে। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৪৩৫-৪৩৬ নং)*

মহিলাদের গোসলও পুরুষদের অনুরূপ। অবশ্য মহিলার মাথার চুলে বেণী বাঁধা (চুটি গাঁথা) থাকলে তা খোলা জরুরী নয়। তবে ৩ বার পানি নিয়ে চুলের গোড়া অবশ্যই ধুয়ে নিতে হবে। *(বুঃ, মিঃ ৪৩৮-নং)* নখে নখপালিশ বা কোন প্রকার পুরু পেন্ট্ থাকলে তা তুলে না ফেলা পর্যন্ত গোসল হবে না। পক্ষান্তরে মেহেদী বা আলতা লেগে থাকা অবস্থায় গোসল হয়ে যাবে। কপালে টিপ (?) থাকলে ছাড়িয়ে ফেলে (কপাল) ধুতে হবে। নচেৎ গোসল হবে না।

বীর্যপাত বা সঙ্গম-জনিত নাপাকী ও মাসিকের গোসল, অথবা মাসিক ও ঈদ, অথবা বীর্যপাত বা সঙ্গম-জনিত নাপাকী ও জুমআ বা ঈদের গোসল নিয়ত হলে একবারই যথেষ্ট। পৃথক পৃথক গোসলের দরকার নেই। *(ফিসুঃ উর্দু ৬০পৃঃ দ্রঃ)*

গোসলের পর নামাযের জন্য আর পৃথক ওযুর প্রয়োজন নেই। গোসলের পর ওযু ভাঙ্গার কোন কাজ না করলে গোসলের ওযুতেই নামায হয়ে যাবে। *(আদাঃ, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ, মিঃ ৪৪৫নং)*

রোগ-জনিত কারণে যদি কারো লাগাতার বীর্য, মযী, স্রাব বা ইস্তিহাযার খুন ঝরে তবে তার জন্য গোসল ফরয নয়; প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযুই যথেষ্ট। এই সকল অবস্থায় নামায মাফ নয়। *(আদাঃ, তিঃ, মিঃ ৫৬০-৫৬১ নং)*

প্রকাশ যে, গোসল, ওযু বা অন্যান্য কর্মের সময় নিয়ত আরবীতে বা নিজ ভাষায় মুখে

উচ্চারণ করা বিদআত।

সতর্কতার বিষয় যে, নাপাকী দূর করার জন্য কেবল গা-ধোয়া বা গা ডুবিয়ে নেওয়া যথেষ্ট নয়। পূর্বে ওযু করে যথানিয়মে গোসল করলে তবেই পূর্ণ গোসল হয়। নচেৎ অনেকের মতে কুল্লি না করলে এবং নাকে পানি না নিলে গোসলই শুদ্ধ হবে না। *(মুমঃ ১/৩০৪)*

ওযু ও তার গুরুত্ব

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করবে। আর পা দু’টিকে গাঁট পর্যন্ত ধৌত করবে। *(কুঃ ৫/৬)*

সুতরাং বড় নাপাকী না থাকার ফলে গোসলের দরকার না হলেও নামাযের জন্য ছোট নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ওযু ফরয। এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ ও বলেন, “ওযু নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় ওযু না করা পর্যন্ত আল্লাহ কারো নামায কবুল করেন না।” *(বুঃ, মুঃ মিঃ ৩০০নং)*

ওযুর মাহাত্ম্য ও ফযীলত প্রসঙ্গে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে তিনি বলেন, “কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে আহ্বান করা হবে; আর সেই সময় ওযুর ফলে তাদের মুখমন্ডল ও হাত-পা দীপ্তিময় থাকবে।” *(বুঃ ১৩৬, মুঃ ২৪৬নং)*

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন, “ওযুর পানি যদ্দূর পৌঁছবে তদ্দূর মু’মিনের অঙ্গে অলঙ্কার (জ্যোতি) শোভমান হবে।” *(মুঃ ২৫০নং)*

তিনি আরো বলেন, “মুসলিম বা মুমিন বান্দা যখন ওযুর উদ্দেশ্যে তার মুখমন্ডল ধৌত করে তখন ওযুর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায় যা সে দুই চক্ষুর দৃষ্টির মাধ্যমে করে ফেলেছিল। অতঃপর যখন সে তার হাত দুটিকে ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায় যা সে উভয় হাতে ধারণ করার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। অতঃপর যখন সে তার পা দুটিকে ধৌত করে তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে প্রত্যেক সেই গোনাহ বের হয়ে যায় যা সে তার দুপায়ে চলার মাধ্যমে করে ফেলেছিল। শেষ অবধি সমস্ত গোনাহ থেকে সে পবিত্র হয়ে বের হয়ে আসে।” *(মালেক, মুসলিম ২৪৪নং, তিরমিযী)*

ওযু করার নিয়ম

১- নামাযী প্রথমে মনে মনে ওযুর নিয়ত করবে। কারণ নিয়ত ছাড়া কোন কর্মই শুদ্ধ হয় না। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১নং)*

২- 'বিসমিল্লাহ' বলে ওযু শুরু করবে। কারণ শুরুতে তা না বললে ওযু হয় না। *(সআদাঃ ৯২নং)*

৩- তিনবার দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নেবে। হাতে ঘড়ি, চুড়ি, আংটি প্রভৃতি থাকলে তা হিলিয়ে তার তলে পানি পৌঁছাবে। আঙ্গুল দিয়ে আঙ্গুলের ফাঁকগুলো খেলাল করবে। *(আদাঃ, তিঃ, ইমাঃ, মিঃ ৪০৭নং)* এরপর পানির পাত্রে হাত ডুবিয়ে পানি নিতে পারে। *(বুঃ, মুঃ ৩৯৪নং)* প্রকাশ যে, নখে নখপালিশ বা কোন প্রকার পুরু পেন্ট্ থাকলে তা তুলে না ফেলা পর্যন্ত ওযু হবে না। পক্ষান্তরে মেহেদী বা আলতা লেগে থাকা অবস্থায় ওযু-গোসল হয়ে যাবে।

৪- তারপর ডান হাতে পানি নিয়ে ৩ বার কুল্লি করবে।

৫-অতঃপর পানি নিয়ে নাকের গোড়ায় লাগিয়ে টেনে নিয়ে বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়বে। এরূপ ৩ বার করবে। তবে রোযা অবস্থায় থাকলে সাবধানে নাকে পানি টানবে, যাতে গলার নিচে পানি না চলে যায়। *(তিঃ, নাঃ, সনাঃ ৮৯, মিঃ ৪০৫, ৪১০নং)*

অবশ্য এক লোট পানিতেই একই সাথে অর্ধেক দিয়ে কুল্লি করে বাকি অর্ধেক দিয়ে নাক ঝাড়লেও চলে। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৩৯৪নং)*

৬- অতঃপর মুখমন্ডল (এক কান থেকে অপর কানের মধ্যবর্তী এবং কপালের চুলের গোড়া থেকে দাড়ির নিচের অংশ পর্যন্ত অঙ্গ) ৩ বার পানি লাগিয়ে দুই হাত দ্বারা ধৌত করবে। *(বুঃ ১৪০নং)* এক লোট পানি দাড়ির মাঝে দিয়ে দাড়ির ফাঁকে ফাঁকে আঙ্গুল চালিয়ে তা খেলাল করবে। *(আদাঃ, মিঃ ৪০৮-নং)* মহিলাদের কপালে টিপ (?) থাকলে ছাড়িয়ে ফেলে (কপাল) ধুতে হবে। নচেৎ ওযু হবে না।

৭- অতঃপর প্রথমে ডান হাত আঙ্গুলের ডগা থেকে কনুই পর্যন্ত এবং তদনুরূপ বাম হাত ৩ বার (প্রত্যেক বারে পুরো হাতে পানি ফিরিয়ে রগড়ে) ধৌত করবে।

৮- অতঃপর একবার মাথা মাসাহ করবে; নতুন পানি দ্বারা দুই হাতকে ভিজিয়ে আঙ্গুলগুলিকে মুখোমুখি করে মাথার সামনের দিক (যেখান থেকে চুল গজানো শুরু হয়েছে সেখান) থেকে পিছন দিক (গর্দানের যেখানে চুল শেষ হয়েছে সেখান) পর্যন্ত স্পর্শ করে পুনরায় সামনের দিকে নিয়ে এসে শুরুর জায়গা পর্যন্ত পূর্ণ মাথা মাসাহ করবে। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৩৯৪নং)* মাথায় পাগড়ি থাকলে তার উপরেও মাসাহ করবে। *(মুঃ, মিঃ ৩৯৯নং)*

৯- অতঃপর আর নতুন পানি না নিয়ে ঐ হাতেই দুই কান মাসাহ করবে; শাহাদতের (তর্জনী) দুই আঙ্গুল দ্বারা দুই কানের ভিতর দিক এবং দুই বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা দুই কানের পিঠ ও বাহির দিক মাসাহ করবে। *(সআদাঃ ৯৯, ১২৫নং)*

প্রকাশ যে, গর্দান মাসাহ করা বিধেয় নয়। বরং এটা বিদআত।

১০- অতঃপর প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা গাঁট পর্যন্ত ৩ বার করে রগড়ে ধোবে। কড়ে

আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকগুলো খেলাল করে রগড়ে ধৌত করবে। *(আদাঃ, তিঃ, ইমাঃ, মিঃ ৪০৭নং)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "পূর্ণাঙ্গরূপে ওযু কর, আঙ্গুলের ফাঁকগুলো খেলাল কর আর রোযা না থাকলে নাকে খুব ভালরূপে পানি চড়াও। (তারপর তা ঝেড়ে ফেলে উত্তমরূপে নাক সাফ কর।) *(আদাঃ, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ, দাঃ, মিঃ ৪০৫-৪০৬ নং)*

১১- এরপর হাতে পানি নিয়ে কাপড়ের উপর থেকে শরমগাহে ছিটিয়ে দেবে। বিশেষ করে পেশাব করার পর ওযু করলে এই আমল অধিকরূপে ব্যবহার্য। যেহেতু পেশাব করে তাহারতের পর দু-এক কাতরা পেশাব বের হওয়ার অসঅসা থাকে। সুতরাং পানি ছিটিয়ে দিলে ঐ অসঅসা দূর হয়ে যায়। *(সআদাঃ ১৫২-১৫৪, সইমাঃ ৩৭৪-৩৭৬নং)* এই আমল খোদ জিবরাঈল ﷺ মহানবী ﷺ কে শিক্ষা দিয়েছেন। *(ইমাঃ, দাঃ, হাঃ, বাঃ, আঃ, সিসঃ ৮৪১নং)*

ওযুর শেষে দুআ

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউই পরিপূর্ণরূপে ওযু করার পর (নিম্নের যিক্‌র) পড়ে তার জন্যই জান্নাতের আটটি দ্বার উন্মুক্ত করা হয়; যে দ্বার দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারে।

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

"আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু অরাসূলুহ।"

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক তাঁর কোন অংশী নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল। *(মুসলিম ২৩৪নং, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)*

তিরমিযীর বর্ণনায় এই দুআর শেষে নিম্নের অংশটিও যুক্ত আছেঃ-

اَللّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাজ্‌আলনী মিনাত্‌ তাওয়াবীনা, অজ্‌আলনী মিনাল মুতাত্বাহহিরীন।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের দলভুক্ত কর। *(মিঃ ২৮৯নং)*

ওযুর শেষে নিম্নের দুআ পাঠ করলে তা শুভ্র নিবন্ধে লিখে সীল করা হয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা নষ্ট করা হয় না।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

"সুবহানাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত্‌, আস্তাগফিরুকা অ আতূবু ইলাইক্‌।"

অর্থাৎ, তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি হে আল্লাহ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তুমিই

একমাত্র সত্য উপাস্য। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও তোমার দিকে প্রত্যাবর্তন (তওবা) করছি। *(ত্বাঃ, সতাঃ ২ ১৮-নং, ইগঃ ১/ ১৩৫, ৩/৯৪)*

এ ছাড়া প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় নির্দিষ্ট দুআ অথবা শেষে 'ইন্না আনযালনা' পাঠ বিদআত।

ওযুর আনুষঙ্গিক মাসায়েল

ওযুর অঙ্গগুলোকে কমপক্ষে ১ বার করে ধোয়া জরুরী। ২ বার করে ধুলেও চলে। তবে ৩ বার করে ধোয়াই উত্তম। এরই উপরে আল্লাহর রসূল ﷺ তথা সাহাবায়ে কেরামের আমল বেশী। কিন্তু তিনবারের অধিক ধোয়া অতিরঞ্জন, বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন করা। *(আদাঃ, নাঃ, ইমাঃ, মিঃ ৪১৭-৪১৮ নং)*

ওযুর কোন অঙ্গ ২ বার এবং কোন অঙ্গ ৩ বার ধোয়া দূষণীয় নয়। *(সংআদাঃ ১০৯, সংতিঃ ৪৩নং)*

জোড়া অঙ্গগুলির ডান অঙ্গকে আগে ধোয়া রসূল ﷺ এর নির্দেশ। *(আঃ, আদাঃ, ইমাঃ, মিঃ ৪০১নং)* তিনি ওযু, গোসল, মাথা আঁচড়ানো, জুতো পরা প্রভৃতি সকল কাজের সময় ডান থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৪০০নং)*

ওযুর অঙ্গগুলো -বিশেষ করে হাত ও পা- রগড়ে ধোয়া উত্তম। রসূল ﷺ এর এরূপই আমল ছিল। *(সনাঃ ৭২, মিঃ ৪০৭নং)*

অঙ্গসমূহ এমনভাবে ধুতে হবে যাতে কোন সামান্য জায়গাও শুকনো থেকে না যায়। ওযুর অঙ্গে কোন প্রকার পানিরোধক বস্তু (যেমন পেন্ট, চুন, কুমকুম, অলঙ্কার, ঘড়ি, টিপ ইত্যাদি) থাকলে তা অবশ্যই দূর করে নিতে হবে। যেহেতু আল্লাহর নবী ﷺ একদা কতক লোকের শুষ্ক গোড়ালি দেখে বলেছিলেন, "গোড়ালিগুলোর জন্য দোযখে ধ্বংস ও সর্বনাশ রয়েছে! তোমরা ভালরূপে (সকল অঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে) ধুয়ে ওযু কর।" *(মুঃ, মিঃ ৩৯৮-নং)*

এক ব্যক্তি ওযু করার পর মহানবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলে দেখলেন, তার দুই পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুষ্ক রয়েছে। তিনি তাকে বললেন, "তুমি ফিরে গিয়ে ভালরূপে ওযু করে এস।" *(সআদাঃ ১৫৮-নং)*

এক ব্যক্তিকে তিনি দেখলেন নামায পড়ছে, আর তার এক পায়ের পিঠে এক দিরহাম বরাবর স্থান শুষ্ক রয়েছে, যাতে সে পানিই পৌঁছায়নি। তিনি তাকে পুনরায় ওযু করে নতুনভাবে নামায পড়তে আদেশ দিলেন। *(সআদাঃ ১৬১ নং)*

ওযু করার সময় নিরবচ্ছিন্নভাবে একটানা অঙ্গগুলোকে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ধুতে হবে। মাঝে বিরতি দেওয়া বৈধ নয়। সুতরাং কেউ মাথা বা কান মাসাহ না করে ভুলে পা ধুয়ে ফেললে এবং সত্বর মনে পড়লে, সে মাসাহ করে পুনরায় পা ধোবে। বহু পরে মনে পড়লে পুনরায় নতুন করে ওযু করবে।

কেউ যদি ওযু শুরু করার পর কাপড়ে নাপাকী দেখে এবং তা সাফ করতে করতে পূর্বেকার ধৌত অঙ্গ শুকিয়ে যায়, তাহলে তাকে পুনঃ ওযু করতে হবে। পক্ষান্তরে যদি ওযু সম্পর্কিত কোন বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে নিরবচ্ছিন্নতা কেটে যায়, তবে তাতে কোন ক্ষতি হয় না। যেমন ওযু

করতে করতে হাতে বা ওযুর কোন অঙ্গে পেন্ট্ বা নখ-পালিশ বা চুন ছাড়াতে অথবা পানি শেষ হয়ে গেলে পুনরায় কুঁয়ো বা কল থেকে পানি তুলতে কিংবা ট্যাঙ্কের পাইপ খুলতে প্রভৃতি কারণে ওযুতে সামান্য বিরতি এসে পূর্বেকার ধোয়া অঙ্গ শুকিয়ে যায়, তাহলে পুনরায় নতুনভাবে শুরু করে ওযু করতে হবে না। যে অঙ্গ ধোয়া হয়েছিল তার পর থেকেই বাকী অঙ্গসমূহ ধুয়ে ওযু শেষ করা যাবে। *(মুমঃ ১/ ১৫৭)*

ওযু করার সময় বাঁধানো দাঁত খোলা বা খেলাল করে দাঁতের ফাঁক থেকে লেগে থাকা খাদ্যাংশ বের করা জরুরী নয়। *(ফউঃ ১/২৮৩, ফমঃ ১/২ ১০)*

একই পাত্র হতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক সাথে অথবা স্ত্রী আগে ও স্বামী পরে অথবা তার বিপরীতভাবে ওযু-গোসল করায় কোন ক্ষতি বা বাধা নেই। আল্লাহর রসূল ﷺ তথা সাহাবাগণ এরূপ আমল করেছেন। *(বুঃ, ফতহুল বারী ১/৩৫৭-৩৫৮, মুঃ, মিঃ ৪৪০নং)*

ঠান্ডার কারণে গরম পানিতে ওযু-গোসল করায় কোন বাধা নেই। হযরত উমার ﷺ এরূপ করতেন। *(বুঃ, ফবাঃ ১/৩৫৭-৩৫৮)*

ওযু-গোসলের জন্য পরিমিত পানি ব্যবহার করা কর্তব্য। অধিক পানি খরচ করা অতিরঞ্জনের পর্যায়ভুক্ত; আর তা বৈধ নয়। *(আঃ আদাঃ, ইমাঃ, মিঃ ৪১৮-নং)* মহানবী ﷺ ১ মুদ্দ্ (কম-বেশী ৬২৫ গ্রাম) পানিতে ওযু এবং ১ সা’ থেকে ৫ মুদ্দ্ (কম-বেশী ২৫০০ থেকে ৩১২৫ গ্রাম) পানিতে গোসল করতেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৪৩৯নং)* সুতরাং যাঁরা ট্যাঙ্কের পানিতে ওযু-গোসল করেন, তাঁদেরকে সতর্ক হওয়া উচিত।

ওযুর ফরয অঙ্গ সম্পূর্ণ কাটা থাকলে তার বাকী অঙ্গ ধুতে বা মাসাহ করতে হয় না। যেমন একটি হাত গোটা বা কনুই পর্যন্ত অথবা একটি পা গোটা বা গাঁট পর্যন্ত কাটা থাকলে বাকী একটি হাত বা পা-ই ওযুর জন্য ধুতে হবে। *(ফইঃ ১/৩৯০)*

ওযুর শেষে পাত্রের অবশিষ্ট পানি থেকে এক আঁজলা দাঁড়িয়ে পান করার কথা হাদীসে রয়েছে। *(বুঃ ৫৬১৬, সতিঃ ৪৪-৪৫, সনাঃ ৯৩নং)*

ওযুর শেষে ওযুর পানি অঙ্গ থেকে কাপড় দিয়ে মুছে ফেলা দূষণীয় নয়। মহানবী ﷺ ওযুর পর নিজের জুব্বায় নিজের চেহারা মুছেছেন। *(সইমাঃ ৩৭৯নং)* ওযূর পর পানি মুছার জন্য তাঁর একটি বস্ত্রখন্ড ছিল। *(তিঃ, হাঃ, সজাঃ ৪৮৩০নং)*

ওযুর পর দুই রাকআত নামাযের বড় ফযীলত রয়েছে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে কোন ব্যক্তি যখনই সুন্দরভাবে ওযু করে সবিনয়ে একাগ্রতার সাথে (কায়মনোবাক্যে) দুই রাকআত নামায পড়ে তক্ষণই তার জন্য জান্নাত অবধার্য হয়ে যায়।” *(মুসলিম ২৩৪নং, আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে, কোন ভুল না করে (একাগ্রচিত্তে) দুই রাকআত নামায পড়ে সেই ব্যক্তির পূর্বেকার সমূদয় গোনাহ মাফ হয়ে যায়।” *(আবু দাঊদ, সহীহ তারগীব ২২১নং)*

ওযুর পরে নামায পড়ার ফলেই নবী ﷺ বেহেশ্তে তাঁর আগে আগে হযরত বিলালের জুতোর শব্দ শুনেছিলেন। *(বুঃ, মুঃ, সতাঃ ২১৯নং)*

প্রিয় নবী ﷺ প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযু করতেন। তবে সাহাবাগণ না ভাঙ্গা পর্যন্ত একই ওযুতে কয়েক অক্তের নামায পড়তেন। *(আঃ, বুঃ ২১৪ নং, আদাঃ, তিঃ, নাঃ, দাঃ, মিঃ ৪২৫নং)*

অবশ্য মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ এক ওযুতেই পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়েছিলেন। *(মুঃ ২৭৭, আদাঃ ১৭২, ইমাঃ ৫১০নং)*

সর্বদা ওযু অবস্থায় থাকা এবং ওযু ভাঙ্গলে সাথে সাথে ওযু করে নেওয়ার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা (প্রত্যেক বিষয়ে) কর্তব্যনিষ্ঠ রহ; আর তাতে কখনই সক্ষম হবে না। জেনে রেখো, তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল নামায। আর মুমিন ব্যতীত কেউই ওযুর হিফাযত করবে না।" *(ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ১৯০নং)*

হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদাহ তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করে বলেন, একদা প্রভাতকালে আল্লাহর রসূল ﷺ হযরত বিলালকে ডেকে বললেন, "হে বিলাল! কি এমন কাজ করে তুমি জান্নাতে আমার আগে চলে গেলে? আমি গত রাত্রে (স্বপ্নে) জান্নাতে প্রবেশ করলে তোমার (জুতার) শব্দ আমার সামনে থেকে শুনতে পেলাম!" বিলাল বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দুই রাকআত নামায পড়েছি। আর যখনই আমি অপবিত্র হয়েছি তখনই আমি সাথে সাথে ওযু করে নিয়েছি।' এ শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "এই কাজের জন্যই। (জান্নাতে আমার আগে আগে তোমার শব্দ শুনলাম।)" *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ১৯৪নং)*

রোগীর পবিত্রতা ও ওযু-গোসল

রোগী হলেও গোসল ওয়াজেব হলে গোসল এবং ওযুর দরকার হলে ওযু করা জরুরী।

ঠান্ডা পানি ব্যবহার করায় ক্ষতির আশঙ্কা হলে রোগী গরম পানি ব্যবহার করবে। পানি ব্যবহারে একেবারেই অসমর্থ হলে বা রোগ-বৃদ্ধি অথবা আরোগ্য লাভে বিলম্বের আশঙ্কা হলে তায়াম্মুম করবে।

রোগী নিজে ওযু বা তায়াম্মুম করতে না পারলে অন্য কেউ করিয়ে দেবে।

ওযুর কোন অঙ্গে ক্ষত থাকলেও তা ধুতে হবে। অবশ্য পানি লাগলে ঘা বেড়ে যাবে এমন আশঙ্কা থাকলে হাত ভিজিয়ে তার উপর বুলিয়ে মাসাহ করবে। মাসাহ করাও ক্ষতিকারক হলে ঐ অঙ্গের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নেবে।

ক্ষতস্থানে পটি বাঁধা বা প্লাস্টার করা থাকলে অন্যান্য অঙ্গ ধুয়ে পটির উপর মাসাহ করবে। মাসাহ করলে আর তায়াম্মুমের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্যও দেহ, লেবাস ও নামায পড়ার স্থানের সর্বপ্রকার পবিত্রতা জরুরী। কিন্তু অপবিত্রতা দূর করতে না পারলে যে অবস্থায় থাকবে সে অবস্থাতেই তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

কোন নামাযকে তার যথা সময় থেকে পিছিয়ে দেওয়া (যেমন ফজরকে যোহরের সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা) রোগীর জন্যও বৈধ নয়। যথা সম্ভব পবিত্রতা অর্জন করে অথবা (অক্ষম হলে) না করেই নামাযের যথা সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই নামায অবশ্যই পড়ে নেবে।

নচেৎ গোনাহগার হবে। *(রাসাইল ফিত্ তাহারাতি অস্ সালাত, ইবনে উসাইমীন ৩৯-৪১পৃঃ)*

কেবলমাত্র মাথা ধুলে অসুখ হওয়ার বা বাড়ার ভয় হলে বাকী দেহ ধুয়ে মাথায় মাসাহ করবে। অবশ্য এর সাথে তায়াম্মুমও করতে হবে। *(ইবনে বায, ফইঃ ১/২১৪)*

সর্বদা প্রস্রাব ঝরলে অথবা বাতকর্ম হলে অথবা মহিলাদের সাদা স্রাব ঝরলে প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযু জরুরী। *(ফউঃ ১/২৮৭-২৯১দ্রঃ)*

নামাযের সময় হলে যদি কাপড়ে নাপাকী লেগে থাকে, তবে নামাযী তা বদলে লজ্জাস্থান ধুয়ে ওযু করবে। নামাযের সময় যাতে নাপাকী অন্যান্য অঙ্গে বা কাপড়ে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য শরমগাহে বিশেষ কাপড়, ল্যাঙ্গট বা পটি ব্যবহার করবে।

গোসল করলে রোগ-বৃদ্ধি হবে এবং ওযু করলে ক্ষতি হবে না বুঝলে তায়াম্মুম করে ওযু করবে।

ওযু নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ

১। পেশাব ও পায়খানা দ্বার হতে কিছু (পেশাব, পায়খানা, বীর্য, মযী, হাওয়া, রক্ত, কৃমি, পাথর প্রভৃতি) বের হলে ওযু ভেঙ্গে যায়। *(মুমঃ ১/২২০)*

তদনুরূপ দেহের অন্যান্য অঙ্গ থেকে (যেমন অপারেশন করে পেট থেকে পাইপের মাধ্যমে) অপবিত্র (বিশেষ করে পেশাব-পায়খানা) বের হলেও ওযু নষ্ট হয়ে যাবে। *(ঐ ১/২২১)*

২। যাতে গোসল ওয়াজেব হয়, তাতে ওযুও নষ্ট হয়।

৩। কোন প্রকারে বেহুশ বা জ্ঞানশূন্য হলে ওযু নষ্ট হয়।

৪। গাঢ়ভাবে ঘুমিয়ে পড়লে ওযু ভাঙ্গে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “চোখ হল মলদ্বারের বাঁধন। সুতরাং যে ঘুমিয়ে যায়, সে যেন ওযু করে।” *(আঃ, আদাঃ, ইমাঃ, মিঃ ৩১৬, সজাঃ ৪১৪৯নং)*

অবশ্য হাল্কা ঘুম বা ঢুল (তন্দ্রা) এলে ওযু ভাঙ্গে না। সাহাবায়ে কেরাম নবী ﷺ এর যুগে এশার নামাযের জন্য তাঁর অপেক্ষা করতে করতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঢুলতেন। অতঃপর তিনি এলে তাঁরা নামায পড়তেন, কিন্তু নতুন করে আর ওযু করতেন না। *(মুঃ ৩৭৬নং, আদাঃ ১৯৯-২০১নং)*

৫। পেশাব অথবা পায়খানা-দ্বার সরাসরি স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয়। (কাপড়ের উপর থেকে হাত দিলে নষ্ট হয় না।) *(সজাঃ ৬৫৫৪, ৬৫৫৫নং)* মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিনা পর্দায় ও অন্তরালে নিজের শরমগাহ স্পর্শ করে, তার উপর ওযু ওয়াজেব হয়ে যায়।” *(সজাঃ ৩৬২, সিসঃ ১২৩৫ নং)*

হাতের কব্জির উপরের অংশ দ্বারা স্পর্শ হলে ওযু ভাঙ্গবে না। *(মুমঃ ১/২২৯)*

৬। উটের গোশ্ত্ (কলিজা, ভুঁড়ি) খেলে ওযু ভেঙ্গে যায়। এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করল, ‘উটের গোশ্ত্ খেলে ওযু করব কি?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ, উটের গোশ্ত্ খেলে ওযু করো।” *(মুঃ ৩৬০নং)*

তিনি বলেন, “উটের গোশ্ত্ খেলে তোমরা ওযু করো।” *(আঃ, আদাঃ, তিঃ, ইমাঃ, সজাঃ ৩০০৬ নং)*

যাতে ওযু নষ্ট হয় না

১। নারীদেহ স্পর্শ করলে ওযু ভাঙ্গে না। কারণ, মহানবী ﷺ রাত্রে নামায পড়তেন, আর মা আয়েশা (রাঃ) তাঁর সম্মুখে পা মেলে শুয়ে থাকতেন। যখন তিনি সিজদায় যেতেন, তখন তাঁর পায়ে স্পর্শ করে পা সরিয়ে নিতে বলতেন। এতে তিনি নিজের পা দু'টিকে গুটিয়ে নিতেন। *(বুঃ ৫১৩, মুঃ ৫১২নং)*

তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে চুম্বন দিতেন। তারপর ওযু না করে নামায পড়তে বেরিয়ে যেতেন। *(আদাঃ ১৭৮-১৭৯ নং, আঃ ৬/২১০, দিঃ ৮৬, নাঃ ১৭০, ইমাঃ ৫০২নং, দারাঃ ১/১৩৮, বাঃ ১/১২৫)*

অবশ্য স্পর্শ বা চুম্বনে মযী বের হলে তা ধুয়ে ওযু জরুরী। *(ফউঃ ১/২৮৫-২৮৬)*

২। হো-হো করে হাসলে; এ প্রসঙ্গের হাদীসটি দলীলের যোগ্য নয়। তাই হাসলে ওযু ভাঙ্গে না। *(ফিসুঃ উর্দু ১/৫০-৫১, বুঃ, ফবাঃ ১/৩৩৬)*

৩। বমি করলে; একদা নবী ﷺ বমি করলে রোযা ভেঙ্গে ফেললেন। তারপর তিনি ওযু করলেন। *(আঃ ৬/৪৪৯, তিঃ)* এই হাদীসে তাঁর কর্মের পরস্পর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। বমি করলেন বলে ওযু ভেঙ্গে গিয়েছিল, তাই তিনি ওযু করেছিলেন -তা প্রমাণ হয় না। *(ইগঃ ১/১৪৮, মুমঃ ১/২২৪-২২৫)*

৪। গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলালে; গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলানো কাবীরা গোনাহ। কিয়ামতে আল্লাহ সেই ব্যক্তির দিকে তাকিয়েও দেখবেন না, যে ব্যক্তি তার পরনের কাপড় পায়ের গাঁটের নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরে। *(বুঃ ৫৭৮৪, মুঃ ২০৮৫নং)* কিন্তু এর ফলে ওযু ভাঙ্গে না। এক ব্যক্তি ঐরূপ কাপড় ঝুলিয়ে নামায পড়লে মহানবী ﷺ তাকে পুনরায় ওযু করে নামায পড়তে হুকুম দিয়েছিলেন বলে যে হাদীস আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে, তা যয়ীফ এবং দলীলের যোগ্য নয়। *(যঃ আদাঃ ১২৪, ৮৮৪নং)*

৫। নাক থেকে রক্ত পড়লে; এতে ওযু নষ্ট হয় বলে হাদীস ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে, তা যয়ীফ। *(যঃ ইমাঃ ২৫২, যঃজাঃ ৫৪২৬নং)*

৬। দেহের কোন অঙ্গ কেটে রক্ত পড়লে, দাঁত থেকে রক্ত ঝরলে, তীরবিদ্ধ হয়ে রক্ত পড়লে; যা-তুর রিকা' যুদ্ধে নবী ﷺ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তি তীরবিদ্ধ হয়ে রক্তাক্ত হলেও সে রুকু সিজদা করে নামায সম্পন্ন করেছিল। হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, মুসলিমরা এ যাবৎ তাদের রক্তাক্ত ক্ষত নিয়েই নামায পড়ে আসছে। হযরত ইবনে উমার رضي الله عنه একটি ফুসকুরি গেলে দিলে তা থেকে রক্ত বের হল। কিন্তু তিনি ওযু করলেন না। ইবনে আবী আওফা রক্তমাখা থুথু ফেললেন। অতঃপর তিনি তাঁর নামায সম্পন্ন করলেন। ইবনে উমার ও হাসান বলেন, কেউ শৃঙ্গ লাগিয়ে বদ-রক্ত বের করলে কেবল ঐ জায়গাটা ধুয়ে নেবে। এ ছাড়া ওযু-গোসল নেই। *(বুঃ ফবাঃ ১/৩৩৬)*

পূর্বোক্ত তীরবিদ্ধ লোকটি ছিল একজন আনসারী। তার সঙ্গী এক মুহাজেরী তার রক্তাক্ত অবস্থা দেখে বলল, 'সুবহানাল্লাহ! (তিন তিনটে তীর মেরেছে?!) প্রথম তীর মারলে তুমি

আমাকে জাগিয়ে দাওনি কেন?' আনসারী বলল, 'আমি এমন একটি সূরা পাঠ করছিলাম, যা সম্পূর্ণ না করে ছেড়ে দিতে পছন্দ করিনি!' *(আদাঃ ১৯৮-নং)*

৭। মুর্দা গোসল দিলে; মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মুর্দাকে গোসল দেবে, সে যেন নিজে গোসল করে নেয়। আর যে ব্যক্তি জানাযা বহন করবে, সে যেন ওযু করে নেয়।" *(আদাঃ, তিঃ, আঃ ২/২৮০ প্রভৃতি)* কিন্তু এই নির্দেশটি মুস্তাহাব। অর্থাৎ না করলেও চলে। তবে করা উত্তম। কারণ, গোসলদাতার দেহে নাপাকী লেগে যাওয়ার সন্দেহ থাকে তাই। তাই তো অন্য এক বর্ণনায় আছে; তিনি বলেন, "মুর্দাকে গোসল দিলে তোমাদের জন্য গোসল করা জরুরী নয়। কারণ তোমাদের মুর্দা তো আর নাপাক নয়। অতএব তোমাদের হাত ধুয়ে নেওয়াই যথেষ্ট।" *(হাঃ ১/৩৮৬, বাঃ ৩/৩৯৮)*

হযরত উমার ﷺ বলেন, 'আমরা মাইয়্যেতকে গোসল দিতাম। তাতে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ গোসল করে নিত। আবার অনেকে করত না।' *(দারাঃ ১৯১নং)*

অবশ্য মাইয়্যেতকে গোসল দেওয়ার সময় তার শরমগাহে হাত লেগে থাকলে ওযু অবশ্যই নষ্ট হবে। আর জানাযা বহন করাতে ওযু নষ্ট হয় না। *(মবঃ ২৬/৯৬)*

৮। মৃতদেহের পোষ্টমর্টেম করাতেও ওযু ভাঙ্গে না। *(ঐ ২৭/৪০)*

৯। ওযু করে মায়েরা যদি তাদের শিশুর পেশাব বা পায়খানা সাফ করে, তবে তা হাতে লাগলেও ওযু ভাঙ্গে না। অবশ্য পায়খানাদ্বার বা পেশাবদ্বার ধোয়ার সময় কোন দ্বারে হাত লাগলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। *(ঐ ২২/৬২)*

১০। কোনও নাপাক বস্তু (মানুষ বা পশুর পেশাব, পায়খানা, রক্ত প্রভৃতি)তে হাত বা পা দিলে ওযু ভাঙ্গে না। *(ঐ ৩৫/৯৬)*

১১। ওযু করার পর ধূমপান করলে ওযু নষ্ট হয় না। তবে ধূমপান করা অবশ্যই হারাম। *(ঐ ১৮/৯২-৯৩)*

১২। কোলন, কোহল বা স্পিরিট-মিশ্রিত আতর বা সেন্ট্ ব্যবহার করলে ওযুর কোন ক্ষতি হয় না। তবে তা ব্যবহার বৈধ নয়। *(ফইঃ ১/২০৩)*

১৩। চুল, নখ ইত্যাদি সাফ করলে ওযু ভাঙ্গে না। *(ফউঃ ১/২৯২, বুঃ ১/৩৩৬)* তদনুরূপ অশ্লীল কথা বললে, হাঁটুর উপর কাপড় উঠে এলে, মহিলার মাথা খোলা গেলে, কাউকে বা নিজেকে উলঙ্গ দেখলে ওযু নষ্ট হয় না।

দুধ পান করলে নামাযের পূর্বে কুল্লি করা মুস্তাহাব। *(বুঃ ২১১, মুঃ ৩৫৮-নং)*

যে যে কাজের জন্য ওযু জরুরী বা মুস্তাহাব

নামায পড়ার জন্য, কুরআন মাজীদ (মুসহাফ) স্পর্শ করা বা হাতে নেওয়ার জন্য এবং কা'বা শরীফের তওয়াফ করার জন্য ওযু করা জরুরী।

এ ছাড়া কুরআন তেলাঅত, আল্লাহর যিক্র, তেলাঅত ও শুকরের সিজদা, আযান, সাফা-মারওয়ার সাঈ, বিভিন্ন খোতবা পাঠ ইত্যাদির সময় ওযু করা মুস্তাহাব।

মোজার উপর মাসাহ

চামড়া বা কাপড়ের (সুতি বা নাইলনের) মোজার উপর মাসাহ বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবী জারীর (রাঃ) (যিনি ওযুর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি) বলেন, 'আমি দেখেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ পেশাব করার পর ওযু করলেন এবং নিজের (চামড়ার) মোজার উপর মাসাহ করলেন।' *(মুঃ ২৭২নং)*

মুগীরাহ বিন শো'বাহ ؓ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ ওযুর পর (সুতির) মোজা ও জুতোর উপর মাসাহ করেছেন। *(আদাঃ ১৫৯, ইমাঃ, তিঃ, আঃ, মিঃ ৫২৩নং)*

এই মাসাহর শর্তাবলী

এই মাসাহর জন্য ৪টি শর্ত রয়েছে;

১- পা ধুয়ে পূর্ণরূপে ওযু করার পর মোজা পরতে হবে। পূর্বে ওযু না করে মোজা পরে, তারপর তার উপর মাসাহ চলবে না।

সাহাবী মুগীরাহ ؓ বলেন, আমি নবী ﷺ এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। তিনি ওযু করছিলেন। আমি তাঁর মোজা দু'টি খুলে নিতে ঝুঁকলাম। তিনি বললেন, "ছাড়ো, আমি ও দু'টিকে ওযু অবস্থায় পরেছি।" *(বুঃ ২০৬, মুঃ ২৭৪নং)*

২- মোজা দু'টি যেন পবিত্র হয়। অর্থাৎ, তাতে যেন কোন প্রকারের নাপাকী লেগে না থাকে।

৩- এই মাসাহ যেন সেই পবিত্রতা অর্জনের সময় হয়, যার জন্য কেবল ওযু জরুরী হয়। কারণ, যার জন্য গোসল জরুরী হয়, সেই পবিত্রতা অর্জনের সময় মোজা খুলে দিয়ে পা ধোওয়া জরুরী। *(তিঃ, নাঃ, আঃ, ইখুঃ, মিঃ ৫২০নং)*

৪- মাসাহ যেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হয়। *(ফাতাওয়া ফিল মাসহি আলাল খুফ্ফাইন, ইবনে উসাইমীন ৩নং)*

মাসাহর সময়কাল

হযরত আলী ؓ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ মুসাফিরের জন্য ৩ দিন এবং গৃহবাসীর জন্য ১ দিন মোজার উপর মাসাহর সময়-সীমা নির্ধারিত করেছেন। *(মুঃ ২৭৬)*

এই নির্দিষ্ট সময় শুরু হবে, ওযু করে মোজা পরে ঐ ওযু ভাঙ্গলে তার পরের ওযু করার সময় তার উপর মাসাহ করার পর থেকে। অতএব প্রথম মাসাহ থেকে ২৪ ঘন্টা গৃহবাসীর জন্য এবং ৭২ ঘন্টা মুসাফিরের জন্য মাসাহ করা বৈধ হবে। সুতরাং যদি কেউ মঙ্গলবারের ফজরের নামাযের জন্য ওযু করার সময় মোজা পরে, তারপর ঐ ওযুতে চার অক্ত নামায পড়ে যদি তার ওযু এশার পর ভাঙ্গে এবং বুধবার ফজরের পূর্বে ওযু করার সময় মাসাহ করে, তাহলে সে গৃহবাসী হলে পর দিন বৃহস্পতিবারের ফজর পর্যন্ত ওযু করার সময় মোজার উপর মাসাহ করতে পারে। অনুরূপ মুসাফির হলে শনিবার ফজর পর্যন্ত মাসাহ করতে পারবে। *(ফাখুঃ, ইবনে উসাইমীন ৮-৯পৃঃ, মবঃ ১/২৩৬)*

এই মাসাহর নিয়ম

দু’টি হাতকে ভিজিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলগুলিকে ডান পায়ের আঙ্গুলের উপর থেকে শুরু করে পায়ের পাতার উপর দিকে বুলিয়ে নিয়ে গিয়ে পায়ের রলার শুরু পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। আর ঐ একই সাথে একই নিয়মে বাম হাতের আঙ্গুল দিয়ে বাম পায়ের পাতার উপর মাসাহ করবে। উভয় কানের মাসাহ যেমন একই সঙ্গে হয়, ঠিক তেমনিই উভয় পায়ের মাসাহ একই সঙ্গে হবে। দুই হাত জুড়ে প্রথমে ডান পা, তারপর বাম পা পৃথক করে মাসাহ করা ঠিক নয়। *(ফাখুঃ ১৩নং)*

পায়ের তেলোতে ধুলো-বালি থাকলেও তার নিচে মাসাহ করা বিধেয় নয়। হযরত আলী ﷺ বলেন, ‘দ্বীনে যদি রায় ও বিবেকের স্থান থাকত, তাহলে মোজার উপরের অংশ অপেক্ষা নিচের অংশই অধিক মাসাহযোগ্য হত। কিন্তু আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে তাঁর মোজার উপরের অংশে মাসাহ করতে দেখেছি।’ *(আদাঃ, দাঃ, আঃ, মিঃ ৫২৫নং)*

মাসাহ নষ্ট হয় কিসে?

১- মাসাহর নির্দিষ্ট সময়-সীমা অতিবাহিত হয়ে গেলে।
২- গোসল ফরয হলে।
৩- (মাসাহ করার পর) মোজা খুলে ফেললে।

এই মাসাহর আনুষঙ্গিক মাসায়েল

শীত-গ্রীষ্ম যে কোন সময়ে মোজা পরে থাকলে তার উপর মাসাহ বৈধ। মোজা পরা শীতের জন্যই হতে হবে, এমন কোন শর্ত নেই। *(ফইঃ ১/২৩৫)*

একেবারে পাতলা (যাতে পা দেখা যায় এমন) মোজা হলে তাতে মাসাহ চলবে না। *(ঐ ১/২৩৪)*

উত্তম ও সতর্কতামূলক আমল এই যে, উভয় পা ধোয়া শেষ হলে তবেই মোজা পরা হবে। নচেৎ ডান পা ধুয়ে মোজা পরে নিয়ে তারপর বাম পা ধোয়া ও মোজা পরা উত্তম নয়। *(ঐ ১/২৩৩-২৩৪)*

মোজা পরার সময় ‘এর উপর মাসাহ করব’ বা ‘এতদিন মাসাহ করব’ এমন কোন নিয়ত শর্ত বা জরুরী নয়। *(ফাখুঃ ৬নং)*

ওযু করার পরই মোজা পরলে তার উপর মাসাহ করা যায়। তায়াম্মুম করার পর মোজা পরলে (পুনরায় পানি পেলে ও ওযু করলে সেই সময়) মাসাহ করা যায় না। পক্ষান্তরে পানি না পেলে এবং ওযু না করলে যতদিন তায়াম্মুম করবে ততদিন পায়ে মোজা থাকবে। এ সময় মোজার উপর মাসাহ করা বা মোজা খুলে ফেলা জরুরী নয়। যেহেতু তায়াম্মুমের সাথে

পায়ের কোন সম্পর্ক নেই। *(ফাখুঃ ৫নং)*

যে সফরে নামাযের কসর বৈধ, সেই সফরে ৩ দিন ৩ রাত মাসাহ বৈধ। *(ঐ ৭নং)* ঘরে থেকে মাসাহ শুরু করার পর সফর করলে মুসাফিরের মত ৭২ ঘন্টাই মাসাহ করতে পারা যাবে। অনুরূপ সফরে মাসাহ শুরু করে ঘরে ফিরে এলে গৃহবাসীর মত কেবল ২৪ ঘন্টাই মাসাহ করা যাবে। *(ঐ ৮নং)*

মাসাহর নির্ধারিত সময়কাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর মাসাহ করে নামায পড়লে নামায হয় না। *(ঐ ১০নং)*

ওযু করার পর মোজা পরে ওযু না ভাঙ্গার পূর্বেই যদি খুলে পুনরায় পরে নেওয়া হয়, তাহলে তাতেও মাসাহ করা চলবে। কিন্তু একবার মাসাহ করার পর মোজা খুলে ফেললে তারপর পুনরায় (ওযু থাকলেও) পরার পর আর মাসাহ চলবে না। কারণ, যে ওযুতে পা ধোওয়া হয় কেবল সেই ওযুর পরই মোজা পরলে তার উপর মাসাহ করা যাবে। *(ঐ ১১নং)*

মোজার উপর মাসাহ করার পর জুতো পরলে বা ডবল মোজা পরলে অথবা ডবল মোজা বা জুতোর উপর মাসাহ করার পর একটি মোজা বা জুতো খুলে ফেললে উভয় অবস্থাতেই মাসাহ বৈধ। তবে মাসাহর সময়কাল ধরতে হবে প্রথম অবস্থা থেকে। *(ঐ ১২নং)*

মহিলারাও পুরুষদের মতই মাসাহ করবে। *(ঐ ১৬নং)*

মোজা নামিয়ে পা চুলকালে বা পাথর আদি বের করলে যদি অধিকাংশ পা বের হয়ে যায়, তাহলে তার উপর আর মাসাহ বৈধ হবে না। মোজার তলায় হাত ভরলে বা সামান্য পা বের হয়ে গেলে মাসাহতে কোন প্রভাব পড়বে না। *(ঐ ১৭নং)*

মোজার উপর মাসাহ করার পর মোজা খুলে ফেললে ঐ ওযু নষ্ট হয়ে যায় না। তবে পুনরায় (পা না ধুয়ে ওযু করে) মোজা পরলে তার উপর মাসাহ চলে না। *(ঐ ১৯নং)*

ওযুর মধ্যে যতটা পা ধোয়া ফরয মোজাতে ততটা পা-ই ঢাকতে হবে; নচেৎ মাসাহ হবে না -এ কথার কোন দলীল নেই। অতএব ফাটা, কাটা ও ছেঁড়া মোজার উপরেও মাসাহ চলবে। *(ঐ ৪নং)* তবে যদি অধিকাংশ পা বেরিয়ে থাকে, তাহলে সে কথা ভিন্ন।

ওযু না করে মোজা পরে তাতে মাসাহ করে ওযু করলে নামায হয় না। যেমন ক্ষতস্থানে মাসাহ ভুলে গিয়ে ওযু করে নামায পড়লেও নামায হয় না। *(ফইঃ ১/২৩২, মবঃ ৫/২৯৮)*

তায়াম্মুম

তায়াম্মুমের নির্দেশ খোদ আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْداً طَيِّباً فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِّنْهُ﴾

অর্থাৎ, যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক, কিংবা তোমাদের মধ্যে কেউ পায়খানা করে আসে অথবা তোমরা স্ত্রী-সঙ্গম কর, অতঃপর পানি না পাও, তাহলে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও; তোমাদের মুখমন্ডল ও হাতকে মাটি দ্বারা মাসাহ কর---। *(কুঃ ৫/৬)*

সরল ও সহজ দ্বীনের নবী ﷺ বলেন, "সকল মানুষ (উম্মতের) উপর আমাদেরকে ৩টি বিষয়ের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে; আমাদের কাতারকে করা হয়েছে ফিরিশ্তাবর্গের কাতারের মত, সারা পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদ করে দেওয়া হয়েছে এবং পানি না পাওয়া গেলে মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ করা হয়েছে। *(মুঃ, মিঃ ৫২৬নং)*

কোন্ কোন্ অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ?

১। একেবারেই পানি না পাওয়া গেলে অথবা পান করার মত থাকলে এবং ওযু-গোসলের জন্য যথেষ্ট পানি না পাওয়া গেলে।

হযরত ইমরান বিন হুসাইন رضي الله عنه বলেন, আমরা নবী ﷺ এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। এক সময় তিনি লোকেদের নিয়ে নামায পড়লেন। যখন তিনি নামায শেষ করলেন, তখন দেখলেন একটি লোক একটু সরে পৃথক দাঁড়িয়ে আছে। সে জামাআতে নামাযও পড়েনি। তিনি তাকে বললেন, "কি কারণে তুমি জামাআতে নামায পড়লে না?" লোকটি বলল, 'আমি নাপাকে আছি, আর পানিও নেই।' তিনি বললেন, "পাক মাটি ব্যবহার কর। তোমার জন্য তাই যথেষ্ট।" *(বুঃ, মুঃ মিঃ ৫২৭নং)*

তিনি আরো বলেন, "দশ বছর যাবৎ পানি না পাওয়া গেলে মুসলিমের ওযুর উপকরণ হল পাক মাটি। পানি পাওয়া গেলে গোসল করে নেওয়া উচিত। আর এটা অবশ্যই উত্তম।" *(আদাঃ, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ, আঃ, মিঃ ৫৩০নং)*

অবশ্য আশে-পাশে বা সঙ্গীদের কারো নিকট পানি আছে কি না, তা অবশ্যই দেখে নিতে হবে। যখন একান্ত পানি পাওয়ার কোন আশাই থাকবে না, তখন তায়াম্মুম করে নামায পড়তে হবে।

২। অসুস্থ থাকলে অথবা দেহে কোন প্রকার ক্ষত বা ঘা থাকলে এবং পানি ব্যবহারে তা বেড়ে যাওয়া বা সুস্থ হতে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা হলে।

হযরত জাবের رضي الله عنه বলেন, একদা আমরা কোন সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির মাথায় পাথরের আঘাত লেগে ক্ষত হয়েছিল। এরপর তার স্বপ্নদোষও হল। সে সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার জন্য কি তায়াম্মুম বৈধ মনে কর?' সকলে বলল, 'তুমি পানি ব্যবহার করতে অক্ষম নও। অতএব তোমার জন্য আমরা তায়াম্মুম বৈধ মনে করি না।' তা শুনে লোকটি গোসল করল এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সে মারা গেল। অতঃপর আমরা যখন নবী ﷺ-এর নিকট ফিরে এলাম তখন তাঁকে সেই লোকটার ঘটনা খুলে বললাম। তা শুনে তিনি বললেন, "ওরা ওকে মেরে ফেলল, আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করুক! যদি ওরা জানত না, তবে জেনে কেন নেয়নি? অজ্ঞতার ওষুধ তো প্রশ্নই।" *(সঃআদাঃ ৩২৫, ইমাঃ, দারাঃ, মিঃ ৫৩১নং)*

৩। পানি অতিরিক্ত ঠান্ডা হলে এবং তাতে ওযু-গোসল করাতে অসুখ হবে বলে দৃঢ় আশঙ্কা হলে, পরন্তু পানি গরম করার সুযোগ বা ব্যবস্থা না থাকলে তায়াম্মুম বৈধ।

হযরত আম্র বিন আস رضي الله عنه বলেন, যাতুস সালাসিল যুদ্ধ -সফরে এক শীতের রাতে

আমার স্বপ্নদোষ হল। আমার ভয় হল যে, যদি গোসল করি তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। তাই আমি তায়াম্মুম করে সঙ্গীদেরকে নিয়ে (ইমাম হয়ে) ফজরের নামায পড়লাম। আমার সঙ্গীরা একথা নবী ﷺ-এর নিকটে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "হে আম্র! তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সঙ্গীদের ইমামতি করেছ?" আমি গোসল না করার কারণ তাঁকে বললাম। আরো বললাম যে, আল্লাহ তাআলার এ বাণীও আমি শুনেছি, তিনি বলেন, "তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড় দয়াশীল।" *(কুঃ ৪/২৯)*

একথা শুনে তিনি হাসলেন এবং আর কিছুই বললেন না। *(বুঃ, সঃআদাঃ ৩২৩নং, আঃ, হাঃ, দারাঃ, ইহিঃ)*

৪। পানি ব্যবহারে ক্ষতি না হলে এবং পানি নিকটবর্তী কোন জায়গায় থাকলেও তা আনতে জান, মাল বা ইজ্জতহানির আশঙ্কা হলে, পানি ব্যবহার করতে গিয়ে সফরের সঙ্গীদের সঙ্গ-ছাড়া হওয়ার ভয় হলে, বন্দী অবস্থায় থাকলে অথবা (কুঁয়ো ইত্যাদি থেকে) পানি তোলার কোন ব্যবস্থা না থাকলে তায়াম্মুম করা বৈধ। কারণ উক্ত অবস্থাগুলো পানি না পাওয়ার মতই অবস্থা।

৫। পানি কাছে থাকলেও তা ওযুর জন্য ব্যবহার করলে পান করা, রান্না করা ইত্যাদি হবে না আশঙ্কা হলেও তায়াম্মুম বৈধ। *(মুগনী, ফিসুঃ উর্দু ১/৬১-৬২)*

কিসে তায়াম্মুম হবে?

পবিত্র মাটি এবং তার শ্রেণীভুক্ত সকল বস্তু (যেমন, পাথর, বালি, কাঁকর, সিমেন্ট প্রভৃতি) দ্বারা তায়াম্মুম শুদ্ধ। ধুলাযুক্ত মাটি না পাওয়া গেলে ধুলাহীন পাথর বা বালিতে তায়াম্মুম বৈধ হবে। *(ফইঃ ১/২১৮)*

তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

শুদ্ধতম হাদীস অনুসারে তায়াম্মুম করার পদ্ধতি নিম্নরূপঃ-

(নিয়ত করার পর 'বিসমিল্লাহ' বলে) দুই হাতের চেটো মাটির উপর মারতে হবে। তারপর তুলে নিয়ে তার উপর ফুঁক দিয়ে অতিরিক্ত ধুলোবালি উড়িয়ে দিয়ে উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল মাসাহ করতে হবে। এরপর বাম হাত দ্বারা ডান হাত কব্জি পর্যন্ত এবং শেষে ডান হাত দ্বারা বাম হাত কব্জি পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৫২৮নং)*

তায়াম্মুম কিসে নষ্ট হয়?

যে যে কারণে ওযু নষ্ট হয়, ঠিক সেই সেই কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়ে যায়। কারণ তায়াম্মুম হল ওযুর বিকল্প। এ ছাড়া যে অসুবিধার কারণে তায়াম্মুম করা হয়েছিল, সেই অসুবিধা দূর হয়ে গেলেই তায়াম্মুম নষ্ট হয়ে যায়। যেমন পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করলে পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম শেষ হয়ে যায়। অসুখের কারণে করলে, অসুখ দূর হয়ে যাওয়ার পর পরই আর তায়াম্মুম থাকে না। *(ফিসুঃ উর্দু ১/৬৩)*

তায়াম্মুমের আনুষঙ্গিক মাসায়েল

খোঁজার পর পানি না পাওয়া গেলে আওয়াল অক্তেই তায়াম্মুম করে নামায পড়া উচিত। শেষ অক্ত পর্যন্ত পানির অপেক্ষা করা বা পানি খোঁজা জরুরী নয়। আওয়াল অক্তে নামায পড়ে শেষ অক্তে পানি পাওয়া গেলেও নামায পুনরায় পড়তে হবে না। *(সিঃসঃ ৬/২৬৫-২৬৮)*

পানি খোঁজাখুঁজি না করেই তায়াম্মুম করে নামায পড়লে এবং পানি তার আশে-পাশে মজুদ থাকলে নামায বাতিল গণ্য হবে। *(ফইঃ ১/২২০)*

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, দুই ব্যক্তি সফরে বের হল। নামাযের সময় হলে তাদের নিকট পানি না থাকার কারণে তায়াম্মুম করে উভয়েই নামায পড়ে নিল। অতঃপর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পূর্বেই তারা পানি পেয়ে গেল। ওদের মধ্যে একজন পানি দ্বারা ওযু করে পুনরায় ঐ নামায ফিরিয়ে পড়ল। কিন্তু অপর জন পড়ল না। তারপর তারা আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এলে ঘটনা খুলে বলল। তিনি যে নামায ফিরিয়ে পড়েনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমার আমল সুন্নাহর অনুসারী হয়েছে এবং তোমার নামাযও যথেষ্ট (শুদ্ধ) হয়ে গেছে।" আর যে ওযু করে নামায ফিরিয়ে পড়েছিল, তার উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "তোমার জন্য ডবল সওয়াব।" *(আদাঃ, নাঃ, দাঃ, মিঃ ৫৩৩নং)*

প্রকাশ যে, সুন্নাহ জানার পর ডবল করে নামায বৈধ নয়। *(মুমঃ ১/৩৪৪)*

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামায পড়া অবস্থায় পানি পেয়ে যায়, তাকে নামায ছেড়ে দিয়ে ওযু করে পুনরায় নামায পড়তে হবে। *(ফিসুঃ উর্দু ১/৬৩, মুমঃ ১/৩৪৩)*

ওযু ও গোসলের পর যে কাজ করা বৈধ, তায়াম্মুমের পরও সেই কাজ করা বৈধ হয়। যেহেতু তায়াম্মুম ওযু-গোসলের পরিবর্ত। *(ঐ)*

পানি বা মাটি কিছু না পাওয়া গেলে বিনা ওযু ও তায়াম্মুমেই নামায পড়তে হবে। *(বুঃ ৩৩৬নং)*

ঘরে থাকলেও খোঁজাখুঁজির পর পানি না পাওয়া গেলে এবং নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার আশঙ্কা হলে তায়াম্মুম করে নামায পড়তে হবে। *(বুঃ, ফবাঃ ১/৫২৫-৫২৬)*

পক্ষান্তরে পানি মজুদ থাকলে নামাযের ওয়াক্ত্ চলে যাওয়ার আশঙ্কা হলেও ওযু-গোসল করে নামায পড়তে হবে। ঐ সময় তায়াম্মুম করে নামায হবে না। *(ঐ ১/২১২)*

একই তায়াম্মুমে কয়েক অক্তের নামায পড়া সিদ্ধ। *(মুমঃ ১/৩৪০)* সিদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে আসারগুলো শুদ্ধ নয়।

মিসওয়াক (দাঁতন) করার গুরুত্ব

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "আমি উম্মতের জন্য কষ্টকর না জানলে এশার নামাযকে দেরী করে পড়তে এবং প্রত্যেক নামাযের সময় দাঁতন করতে আদেশ দিতাম।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৩৭৬নং)*

তিনি আরো বলেন, "আমি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর না জানলে (প্রত্যেক) ওযুর

সাথে দাঁতন করা ফরয করতাম এবং এশার নামায অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরী করে পড়তাম।” *(হাঃ, বাঃ, সঃজাঃ ৫৩১৯ নং)*

তাই সাহাবী যায়েদ বিন খালেদ জুহানী ﷺ মসজিদে নামায পড়তে হাজির হতেন, আর তাঁর দাঁতনকে কলমের মত তাঁর কানে গুঁজে রাখতেন। নামাযে দাঁড়াবার সময় তিনি দাঁতন করে পুনরায় কানে গুঁজে নিতেন। *(আদাঃ, তিঃ, মিঃ ৩৯০ নং)*

মুসলিমের প্রকৃতিগত কর্মসমূহের একটি হল, মিসওয়াক করে মুখ সাফ করা। *(মুঃ, মিঃ ৩৭৯নং)*

বিশেষ করে জুমআর দিন গোসল ও দাঁতন করা এবং আতর ব্যবহার করা কর্তব্য। *(আঃ, বুঃ, মুঃ, আদাঃ, সঃজাঃ ৪১৭৮ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, “জিবরীল (আঃ) আমাকে (এত বেশী) দাঁতন করতে আদেশ করেছেন, যাতে আমি আমার দাঁত ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা করছি।” *(সিসঃ ১৫৫৬ নং)* অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, “---এতে আমার ভয় হয় যে, দাঁতন করা আমার উপর ফরয করে দেওয়া হবে।” *(সঃজাঃ ১৩৭৬ নং)*

বাড়িতে প্রবেশ করা মাত্র তিনি প্রথম যে কাজ করতেন, তা হল দাঁতন। *(মুঃ, মিঃ ৩৭৭নং)* তাহাজ্জুদ পড়তে উঠলেই তিনি দাঁতন করে দাঁত মাজতেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৩৭৮-নং)* আবার রাত্রের অন্যান্য সময়েও যখন জেগে উঠতেন, তখন মিসওয়াক করতেন। *(সঃজাঃ ৪৮৫৩ নং)* আর এই জন্যই রাত্রে শোবার সময় শিথানে দাঁতন রেখে নিতেন। *(ঐ ৪৮৭২ নং)*

তিনি বলেন, “দাঁতন করায় রয়েছে মুখের পবিত্রতা এবং প্রতিপালক আল্লাহর সন্তুষ্টি। *(আঃ, দাঃ, নাঃ, ইখুঃ, ইহিঃ, বুঃ (বিনা সনদে), মিঃ ৩৮১নং)*

একদা হযরত আলী ﷺ দাঁতন আনতে আদেশ করে বললেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “বান্দা যখন নামায পড়তে দণ্ডায়মান হয় তখন ফিরিশ্‌তা তার পিছনে দণ্ডায়মান হয়ে তার ক্বিরাআত শুনতে থাকেন। ফিরিশ্‌তা তার নিকটবর্তী হন; (অথবা বর্ণনাকারী অনুরূপ কিছু বললেন।) পরিশেষে তিনি নিজ মুখ তার (বান্দার) মুখে মিলিয়ে দেন! ফলে তার মুখ হতে কুরআনের যেটুকুই অংশ বের হয় সেটুকু অংশই ফিরিশ্‌তার পেটে প্রবেশ করে যায়। সুতরাং কুরআনের জন্য তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর।” *(বাযযার, সতাঃ২ ১০নং)*

তিনি বলেন, “মিসওয়াক করে তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর। কারণ, মুখ হল কুরআনের পথ।” *(বাযঃ, সিসঃ ১২১৩ নং)*

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘নবী ﷺ মিসওয়াক করে আমাকে তা ধুতে দিতেন। কিন্তু ধোয়ার আগে আমি মিসওয়াক করে নিতাম। তারপর তা ধুয়ে তাঁকে দিতাম।’ *(আদাঃ, মিঃ ৩৮৪নং)*

তাঁর নিকট মিসওয়াকের এত গুরুত্ব ছিল যে, তিরোধানের পূর্ব মুহূর্তেও তিনি হযরত আয়েশার দাঁতে চিবিয়ে নরম করে নিজে দাঁতন করেছেন। *(বুঃ, মিঃ ৫৯৫৯ নং)*

তিনি আরাক (পিল্লু) গাছের (ডাল বা শিকড়ের) দাঁতন করতেন। *(আঃ, ইগঃ ১/১০৪)*

আঙ্গুল দ্বারা দাঁত মাজা যায়। তবে এটা সুন্নত কি না বা এতেও ঐ সওয়াব অর্জন হবে কি না, সে ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস মিলে না। হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) তালখীসে *(১/৭০)*

এ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন, 'এগুলির চেয়ে মুসনাদে আহমাদে আলী ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসটি অধিকতর সহীহ।' কিন্তু সে হাদীসটিরও সনদ যয়ীফ। *(মুসনাদে আহমাদ, তাহক্বীক্ব আহমাদ শাকের ১৩৫৫ নং)*

নামাযীর লেবাস

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"হে মানব জাতি! তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকার ও বেশভূষার জন্য আমি তোমাদেরকে লেবাস দিয়েছি। পরন্তু 'তাকওয়া'র লেবাসই সর্বোৎকৃষ্ট। *(কুঃ ৭/২৬)*

"হে আদম সন্তানগণ! প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান কর। পানাহার কর, কিন্তু অপচয় করো না। তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।" *(কুঃ ৭/৩১)*

শরীয়তের সভ্য-দৃষ্টিতে সাধারণভাবে লেবাসের কতকগুলি শর্ত ও আদব রয়েছে; যা পালন করতে মুসলিম বাধ্য।

মহিলাদের লেবাসের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ-

১। লেবাস যেন দেহের সর্বাঙ্গকে ঢেকে রাখে। দেহের কোন অঙ্গ বা সৌন্দর্য যেন কোন বেগানা (যার সাথে কোনও সময়ে বিবাহ বৈধ এমন) পুরুষের সামনে প্রকাশ না পায়। কেন না মহানবী ﷺ বলেন, "মেয়ে মানুষের সবটাই লজ্জাস্থান (গোপনীয়)। আর সে যখন বের হয়, তখন শয়তান তাকে পুরুষের দৃষ্টিতে পরিশোভিতা করে তোলে।" *(তিঃ, মিঃ ৩১০৯ নং)*

মহান আল্লাহ বলেন, "হে নবী! তুমি তোমার পত্নীগণকে, কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (চেহারার) উপর টেনে নেয়---।" *(কুঃ ৩৩/৫৯)*

হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, 'উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে (মদীনার) আনসারদের মহিলারা যখন বের হল, তখন তাদের মাথায় (কালো) চাদর (বা মোটা উড়না) দেখে মনে হচ্ছিল যেন ওদের মাথায় কালো কাকের ঝাঁক বসে আছে!' *(আদাঃ ৪১০১ নং)*

আল্লাহ তাআলার আদেশ, মুমিন মেয়েরা যেন তাদের ঘাড় ও বুককে মাথার কাপড় দ্বারা ঢেকে নেয়---। *(কুঃ ২৪/৩১)*

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'পূর্বের মুহাজির মহিলাদের প্রতি আল্লাহ রহম করেন। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে তারা তাদের পরিধেয় কাপড়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে মোটা কাপড়টিকে ফেড়ে মাথার উড়না বানিয়ে মাথা (ঘাড়-গলা-বুক) ঢেকেছিল।' *(আদাঃ ৪১০২)*

সাহাবাদের মহিলাগণ যখন পথে চলতেন, তখন তাঁদের নিম্নাঙ্গের কাপড়ের শেষ প্রান্ত মাটির উপর ছেঁচড়ে যেত। নাপাক জায়গাতে চলার সময়েও তাদের কেউই পায়ের পাতা বের করতেন না। *(মিঃ ৫০৪, ৫১২, ৪৩৩৫ নং)*

সুতরাং মাথা ও পায়ের মধ্যবর্তী কোন অঙ্গ যে প্রকাশ করাই যাবে না, তা অনুমেয়।

২। যে লেবাস মহিলা পরিধান করবে সেটাই যেন (বেগানা পুরুষের সামনে) সৌন্দর্যময় ও

দৃষ্টি-আকর্ষী না হয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন, “সাধারণতঃ যা প্রকাশ হয়ে থাকে তা ছাড়া তারা যেন তাদের অন্যান্য সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।” *(কুঃ ২৪/৩১)*

৩। লেবাস যেন এমন পাতলা না হয়, যাতে কাপড়ের উপর থেকেও ভিতরের চামড়া নজরে আসে। নচেৎ ঢাকা থাকলেও খোলার পর্যায়ভুক্ত। এ ব্যাপারে এক হাদীসে আল্লাহর রসূল ﷺ হযরত আসমা (রাঃ)কে সতর্ক করেছিলেন। *(আদাঃ, মিঃ ৪৩৭২ নং)*

একদা হাফসা বিন্তে আব্দুর রহমান পাতলা ওড়না পরে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর নিকট গেলে তিনি তার উড়নাকে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তাকে একটি মোটা ওড়না পরতে দিলেন। *(মাঃ, মিঃ ৪৩৭৫ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, “দুই শ্রেণীর মানুষ দোযখবাসী; যাদেরকে আমি (এখনো) দেখিনি। --- (এদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ সেই) মহিলাদল, যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকবে, অপর পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেও তার দিকে আকৃষ্ট হবে, যাদের মাথা (চুলের খোঁপা) হিলে থাকা উটের কুঁজের মত হবে। তারা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না। আর তার সুগন্ধও পাবে না; অথচ তার সুগন্ধ এত এত দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।” *(আঃ, মুঃ, সঃজাঃ ৩৭৯৯ নং)*

৪। পোশাক যেন এমন আঁট-সাঁট (টাইট্‌ফিট্‌) না হয়, যাতে দেহের উঁচু-নিচু ব্যক্ত হয়। কারণ এমন ঢাকাও খোলার পর্যায়ভুক্ত এবং দৃষ্টি-আকর্ষী।

৫। যেন সুগন্ধিত না হয়। মহানবী ﷺ বলেন, “সেন্ট্‌ বিলাবার উদ্দেশ্যে কোন মহিলা যদি তা ব্যবহার করে পুরুষদের সামনে যায়, তবে সে বেশ্যা মেয়ে।” *(আদাঃ, তিঃ, মিঃ ১০৬৫ নং)*

সেন্ট্‌ ব্যবহার করে মহিলা মসজিদেও যেতে পারে না। একদা চাশ্‌তের সময় আবূ হুরাইরা ﷺ মসজিদ থেকে বের হলেন। দেখলেন, একটি মহিলা মসজিদ প্রবেশে উদ্যত। তার দেহ বা লেবাস থেকে উৎকৃষ্ট সুগন্ধির সুবাস ছড়াচ্ছিল। আবূ হুরাইরা মহিলাটির উদ্দেশে বললেন, ‘আলাইকিস্‌ সালাম।’ মহিলাটি সালামের উত্তর দিল। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, ‘কোথায় যাবে তুমি?’ সে বলল, ‘মসজিদে।’ বললেন, ‘কি জন্য এমন সুন্দর সুগন্ধি মেখেছ তুমি?’ বলল, ‘মসজিদের জন্য।’ বললেন, ‘আল্লাহর কসম?’ বলল, ‘আল্লাহর কসম।’ পুনরায় বললেন, ‘আল্লাহর কসম?’ বলল, ‘আল্লাহর কসম।’ তখন তিনি বললেন, ‘তবে শোন, আমাকে আমার প্রিয়তম আবুল কাসেম ﷺ বলেছেন যে, “সেই মহিলার কোন নামায কবুল হয় না, যে তার স্বামী ছাড়া অন্য কারোর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে; যতক্ষণ না সে নাপাকীর গোসল করার মত গোসল করে নেয়।” অতএব তুমি ফিরে যাও, গোসল করে সুগন্ধি ধুয়ে ফেল। তারপর ফিরে এসে নামায পড়ো।’ *(আদাঃ, নাঃ, ইমাঃ, বাঃ, সিসঃ ১০৩১ নং)*

৬। লেবাস যেন কোন কাফের মহিলার অনুকৃত না হয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন (লেবাসে-পোশাকে, চাল-চলনে অনুকরণ) করবে সে তাদেরই দলভুক্ত।” *(আদাঃ, মিঃ ৪৩৪৭ নং)*

৭। তা যেন পুরুষদের লেবাসের অনুরূপ না হয়। মহানবী ﷺ সেই নারীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, যারা পুরুষদের বেশ ধারণ করে এবং সেই পুরুষদেরকেও অভিশাপ দিয়েছেন,

যারা নারীদের বেশ ধারণ করে।” *(আদাঃ ৪০৯৭, ইমাঃ ১৯০৪ নং)*

তিনি সেই পুরুষকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে মহিলার মত লেবাস পরে এবং সেই মহিলাকেও অভিশাপ দিয়েছেন, যে পুরুষের মত লেবাস পরে। *(আদাঃ ৪০৯৮, ইমাঃ ১৯০৩ নং)*

৮। লেবাস যেন জাঁকজমকপূর্ণ প্রসিদ্ধিজনক না হয়। কারণ, বিরল ধরনের লেবাস পরলে সাধারণতঃ পরিধানকারীর মনে গর্ব সৃষ্টি হয় এবং দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধিজনক লেবাস পরবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতে লাঞ্ছনার লেবাস পরাবেন।” *(আঃ, আদাঃ, ইমাঃ, মিঃ ৪৩৪৬ নং)*

“যে ব্যক্তি জাঁকজমকপূর্ণ লেবাস পরবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতে অনুরূপ লেবাস পরিয়ে তা অগ্নিদগ্ধ করবেন।” *(আদাঃ, বাঃ, সঃজাঃ ৬৫২৬ নং)*

আর পুরুষদের লেবাসের শর্তাবলী নিম্নরূপঃ-

১। লেবাস যেন নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ অবশ্যই আবৃত রাখে। যেহেতু ঐটুকু অঙ্গ পুরুষের লজ্জাস্থান। *(সঃজাঃ ৫৫৮৩ নং)*

২। এমন পাতলা না হয়, যাতে ভিতরের চামড়া নজরে আসে।

৩। এমন আঁট-সাট না হয়, যাতে দেহের উঁচু-নিচু ব্যক্ত হয়।

৪। কাফেরদের লেবাসের অনুকৃত না হয়।

৫। মহিলাদের লেবাসের অনুরূপ না হয়।

৬। জাঁকজমকপূর্ণ প্রসিদ্ধিজনক না হয়।

৭। গাঢ় হলুদ বা জাফরানী রঙের যেন না হয়। আম্র বিন আস رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা আমার গায়ে দু’টি জাফরানী রঙের কাপড় দেখে বললেন, “এগুলো কাফেরদের কাপড়। সুতরাং তুমি তা পরো না।” *(মুঃ, মিঃ ৪৩২৭ নং)*

৮। লেবাস যেন রেশমী কাপড়ের না হয়। মহানবী ﷺ বলেন, “সোনা ও রেশম আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।” *(তিঃ, নাঃ, মিঃ ৪৩৪১ নং)* “দুনিয়ায় রেশম-বস্ত্র তারাই পরবে, যাদের পরকালে কোন অংশ নেই।” *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৪৩২০ নং)*

হযরত উমার رضي الله عنه বলেন, রসূল ﷺ রেশমের কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তবে দুই, তিন অথবা চার আঙ্গুল পরিমাণ (অন্য কাপড়ের সঙ্গে জুড়ে) ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন। *(মুঃ, মিঃ ৪৩২৪ নং)* তদনুরূপ কোন চর্মরোগ প্রভৃতিতে উপকারী হলে তা ব্যবহারে অনুমতি আছে। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৪৩২৬ নং)*

৯। পরিহিত লেবাস (পায়জামা, প্যান্ট, লুঙ্গি , কামীস প্রভৃতি) যেন পায়ের গাঁটের নিচে না যায়। মহানবী ﷺ বলেন, “গাঁটের নিচের অংশ লুঙ্গি জাহান্নামে।” *(বুঃ, মিঃ ৪৩১৪ নং)* “মু’মিনের লুঙ্গি পায়ের অর্ধেক রলা পর্যন্ত। এই (অর্ধেক রলা) থেকে গাঁট পর্যন্ত অংশের যে কোনও জায়গায় হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু এর নিচের অংশ দোযখে যাবে।” এরূপ ৩ বার বলে তিনি পুনরায় বললেন, “আর কিয়ামতের দিন আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি তাকিয়েও দেখবেন

না, যে অহংকারের সাথে নিজের লুঙ্গি (গাঁটের নিচে) ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়।” *(আদাঃ,ইমাঃ,মিঃ ৪৩৩১)*

আল্লাহর রসূল ﷺ এর সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় লেবাস ছিল কামীস (ফুল-হাতা প্রায় গাঁটের উপর পর্যন্ত লম্বা জামা বিশেষ)। *(আদাঃ, তিঃ, মিঃ ৪৩২৮ নং)* যেমন তিনি চেক-কাটা চাদর পরতে ভালোবাসতেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৪৩০৪ নং)*

তিনি মাথায় ব্যবহার করতেন পাগড়ী। *(তিঃ, সঃজাঃ ৪৬৭৬ নং)* তিনি কালো রঙের পাগড়ীও বাঁধতেন। *(আদাঃ, ৪০৭৭, ইমাঃ ৩৫৮৪ নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ ও সাহাবা তথা সলফদের যুগে টুপীও প্রচলিত ছিল। *(বুঃ, ফবাঃ ১/৫৮৭, ৩/৮৬, মুঃ ৯২৫, আদাঃ ৬৯১ নং)*

যেমন সে যুগে শেলোয়ার বা পায়জামাও পরিচিত ছিল। মহানবী ﷺ ও পায়জামা খরিদ করেছিলেন। *(ইমাঃ ২২২০, ২২২১ নং)* তিনি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় হাজীদেরকে পায়জামা পরতে নিষেধ করেছেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ২৬৭৮ নং)* অবশ্য লুঙ্গি না পাওয়া গেলে পায়জামা পরতে অনুমতি দিয়েছেন। *(ঐ ২৬৭৯ নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ যখন লুঙ্গি পরতেন, তখন লুঙ্গির সামনের দিকের নিচের অংশ পায়ের পাতার উপর ঝুলিয়ে দিতেন এবং পেছন দিকটা (গাঁটের) উপরে তুলে নিতেন। এরূপ পরার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে এরূপ পরতে দেখেছি।' *(আদাঃ, মিঃ ৪৩৭০ নং)*

তাঁর নিকট পোশাকের সবচেয়ে পছন্দনীয় রঙ ছিল সাদা। তিনি বলেন, “তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর। কারণ সাদা রঙের কাপড় বেশী পবিত্র থাকে। আর ঐ রঙের কাপড়েই তোমাদের মাইয়্যেতকে কাফনাও।” *(আঃ, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ, মিঃ ৪৩৩৭ নং)*

এ ছাড়া সবুজ রঙের কাপড়ও তিনি ব্যবহার করতেন। *(আদাঃ ৪০৬৫ নং)* এবং লাল রঙেরও লেবাস পরিধান করতেন। *(আদাঃ ৪০৭২, ইমাঃ ৩৫৯৯, ৩৬০০ নং)*

মুহাদ্দেস আলবানী হাফেযাহুল্লাহ বলেন, 'লাল রঙের কাপড় ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ নয়।' *(মিশকাতের টীকা ২/ ১২৪৭)*

লেবাসে-পোশাকে সাদা-সিধে থাকা ঈমানের পরিচায়ক। *(আদাঃ, মিঃ ৪৩৪৫ নং)* মহানবী ﷺ বলেন, “সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বিনয় সহকারে সৌন্দর্যময় কাপড় পরা ত্যাগ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতে সৃষ্টির সামনে ডেকে এখতিয়ার দেবেন; ঈমানের লেবাসের মধ্যে তার যেটা ইচ্ছা সেটাই পরতে পারবে। *(তিঃ, হাঃ, সঃজাঃ ৬১৪৫ নং)*

তবে সুন্দর লেবাস পরা যে নিষিদ্ধ তা নয়। কারণ, “আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। বান্দাকে তিনি যে নেয়ামত দান করেছেন তার চিহ্ন (তার দেহে) দেখতে পছন্দ করেন। আর তিনি দারিদ্র ও (লোকচক্ষে) দরিদ্র সাজাকে ঘৃণা করেন।” *(বাঃ, সঃজাঃ ১৭৪২ নং)*

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, “যার অন্তরে অণু পরিমাণও অহংকার থাকবে, সে জান্নাত প্রবেশ করবে না।” বলা হল, 'লোকে তো চায় যে, তার পোশাকটা সুন্দর হোক, তার জুতোটা সুন্দর হোক। (তাহলে সেটাও কি ঐ পর্যায়ে পড়বে?)' তিনি বললেন, “আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার তো 'হক' (ন্যায় ও সত্য) প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে

ঘৃণা করার নাম।” *(মুঃ, সংজাঃ ৭৬৭৪ নং)*

তিনি আরো বলেন, “উত্তম আদর্শ, উত্তম বেশভূষা এবং মিতাচারিতা নবুওতের ২৫ অংশের অন্যতম অংশ।” *(আঃ, আদাঃ, সংজাঃ ১৯৯৩ নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির মাথায় আলুথালু চুল দেখে বললেন, “এর কি এমন কিছুও নেই, যার দ্বারা মাথার এলোমেলো চুলগুলোকে সোজা করে (আঁচড়ে) নেয়?!” আর এক ব্যক্তির পরনে ময়লা কাপড় দেখে বললেন, “এর কি এমন কিছুও নেই, যার দ্বারা ময়লা কাপড়কে পরিষ্কার করে নেয়?!” *(আদাঃ, নাঃ, আঃ, মিঃ ৪৩৫১ নং)*

আবুল আহওয়াস বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট এলাম। আমার পরনে ছিল নেহাতই নিম্নমানের কাপড়। তিনি তা দেখে আমাকে বললেন, “তোমার কি মাল-ধন আছে?” আমি বললাম, ‘জী হ্যাঁ।’ বললেন, “কোন্ শ্রেণীর মাল আছে?” আমি বললাম, ‘সকল শ্রেণীরই মাল আমার নিকট মজুদ। আল্লাহ আমাকে উট, গরু, ছাগল, ভেঁড়া, ঘোড়া ও ক্রীতদাস দান করেছেন।’ তিনি বললেন, “আল্লাহ যখন তোমাকে এত মাল দান করেছেন, তখন আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ও অনুগ্রহ তোমার বেশ-ভূষায় প্রকাশ পাওয়া উচিত।” *(আঃ, নাঃ, মিঃ ৪৩৫২ নং)*

তিনি বলেন, “যা ইচ্ছা তাই খাও এবং যেমন ইচ্ছা তেমনিই পর, তবে তাতে যেন দু’টি জিনিস না থাকে; অপচয় ও অহংকার।” *(বুঃ, মিঃ ৪৩৮০ নং)*

নামাযের ভিতরে বিশেষ লেবাস

একটাই কাপড়ে পুরুষের নামায শুদ্ধ, তবে তাতে কাঁধ ঢাকতে হবে। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৭৫৪-৭৫৬ নং)* আর খেয়াল রাখতে হবে, যেন শরমগাহ প্রকাশ না পেয়ে যায়। *(ঐ মিঃ ৪৩১৫ নং)* তওয়াফে কুদূম (হজ্জ ও উমরায় সর্বপ্রথম তওয়াফ) ছাড়া অন্য সময় ইহরাম অবস্থায় ডান কাঁধ বের করে রাখা বিধেয় নয়। বলা বাহুল্য নামাযের সময় উভয় কাঁধ ঢাকা জরুরী।

এক ব্যক্তি হযরত উমার ﷺ কে এক কাপড়ে নামায পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ‘আল্লাহ আধিক্য দান করলে তোমরাও অধিক ব্যবহার কর।’ অর্থাৎ বেশী কাপড় থাকলে বেশী ব্যবহার করাই উত্তম। *(বুঃ ৩৬৫ নং)*

দরবার আল্লাহর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। তাই নামাযীর উচিত, যথাসাধ্য সৌন্দর্য অবলম্বন করে তাঁর দরবারে হাজির হওয়া। মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, তখন তাকে দু’টি কাপড় পরা উচিত। কারণ, আল্লাহ অধিকতম হকদার যে, তাঁর জন্য সাজসজ্জা গ্রহণ করা হবে।” *(সংজাঃ ৬৫২ নং)*

পক্ষান্তরে নামাযের জন্য এমন নক্‌শাদার কাপড় হওয়া উচিত নয়, যাতে নামাযীর মন বা একাগ্রতা চুরি করে নেয়। একদা মহানবী ﷺ নক্‌শাদার কোন কাপড়ে নামায পড়ার পর বললেন, “এটি ফেরৎ দিয়ে ‘আম্বাজানী’ (নক্‌শাবিহীন) কাপড় নিয়ে এস। কারণ, এটি আমাকে আমার নামায থেকে উদাস করে ফেলেছিল।” *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৭৫৭ নং)*

নামাযীর নামাযের এমন লেবাস হওয়া উচিত নয়, যাতে কোন (বিচরণশীল) প্রাণীর ছবি থাকে। কারণ, এতেও নামাযীর মনোযোগ ছিনিয়ে নেয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর কক্ষের এক প্রান্তে একটি ছবিযুক্ত রঙিন পর্দা টাঙ্গানো ছিল। একদা মহানবী ﷺ বললেন, "তোমার এই পর্দা আমাদের নিকট থেকে সরিয়ে নাও। কারণ, ওর ছবিগুলো আমার নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।" *(বুঃ ৩৭৪ নং)*

তিনি বলেন, "যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি (বা মূর্তি) থাকে, সে ঘরে ফিরিশ্তা প্রবেশ করেন না।" *(ইমাঃ, আঃ, তিঃ, ইহিঃ, সংজাঃ ১৯৬১, ১৯৬৩ নং)*

অতএব নামাযের বাইরেও এ ধরনের ছবিযুক্ত লেবাস মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। কারণ, ইসলাম ছবি ও মূর্তির ঘোর বিরোধী।

যে কাপড়ে অমুসলিমদের কোন ধর্মীয় প্রতীক (যেমন ক্রুশ, শঙ্খ প্রভৃতি) থাকে, সে কাপড় (ও অলঙ্কার) ব্যবহার বৈধ নয়। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নবী ﷺ বাড়িতে কোন জিনিসে ক্রুশ দেখলেই তা কেটে ফেলতেন।' *(আঃ, আদাঃ ৪১৫১ নং)*

জুতো পবিত্র হলে, তা পায়ে রেখেই নামায পড়া বৈধ। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা ইয়াহুদীদের বিপরীত কর। (এবং জুতো ও মোজা পায়ে নামায পড়।) কারণ, ওরা ওদের জুতো ও মোজা পায়ে রেখে নামায পড়ে না।" *(আদাঃ, মিঃ ৭৬৫নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ নিষেধ করেছেন, যেন কেউ বাম হাতে না খায়, কেউ যেন এক পায়ে জুতো রেখে না চলে, কেউ যেন এমনভাবে একটি মাত্র কাপড় দ্বারা নিজেকে জড়িয়ে না নেয়, যাতে তার হাত বের করার পথ থাকে না এবং কেউ যেন একটাই কাপড় পরে, পাছার উপর ভর করে, পায়ের রলা ও হাঁটু দু'টিকে খাড়া করে পেটে লাগিয়ে, হাত দু'টিকে পায়ে জড়িয়ে, লজ্জাস্থান খুলে না বসে। *(মুঃ, মিঃ ৪৩১৫ নং)*

লুঙ্গির ভিতরে কিছু না পরে থাকলে এবং অনুরূপ বসলেও লজ্জাস্থান প্রকাশ পাওয়ার ভয় থাকে। যেমন মহিলাদের শাড়ি-সায়াতেও ঐ একই অবস্থা হতে পারে। অতএব ঐ সব কাপড়ে ঐরূপ বসা বৈধ নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি নামাযে তার লুঙ্গিকে অহংকারের সাথে গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে রাখে, তার এ কাজ হালাল নয় এবং আল্লাহর নিকট তার কোন সম্মান নেই।" *(আদাঃ, সংজাঃ ৬০১২ নং)*

প্রকাশ যে, গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে নামায পড়লে নামায কবুল হয় না -এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি সহীহ নয়। *(যঃআদাঃ ১২৪, ৮৮৪ নং)*

নাপাকীর সন্দেহ না থাকলে প্রয়োজনে মহিলাদের শাল, চাদর, বা শাড়ি গায়ে দিয়ে পুরুষরা নামায পড়তে পারে।

প্রয়োজনে একই কাপড়ের অর্ধেকটা (ঋতুমতী হলেও) স্ত্রীর গায়ে এবং পুরুষ তার অর্ধেকটা গায়ে দিয়ে নামায পড়তে পারে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ রাত্রে নামায পড়তেন। আমি মাসিক অবস্থায় তাঁর পাশে থাকতাম। আর আমার একটি কাপড় আমার গায়ে এবং কিছু তাঁর গায়ে থাকত।' *(আদাঃ ৩৭০ নং)*

যে কাপড় পরে থাকা অবস্থায় মেয়েদের মাসিক হয়, সেই কাপড়ে মাসিক লেগে থাকার সন্দেহ না থাকলে পবিত্রতার গোসলের পর না ধুয়েও ঐ কাপড়েই তাদের নামায পড়া বৈধ। মাসিক লাগলেও যে স্থানে লেগেছে কেবল সেই স্থান ধুয়ে খুনের দাগ না গেলেও তাতেই নামায পড়া বৈধ ও শুদ্ধ হবে। *(আদাঃ ৩৬৫নং)*

কেবল দুধ পান করে এমন শিশুপুত্র যদি কাপড়ে পেশাব করে দেয়, তাহলে তার উপর পানির ছিটা মেরে এবং না ধুয়ে তাতেই নামায হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি শিশুকন্যার পেশাব হয় অথবা দুধ ছাড়া অন্য খাবারও খায় এমন শিশু হয়, তাহলে তার পেশাব কাপড় থেকে ধুয়ে ফেলতে হবে। নচেৎ নামায হবে না। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৪৯৭, ৫০২, আদাঃ ৩৭৭-৩৭৯ নং)*

কাপড়ের পেশাব রোদে শুকিয়ে গেলেও তাতে নামায হয় না। কাপড় থেকে পেশাব পানি দিয়ে ধোয়া জরুরী। *(ফইঃ ১/১৯৮)*

যে কাপড় পরে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয় সেই কাপড়েও নামায শুদ্ধ। অবশ্য নাপাকী লাগলে বা লাগার সন্দেহ হলে নয়। *(আদাঃ ৩৬৬নং)*

টাইট-ফিট্ প্যান্ট ও শার্ট এবং চুস্ত্ পায়জামা ও খাটো পাঞ্জাবী পরে নামায মকরূহ। টাইট হওয়ার কারণে নামাযে একাগ্রতা ভঙ্গ হয়। তাছাড়া কাপড়ের উপর থেকে (বিশেষ করে পিছন থেকে) শরমগাহের উঁচু-নীচু অংশ ও আকার বোঝা যায়। *(মবঃ ১৫/৭৫)*

মহিলাদের লেবাসে চুল, পেট, পিঠ, হাতের কব্জির উপরি ভাগের অঙ্গ (কনুই, বাহু প্রভৃতি) বের হয়ে থাকলে নামায হয় না। কেবল চেহারা ও কব্জি পর্যন্ত হাত বের হয়ে থাকবে। পায়ের পাতাও ঢেকে নেওয়া কর্তব্য। *(মবঃ ১৬/১৩৮, ফইঃ ১/২৮৮, কিদাঃ ৯৪পৃঃ)* অবশ্য সামনে কোন বেগানা পুরুষ থাকলে চেহারাও ঢেকে নিতে হবে।

ঘর অন্ধকার হলেও বা একা থাকলেও নামায পড়তে পড়তে ঢাকা ফরয এমন কোন অঙ্গ প্রকাশ পেয়ে গেলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। সেই নামায পুনরায় ফিরিয়ে পড়তে হবে। *(ফইঃ ১/২৮৫)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "কোন সাবালিকা মেয়ের মাথায় চাদর ছাড়া তার নামায কবুল হয় না।" *(আদাঃ, তিঃ, মিঃ ৭৬২নং)*

পুরুষের দেহের ঊর্ধ্বাংশের কাপড় (চাদর বা গামছা) সংকীর্ণ হলে মাথা ঢাকতে গিয়ে যেন পেট-পিঠ বাহির না হয়ে যায়। প্রকাশ যে, নামাযে পুরুষের জন্য মাথা ঢাকা জরুরী নয়। সৌন্দর্যের জন্য টুপী, পাগড়ী বা মাথার রুমাল মাথায় ব্যবহার করা উত্তম। আর এ কথা বিদিত যে, আল্লাহর নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ কখনো কখনো এক কাপড়েও নামায পড়েছেন। তাছাড়া কতক সলফ সুতরার জন্য কিছু না পেলে মাথার টুপী খুলে সামনে রেখে সুতরা বানাতেন। *(আদাঃ ৬৯১নং)*

প্রকাশ যে, পরিশ্রম ও মেহনতের কাজের ঘর্মসিক্ত, কাদা বা ধুলোমাখা দুর্গন্ধময় লেবাসে মহান বাদশা আল্লাহর দরবার মসজিদে আসা উচিত নয়। কারণ, তাতে আল্লাহর উপস্থিত ফিরিশ্তা তথা মুসল্লীগণ কষ্ট পাবেন। আর এই জন্যই তো কাঁচা পিঁয়াজ-রসুন খেয়ে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছে।

নামাযের অক্তসমূহ

ফরয নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য এক শর্ত হল, তা যথা সময়ে আদায় করা। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া ভিন্ন সময়ে নামায হয় না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَّوْقُوْتاً﴾

অর্থাৎ, নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে নামায পড়া মু'মিনদের কর্তব্য। *(কুঃ ৪/১০৩)*

কুরআন মাজীদে কতিপয় আয়াতে নামাযের ৫টি অক্তের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর নামায কায়েম কর দিনের দু' প্রান্তভাগে (অর্থাৎ ফজর ও মাগরেবের সময়) ও রাতের প্রথমাংশে (অর্থাৎ এশার সময়)। *(কুঃ ১১/১১৪)*

"সূর্য ঢলে যাওয়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত (অর্থাৎ যোহর, আসর, মাগরেব ও এশার) নামায কায়েম কর, আর কায়েম কর ফজরের নামায।" *(কুঃ ১৭/৭৮)*

"আর সূর্যোদয়ের পূর্বে (ফজরে) ও সূর্যাস্তের পূর্বে (আসরে) তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির কিছু সময়ে (এশায়) এবং দিনের প্রান্তভাগগুলিতে (ফজর, যোহর ও মাগরেবে), যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।" *(কুঃ ২০/১৩০)*

পাঁচ অক্তকে নির্দিষ্ট করতে আল্লাহর তরফ হতে স্বয়ং জিবরীল (আঃ) এসে ইমাম হয়ে রসূল ﷺকে সঙ্গে নিয়ে নামায পড়েন। নবী ﷺ বলেন, "কা'বাগৃহের নিকট জিবরীল (আঃ) আমার দু'বার ইমামতি করেন; প্রথমবারে তিনি আমাকে নিয়ে যোহরের নামায তখন পড়লেন, যখন সূর্য ঢলে গিয়ে তার ছায়া জুতোর ফিতের মত (সামান্য) হয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে আসরের নামায পড়লেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়েছিল। অতঃপর আমাকে নিয়ে মাগরেবের নামায পড়লেন তখন, যখন রোযাদার ইফতার করে ফেলেছিল। (অর্থাৎ সূর্যাস্তের সাথে সাথে।) অতঃপর এশার নামায তখন পড়লেন, যখন (সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশের অস্তরাগ) লাল আভা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। আর আমাকে নিয়ে ফজরের নামায তখন পড়লেন, যখন রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনে তিনি আমাকে নিয়ে যোহরের নামায তখন পড়লেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়েছিল। আসরের নামাযে আমার ইমামতি তখন করলেন, যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়েছিল। অতঃপর আমাকে নিয়ে মাগরেবের নামায তখন পড়লেন, যখন রোযাদার ইফতার করে ফেলেছিল। অতঃপর রাতের এক তৃতীয়াংশ গত হলে তিনি এশার নামায পড়লেন। আর আমাকে নিয়ে ফজরের নামায তখন পড়লেন, যখন (ভোর) ফর্সা হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! এ হল আপনার পূর্বে সকল নবীগণের অক্ত। আর এই দুই অক্তের মধ্যবর্তী অক্তই হল নামাযের অক্ত।' *(আদাঃ, তিঃ, মিঃ ৫৮৩নং)*

শেষ অক্তে নামায যদিও শুদ্ধ, তবুও প্রথম (আওয়াল) অক্তে নামায পড়া হল শ্রেষ্ঠ আমল। আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন আমল সর্বশ্রেষ্ঠ?' উত্তরে তিনি বললেন, "আওয়াল অক্তে নামায পড়া।" *(সঃআদাঃ ৪৫২, সঃতিঃ ১৪৪, মিঃ ৬০৭নং)*

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ শেষ জীবন পর্যন্ত দ্বিতীয় বার কখনো শেষ অক্তে নামায পড়েন নি।' *(সঃতিঃ ১৪৬, মিঃ ৬০৮নং)*

ফজরের সময়

সুবহে সাদেক উদিত হলে ফজরের নামাযের সময় শুরু হয় এবং রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয়ে যায়। (সুবহে সাদেক বলা হয় সেই সময়কে, যে সময়ে ভোরের আভা পূর্ব আকাশে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তীর্ণ অবস্থায় দেখা যায়।) আর এর শেষ সময় হল সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।

তবে এই নামায প্রথম অক্তে 'গালাসে' (একটু অন্ধকারে কাকভোরে) পড়া উত্তম।

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ ফজরের নামায পড়তেন। অতঃপর মহিলারা তাদের চাদর জড়িয়েই নিজ নিজ বাসায় ফিরে যেত। কিন্তু অন্ধকারের জন্য তাদেরকে চেনা যেত না।' *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৫৯৮-নং)*

আবূ মূসা ؓ বলেন, 'একদা আল্লাহর রসূল ﷺ তখন ফজরের নামায পড়লেন, যখন কেউ তার পাশ্ববর্তী সঙ্গীর চেহারা চিনতে পারত না অথবা তার পাশে কে রয়েছে তা জানতে পারত না।' *(আদাঃ ৩৯৫, ৩৯৮-নং)*

আবূ মাসঊদ আনসারী ؓ বলেন, তিনি (নবী ﷺ) একবার ফজরের নামায অন্ধকারে (খুব ভোরে) পড়লেন। অতঃপর দ্বিতীয় বার ফর্সা করে পড়লেন। এরপর তাঁর ফজরের নামায অন্ধকারেই হত। আর ইন্তেকাল অবধি কোন দিন পুনর্বার (ফজরের নামায) ফর্সা করে পড়েন নি।' *(আদাঃ ৩৯৪নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা ফজরের নামায ফর্সা করে পড়। কারণ, তাতে সওয়াব অধিক।" *(আদাঃ, তিঃ, নাঃ, মিঃ ৬১৪নং)*

এই হাদীসের ব্যাখ্যা এই যে, 'ফজর স্পষ্টরূপে প্রকাশ হতে দাও, নিশ্চিতরূপে ফজর উদিত হওয়ার কথা না জেনে নামাযের জন্য তাড়াহুড়া করো না।' অথবা 'তোমরা ফজরের নামায লম্বা ক্বিরাআত ধরে ফর্সা করে পড়। এতে অধিক সওয়াব লাভ হবে।' আর এ কথা বিদিত যে, মহানবী ﷺ নিজে এই নামাযে (কখনো কখনো) ৬০ থেকে ১০০ আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন এবং যখন নামায শেষ করতেন, তখন প্রত্যেকে তার পাশের সাথীকে চিনতে পারত। *(বুঃ ৫৯৯নং)*

অথবা 'চাঁদনী রাতে একটু ফর্সা হতে দাও। যাতে ফজর হওয়া স্পষ্ট ও নিশ্চিতরূপে বুঝা যায়।' *(মুমঃ ২/১১৪-১১৫)*

যেহেতু তাঁর আমল মৃত্যু পর্যন্ত ফজরের নামায ফর্সা করে ছিল না, বরং এ নামায একটু

অন্ধকার থাকতেই শুরু করতেন, সেহেতু উক্ত হাদীসের এই সব ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত।

যোহরের সময়

সূর্য পশ্চিম আকাশের দিকে ঢলে গেলেই যোহরের আওয়াল অক্ত শুরু হয়। আর প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হলে তার সময় শেষ হয়ে যায়।

সূর্য মধ্যরেখায় থাকলে কোন খোলা জায়গায় একটি সরল কাঠি বা শলাকা সোজাভাবে গাড়লে যখন তার ছায়া তার দেহে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর পূর্ব দিকে পড়ে লম্বা হতে লাগবে, তখনই হবে যোহরের সময়। এইভাবে তার ছায়া তার সমপরিমাণ হলে যোহরের সময় শেষ হয়ে যাবে।

অন্যথা সূর্য মধ্যরেখায় না থাকলে, কোন গোলার্ধে থাকার ফলে যে অতিরিক্ত ছায়া পড়ে, তা বাদ দিয়ে মাপতে হবে। কাঠির ছায়া কমতে কমতে ঠিক মধ্যাহ্নকালে আবার বাড়তে শুরু হবে। ঐ বাড়া অংশটি মাপলে যোহর-আসরের সময় নির্ণয় করা যাবে।

প্রত্যেক নামায তার প্রথম অক্তে পড়াই হল উত্তম। কিন্তু গ্রীষ্মকালে কঠিন গরমের দিনে যোহরের নামায একটু ঠান্ডা বা দেরী করে পড়া আফযল।

আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ এর সাথে এক সফরে ছিলাম। যোহরের সময় হলে মুআয্যিন আযান দিতে চাইল। নবী ﷺ বললেন, "ঠান্ডা কর।" এইরূপ তিনি দুই অথবা তিন বার বললেন। তখন আমরা দেখলাম যে, ছোট ছোট পাহাড়গুলোর ছায়া নেমে এসেছে। পুনরায় নবী ﷺ বললেন, "গ্রীষ্মের এই প্রখর উত্তাপ দোযখের অংশ। অতএব গরম কঠিন হলে নামায ঠান্ডা (দেরী) করে পড়।" *(বুঃ ৫৩৯নং, মুঃ, আদাঃ, তিঃ)* গ্রীষ্মকালে নিজের ছায়া ৩ থেকে ৫ কদম হলে এবং শীতকালে ৫ থেকে ৭ কদম হলে যোহরের সময় নির্ণয় করা যায়। *(আদাঃ, নাঃ, মিঃ ৫৮৬নং)* অবশ্য সকল দেশেই এ মাপ সঠিক হবে না।

আসরের সময়

যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয়ে যায়, তখন আসরের সময় শুরু হয়। শেষ হয় ঠিক সূর্যাস্তের পূর্বমুহূর্তে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার পূর্বে আসরের এক রাকআত পেয়ে নেয়, সে আসর পেয়ে নেয়।" *(বুঃ, মুঃ)*

আসরের আওয়াল অক্তেই নামায পড়া মহানবী ﷺ এর আমল ছিল। আনাস ﷺ বলেন, 'সূর্য যখন আকাশের উচ্চতায় প্রদীপ্ত থাকত, তখন আল্লাহর রসূল ﷺ আসরের নামায পড়তেন। তাঁর সাথে নামায পড়ে অনেকে মদীনার পার্শ্ববর্তী বস্তীতে (কোন কাজে বা নিজের বাড়ি ফিরে) যেত, আর যখন সেখানে পৌঁছত তখনও সূর্য (অপেক্ষাকৃত) উচ্চতায় থাকত। পরন্তু কোন কোন বস্তী মদীনা থেকে প্রায় ৪ মীল (১৬ হাজার হাত, প্রায় ৭ কিমি) দূরে অবস্থিত ছিল।' *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৫৯২নং)*

রাফে' বিন খাদীজ ﷺ বলেন, 'আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথে আসরের নামায পড়তাম। অতঃপর উট নহর (যবেহ) করা হত, তারপর তার গোশ্ত্ দশ ভাগ করা হত। সেই গোশ্ত্ সূর্য ডোবার পূর্বেই রান্না করে খেতে পেতাম।' *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৬১৫নং)*

বিনা ওজরে আসরের নামায শেষ সময়ে দেরী করে পড়া মকরূহ। মহানবী ﷺ বলেন, "এটা তো মুনাফিকের নামায; যে সূর্যের অপেক্ষা করে যখন তা হলদে হয়ে শয়তানের দুই শিঙের মাঝে আসে, তখন সে উঠে (কাকের বা মুরগীর দানা খাওয়ার মত) চার রাকআত ঠকাঠক পড়ে নেয়। যাতে সে আল্লাহর যিক্র কমই করে থাকে।" *(মুঃ, আঃ, আদাঃ, তিঃ, নাঃ, মিঃ ৫৯৩নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেন, "যে ব্যক্তি আসরের নামায ত্যাগ করে সে ব্যক্তির আমল পন্ড হয়ে যায়।" *(বুখারী ৫৫৩, নাসাঈ)*

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "যে ব্যক্তির আসরের নামায ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন-মাল লুণ্ঠন হয়ে গেল।" *(মালেক, বুখারী ৫৫২, মুসলিম ৬২৬ নং প্রমুখ)*

মাগরেবের সময়

সূর্য অস্ত গেলেই মাগরেবের সময় হয় এবং পশ্চিমাকাশে লাল আভা (অস্তরাগ) কেটে গেলেই এর সময় শেষ হয়ে যায়। *(মুঃ)*

মাগরেবের নামাযও আওয়াল অক্তে পড়া আফযল এবং বিনা ওজরে দেরী করে পড়া মকরূহ। কেননা, জিবরীল (আঃ) মহানবী ﷺ এর ইমামতি কালে ২ দিনই একই সময়ে আওয়াল অক্তে নামায পড়িয়েছিলেন- যেমন পূর্বেকার হাদীস হতে আমরা জানতে পেরেছি। তাছাড়া রাফে' বিন খাদীজ ﷺ বলেন, 'আমরা নবী ﷺ এর সাথে মাগরেবের নামায পড়তাম। অতঃপর নামায সেরে যদি আমাদের কেউ তীর মারত, তাহলে সে তার তীর পড়ার স্থানটি দেখতে পেত।' (অর্থাৎ, বেশী অন্ধকার হত না।) *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৫৯৬নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের লোকেরা ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী ফিতরাত (প্রকৃতির) উপর থাকবে, যতক্ষণ তারা তারকারাজি (আকাশে) প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই মাগরেবের নামায পড়ে নেবে।" *(আঃ, ত্বাবঃ, আদাঃ, হাঃ, মিঃ ৬০৯নং)*

এশার সময়

সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশ হতে লাল আভা কেটে গেলে এশার সময় উপস্থিত হয়। নু'মান বিন বাশীর ﷺ এর বর্ণনা অনুযায়ী (চাঁদের মাসের) তৃতীয় রাতে চাঁদ ডুবে গেলে এশার সময় হয়। *(আদাঃ, দাঃ, মিঃ ৬১৩নং)* সূর্য ডোবার পর থেকে ঘড়ি ধরে দেড় ঘন্টা অতিবাহিত হলে এই অক্ত আসে।

আর এর শেষ সময় অর্ধেক রাত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য কোন ওযর ও বাধার ফলে ফজরের আগে পর্যন্ত এশার নামায পড়ে নিলে আদায় হয়ে যায়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "কেউ ঘুমিয়ে যাওয়ার ফলে নামায না পড়লে তা শৈথিল্য বলে গণ্য হবে না। অবশ্য

জাগ্রতাবস্থায় যদি কেউ নামায না পড়ে এবং অন্য নামাযের সময় উপস্থিত হয়ে যায়, তবে তার শৈথিল্যই ধর্তব্য।” *(মুঃ ৬৮১নং)*

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আগামী নামাযের সময় এসে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান নামাযের সময় অবশিষ্ট থাকে। অবশ্য ফজরের নামাযের সময় শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। সূর্য উদয়ের সাথে সাথেই তা শেষ হয়ে যায়। যোহর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। *(ফিসুঃ উর্দু ৭৫পৃঃ)*

আওয়াল অক্তে নামায আফযল হলেও এক তৃতীয়াংশ বা মধ্যরাতে (শেষ অক্তে) এশার নামায পড়া আফযল। মহানবী ﷺ বলেন, “আমার উম্মতের জন্য কষ্টসাধ্য না জানলে আমি এশার নামাযকে এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধরাত পর্যন্ত দেরী করে পড়তে তাদেরকে আদেশ দিতাম।” *(আঃ, তিঃ, ইমাঃ, মিঃ ৬১১নং)*

প্রিয় রসূল ﷺ এশার নামাযকে এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দেরী করে পড়তে পছন্দ করতেন এবং এশার পূর্বে ঘুমানো ও পরে কথাবার্তা বলাকে অপছন্দ করতেন। *(বুঃ ৫৯৯, মুঃ, প্রমুখ)* যাতে এশা, তাহাজ্জুদ, বিতর ও ফজরের নামায যথা সময়ে পড়া সহজ হয়।

তবে দ্বীন অথবা জরুরী বিষয়ে কথাবার্তা বলা ও ইল্‌ম চর্চা করা দূষনীয় নয়। যেমন আল্লাহর রসূল ﷺ আবূ বকর ও উমারের সাথে এশার পর জনসাধারণের ভালো-মন্দ নিয়ে কথাবার্তা বলতেন। *(আঃ, তিঃ ১৬৯নং)*

নামাযের সময় নির্দিষ্টীকরণের পশ্চাতে হিকমত

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে এমন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি দান করেছেন, যাতে রুযী অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাকে জীবনধারণ করতে হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন পরিশ্রমের। পরিশ্রম দেহ-মনে ক্লান্তি, ব্যস্ততা ও শৈথিল্য আনে। ফলে পরিশ্রমে ছিন্ন হয় আল্লাহ ও বান্দার মাঝে বিশেষ যোগসূত্র। তাই তো যথাসময়ে সেই যোগসূত্র -একটানা নয় বরং মাঝে মাঝে কায়েম করে বান্দাকে আল্লাহ-মুখো করে রাখার উদ্দেশ্যে নামাযের অক্তের এই বিশেষ সময়াবলী নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে পরিশ্রম ও উপার্জনের জন্যও উদ্যম জরুরী। বিশেষ করে ফজরের সময়ে এমন কিছু অনুশীলনের দরকার, যার মাঝে নিদ্রার জড়তা ও আলস্য কেটে গিয়ে মনে স্ফূর্তি ফিরে আসে এবং যার ফলে এই বর্কতের সময়ে মানুষ নিজ নিজ কাজে মনোযোগী হতে পারে। তাই তো ফজরের নামাযের মাধ্যমে বান্দা তার নিদ্রা অবস্থায় নিরাপত্তা লাভের উপর আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে এবং আল্লাহর নিকট তওফীক ও সাহায্য কামনার মধ্য দিয়ে শুরু করে তার প্রাত্যহিক কর্মজীবন।

পরিশ্রম ও ব্যস্ততার মাঝে ঠিক দিন দুপুরে মানুষ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে একটু বিরতির সাথে বিশ্রাম নিয়ে থাকে। এই বিশ্রামের সময় সে তার নিজ কর্মের উপর তওফীক লাভের শুকরিয়া জ্ঞাপন করে আল্লাহর নিকট। অতঃপর আসরের সময় উপস্থিত হলে পুনরায় বান্দা তার বাকী দিনের কর্ম সম্পন্ন করার মানসে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে। মাগরেবের সময় হলে

বান্দা নিজ গৃহে ফিরে কর্ম সম্পাদন করার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক মাগরেবের নামায পড়ে। অতঃপর সময় আসে বিশ্রাম ও আরামের। এই সময় বান্দা প্রাত্যহিক কর্ম সেরে সারা দিনে আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ অনুগ্রহের উপর শুক্র জানিয়ে এশার নামায পড়ে। আর এইভাবে সে প্রত্যহ কর্ম ও ইবাদতের মধ্য দিয়ে নিজের কাল যাপন করে থাকে। কোন সময় আত্মবিস্মৃত হয়ে পাপের প্রতি ঢলে পড়লে নামায তাকে বাধা দেয়। আল্লাহর আযাব ভীষণ কঠিন এবং তাঁর অনুগ্রহ অনন্ত-অসীম -এ কথা প্রত্যহ পাঁপ-পাঁচ বার বান্দাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। *(মাসাইঃ ৯১-৯২পৃঃ)*

যে যে সময়ে নামায নিষিদ্ধ

দিবারাত্রে পাঁচটি সময়ে নামায পড়া নিষিদ্ধ; মহানবী ﷺ বলেন, (১) “আসরের নামাযের পর সূর্য না ডোবা পর্যন্ত আর কোন নামায নেই এবং (২) ফজরের নামাযের পর সূর্য না ওঠা পর্যন্ত আর কোন নামায নেই।” *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১০৪১ নং)*

উক্ববা বিন আমের ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে তিন সময়ে নামায পড়তে এবং মুর্দা দাফন করতে নিষেধ করতেন; (৩) ঠিক সূর্য উদয় হওয়ার পর থেকে একটু উঁচু না হওয়া পর্যন্ত, (৪) সূর্য ঠিক মাথার উপর আসার পর থেকে একটু ঢলে না যাওয়া পর্যন্ত এবং (৫) সূর্য ডোবার কাছাকাছি হওয়া থেকে ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত। *(মুঃ, আঃ, আদাঃ, নাঃ, ইমাঃ, মিঃ ১০৪০ নং)* যেহেতু এই সময়গুলিতে সাধারণতঃ কাফেররা সূর্যের পূজা করে থাকে তাই। *(মুঃ, মিঃ ১০৪২ নং)*

নামায নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে এটি হল সাধারণ নির্দেশ। কিন্তু অন্যান্য হাদীস দ্বারা কিছু সময়ে কিছু নামাযকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। যেমনঃ-

১। ফরয নামায বাকী থাকলে তা আদায় করার সুযোগ হওয়া মাত্র যে কোন সময়ে সত্বর পড়ে নেওয়া জরুরী। মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার পূর্বে আসরের এবং সূর্য ওঠার পূর্বে ফজরের এক রাকআত নামায পেয়ে যায়, সে (যথাসময়ে) নামায পেয়ে যায়।” *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৬০১নং)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার পূর্বে আসরের এক রাকআত নামায পায়, সে যেন (সূর্য ডুবে গেলেও) তার বাকী রাকআত নামায সম্পন্ন করে নেয়। আর যে ব্যক্তি সূর্য ওঠার পূর্বে ফজরের এক রাকআত নামায পায়, সে যেন (সূর্য উঠে গেলেও) তার বাকী রাকআত নামায সম্পন্ন করে নেয়।” *(বুঃ, মিঃ ৬০২নং)*

২। অনুরূপ কোন ফরয নামায পড়তে ভুলে গিয়ে থাকলে তা স্মরণ হওয়া মাত্র সত্বর যে কোন সময়ে অথবা ঘুমিয়ে গিয়ে থাকলে জাগার পর উঠে সত্বর যে কোন সময়ে আদায় করা জরুরী। মহানবী ﷺ বলেন, “কেউ ঘুমিয়ে গেলে তা তার শৈথিল্য নয়। শৈথিল্য তো জাগ্রত অবস্থাতেই হয়ে থাকে। সুতরাং যখন কেউ কোন নামায পড়তে ভুলে যাবে অথবা ঘুমিয়ে যাবে, তখন তার উচিত, তা স্মরণ (বা জাগ্রত) হওয়া মাত্র পড়ে নেওয়া। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে তুমি নামায কায়েম কর।" *(মুঃ, মিঃ ৬০৪নং, ত্বঃ ২০/১৪)*

৩। দিন-দুপুরে মসজিদে জুমআহ পড়তে এসে ইচ্ছামত নফল নামায পড়া বিধেয়। এ নামাযও নিষেধের আওতাভুক্ত নয়। *(মিঃ ১০৪৬নং)*

৪। ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে দু' রাকআত সুন্নত পড়তে সময় না পেলে ফরযের পর তা পড়া যায়। আল্লাহর রসূল ﷺ একদা এক ব্যক্তিকে দেখলেন ফজরের ফরয নামাযের পর দু' রাক্‌আত নামায পড়ল। তিনি তাকে বললেন, "ফজরের নামায তো দু' রাকআত মাত্র!" লোকটি বলল, 'আমি ফরযের পূর্বে দু' রাকআত পড়তে পাই নি, এখন সেটা পড়ে নিলাম।' এ কথা শুনে তিনি নীরব থাকলেন। (অর্থাৎ, মৌনসম্মতি জানালেন।) *(আদাঃ, তিঃ, মিঃ ১০৪৪)*

৫। কারণ-সাপেক্ষ যাবতীয় নামায যথার্থ কারণ উপস্থিত হওয়া মাত্র যে কোন সময়েই পড়া যায়। যেমন ঃ-

ক- কা'বা শরীফের তওয়াফের পর দু' রাকআত নামায। তওয়াফ শেষ হওয়ার পরেই যে কোন সময়ে ঐ নামায পড়া যায়। মহানবী ﷺ বলেন, "হে আব্দে মানাফের বংশধর! দিবারাত্রের যে কোন সময়ে কেউ এ গৃহের তওয়াফ করে নামায পড়লে তাকে তোমরা বাধা দিও না।" *(আদাঃ, তিঃ, নাঃ, মিঃ ১০৪৫ নং)*

খ- তাহিয়্যাতুল মাসজিদ (মসজিদ-সেলামী) দু' রাকআত নামায। যে কোনও সময়ে মসজিদ প্রবেশ করে বসার ইচ্ছা করলে বসার পূর্বে এই নামায পড়তে হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ মসজিদ প্রবেশ করলে সে যেন দু' রাকআত নামায পড়ার পূর্বে না বসে।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৭০৪নং)*

গ- সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের নামায। মহানবী ﷺ বলেন, "সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে তাতে গ্রহণ লাগে না। সুতরাং গ্রহণ লাগা দেখলে তোমরা আল্লাহর নিকট দুআ কর, তকবীর পড়, নামায পড় এবং সদকাহ কর।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১৪৮৩ নং)*

ঘ- জানাযার নামায। আসর ও ফজর নামাযের পরও জানাযার নামায পড়া যাবে। অবশ্য শেষোক্ত তিন সময়ে এই নামায বৈধ নয়। যেমন পূর্বোক্ত হাদীসে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। *(আজাঃ ১৩০-১৩১পৃঃ)*

সুতরাং সাধারণ নফল নামায উক্ত সময়গুলিতে নিষিদ্ধ। তবে আসরের পর সূর্য হলুদবর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ নয়। *(সিসঃ ২৫৪৯ নং)*

অক্ত-বিষয়ক আরো কিছু মাসায়েল

১। যে ব্যক্তি অক্ত শেষ হওয়ার পূর্বে এক রাকআত নামায পেয়ে নেবে সে অক্ত পেয়ে যাবে। অর্থাৎ, তার নামায যথা সময়ে আদায় হয়েছে এবং কাযা হয় নি বলে গণ্য হবে। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৬০১নং)* বিধায় যে ব্যক্তি এক রাকআতের চেয়ে কম নামায পাবে, সে সময় পাবে না; অর্থাৎ তার নামায যথাসময়ে আদায় হবে না এবং তা কাযা বলে গণ্য হবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা ওজরে শেষ সময়ে নামায পড়া বৈধ নয়।

তদনুরূপ যদি কোন ব্যক্তি এক রাকআত নামায পড়ার মত সময়ের পূর্বেই মুসলমান হয় অথবা কোন মহিলা অনুরূপ সময়ে মাসিক থেকে পবিত্রা হয় তবে ঐ অক্তের নামায তাদের জন্য কাযা করা ওয়াজেব।

যেমন কোন ব্যক্তি যদি সূর্য ওঠার পূর্বে এমন সময়ে ইসলাম গ্রহণ করে, যে সময়ের মধ্যে মাত্র এক রাকআত ফজরের নামায পড়লেই সূর্য উঠে যাবে, তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য ফজরের ঐ নামায ফরয এবং তাকে কাযা পড়তে হয়। অনুরূপ যদি কোন পাগল জ্ঞান ফিরে পায় অথবা কোন মহিলার মাসিক বন্ধ হয়, তাহলে তাদের জন্যও ঐ ফজরের নামায ফরয।

ঠিক তদ্রূপই যদি কোন মহিলা মাগরেবের নামায না পড়ে থাকে এবং এতটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তার মাসিক শুরু হয়ে যায়, যার মধ্যে এক রাকআত নামায পড়া যেত, তাহলে ঐ মহিলার জন্য ঐ মাগরেবের নামায ফরয। মাসিক থেকে পাক হওয়ার পরে তাকে ঐ নামায কাযা পড়তে হবে। *(রাফিঃ ২৩-২৪পৃঃ)*

২। এশার নামায অর্ধরাত্রি পর্যন্ত দেরী করে পড়া আফযল হলেও আওয়াল অক্তে জামাআত হলে জামাআতের সাথে আওয়াল অক্তেই পড়া আফযল। কারণ, জামাআতে নামায পড়া ওয়াজেব।

৩। ফজরের আযান হলে ২ রাকআত সুন্নাতে রাতেবাহ ছাড়া ফরয পর্যন্ত আর অন্য কোন নামায নেই। মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে যেন পৌঁছে দেয় যে, ফজরের (আযানের) পর দু’ রাকআত (সুন্নত) ছাড়া আর কোন (নফল) নামায পড়ো না।” *(আঃ, আদাঃ ১২৭৮ নং)*

৪। জামাআত খাড়া হলে ফরয নামায ছাড়া কোন প্রকারের নফল ও সুন্নত (অনুরূপ পৃথক ফরয) নামায পড়া বৈধ নয়। *(মুঃ প্রমুখ, মিঃ ১০৫৮ নং)*

৫– পৃথিবীর যে স্থানে দিন বা রাত্রি অস্বাভাবিক লম্বা (যেমন ৬ মাস রাত, ৬ মাস দিন) হয়, সে স্থানে ২৪ ঘন্টা হিসাব করে রাত-দিন ধরে হিসাব মত পাঁচ অক্ত নামায পড়তে হবে। যে স্থানে দিন বা রাত অস্বাভাবিক ছোট সেখানেও আন্দাজ করে সকল নামায আদায় করা জরুরী। যেমন দাজ্জাল এলে দিন ১ বছর, ১ মাস ও ১ সপ্তাহ পরিমাণ লম্বা হলে, স্বাভাবিক দিন অনুমান ও হিসাব করে নামায পড়তে বলা হয়েছে। *(মুঃ ২১৩৭ নং)*

আযান ও তার মাহাত্ম্য

আযান ফরয এবং তা দেওয়া হল ফর্যে কিফায়াহ। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “নামাযের সময় উপস্থিত হলে তোমাদের একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।” *(বুঃ ৬২৮-নং, মুঃ, নাঃ, দাঃ)*

আযান ইসলামের অন্যতম নিদর্শন ও প্রতীক। কোন গ্রাম বা শহরবাসী তা ত্যাগ করলে ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবেন। যেমন মহানবী ﷺ অভিযানে গেলে কোন জনপদ থেকে আযানের ধ্বনি শুনলে তাদের উপর আক্রমণ করতেন না। *(বুঃ ৬১০ নং, মুঃ)*

সফরে একা থাকলে অথবা মসজিদ খুবই দূর হলে এবং আযান শুনতে না পাওয়া গেলে

একাই আযান ও ইকামত দিয়ে নামায পড়া সুন্নত। *(ফইঃ ১/২৫৫)*

আযান দেওয়ায় (মুআয্যেনের জন্য) রয়েছে বড় সওয়াব ও ফযীলত। মহান আল্লাহ বলেন, "সে ব্যক্তি অপেক্ষা আর কার কথা উৎকৃষ্ট, যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করে, সৎকাজ করে এবং বলে আমি একজন 'মুসলিম' (আত্মসমর্পণকারী)?" *(কুঃ ৪১/৩৩)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "লোকে যদি আযান ও প্রথম কাতারের মাহাত্ম্য জানত, অতঃপর তা লাভের জন্য লটারি করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় না পেত, তাহলে তারা লটারিই করত।" *(বুঃ ৬১৫, মুঃ ৪৩৭নং)*

"আল্লাহ প্রথম কাতারের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তাগণ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন। মুআয্যিনকে তার আযানের আওয়াযের উচ্চতা অনুযায়ী ক্ষমা করা হয়। তার আযান শ্রবণকারী প্রত্যেক সরস বা নীরস বস্তু তার কথার সত্যায়ন করে থাকে। তার সাথে যারা নামায পড়ে তাদের সকলের নেকীর সমপরিমাণ তার নেকী লাভ হয়।" *(আহমদ, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ২২৮নং)*

"কিয়ামতের দিন মুআয্যিনগণের গর্দান অন্যান্য লোকেদের চেয়ে লম্বা হবে।" *(মুঃ৩৮৭নং)*

"যে ব্যক্তি বারো বৎসর আযান দেবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজেব হয়ে যাবে। আর প্রত্যেক দিন আযানের দরুন তার আমলনামায় ষাটটি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার ইকামতের দরুন লিপিবদ্ধ হবে ত্রিশটি নেকী।" *(ইবনে মাজাহ, দারাকুত্বনী, হাকেম, সহীহ তারগীব ২৪০নং)*

"যে কোন মানুষ, জ্বিন বা অন্য কিছু মুআয্যিনের আযানের শব্দ শুনতে পাবে, সেই মুআয্যিনের জন্য কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য প্রদান করবে।" *(বুখারী ৬০৯ নং)*

আযানের প্রারম্ভিক ইতিহাস

মক্কায় অবস্থানকালে মহানবী ﷺ তথা মুসলিমগণ বিনা আযানে নামায পড়েছেন। অতঃপর মদীনায় হিজরত করলে হিজরী ১ম (মতান্তরে ২য়) সনে আযান ফরয হয়। *(ফবাঃ ২/৭৮)*

সকল মুসলমানকে একত্রে সমবেত করে জামাআতবদ্ধভাবে নামায পড়ার জন্য এমন এক জিনিসের প্রয়োজন ছিল, যা শুনে বা দেখে তাঁরা জমা হতে পারতেন। এ জন্যে তাঁরা পূর্ব থেকেই মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামাযের অপেক্ষা করতেন। এ মর্মে তাঁরা একদিন পরামর্শ করলেন; কেউ বললেন, 'নাসারাদের ঘন্টার মত আমরাও ঘন্টা ব্যবহার করব।' কেউ কেউ বললেন, 'বরং ইয়াহুদীদের শৃঙ্গের মত শৃঙ্গ ব্যবহার করব।' হযরত উমার ﷺ বললেন, 'বরং নামাযের প্রতি আহ্বান করার জন্য একটি লোককে (গলি-গলি) পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?' কিন্তু মহানবী ﷺ বললেন, "হে বিলাল! ওঠ, নামাযের জন্য আহ্বান কর।" *(বুঃ ৬০৪, মুঃ)*

কেউ বললেন, 'নামাযের সময় মসজিদে একটি পতাকা উত্তোলন করা হোক। লোকেরা তা দেখে একে অপরকে নামাযের সময় জানিয়ে দেবে।' কিন্তু মহানবী ﷺ এ সব পছন্দ করলেন না। *(আদাঃ ৪৯৮নং)* পরিশেষে তিনি একটি ঘন্টা নির্মাণের আদেশ দিলেন। এই অবসরে

আব্দুল্লাহ বিন যায়দ ﵁ স্বপ্নে দেখলেন, এক ব্যক্তি ঘন্টা হাতে যাচ্ছে। আব্দুল্লাহ বলেন, আমি তাকে বললাম, 'হে আল্লাহর বান্দা! ঘন্টাটি বিক্রয় করবে?' লোকটি বলল, 'এটা নিয়ে কি করবে?' আমি বললাম, 'ওটা দিয়ে লোকেদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান করব।' লোকটি বলল, 'আমি তোমাকে এর চাইতে উত্তম জিনিসের কথা বলে দেব না কি?' আমি বললাম, 'অবশ্যই।'

তখন ঐ ব্যক্তি আব্দুল্লাহকে আযান ও ইকামত শিখিয়ে দিল। অতঃপর সকাল হলে তিনি রসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে স্বপ্নের কথা খুলে বললেন। সব কিছু শুনে মহানবী ﷺ বললেন, "ইন শাআল্লাহ! এটি সত্য স্বপ্ন। অতএব তুমি বিলালের সাথে দাঁড়াও এবং স্বপ্নে যেমন (আযান) শুনেছ ঠিক তেমনি বিলালকে শুনাও; সে ঐ সব বলে আযান দিক্। কারণ, বিলালের আওয়াজ তোমার চেয়ে উচ্চ।"

অতঃপর আব্দুল্লাহ ﵁ স্বপ্নে প্রাপ্ত আযানের ঐ শব্দগুলো বিলাল ﵁ কে শুনাতে লাগলেন এবং বিলাল ﵁ উচ্চস্বরে আযান দিতে শুরু করলেন। উমার ﵁ নিজ ঘর হতেই আযানের শব্দ শুনতে পেয়ে চাদর ছেঁচড়ে (তাড়াতাড়ি) বের হয়ে মহানবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলেন; বললেন, 'সেই সত্তার কসম, হে আল্লাহর রসূল! আমিও (২০ দিন পূর্বে) স্বপ্নে ঐরূপ দেখেছি।' আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বললেন, "অতএব যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই।" *(আঃ, আদাঃ ৪৯৮-৪৯৯, তিঃ ১৮৯, ইমাঃ ৭০৬নং)*

আযানের শব্দাবলী

মহানবী ﷺ এর মুআয্যিন ছিল মোট ৪ জন। মদীনায় ২ জন; বিলাল বিন রাবাহ ও আম্র বিন উম্মে মাকতূম কুরাশী। আম্র ছিলেন অন্ধ।আর কুবায় ছিলেন সা'দ আল-কুর্য্। মক্কায় আবূ মাহযূরাহ আওস বিন মুগীরাহ জুমাহী। *(যামাঃ ১/১২৪)*

আব্দুল্লাহ বিন যায়দ ﵁ এর বর্ণিত বিলাল ﵁ এর আযান ছিল নিম্নরূপঃ-

اَللّٰهُ أَكْبَر (আল্লা-হু আকবার) ৪ বার।

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللّٰه (আশহাদু আল্ লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ) ২ বার।

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّٰه (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লা-হ) ২ বার।

حَيَّ عَلَى الصَّلاَة (হাইয়্যা আলাস স্বলা-হ) ২ বার।

حَيَّ عَلَى الْفَلاَح (হাইয়্যা আলাল ফালা-হ) ২ বার।

اَللّٰهُ أَكْبَر (আল্লা-হু আকবার) ২ বার।

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّٰه (লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ) ১ বার। *(আঃ, আদাঃ ৪৯৯নং)*

আবূ মাহযূরাহ ﵁ কে আল্লাহর রসূল ﷺ নিম্নরূপ আযান শিখিয়েছিলেনঃ-

اَللّٰهُ أَكْبَر (আল্লাহ সবার চেয়ে মহান) ৪ বার।

أَشْـهَدُ أَنْ لاَّ إِلـهَ إِلاَّ اللّٰه (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ভিন্ন কোন সত্য উপাস্য নেই।) ২বার চুপে চুপে।

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّٰه (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল।) ২ বার চুপে চুপে।

পুনরায় أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللّٰه ২বার উচ্চস্বরে।

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّٰه ২বার উচ্চস্বরে।

حَيَّ عَلَى الصَّلاَة (এস নামাযের জন্য) ২ বার।

حَيَّ عَلَى الْفَلاَح (এস মুক্তির জন্য) ২ বার।

اَللّٰهُ أَكْبَر (আল্লাহ সবার চেয়ে মহান) ২ বার।

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّٰه (আল্লাহ ভিন্ন কোন সত্য মা'বূদ নেই।) ১ বার।

আর এই আযানকে 'তারজী' আযান' বলা হয়। *(আঃ, আদাঃ ৫০০নং, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ)*

ফজরের আযান হলে حيَّ عَلَى الْفَلاَح এর পরে ২বার বলতে হয়,

اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم (আস্‌স্বলা-তু খাইরুম মিনান্ নাওম্। অর্থাৎ, নিদ্রা অপেক্ষা নামায উত্তম। *(ঐ)*

আযানের বিশেষ নিয়মাবলী

১। আযান যেন তার শব্দবিন্যাসের বিপরীত না হয়। যার পর যে বাক্য পরস্পর সজ্জিত আছে ঠিক সেই পর্যায়ক্রমে তাই বলা জরুরী। সুতরাং -উদাহরণস্বরূপ- যদি কেউ حيَّ عَلَى الصَّلاَة বলার আগে حيَّ عَلَى الْفَلاَح বলে ফেলে, তাহলে পুনরায় حيَّ عَلَى الصَّلاَة বলে যথা অনুক্রমে আযান শেষ করবে। *(ফউঃ ১/৩৪৮)*

২। একটা বাক্য বলার পর অন্য বাক্য বলতে যেন বেশী দেরী না হয়। মাইক ইত্যাদি ঠিক করতে গিয়ে বা অন্য কোন কারণে বিরতি অধিক হলে পুনরায় শুরু থেকে আযান দিতে হবে।

৩। আযান যেন নামাযের অক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে না হয়। যেহেতু অক্তের পূর্বে আযান যথেষ্ট নয়। *(মুগনী ১/৪৪৫)* পূর্বে দিয়ে ফেললে অক্ত হলে পুনরায় আযান দেওয়া জরুরী। *(আমাঃ ২/১৬৬)* একদা হযরত বিলাল ﷺ (ফজরের) আযান ফজর উদয় হওয়ার আগেই দিয়ে ফেলেছিলেন। মহানবী ﷺ তাঁকে আদেশ করলেন যে, তিনি যেন ফিরে গিয়ে বলেন, 'শোনো! বান্দা ঘুমিয়েছিল। শোনো! বান্দা ঘুমিয়েছিল।' (অর্থাৎ ঘুমের ঘোরে সময় বুঝতে পারি নি।) *(আদাঃ ৫৩২নং)*

৪। আযানের শব্দাবলী আরবী। ভিন্ন ভাষায় (অনুবাদ করে) আযান তো শুদ্ধ নয়ই; পরন্তু ঐ আরবী শব্দগুলোর উচ্চারণে ভুল করাও বৈধ নয়। সুতরাং যদি আযানের এমন উচ্চারণ করা হয়, যাতে তার অর্থ বদলে যায়, তাহলে আযান শুদ্ধ নয়। যেমন, آللّٰهُ أَكْبَر 'আ-ল্লা-হু আকবার' (প্রথমকার আলিফে টান দিয়ে) বলা। এর অর্থ হবে, 'আল্লাহ কি সবার চেয়ে মহান?' আল্লাহর মহানতায় সন্দেহ পোষণ করে এ ধরনের প্রশ্নবোধক বাক্য বললে মানুষ কাফের হয়ে যায়। না জেনে বললে কাফের না হলেও আযান শুদ্ধ নয়।

তদনুরূপ الله أكبار। 'আল্লাহু আকবা-র' (আকবারের শেষে টান দিয়ে) বললে এর অর্থ দাঁড়াবে, 'আল্লাহ একমুখো তবলা!' অথবা 'আল্লাহ আকবা-র (এক শয়তানের নাম)! নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক।

অনুরূপ যেখানে টান আছে সেখানে না টানা এবং যেখানে টান নেই সেখানে টান দেওয়া, ع (আইন)কে ا (আলিফ) এর মত অথবা তার বিপরীত, ح (বড় হে বা হা)কে هـ (ছোট হে বা হা)এর মত অথবা তার বিপরীত উচ্চারণ, 'ফালাহ' ও 'স্বালাহ' বলার সময় 'হ'এর উচ্চারণ বাদ দিয়ে 'ফালা' ও 'সালা' বলা, যের-যবর প্রভৃতি উল্টাপাল্টা করা ইত্যাদি আযানের অর্থ বদলে দেয়। এতে আযান শুদ্ধ হয় না।

৫। আযানের সমস্ত শব্দাবলী গোনা-গাঁথা। এর উপর কিছু অতিরিক্ত করা বিদআত।মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীনের) ব্যাপারে কোন নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুঃ, মুঃ)*

তাই 'হাইয়্যা আলা খাইরিল আমাল,' 'আশহাদু আন্না সাইয়্যিদানা---' প্রভৃতি বাড়তি শব্দ ও বাক্য বিদআত। *(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ তাতাআল্লাকু বিস্‌সলাহ, ইবনে বায ৩৪পৃঃ)*

তদনুরূপ ফজর ছাড়া অন্য অক্তের আযানে 'আস্‌স্বলাতু খাইরুম--' বলা বৈধ নয়। ইবনে উমার رضي الله عنه এটিকে বিদআত বলেছেন এবং তা শুনে সে আযানের মসজিদ ত্যাগ করেছেন। *(আদাঃ ৫৩৮-নং)*

অনুরূপ আযানের পর আযানের মত চিল্লিয়ে 'নামায পড়' ইত্যাদি বলাও বিদআত। *(ফইঃ ১/২৫২)*

প্রকাশ যে, ফজরের আযানে 'আস্‌স্বলাতু খাইরুম--' বলতে ভুলে গেলে আযানের কোন ক্ষতি হয় না। *(ফউঃ ১/৩৪৯)*

আযান দিতে দিতে অতি প্রয়োজনে কথা বলায় দোষ নেই। *(বুঃ, ফবাঃ ২/ ১১৬)*

কোন কারণে আযান দিতে দিতে মুআয্‌যিন তা শেষ করতে না পারলে অন্য ব্যক্তি নতুন করে শুরু থেকে আযান দেবে।

টেপ-রেকর্ডারের মাধমে আযান শুদ্ধ নয়। কারণ, আযান এক ইবাদত। *(মুমঃ ২/৬১-৬২)*

মুআয্‌যিনের কি হওয়া ও কি করা উচিত

১। মুআয্যিন যেন ‘মুসলিম’ ও জ্ঞানসম্পন্ন (সাবালক বা নাবালক) পুরুষ হয়। কোন মহিলার জন্য (পুরুষ-মহলে) আযান দেওয়া বৈধ নয়; দিলে সে আযান শুদ্ধ নয়। *(মুগনী ১/৪৫৯)*

২। মুআয্যিন হবে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। যাতে তার আযান শুনে কারো মনে (আযানের প্রতি) বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার উদ্রেক না হয়। (কাবীরা গোনাহ করে এমন) ফাসেকের আযান যদিও শুদ্ধ, তবুও কোন ফাসেককে মসজিদের মুআয্যিন নিয়োগ করা ঠিক নয়। *(মুগনী ১/৪৪৯)*

৩। সেই ব্যক্তিই হবে যোগ্য মুআয্যিন, যে আযানের শব্দাবলীর যথার্থ উচ্চারণ করতে সক্ষম।

৪। উপযুক্ত মুআয্যিন সেই, যে আযান দেওয়ার উপর কোন পারিশ্রমিক নেয় না। একদা উসমান আবিল আস ﷛ আল্লাহর রসূল ﷺ কে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আমার কওমের ইমাম বানিয়ে দিন।’ তিনি বললেন, “তুমি ওদের ইমাম। (তবে) ওদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির কথা খেয়াল করে ইমামতি (ও নামায হাল্কা) করো। আর এমন মুআয্যিন রেখো, যে আযান দেওয়ার বিনিময়ে কোন বেতন নেবে না।” *(মুঃ, আদাঃ ৫৩১, তিঃ ২০৯, নাঃ, ইমাঃ ৯৮৭নং, হাঃ ৫/৩)*

অবশ্য তার কিছু নেওয়ার উদ্দেশ্য না থাকার পরেও যদি তাকে কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তাহলে তা গ্রহণ করায় দোষ নেই। কিন্তু উদ্দেশ্য যদি বেতন পাওয়াই হয় অথবা নাম নেওয়া বা লোক-প্রদর্শন হয়, তবে তার ঐ আমল ছোট শির্কে পরিগণিত হবে। *(রিসালাতুন ইলা মুআয্যিন ৪২-৪৫ দ্রঃ)*

৫। আযান দেওয়ার জন্য ওযু জরুরী নয়। কারণ, এ ব্যাপারে সহীহ হাদীস নেই। *(ইগঃ ১/২৪০, ফবাঃ ২/১৩৫)*

৬। আযান দিতে হবে উঁচু স্থানে; যাতে তার শব্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইবনে উমার ﷛ উটের উপর চড়ে আযান দিতেন। *(বাঃ, ইগঃ ২২৬নং)* বিলাল ﷛ আযান দিতেন নাজ্জার গোত্রের এক মহিলার ঘরের ছাদে উঠে। কারণ, মসজিদের আশেপাশে সমস্ত ঘরের চেয়ে তার ঘরটাই ছিল বেশী উঁচু। আর আব্দুল্লাহ বিন শাকীক বলেন, ‘সুন্নাহ (মহানবী ﷺ এর তরীকা) হল মিনারে আযান দেওয়া এবং মসজিদের ভিতর ইকামত দেওয়া।’ *(ইআশাঃ ২৩৩১ নং)*

অবশ্য এ প্রয়োজন মাইকে মিটিয়ে দেয়। কিন্তু মাইক-ঘর মিনারের উপরে করলে সুন্নত পালনে ত্রুটি হয় না এবং আযান চলা অবস্থায় মাইক বন্ধ হলেও আযান পুরা করা যায়।

৭। দাঁড়িয়ে আযান দেওয়াই সুন্নত। ইবনুল মুনযির বলেন, ‘যাঁদের নিকট হতে ইলম সংরক্ষণ করা হয় তাঁরা এ বিষয়ে একমত যে, মুআয্যিনের দাঁড়িয়ে আযান দেওয়াই সুন্নত।’ *(ইগঃ ১/২৪১)*

অবশ্য কোন অসুবিধার ক্ষেত্রে বসে আযান দেওয়াও দোষাবহ নয়। যেমন সাহাবী আবূ যায়দ ﷛ কোন জিহাদে গিয়ে তাঁর পা ক্ষত হলে বসে আযান দিতেন। *(আষরাম, বাঃ ১/৩৯২, ইগঃ ২২৫নং)*

৮। আযানের সময় কেবলামুখ হওয়া মুস্তাহাব। পূর্বে উল্লেখিত আব্দুল্লাহ বিন যায়দের হাদীসের এক বর্ণনায় আছে যে, এক ফিরিশ্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে এক পোড়ো

বাড়ির দেওয়ালের উপর কেবলামুখে খাড়া হলেন---। *(মুসনাদ ইসহাক বিন রাহওয়াইহ্‌, ইগঃ ১/২৫০)*

আযানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বলা উত্তম হলে নিশ্চয় এর কোন নির্দেশ থাকত। *(রিসালাতুন ইলা মুআয্‌যিন ৫১পৃঃ)*

৯। শব্দ জোর করার উদ্দেশ্যে দুই কানে আঙ্গুল রেখে নেওয়া সুন্নত। বিলাল ﷺ আযান দেওয়ার সময় কানে আঙ্গুল রাখতেন। *(আঃ, তিঃ, হাঃ, ইগঃ ২৩০নং)* অবশ্য আঙ্গুল দেওয়াটা জরুরী নয়। যেমন ইবনে উমার ﷺ আযান দেওয়ার সময় কানে আঙ্গুল রাখতেন না। *(বুঃ, ফবাঃ ২/১৩৫)*

ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, 'নির্দিষ্ট করে কোন্‌ আঙ্গুলকে কানে রাখতে হবে সে বিষয়ে কোন নির্দেশ আসে নি।' *(ফবাঃ ২/১৩৭)*

১০। উপযুক্ত মুআয্‌যিন সেই ব্যক্তি, যার গলার আওয়াজে জোর বেশী। যেহেতু উদ্দেশ্য হল বেশী বেশী লোককে নামাযের সময় জানিয়ে মসজিদের দিকে আহ্বান করা। তাই তো সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন যায়দ ﷺ এর মাধ্যমে আযানের সূচনা হলেও মুআয্‌যিন হলেন বিলাল ﷺ। আর তার জন্যই মহানবী ﷺ আব্দুল্লাহ ﷺ কে বললেন, "তুমি আযানের শব্দগুলো বিলালকে শিখিয়ে দাও। কারণ, তোমার চেয়ে ওর গলার জোর বেশী।" *(আঃ, আদাঃ ৪৯৯নং প্রমুখ)*

অনেকে বলেছেন, এই সাথে কণ্ঠস্বর মিষ্টি হওয়াও মুস্তাহাব। কারণ, তাহলে আযান শুনে মানুষের হৃদয় নরম হবে এবং কারো মনে আযানের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাবে না। *(মুগনী ১/৪২৮)*

কোন নির্জন প্রান্তরে একা হলেও নামাযের সময় জোরদার শব্দে আযান দেওয়া উত্তম। মহানবী ﷺ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান ﷺ কে বলেছিলেন, "আমি দেখছি, তুমি ছাগল-ভেঁড়া ও মরু-ময়দান পছন্দ কর। সুতরাং তুমি যখন তোমার ছাগল-ভেঁড়ার সাথে মরু-ময়দানে থাকবে এবং নামাযের (সময় হলে) আযান দেবে, তখন যেন উচ্চস্বরে আযান দিও। কারণ, মানুষ, জিন অথবা যে কেউই মুআয্‌যিনের সামান্য শব্দও শুনতে পাবে, সে তার জন্য কিয়ামতে সাক্ষ্য দেবে।" *(মাঃ, বুঃ, নাঃ, ইমাঃ, মিঃ ৬৫৬নং)*

উচ্চস্বর বাঞ্ছিত বলেই আযানে মাইক্রোফোন ব্যবহার (বিদআত) দূষনীয় নয়। বরং এ জন্য মাইক মুসলিমদের পক্ষে আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। *(মুমঃ ২/৪৬)*

১১। আযান ও ইকামতে তকবীরের শব্দ একটা একটা করে পৃথক পৃথক না বলা; বরং জোড়া জোড়া এক সাথে বলা বিধেয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "মুআয্‌যিন যখন বলে, 'আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বার' এবং তোমাদের কেউ তার জওয়াবে বলে, 'আল্লাহু আক্‌বার, আল্লাহু আক্‌বার'---।" *(মুঃ, আদাঃ, নাঃ, সতাঃ ২৪৪নং)*

১২। আযান টেনে টেনে হলেও গানের মত সুললিত কণ্ঠে লম্বা টান টানা মকরূহ। সলফদের এক জামাআত এরূপ টানাকে অপছন্দ করেছেন। মালেক বিন আনাস প্রমুখ উলামাগণের নিকট তা মকরূহ বলে বর্ণিত আছে। *(তালবীসু ইবলীস, ইবনুল জাওযী ১৬৮পৃঃ)* উমার বিন আব্দুল আযীযের যুগে একজন মুআয্‌যিন আযানে গানের মত টান দিলে তিনি তাকে বললেন, 'সাধারণ (সাদা-সিধা) ভাবে আযান দাও। নচেৎ আমাদের নিকট থেকে দূর হয়ে

যাও!' *(ইআশাঃ, বুঃ, ফবাঃ ২/ ১০৫)*

১৩। 'হাইয়্যা আলাস সলা-হ' ও '---ফালা-হ' বলার সময় ডানে-বামে মুখ ফিরানো সুন্নত। আবূ জুহাইফাহ বলেন, আমি বিলালকে আযান দিতে দেখেছি। তিনি 'হাইয়্যা আলাস সলা-হ, হাইয়্যা আলাল ফালা-হ' বলার সময় তাঁর মুখকে এদিক ওদিক ডানে-বামে ফিরাতেন। *(বুঃ ৬৩৪নং, মুঃ, আদাঃ ৫২০নং, নাঃ)*

২ বার 'হাইয়্যা আলাস স্বলাহ' বলার সময় ডান দিকে এবং '---ফালা-হ' বলার সময় বাম দিকে মুখ ফিরানো যায়। এরূপ আমলই উক্ত হাদীসের অর্থের কাছাকাছি। পক্ষান্তরে প্রথমবার 'হাইয়্য আলাস সলা-হ' বলার সময় ডান দিকে, তারপর দ্বিতীয়বার বলার সময় বাম দিকে, অনুরূপ '---ফালা-হ' বলার সময় ডান দিকে এবং দ্বিতীয়বার বলার সময় বাম দিকে মুখ ফিরালেও চলে। এতে উভয় দিকেই উভয় বাক্যই বলা হয়। *(ফবাঃ ২/ ১৩৬)* উক্ত উভয় প্রকার আমলের মধ্যে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই।

আযান মাইক্রোফোনে ঘরের ভিতরে হলেও উক্ত সুন্নাত ত্যাগ করা উচিত নয়। *(রিসালাতুন ইলা মুআয্‌যিন ৩০পৃঃ)*

১৪। মুআয্‌যিনের কর্তব্য যথা সময়ে আযান দেওয়া। কারণ, তার আযানের উপর লোকেদের নামায-রোযা শুদ্ধ-অশুদ্ধ হওয়া নির্ভর করে। অসময়ে আযান দিলে নামায ও রোযা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। সুতরাং সময় জেনে আযান দেওয়া জরুরী। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুআয্‌যিনগণ লোকেদের নামায ও সেহরীর জিম্মেদার।" *(বাঃ ১/৪২৬, ইরঃ ১/২৩৯)*

তিনি আরো বলেন, "ইমাম (লোকেদের) যামিন, আর মুআয্‌যিন হল তাদের (নামায-রোযার) জিম্মেদার। হে আল্লাহ! তুমি ইমামগণকে পথপ্রদর্শন কর এবং মুআয্‌যিনগণকে ক্ষমা করে দাও।" এক ব্যক্তি বলল, 'এ কথা শুনিয়ে আপনি তো আমাদেরকে আযানে প্রতিযোগিতা করতে লাগিয়ে দিলেন।' তিনি বললেন, "তোমাদের পরে এমন যুগ আসবে, যে যুগের নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষরাই হবে মুআয্‌যিন।" *(আঃ, তাবঃ, বাঃ, ইবনে আসাকের প্রমুখ, ইরঃ ২১৭নং)*

আযানের জওয়াব

আযান শুরু হলে চুপ থেকে শুনে তার জওয়াব দেওয়া বিধেয় (সুন্নত)। মুআয্‌যিন 'আল্লাহু আকবার' বললে, শ্রোতাও তার জবাবে 'আল্লাহু আকবার' বলবে। মুআয্‌যিন 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বললে শ্রোতা বলবে, 'অআনা, অআনা।' অর্থাৎ আমিও সাক্ষি দিচ্ছি, আমিও। *(আদাঃ ৫২৬নং)*

এই সময় নিম্নের দুআও বলতে হয়ঃ-

وَ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ (أَشْهَدُ) أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ،

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبّاً وَبِمُحَمَّدٍ (ﷺ) رَسُوْلاً وَّ بِالإِسْلاَمِ دِيْناً.

উচ্চারণঃ- অআনা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহ, অ (আশহাদু) আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ। রাযীতু বিল্লাহি রাব্বাঁউ অবিমুহাম্মাদিন

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামা) রাসূলাঁউ অবিল ইসলামি দীনা।

অর্থাৎ, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল। আল্লাহ আমার প্রতিপালক হওয়ার ব্যাপারে, মুহাম্মাদ ﷺ রসূল হওয়ার ব্যাপারে এবং ইসলাম আমার দ্বীন হওয়ার ব্যাপারে আমি সন্তুষ্ট।

এই দুআ পড়লে গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। *(মুঃ ৩৮৬, আদাঃ ৫২৫নং, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ)*

আযানে মহানবী ﷺ এর নাম শুনে চোখে আঙ্গুল বুলানো বিদআত। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি জাল। *(তাযকিরাহ, ইবনে তাহের, রিসালাতুন ইলা মুআয্‌যিন ৫৬পৃঃ)* অনুরূপ সেই সময় আঙ্গুলে চুমু খাওয়াও বিদআত।

মুআয্‌যিন 'হাইয়্যা আলাস স্বালাহ' ও '---ফালাহ' বললে জওয়াবে শ্রোতা বলবে,

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

উচ্চারণঃ- লা হাউলা অলা ক্কুওঅতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থাৎ, আল্লাহর তওফীক ছাড়া পাপকর্ম ত্যাগ করা এবং সৎকর্ম করার সাধ্য কারো নেই। *(মুঃ, আদাঃ ৫২৭নং)*

মুআয্‌যিন 'আস্‌স্বলাতু খাইরুম মিনান নাউম' বললে অনুরূপ বলে জওয়াব দিতে হবে। এর জওয়াবে অন্য কোন দুআ (যেমন 'স্বাদাক্বতা অবাররিতা বা বারারতা--' বলার হাদীস নেই। *(সুবুলুস সালাম ৮৭পৃঃ, তুআঃ ১/৫২৫)*

আযান শেষ হলে মহানবী ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ করে নিম্নের দুআ পড়লে কিয়ামতে তাঁর সুপারিশ নসীব হবে;

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَّحْمُوْداً الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ.

"আল্লাহুম্মা রাব্বা হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি অস্‌সালা-তিল ক্বা-ইমাহ্, আ-তি মুহাম্মাদানিল অসীলাতা অলফাযীলাহ্, অবআসহু মাক্বা-মাম মাহমূদানিল্লাযী অআত্তাহ্।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! হে এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠালাভকারী নামাযের প্রভু! তুমি মুহাম্মাদ ﷺ কে অসীলাহ (জান্নাতের সুউচ্চ স্থান) এবং মর্যাদা দান কর। আর তাঁকে সেই মাক্বামে মাহমূদ (প্রশংসিত স্থানে) প্রেরণ করো যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দান করেছ। *(বুঃ ৬১৪নং, আদাঃ, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ)*

প্রকাশ যে, উক্ত দুআর মাঝে ইবনে সুন্নীর বর্ণনায় 'অদ্দারাজাতার রাফীআহ', (তদনুরূপ লোকেদের বর্ণনায় 'সাইয়্যিদানা মুহাম্মাদান', অরযুক্বনা শাফাআতাহু') এবং শেষে বাইহাকীর বর্ণনায় অতিরিক্ত 'ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ' প্রভৃতি শুদ্ধ নয়। *(ইরঃ ১/২৬১)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুআয্‌যিনকে আযান দিতে শুনলে তোমরাও ওর মতই বল। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ কর; কেন না, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর তোমরা আমার

জন্য আল্লাহর নিকট অসীলা প্রার্থনা কর; কারণ, অসীলা হল জান্নাতের এমন এক সুউচ্চ স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একটি বান্দার জন্য উপযুক্ত। আর আমি আশা রাখি যে, সেই বান্দা আমিই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য ঐ অসীলা প্রার্থনা করবে, তার জন্য আমার শাফাআত (সুপারিশ) অবধার্য হয়ে যাবে।” *(মুঃ প্রমুখ, মিঃ ৬৫৭নং)*

আযানের পূর্বে শুরুতে (উচ্চস্বরে বা মাইক্রোফোনে) দরূদ বা তসবীহ্ পাঠ এবং অনুরূপ শেষেও দরূদ বা উক্ত দুআ (জোরে-শোরে) পাঠ বিদআত। শিখাবার উদ্দেশ্যেও আল্লাহর নবী ﷺ বা সলফদের কেউই এরূপ করে যান নি। *(ইবনে বায, ফবাঃ ২/৯২, টীকা)* যেমন আযান ও ইকামতের শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ পড়া বিদআত। *(মুমঃ ১/১৩২)* তদ্রূপ উপরোক্ত ঐ দুআ পড়ার সময় হাত তোলাও বিধেয় নয়। বিধেয় নয় আযান শুরু হলে মহিলাদের মাথায় কাপড় নেওয়া।

জ্ঞাতব্য যে, আযানের জওয়াব দেবে প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যার জন্য আল্লাহর যিক্‌র করা বৈধ। অতএব পবিত্র অবস্থায়, অপবিত্র বা মাসিক অবস্থায় নারী-পুরুষ সকলের জন্যই আযানের জওয়াব দেওয়া মুস্তাহাব। অবশ্য নামায পড়া অবস্থায়, প্রস্রাব-পায়খানা করা অথবা বাথরুমে থাকা অবস্থায় এবং স্ত্রী-মিলন রত অবস্থায় আযানের উত্তর দেওয়া বৈধ নয়। এসব কাজ থেকে ফারেগ হওয়ার পর বাকী আযানের উত্তর দেওয়া বিধেয়।

যে ব্যক্তি কুরআন তেলাঅত বা যিক্‌র করে অথবা দর্স দেয় সে ব্যক্তি তা বন্ধ রেখে আযানের জওয়াব দিয়ে পুনরায় তা ছেড়ে রাখা জায়গা থেকে শুরু করবে। *(ফিসুঃ ১/৮৭)*

খাওয়ার সময় আযান হলে খেতে খেতেও আযানের জওয়াব দিতে এবং তারপর দুআ পড়তে কোন বাধা নেই। *(ফউঃ ১/৫৩২)*

আযানের সময় দুআ কবুল হয়ে থাকে। *(আদাঃ, হাঃ, সজাঃ ৩০৭৯ নং)*

মসজিদ ছাড়া অন্য স্থানে আযান

ভয়, শত্রুতা প্রভৃতির কারণে মসজিদে যেতে বাধা থাকলে, মসজিদ বহু দূরে হলে (এবং আযান শুনতে না পেলে), সফরে কোন নির্জন প্রান্তরে থাকলে, যে জায়গায় থাকবে সেই জায়গাতেই নামাযের সময় হলে আযান-ইকামত দিয়ে নামায আদায় করতে হবে। একা হলে আযান ওয়াজেব না হলেও সুন্নত অবশ্যই বটে।

মহানবী ﷺ বলেন, “যখন সফরে থাকবে, তখন তোমরা আযান দিও এবং ইকামত দিও। আর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করো।” *(বুঃ, মিঃ ৬৮২নং)*

তাছাড়া আল্লাহর নবী ﷺ এবং সাহাবাগণ সফরে থাকলে ফাঁকা মাঠে আযান দিয়ে নামায পড়েছেন। *(মুঃ ৬৮১নং, প্রমুখ)*

মহানবী ﷺ বলেন, “তোমার প্রতিপালক বিস্মিত হন পর্বত চূড়ায় সেই ছাগলের রাখালকে দেখে যে নামাযের জন্য আযান দিয়ে (সেখানেই) নামায আদায় করে; আল্লাহ আযযা অজাল্ল্‌ বলেন, “তোমরা আমার এই বান্দাকে লক্ষ্য কর, (এমন জায়গাতেও) আযান

দিয়ে নামায কায়েম করছে! সে আমাকে ভয় করে। আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং জান্নাতে প্রবেশ করালাম।” *(আদাঃ, নাঃ, সতাঃ ২৩৯ নং)*

তিনি বলেন, “কোন ব্যক্তি যখন কোন বৃক্ষ-পানিহীন প্রান্তরে থাকে, অতঃপর সেখানে নামাযের সময় উপস্থিত হয়, তখন সে যেন ওযু করে। পানি না পেলে যেন তায়াম্মুম করে। অতঃপর সে যদি শুধু ইকামত দিয়ে নামায পড়ে, তাহলে তার সাথে তার সঙ্গী দুই ফিরিশ্তা নামায পড়েন। কিন্তু সে যদি আযান দিয়ে ও ইকামত দিয়ে নামায পড়ে, তাহলে তার পশ্চাতে আল্লাহর এত ফিরিশ্তা নামায পড়েন, যাদের দুই প্রান্ত নজরে আসে না!” *(আরাঃ, সতাঃ ২৪১নং)*

আর একদা তিনি আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমানকে মরুভূমিতে ছাগপালে থাকাকালে নামাযের জন্য উচ্চশব্দে আযান দিতে আদেশ করেছিলেন। *(বুঃ প্রমুখ, মিঃ ৬৫৬নং)*

কাযা নামাযের জন্য আযান

মসজিদে কেউ আযান না দিলে এবং শহরে বা গ্রামে থাকতে সকলের নামায কাযা হলে অথবা সফরে পুরো জামাআতের বা একাকীর নামায কাযা হলে অসময়েও আযান-ইকামত দিয়ে নামায পড়া কর্তব্য।

একদা মহানবী ﷺ সাহাবাসহ সফরে থাকাকালীন তাঁদের ফজরের নামায কাযা হয়ে যায়। সূর্য ওঠার পর তেজ হয়ে এলে ঐ স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে গিয়ে বিলাল (রাঃ) আযান দেন। অতঃপর যথা নিয়মে ফজরের নামায আদায় করেন। *(মুঃ ৬৮১নং, প্রমুখ)*

যেমন খন্দকের যুদ্ধের সময় একদা সকলের চার অক্তের নামায হলে, এশার পর আযান দিয়ে যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায আদায় করেছিলেন। *(আঃ প্রমুখ, ইরঃ ১/২৫৭)*

সময় পার হলে আযান

নামাযের সময় বাকী থাকলে এবং আযানের যথা সময় পার হয়ে গেলে খুব দেরীতে হলেও আযান দিয়েই নামায পড়তে হবে। অবশ্য গ্রামে বা শহরে অন্যান্য মসজিদে আযান হয়ে থাকলে যে মসজিদে আযান দিতে খুব দেরী হয়ে গেছে সে মসজিদে আযান না দিলেও চলবে। তবে দেরী সামান্য হলে আযান দেওয়াই উত্তম। কিন্তু গ্রামে এ ছাড়া অন্য মসজিদ না থাকলে খুব দেরী হয়ে গেলেও আযান দেওয়া জরুরী। *(ফঃ ইবনে বায, রিসালাতুন ইলা মুআয্যিন ৬৭পৃঃ, তুইঃ ৭৭পৃঃ)*

খাস মহিলামহলে মহিলাদের আযান ও ইকামত

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর আযান ও ইকামত দেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। অবশ্য বাইহাকীতে আছে, আম্র বিন আবী সালামাহ বলেন, আমি সওবানকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ‘মেয়েরা কি ইকামত দিতে পারে?’ উত্তরে তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনার কথা উল্লেখ করে বললেন, ‘মকহুল বলেছেন, যদি মহিলারা আযান-ইকামত দেয় তবে তা

আফযল। আর যদি শুধু ইকামত দেয়, তবে তাও যথেষ্ট।' সওবান বলেন, যুহরী উরওয়া হতে এবং তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আয়েশা) বলেছেন, 'আমরা বিনা ইকামতেই নামায পড়তাম।' *(এর সনদটি হাসান।)*

ইমাম বাইহাকী বলেন, 'প্রথমোক্ত আসারের সাথে -যদি এই আসার সহীহ হয় তাহলে উভয়ের মধ্যে- পরস্পর বিরোধিতা নেই। কারণ, হতে পারে যে, জায়েয বর্ণনার উদ্দেশ্যে তিনি উভয় প্রকারের আমল (কখনো এরূপ, কখনো ঐরূপ) করেছেন। আর আল্লাহই অধিক জানেন।'

আল্লামা আলবানী বলেন, এ ব্যাপারে সঠিক অভিমত হল নবাব সিদ্দীক হাসান খানের; তিনি বলেছেন, '---আর প্রকাশ যে, মহিলারা আমলে পুরুষদের মতই। কারণ, মহিলারা পুরুষদের সহোদরা। পুরুষদেরকে যা করতে আদেশ হয়, সে আদেশ মহিলাদের উপরেও বর্তায়। পক্ষান্তরে তাদের পক্ষে আযান-ইকামত ওয়াজেব না হওয়ার ব্যাপারে কোন গ্রহণযোগ্য দলীল নেই। আযান না থাকার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসের সনদের কিছু বর্ণনাকারী পরিত্যক্ত; যাদের হাদীস দলীলযোগ্য নয়। সুতরাং মহিলাদেরকে সাধারণ এ নির্দেশ থেকে খারিজ করার মত কোন নির্ভরযোগ্য দলীল থাকলে উত্তম; নচেৎ ওরাও পুরুষদের মতই।' *(আর-রওযাতুন নাদিয়্যাহ ১/৭৯, সিযঃ ২/২৭১)*

ঝড়-বৃষ্টির সময় আযানের বিশেষ শব্দ

ঝড়-বৃষ্টি বা অতিরিক্ত ঠান্ডার সময় মসজিদ আসতে কষ্ট হলে মুআয্‌যিন আযানে নিম্নলিখিত শব্দ অতিরিক্ত বলবে,

'হাইয়্যা আলাস স্বলাহ' ও '---ফালাহ'র পরিবর্তেঃ-

صَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ (স্বল্লূ ফী বুয়ূতিকুম)। *(বুঃ ৯০১, মুঃ ৬৯৯নং)*

অথবা **الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ** (আস্‌স্বলা-তু ফির্রিহাল)। *(বুঃ ৬১৬নং)*

অথবা যথানিয়মে আযান দেওয়ার শেষেঃ-

أَلاَ صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ (আলা স্বল্লূ ফির্রিহাল)। *(বুঃ ৬৩২, মুঃ ৬৯৭নং)*

অথবা **أَلاَ صَلُّوْا فِيْ رِحَالِكُمْ** (আলা স্বল্লূ ফী রিহা-লিকুম)। *(বুঃ ৬৩২, মুঃ ৬৯৭নং)*

অথবা **وَمَنْ قَعَدَ فَلاَ حَرَجَ** (অমান ক্বাআদা ফালা হারাজ)। *(ইআশাঃ, বাঃ ১/৩৯৮, সিসঃ ২৬০৫নং)*

এগুলোর অর্থ হল, 'শোনো! তোমরা নিজ নিজ বাসায় নামায পড়ে নাও। জামাআতে হাজির না হলে কোন দোষ নেই।

তাহাজ্জুদ ও সেহরী বা সাহারীর আযান

মহানবী ﷺ বলেন, বিলাল রাতে (ফজরের পূর্বে) আযান দেয়। সুতরাং ইবনে উম্মে

মাকতূম (ফজরের) আযান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা খাও ও পান কর।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৬৮০নং)*

উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফজরের পূর্বে তাহাজ্জুদ ও সেহরীর আযান মহানবী ﷺ এর যুগে প্রচলিত ছিল এবং আজও পর্যন্ত সে সুন্নত মক্কা-মদীনা সহ সঊদী আরবের প্রায় সকল স্থানে সেহরীর ঐ আযান (বিশেষ করে রমযানে) শুনতে পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে আমাদের দেশে প্রায় সকল স্থানে ঐ সময়ে আযানের পরিবর্তে শোনা যায় কুরআন ও গজল পাঠ! সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সুন্নতের জায়গা দখল করেছে মনগড়া বিদআত।

অনেকে বলে থাকেন, উভয় সময়ে আযান হলে লোকেরা গোলমালে পড়বে; সেটা সেহরীর না ফজরের আযান -এ নিয়ে সন্দেহে পড়বে। কিন্তু পৃথক পৃথক উভয় সময়ের জন্য নির্দিষ্ট দু'জন মুআয্যিন আযান দিলে গোলমালের ভয় থাকে না। তা ছাড়া সেহরীর আযানে **الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْم** শব্দ থাকবে না। অতএব সকল প্রকার ওজর-আপত্তি ত্যাগ করে বিদআত বর্জন করতে এবং সুন্নাহর উপর আমল করতে আল্লাহ আমাদের তওফীক দিন। আমীন।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আযান

আবূ রাফে' ﵁ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে দেখেছি, ফাতেমা (রাঃ) হাসান বিন আলীকে প্রসব করলে তিনি তাঁর (হাসানের) কানে নামাযের আযান দিলেন। *(আদাঃ ৫১০৫, তিঃ ১৫৬৬, মিঃ ৪১৫৭ নং) (মতান্তরে হাদীসটি যয়ীফ, অতএব এ সময় আযান সুন্নত নয়।)*

সুতরাং ছেলে-মেয়ে সকলের কানে ঐ সময় নামাযের জন্য আযান দেওয়ার মতই আযান দেওয়া সুন্নত। পক্ষান্তরে ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিলে 'উম্মুস সিবয়্যান' (ভূত, পঁচো (?) বা এক প্রকার রোগ) কোন ক্ষতি করতে না পারার হাদীসটি জাল। *(সিযঃ ৩২১নং, সজাঃ ৫৮৮১, ইগঃ ১১৭৪নং)*

জিন-ভূতের ভয়ে আযান

শয়তান জিন মানুষকে ভয় দেখায়। ভয় পেয়ে আযান দিলে জিন বা শয়তান বা ভূত সব পালিয়ে যায়।

সুহাইল বলেন, একদা আমার আব্বা আমাকে বনী হারেসায় পাঠান। আমার সঙ্গে ছিল এক সঙ্গী। এক বাগান হতে কে যেন নাম ধরে আমার সঙ্গীকে ডাক দিল। আমার সঙ্গী বাগানে খুঁজে দেখল; কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। ফিরে এলে আব্বার নিকট সে কথা উল্লেখ করলাম। আব্বা বললেন, যদি জানতাম যে, তুমি এই দেখতে পাবে, তাহলে তোমাকে পাঠাতাম না। তবে শোন! যখন (এই ধরনের) কোন শব্দ শুনবে, তখন নামাযের মত আযান দিও। কারণ, আমি আবূ হুরাইরা ﵁ কে আল্লাহর রসূল ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "নামাযের আযান দেওয়া হলে শয়তান পাদতে পাদতে পালিয়ে

যায়!” *(মুঃ ৩৮৯নং)*

আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া

আযান হয়ে গেলে বিনা ওজরে নামায না পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া বৈধ নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, “মসজিদে অবস্থানকালে আযান হলেই তোমাদের কেউ যেন নামায না পড়া পর্যন্ত মসজিদ থেকে বের না হয়।” *(আঃ, মিঃ ১০৭৪ নং)*

এক ব্যক্তি আযানের পর মসজিদ হতে বের হয়ে গেলে আবূ হুরাইরা তার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, ‘এ লোকটা তো আবুল কাসেম ﷺ এর নাফরমানী করল।’ *(মুঃ, আদাঃ ৫৩৬ নং, তিঃ, ইমাঃ, দাঃ, বাঃ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তির মসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হয়, অতঃপর বিনা কোন প্রয়োজনে বের হয়ে যায় এবং ফিরে আসার ইচ্ছা না রাখে সে ব্যক্তি মুনাফিক।” *(ইমাঃ, সতাঃ ১৫৭নং)*

আযান ও ইকামতের মাঝে ব্যবধান

আযান ও ইকামতের মাঝে কতটা বিরতি থাকবে সে ব্যাপারে হাদীস শরীফে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত ও উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে আযান হয় জামাআত ডাকার জন্য। আর এটাই স্বাভাবিক যে, আযানের পর অনেকে ওযু করবে। সুতরাং ওযু করার মত সময় দিতে হবে। তাছাড়া ফরয নামাযের পূর্বে যে সুন্নাতে রাতেবাহ বা মুআক্কাদাহ আছে তাও পড়ার জন্য সময় দিতে হবে। মহানবী ﷺ বলেন, “প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে নামায আছে।” এইরূপ তিনবার বলার পর শেষে বললেন, “যে চাইবে তার জন্য।” *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৬৬২নং)*

মাগরেবের আযানের পরেও সত্বর জামাআত শুরু করা উচিত নয়। যদিও সময় সংকীর্ণ তবুও জামাআত হওয়ার পূর্বে নামায আছে। সুতরাং যার সেই নামায পড়ার ইচ্ছা তাকে সেই নামায পড়তে সময় দেওয়া উচিত।

আনাস رضي الله عنه বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম। মুআয্‌যিন যখন মাগরেবের আযান দিত, তখন লোকেরা প্রতিযোগিতার সাথে মসজিদের খাম্বাগুলোর পশ্চাতে ২ রাকআত নামায পড়তে লেগে যেত। এমনকি যদি কোন অজানা লোক এসে মসজিদে প্রবেশ করত, তাহলে এত লোকের নামায পড়া দেখে সে মনে করত, হয়তো মাগরেবের জামাআত হয়ে গেছে। (এবং ওরা পরের সুন্নত পড়ছে।) *(মুঃ, মিঃ ১১৮০ নং)*

আযান ও ইকামতের মাঝে দুআ

আযান হওয়ার পর এবং ইকামত হওয়ার পূর্বের সময়ে দুআ কবুল হয়ে থাকে। তাই এই সময় দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা উচিত। মহানবী ﷺ বলেন,

"আযান ও ইকামতের মাঝে দুআ রদ্দ্ করা হয় না।" (অর্থাৎ মঞ্জুর করা হয়।) *(আঃ, আদাঃ ৫২১নং, তিঃ)*

এক বর্ণনায় আছে, "সুতরাং তোমরা এ সময়ে দুআ কর।" *(সজাঃ ৩৪০৫ নং)*

তিনি আরো বলেন, "দু'টি সময়ে দুআ (প্রার্থনা)কারীর দুআ রদ্দ্ হয় না; যখন নামাযের ইকামত হয় এবং জিহাদের কাতারে।" *(হাঃ, মাঃ, সতাঃ ২৬০ নং)*

ইকামত

যেমন দুই মুআয্যিনের আযান দুই রকম ছিল, তেমনি উভয়ের ইকামতও ছিল দুই রকম; জোড় এবং বিজোড়। বিলাল ﷺ কে আযান ডবল ডবল শব্দে এবং ইকামত 'ক্বাদ ক্বা-মাতিস সলা-হ' ছাড়া (অন্যান্য) বাক্যাবলীকে একক একক শব্দে বলতে আদেশ করা হয়েছিল। *(বুঃ, মুঃ প্রমুখ, মিঃ ৬৪১ নং)*

সুতরাং বিলালের উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে ইকামত হবে ৯টি বাক্যে; 'ক্বাদ ক্বামাতিস সালাহ ২বার এবং বাকী হবে ১ বার করে। *(মুমঃ ২/৫৯)*

কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন যায়দকে স্বপ্নে শিখানো হয়েছিল নিম্নরূপ ইকামত, আর এটাই প্রসিদ্ধঃ-

اَللّٰهُ أَكْبَر اَللّٰهُ أَكْبَر، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰه، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّٰه، حَيَّ عَلَى الصَّلاَة،

حَيَّ عَلَى الْفَلاَح، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَة، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَة، اَللّٰهُ أَكْبَر اَللّٰهُ أَكْبَر، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰه،

আল্লাহু আকবার ২ বার। আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১ বার। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ ১ বার। হাইয়্যা আলাস স্বলাহ ১ বার। হাইয়্যা আলাল ফালাহ ১ বার। ক্বাদ ক্বামাতিস স্বলাহ (অর্থাৎ নামায প্রতিষ্ঠা বা শুরু হল) ২ বার। আল্লাহু আকবার ২বার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১ বার। *(আদাঃ ৪৯৯, দাঃ ১১৭১, ইখুঃ ৩৭০, ইহিঃ ১৬৭১নং, বাঃ ১/৩৯১)*

উল্লেখ্য যে, যারা মুআয্যিন আবূ মাহযূরার মত তারজী' আযান দেয়, তাদের উচিত তাঁর মতই ইকামত দেওয়া। তিনি বলেন, 'মহানবী ﷺ তাঁকে আযানের ১৯টি এবং ইকামতের ১৭টি বাক্য শিখিয়েছেন।' *(আঃ, আদাঃ, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ, দাঃ, মিঃ ৬৪৪নং)*

সুতরাং তাঁর ইকামত ছিল বিলাল ﷺ এর আযানের মতই। তবে তাতে 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' এর পর অতিরিক্ত ছিল 'ক্বাদ ক্বামাতিস স্বলাহ' ২ বার। *(আদাঃ ৫০২নং)*

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, আহলে হাদীস ও তাঁদের সমর্থকদের নিকট সঠিক সিদ্ধান্ত এই যে, মহানবী ﷺ হতে যা কিছু শুদ্ধভাবে প্রমাণিত আছে তার প্রত্যেকটার উপর আমল করতে হবে। আর তাঁরা ঐ আমলের কোনটিকেও অপছন্দ করেন না। কেন না, আযান ও ইকামতের পদ্ধতি একাধিক হওয়ার ব্যাপারটা ক্বিরাআত, তাশাহ্‌হুদ প্রভৃতির পদ্ধতি একাধিক হওয়ার মতই।' *(মাজমূউ ফাতাওয়া ২২/৩৩৫, ২২/৬৬)* সুতরাং উভয় প্রকারই

আযান ও ইকামত আমলযোগ্য। আর বৈধ নয় এ নিয়ে কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি।

প্রকাশ থাকে যে, ভুলে ইকামত না দিয়ে (একাকী অথবা জামাআতী) নামায পড়ে ফেললে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। ইকামত নামায হতে পৃথক জিনিস। অতএব ঐ ভুলের জন্য সহু সিজদা বিধেয় নয়। *(তুইঃ ৭৮-পৃঃ)*

ইকামতের জওয়াব

ইকামতকে দ্বিতীয় আযান বলা হয়, তাই ইকামতও এক প্রকার আযান। *(ফইঃ ১/২৪৯)* সুতরাং এর জওয়াবও আযানের মতই। অবশ্য 'হাইয়্যা আলাস সলা-হ' ও '--ফালাহ' এর জওয়াবে 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' এবং শেষে (সময় পেলে) দরূদ ও অসীলার দুআ পাঠ করা বিধেয়। যেহেতু হাদীস শরীফে মুআয্যিনের জওয়াব (তার মতই) বলতে এবং তার শেষে দরূদ ও অসীলার দুআ পড়তে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। *(মুঃ, মিঃ ৬৫৭নং)*

উক্ত হাদীসের ভিত্তিতেই 'ক্বাদ ক্বামাতিস স্বলাহ' এর জওয়াবে 'ক্বাদ ক্বামাতিস স্বলাহ'ই বলতে হবে। নচেৎ এর জওয়াবে 'আক্বামাহুল্লাহু অআদামাহা' বলার হাদীস শুদ্ধ নয়। আর যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করে শরীয়তের কোন আমল ও ইবাদত বৈধ নয়। *(দেখুন, মিঃ, আলবানীর টীকা ১/১২১) (মতান্তরে যেহেতু ইকামতের জবাবে কোন স্পষ্ট সহীহ হাদীস নেই, তাই ইকামতের জবাব দেওয়া সুন্নত নয়। অল্লাহু আ'লাম।)*

ইকামত কে দেবে?

ইমাম ও মুক্তাদীগণের মধ্যে যে কেউ ইকামত দিতে পারে। যে আযান দিয়েছে তারই ইকামত দেওয়া জরুরী নয়। আর এ ব্যাপারে যে হাদীস এসেছে তা শুদ্ধ নয়। *(সিযঃ ৩৫নং)*

যয়ীফ হাদীসকে ভিত্তি করেই বহু স্থানে মুআয্যিন ছাড়া অন্য কেউ ইকামত দিলে তার প্রতি চোখ তোলা হয়! আবার এর চেয়ে আরো বিস্ময়ের কথা এই যে, খালি মাথায় ইকামত দিলে অনেক জায়গায় ইকামত পুনরায় ফিরিয়ে বলা হয়! কারণ, তাদের নিকট আযান, ইকামত, নামায, যবাই প্রভৃতির সময় টুপী না হলেও তালপাতা বা প্লাসটিকের ডালি, নচেৎ গা-মোছা গামছা, নতুবা নাক-মোছা রুমাল অথবা অন্য কিছু দিয়ে মাথা ঢাকা জরুরী!!

প্রকাশ যে, ইমামকে উপস্থিত না দেখা পর্যন্ত ইকামত দেওয়া বিধেয় নয়। *(মুঃ, আদাঃ ৫৩৭নং)*

ইকামত ও নামায শুরু করার মাঝে ব্যবধান

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নামাযের ইকামত হয়ে গেলে তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত (নামাযের জন্য) দাঁড়াও না।" *(বুঃ ৬৩৭নং)*

যেমন ইকামত হয়ে গেলে তাড়াহুড়ো করে দাঁড়ানোও উচিত নয়। কারণ উক্ত হাদীসের

এক বর্ণনায় তিনি বলেন, “তোমাদের মাঝে যেন ধীরতা ও শান্তভাব থাকে।” *(ঐ ৬৩৮নং)* যেহেতু রাজাধিরাজের দরবারে কোন প্রকারের হৈ-হুল্লোড় ও তাড়াহুড়ো চলে না। বলা বাহুল্য এই দরবারে থাকবে শত আদব, শত বিনয়, ধীরতা ও স্থিরতা।

হুমাইদ বলেন, আমি সাবেত আল-বুনানীকে ইকামতের পর কথাবার্তা বলার বৈধতার ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি আনাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস শুনালেন; ‘একদা নামাযের ইকামত হয়ে গেলে এক ব্যক্তি নবী ﷺ কে নামাযে প্রবেশ করতে আটকে রেখেছিল।’ *(বুঃ ৬৪৩নং)* ‘মসজিদের এক প্রান্তে গোপনে কথা বলতে লাগলে উপস্থিত মুসল্লীগণ ঘুমে ঢলে পড়েছিল।’ *(ঐ ৬৪২নং)*

একদা নামাযের ইকামত হয়ে গেলে মুসল্লীগণ কাতার সোজা করে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর রসূল ﷺ হুজরা হতে বের হয়ে যখন ইমামতির জায়গায় এলেন, তখন তাঁর মনে পড়ল যে, তিনি নাপাকীর গোসল করেন নি। তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, “তোমরা স্বস্থানে দন্ডায়মান থাক।” অতঃপর তিনি হুজরায় ফিরে গিয়ে গোসল করলেন। তিনি যখন বের হয়ে এলেন, তখন তাঁর মাথা হতে পানি টপকাচ্ছিল। এরপর তিনি ইমামতি করে নামায পড়লেন। *(ঐ ৬৪০নং)*

উক্ত হাদীস থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, প্রয়োজনে ইকামত ও নামাযের মাঝে বেশ কিছু সময় বিরতি হলে কোন ক্ষতি হয় না। পরন্তু ইকামত ফিরিয়ে বলতে হয় না।

ইকামত হওয়ার পর কোন জরুরী কথা, নামায ও কাতার বিষয়ক কথা বলা বৈধ। তবে নামাযের প্রস্তুতি নেওয়ার পর কোন পার্থিব কথা বলা উচিত নয়। *(ফইঃ ১/২৫১)*

ইকামত শুরু হলে এবং ইমাম উপস্থিত থাকলে প্রত্যেকে নিজের সুবিধামত উঠে নামাযের জন্য দন্ডায়মান হবে। ইকামতের শুরুতে, মাঝে বা শেষে, যে কোন সময়ে দাঁড়ালেই চলবে। তবে এ কথার খেয়াল অবশ্যই রাখা উচিত, যাতে ইমামের সাথে তকবীরে তাহরীমা ছুটে না যায়। *(মুমঃ ৩/১০)*

মসজিদ ও নামায পড়ার জায়গা

মহানবী ﷺ বলেন, “---আর সারা পৃথিবীকে আমার জন্য মসজিদ (নামাযের জায়গা) এবং পবিত্রতার উপকরণ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তির নিকট যে কোন স্থানে নামাযের সময় এসে উপস্থিত হবে , সে যেন সেখানেই নামায পড়ে নেয়।” *(বুঃ ৪৩৮নং, মুসলিম প্রমুখ)*

কবরস্থান ও গোসলখানা ছাড়া সারা পৃথিবীর (সমস্ত জায়গাই) মসজিদ (নামায ও সিজদার স্থান)। *(আদাঃ, তিঃ, দাঃ, মিঃ ৭৩৭নং)*

একদা আবূ যার্র ﷺ মহানবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম কোন্ মসজিদ স্থাপিত হয়? উত্তরে তিনি বললেন, “হারাম (কা’বার) মসজিদ।” আবূ যার্র বললেন, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, “তারপর মসজিদুল আকসা।” আবূ যার্র বললেন, দুই

মসজিদ স্থাপনের মাঝে ব্যবধান কত ছিল? তিনি বললেন, "চল্লিশ বছর। আর শোন, সারা পৃথিবী তোমার জন্য মসজিদ। সুতরাং যেখানেই নামাযের সময় এসে উপস্থিত হবে, সেখানেই নামায পড়ে নেবে।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৭৫৩নং)*

নির্মিত গৃহ মসজিদ ছাড়া অন্য স্থানেও নামায পড়ার বৈধতা উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

মসজিদের মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেন, ﴿وأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّه﴾ অর্থাৎ, আর মসজিদসমূহ আল্লাহর। *(কুঃ ৭২/১৮)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম স্থান হল মসজিদ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্টতম স্থান হল বাজার।" *(মুঃ, মিঃ ৬৯৬নং)*

মাহাত্ম্যপূর্ণ চারটি মসজিদ

মহানবী ﷺ বলেন, "তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোন স্থান যিয়ারতের জন্য সফর করা যাবে না; মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা ও আমার এই মসজিদ (নববী)।" *(বুঃ,মুঃ মিঃ ৬৯৩)*

তিনি বলেন, "মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদের তুলনায় আমার এই মসজিদে (নববীতে) একটি নামায হাজার নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৬৯২নং)*

"আর অন্যান্য মসজিদের তুলনায় মসজিদুল হারামের একটি নামায এক লক্ষ নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" *(আঃ, বাঃ, সজাঃ ৩৮৩৮, ৩৮৪১ নং)*

প্রকাশ যে, এই ফযীলত মহিলাদের জন্য নয়। কারণ, তাদের জন্য স্বগৃহে নামায পড়াই উত্তম। যেমন নফল বা সুন্নত নামাযেও উক্ত সওয়াব নেই, কেননা, সুন্নত বা নফল নামায ঘরে পড়াই আফযল। অথবা মক্কা ও মদীনার মহিলাদের জন্য তাদের স্বগৃহে এবং ঐ স্থানদ্বয়ে সুন্নত ও নফল নামায ঘরে পড়ার ফযীলত আরো অধিক। অল্লাহু আ'লাম।

মসজিদে নববীর একটি বিশেষ জায়গার কথা উল্লেখ করে মহানবী বলেন, "আমার গৃহ ও (আমার মসজিদের) মিম্বরের মাঝে বেহেশ্তের এক বাগান রয়েছে। আর আমার মিম্বর রয়েছে আমার হওযের উপর।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৬৯৪নং)*

কুবার মসজিদ সম্বন্ধে মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি স্বগৃহে ওযু বানিয়ে কুবার মসজিদে এসে কোন নামায পড়ে, তার একটি উমরাহ করার সমান সওয়াব লাভ হয়।" *(আঃ, নাঃ, হাঃ, বাঃ, সজাঃ ৬১৫৪ নং)*

প্রথম কিবলা মসজিদুল আকসায় নামায পড়লে ৫০০ বা ১০০০ নামাযের সওয়াবের কথা কোন সহীহ হাদীসে আসে নি। *(তামিঃ ২৯৩-২৯৪পৃঃ)* অবশ্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত সুলাইমান ﷺ যখন ঐ মসজিদ নির্মাণ শেষ করেছিলেন, তখন আল্লাহর নিকট দুআ

করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই ঐ মসজিদে উপস্থিত হবে, সে ব্যক্তি যেন ঐ দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। *(সনাঃ ৬৬৯, ইমাঃ ১৪০৮ নং)*

আর এক বর্ণনামতে তাতে ২৫০ নামাযের সওয়াব আছে। মহানবী ﷺ বলেন, "বায়তুল মাকদিস অপেক্ষা আমার এই মসজিদে নামায চারগুণ উত্তম। আর তা হল শ্রেষ্ঠ নামাযের স্থান।" *(হাঃ ৪/৫০৯, বাঃ শুআবুল ঈমান, ত্বা, সিসঃ ৬/২/৯৫৪)*

মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

আল্লাহর নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেয়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্তে একটি ঘর বানিয়ে দেন।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৬৯৭নং)*

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পাখির বাসার মত অথবা তার চেয়েও ছোট আকারের একটি মসজিদ বানিয়ে দেয়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্তে একটি গৃহ নির্মাণ করে দেন।" *(ইমাঃ, সজাঃ ৬১২৮ নং)*

"যে ব্যক্তি তিতির পাখীর (পোকামাকড় খোঁজার উদ্দেশ্যে) আঁচড়ানো স্থান পরিমাণ আয়তনের অথবা তদপেক্ষা ছোট আকারের মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন।" *(ইখুঃ, সতাঃ ২৬৫নং)*

আর মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فِيْ بُيُوْتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُوْنَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالأَبْصَارُ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ যে সব গৃহকে (মর্যাদায়) উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল-সন্ধায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন লোকেরা; যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম এবং যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে। *(কুঃ ২৪/৩৬-৩৭)*

মসজিদে যাওয়ার মাহাত্ম্য

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, তার জন্য আল্লাহ মেহমানীর উপকরণ প্রস্তুত করেন। যখনই সে সেখানে যায়, তখনই তার জন্য ঐ মেহমানীর উপকরণ প্রস্তুত করা হয়।" *(বুঃ ৬৬২, মুঃ ৬৬৯নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পুরুষের স্বগৃহে বা তার ব্যবসাক্ষেত্রে নামায পড়ার চেয়ে (মসজিদে) জামাআতে শামিল হয়ে নামায পড়ার সওয়াব পঁচিশ গুণ বেশি। কেন না, যে

যখন সুন্দরভাবে ওযু করে কেবল মাত্র নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদের পথে বের হয় তখন চলামাত্র প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে তাকে এক-একটি মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং তার এক-একটি গোনাহ মোচন করা হয়। অতঃপর নামায আদায় সম্পন্ন করে যতক্ষণ সে নামাযের স্থানে বসে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতাবর্গ তার জন্য দুআ করতে থাকে; 'হে আল্লাহ ওর প্রতি করুণা বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা কর। আর সে ব্যক্তি যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষা করে ততক্ষণ যেন নামাযের অবস্থাতেই থাকে।" *(বুঃ ৬৪৭নং, মুঃ ৬৪৯নং, আদাঃ, তিঃ, ইমাঃ)*

তিনি বলেন, "অন্ধকারে অধিকাধিক মসজিদের পথে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামত দিবসের পরিপূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও।" *(আদাঃ, তিঃ, সতাঃ ৩১০নং)*

তিনি আরো বলেন "যে ব্যক্তি কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে স্বগৃহে থেকে ওযু করে (মসজিদের দিকে) বের হয় সেই ব্যক্তির সওয়াব হয় ইহরাম বাঁধা হাজীর ন্যায়। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র চাশ্তের নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই বের হয়, তার সওয়াব হয় উমরাকারীর সমান। এক নামাযের পর অপর নামায; যে দুয়ের মাঝে কোন অসার (পার্থিব) ক্রিয়াকলাপ না থাকে তা এমন আমল যা ইল্লিয়্যীনে (সৎলোকের সৎকর্মাদি লিপিবদ্ধ করার নিবন্ধ গ্রন্থে) লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(আদাঃ, সতাঃ ৩১৫নং)*

"তিন ব্যক্তি আল্লাহর যামানতে; এদের মধ্যে একজন হল সেই ব্যক্তি যে মসজিদে যায়। মরণ পর্যন্ত সে আল্লাহর যামানতে থাকে। অতঃপর তিনি তাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করান। অথবা তাকে তার প্রাপ্ত সওয়াব ও নেকীর সাথে (তার বাড়ি) ফিরিয়ে দেন।" *(আদাঃ, মিঃ ৭২৭নং)*

"নামাযে সওয়াবের দিক থেকে সবচেয়ে বড় সেই ব্যক্তি, যার (বাড়ি থেকে মসজিদের দিকে) চলার পথ সবচেয়ে দূরের।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৬৯৯নং)*

মসজিদে নববীর আশেপাশে কিছু জায়গা খালি পড়েছিল। বনী সালেমাহ মসজিদের পাশে (ঐ খালি জায়গায়) ঘর বানাবার ইচ্ছা করল। এ খবর আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট পৌঁছলে তিনি তাদেরকে বললেন, "আমি শুনলাম যে, তোমরা তোমাদের পূর্বের ঘর-বাড়ি ছেড়ে মসজিদের পাশে এসে বসবাস করতে চাচ্ছ।" তারা বলল, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! এ রকমই ইচ্ছা আমরা করেছি।' তিনি বললেন, "হে বনী সালেমাহ! তোমরা তোমাদের ঐ বাড়িতেই থাক। (দূর হলেও, মসজিদ আসার ফলে) তোমাদের পায়ের চিহ্ন (তোমাদের নেকীর খাতায়) লিপিবদ্ধ করা হবে।" এরূপ তিনি দু'বার বললেন। *(মুঃ, মিঃ ৭০০নং)*

মসজিদের প্রতি আসক্তি ও তথায় অবস্থানের ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ، فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ﴾

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে, যারা আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারা সৎপথপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হবে। *(কুঃ ৯/ ১৮)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; (তারা হল,) ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ (রাষ্ট্রনেতা), সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ আযযা অজাল্লার ইবাদতে অতিবাহিত হয়, সেই ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদ সমূহের সাথে লটকে থাকে (মসজিদের প্রতি তার মন সদা আকৃষ্ট থাকে।) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালোবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালোবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়। সেই ব্যক্তি যাকে কোন কুলকামিনী সুন্দরী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি। সেই ব্যক্তি যে দান করে গোপন করে; এমনকি তার ডান হাত যা প্রদান করে তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। আর সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।" *(বুঃ ৬৬০নং, মুঃ ১০৩১নং)*

"কোন ব্যক্তি যখন যিক্র ও নামাযের জন্য মসজিদে অবস্থান করা শুরু করে তখনই আল্লাহ তাআলা তাকে নিয়ে সেইরূপ খুশী হন যেরূপ প্রবাসী ব্যক্তি ফিরে এলে তাকে নিয়ে তার বাড়ির লোক খুশী হয়।" *(ইআশাঃ, ইমাঃ, ইখুঃ, ইহিঃ, হাঃ, সতাঃ৩২২নং)*

"মসজিদ প্রত্যেক পরহেযগার (ধর্মভীরু) ব্যক্তির ঘর। আর যে ব্যক্তির ঘর মসজিদ সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ আরাম, করুণা এবং তার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রতি পুলসিরাত অতিক্রম করে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন।" *(ত্বাবঃ কাবীর ও আওসাত্ব, বাযযার, সতাঃ ৩২৫ নং)*

"যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নিজ ঘরে ওযু করে মসজিদে আসে, তখন ঘরে না ফিরা পর্যন্ত সে নামাযেই থাকে। সুতরাং সে যেন হাতের আঙ্গুলগুলোর মাঝে খাঁজাখাঁজি না করে।" *(হাঃ, মিঃ ৯৯৪, সিসঃ ১২৯৪নং)*

"যে ব্যক্তি ওযু করে মসজিদে আসে, সে ব্যক্তি আল্লাহর মেহমান। আর মেজবানের দায়িত্ব হল, মেহমানের খাতির করা।" *(সিসঃ ১১৬৯ নং)*

খেয়াল রাখার কথা যে, ই'তিকাফে বসা ছাড়া অন্যান্য দিনে মসজিদের মধ্যে নামাযের জন্য কোন এক কোণ বা স্থানকে নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। কারণ, মহানবী ﷺ নিষেধ করেছেন কাকের দানা খাওয়ার মত (ঠক্ঠক্ করে) নামায পড়তে, নামাযে হিংস্রজন্তুদের মত হাত বিছিয়ে বসতে এবং উট যেমন একই স্থানকে নিজের জায়গা বানিয়ে নেয়, তেমনি মসজিদে নির্দিষ্ট জায়গা বানাতে। *(আদাঃ, নাঃ, দাঃ, ইমাঃ, ইখুঃ, ইহিঃ, হাঃ, আঃ, সিসঃ ১১৬৮নং)*

মসজিদ যাওয়ার আদব

পূর্বে উল্লেখিত এক হাদীসে এসেছে যে, ওযু করে মসজিদ যাওয়ার সময়ও আঙ্গুলসমূহের

মাঝে খাঁজাখাঁজি করা নিষিদ্ধ। অনুরূপ এই সময় পথে ইকামত শুনলেও তাড়াহুড়ো করে বা ছুটাছুটি করে দৌড়ে যাওয়া বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, “তোমরা ধীর ও শান্তভাবে (মসজিদে বা জামাআতে) যাও। ইমামের সঙ্গে নামাযের যতটুকু অংশ পাও ততটুকু পড়ে নাও এবং যেটুকু অংশ ছুটে যায় তা একাকী পূর্ণ করে নাও।” *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৬৮৬ নং)*

মসজিদ যাওয়ার সময় পথে নিম্নের দুআ পড়তে হয়ঃ-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْراً وَّ فِيْ لِسَانِيْ نُوْراً وَّ اجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْراً وَّ اجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْراً وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْراً ، وَّ مِنْ أَمَامِيْ نُوْراً، وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْراً وَ مِنْ تَحْتِيْ نُوْراً،

اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْراً.

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মাজ্‌আল ফী ক্বালবী নূরা, অফী লিসানী নূরা, অজ্‌আল ফী সাময়ী নূরা,অজ্‌আল ফী বাস্বারী নূরা, অজ্‌আল মিন খালফী নূরা, অমিন আমা-মী নূরা, অজ্‌আল মিন ফাউক্বী নূরা, অমিন তাহতী নূরা, আল্লাহুম্মা আ’তিনী নূরা।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার হৃদয়, রসনা, কর্ণ, চক্ষু, পশ্চাত, সম্মুখ, ঊর্ধ্ব ও নিম্নে জ্যোতি প্রদান কর। হে আল্লাহ! আমাকে নূর (জ্যোতি) দান কর। *(বুঃ ৬৩১৬, মুঃ ৭৬৩ নং)*

মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময় দুআ

মহানবী ﷺ যখন মসজিদ প্রবেশ করতেন, তখন ‘বিসমিল্লাহ’ বলতেন এবং নিজের উপর দরূদ ও সালাম পড়তেন। অনুরূপ বের হওয়ার সময়ও পড়তেন। *(ইমাঃ ৭৭১নং)*

তিনি এই সময় নিম্নের দুআও পড়তেন,

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

উচ্চারণঃ- আঊযু বিল্লা-হিল আযীম, অবিঅজ্‌হিহিল কারীম, অ সুলত্বা-নিহিল ক্বাদীম, মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম।

অর্থ- আমি মহিমময় আল্লাহর নিকট এবং তার সম্মানিত চেহারা ও তাঁর প্রাচীন পরাক্রমের অসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এই দুআ পড়ে মসজিদ প্রবেশ করলে শয়তান বলে, ‘সারা দিন ও আমার অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করল।’ *(আদাঃ, মিঃ ৭৪৯ নং)*

(بِسْمِ اللّٰه)، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى رَسُوْلِ اللّٰه، اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِك.

উচ্চারণ- বিসমিল্লা-হ, অসসালা-তু অসসালা-মু আলা রাসূলিল্লা-হ, আল্লা-হুম্মাফ্‌ তাহলী আবওয়া-বা রাহমাতিক।

অর্থ- আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করছি, সালাম ও দরূদ বর্ষিত হোক আল্লাহর রসূলের উপর। হে আল্লাহ! আমার জন্য তুমি তোমার করুণার দুয়ার খুলে দাও। *(সজাঃ ১/৫২৮, মুঃ ১/৪৯৪, ইবনুস সুন্নী ৮৮)*

বের হওয়ার সময় বলতেন,

(بِسْمِ اللهِ)، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلى رَسُوْلِ اللهِ، اللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

'বিসমিল্লাহ' ও দরূদের পর এ দুআও পড়া যায়,

اَللّهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা' সিমনী মিনাশ শাইত্বান।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাকে শয়তান থেকে রক্ষা কর। *(নাঃ, হাঃ, বাঃ, ইহিঃ, সজাঃ ৫১৪নং)*

আনাস ﷺ বলেন, 'এক সুন্নাহ (নবী ﷺ এর তরীকা) এই যে, যখন তুমি মসজিদ প্রবেশ করবে, তখন ডান পা আগে বাড়াবে এবং যখন মসজিদ থেকে বের হবে, তখন বাম পা আগে বাড়াবে।' *(হাঃ ১/২১৮)*

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ বা মসজিদ সেলামীর নামায (২ রাক্আত) মসজিদ প্রবেশ করার পর বসার পূর্বেই পড়তে হয়। এর জন্য কোন সময়-অসময় নেই। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন বসার পূর্বে ২ রাক্আত নামায পড়ে নেয়।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "সে যেন ২ রাক্আত নামায পড়ার পূর্বে না বসে।" *(বুঃ, মুঃ প্রমুখ ইগঃ ৪৬৭নং)*

এই দুই রাকআত নামায বড় গুরুত্বপূর্ণ। তাই তো জুমআর দিনে খুতবা চলাকালীন সময়েও মসজিদে এলে হাল্কা করে তা পড়ে নিতে হয়। *(মুঃ, মিঃ ১৪১১নং)*

আযান চলাকালে মসজিদ প্রবেশ করলে না বসে আযানের জওয়াব দিয়ে শেষ করে তারপর 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' পড়তে হবে। তবে জুমআর দিন খুতবার আযান হলে জওয়াব না দিয়ে ঐ ২ রাকআত নামায আযান চলা অবস্থায় পড়ে নিতে হবে। যেহেতু খুতবা শোনা আরো জরুরী। *(ফইঃ ১/৩৩৫)*

মসজিদে প্রবেশ করে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়তে হলে ঐ নামায আর পড়তে হয় না। কারণ, তখন এই সুন্নতই ওর স্থলাভিষিক্ত ও যথেষ্ট হয়। *(মবঃ ১৫/৬৭, লিমাঃ ৫৩/৬৯)*

যেমন হারামের মসজিদে প্রবেশ করে (বিশেষ করে মুহরিমের জন্য) 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' হল তওয়াফ; ২ রাকআত সুন্নত নয়। *(মবঃ ৬/২৬৪-২৬৫)*

মসজিদ হবে পবিত্র ও সুগন্ধময়

মসজিদ আল্লাহর ঘর। ইবাদতের জায়গা। তা হবে পবিত্র ও সুগন্ধময়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ মহল্লায় মসজিদ বানাতে এবং তা পরিষ্কার ও সুগন্ধময় করে রাখতে আদেশ করেছেন।' *(আদাঃ ৪৫৫ নং, তিঃ, ইমাঃ, ইহিঃ আঃ)*

সামুরাহ ﷺ নিজের ছেলেকে পত্রে লিখেছিলেন, 'অতঃপর বলি যে, আল্লাহর রসূল ﷺ

আমাদেরকে আমাদের মহল্লায় মসজিদ বানাতে, তার তরমীম করতে এবং তা পবিত্র রাখতে আদেশ করতেন।' *(আদাঃ ৪৫৬নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয়ই এই মসজিদসমূহে কোন প্রকার নোংরা, পেশাব-পায়খানা (ইত্যাদি ময়লা দ্বারা অপবিত্র করা) সঙ্গত নয়। মসজিদ তো কুরআন পাঠ, আল্লাহর যিক্র এবং নামাযের জন্য (বানানো হয়)। *(আঃ, মুঃ, সজাঃ ২২৬৮নং)* তিনি মসজিদের দরজায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। *(সজাঃ ৬৮১৩ নং)*

মসজিদে থুথু বা কফ্ ফেলা গোনাহর কাজ। থুথু ইত্যাদি নোংরা বস্তু মসজিদ থেকে পরিষ্কার করা সওয়াবের কাজ। *(আঃ, ত্বাবঃ, সজাঃ ২৮৮৫ নং)* যেমন ঋতুমতী মহিলা প্রভৃতি অপবিত্রের জন্য মসজিদে অবস্থান করা বৈধ নয়। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১৪৩১নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (কাঁচা) পিঁয়াজ, রসুন বা কুর্রাস (Leek) খাবে, সে যেন আমাদের মসজিদে আমাদের নিকটবর্তী না হয়। কেন না, যে বস্তু দ্বারা মানুষ কষ্ট পায়, সেই বস্তুতে ফিরিশ্তারাও কষ্ট পেয়ে থাকেন।" *(মুঃ, তিঃ, নাঃ, সজাঃ ৬০৮৯ নং)*

বলাই বাহুল্য যে, কাঁচা পিঁয়াজ-রসুন অপেক্ষা বিড়ি-সিগারেট, গুল-জর্দা, গালি-তামাক প্রভৃতি মাদকদ্রব্যের দুর্গন্ধ আরো বেশী। সুতরাং তা খেয়েও মসজিদে এসে মুসল্লী তথা আল্লাহর ফিরিশ্তাদেরকে কষ্ট দেওয়া বৈধ নয়। বরং এসব বস্তু খাওয়াই হারাম এবং তা বর্জন করা ওয়াজেব। *(আদর্শ পরিবার ও পরিবেশ দ্রঃ)*

মসজিদে যা অবৈধ

১। হারানো জিনিস খোঁজা; মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে তার হারানো বস্তু খোঁজ করতে দেখবে, সে ব্যক্তি যেন তাকে বলে, 'আল্লাহ তোমার জিনিস ফিরিয়ে না দিক্।' কারণ, মসজিদসমূহ এ উদ্দেশ্যে বানানো হয়নি।" *(মুঃ ৫৬৮নং)*

২। বেচা-কেনা; মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তোমরা দেখবে যে, মসজিদে কেউ কিছু বেচা-কেনা করছে, তখন তাকে বলবে যে, 'আল্লাহ তোমার বেচা-কেনায় লাভ না দিক্।" *(তিঃ, নাঃ, দাঃ, মিঃ ৭৩৩নং)*

৩। অসার, বাজে ও অশ্লীল কবিতা, গজল বা ছড়া পাঠ। আম্র বিন শুআইবের পিতামহ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ মসজিদে আপোসে কবিতা আবৃতি ও বেচা-কেনা করতে, জুমআর দিন (জুমআর) নামাযের পূর্বে গোল হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। *(আদাঃ, তিঃ, মিঃ ৭৩২নং)*

অবশ্য বৈধ শ্রেণীর ইসলামী গজল পাঠ নিষিদ্ধ নয়। একদা হাস্সান ؓ মসজিদে কবিতা পাঠ করছিলেন। হযরত উমার ؓ প্রতিবাদের দৃষ্টিতে তাঁর প্রতি তাকালে তিনি বললেন, 'আমি কবিতা পাঠ করতাম, আর তখন মসজিদে আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (নবী ﷺ) উপস্থিত থাকতেন।' অতঃপর তিনি আবূ হুরাইরার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, আপনি কি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছেন, "(হে হাস্সান! মুশরিকদেরকে) আমার তরফ থেকে (ওদের কবিতার) জবাব দাও। হে আল্লাহ! জিবরীল

দ্বারা ওকে সাহায্য কর?” আবূ হুরাইরা বললেন, ‘জী হ্যাঁ, (আমি এ কথা শুনেছি)। *(বুঃ ৪৫৩, মুঃ ২৪৮-৫ নং)*

৪। হৈ-হাল্লা করা ও উচ্চস্বরে কথা বলা। *(বুঃ, মিঃ ৭৪৪নং)* এমন কি কেউ নামায বা কুরআন পড়লে সেখানে সশব্দে কুরআন পাঠও করা যাবে না। একদা মহানবী ﷺ দেখলেন, লোকেরা নামাযে জোরে-শোরে কুরআন পাঠ করছে। তিনি বললেন, “মুসল্লী (নামাযী) তো আল্লাহর সাথে চুপিসারে কথা বলে। সুতরাং কি নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলছে তা লক্ষ্য করা দরকার। আর তোমরা এমন উচ্চস্বরে কুরআন পড়ো না, যাতে অপরের নামাযে ব্যাঘাত ঘটে।” *(আঃ, মিঃ ৮৫৬নং)*

বলাই বাহুল্য যে, মসজিদের যে প্রতিবেশী অথবা অন্য লোক যে (মাইক, টেপ, রেডিও প্রভৃতির) শব্দ বা গান-বাজনা দ্বারা অথবা কোন রঙ্‌-তামাশা দ্বারা মসজিদের পবিত্রতা-হানি করে এবং মসজিদে অবস্থিত নামাযীদের নামাযে, তেলাঅতে ও আল্লাহর যিক্‌রে ব্যাঘাত ও বাধা সৃষ্টি করে তার ভয় হওয়া উচিত। কারণ, মহান আল্লাহর সাধারণ উক্তি এই যে,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَسَعى فِيْ خَرَابِهَا أُولٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَّدْخُلُوْهَا إِلاَّ خَائِفِيْنَ، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদে তাঁর নাম স্মরণ (যিক্‌র) করতে বাধা দেয় ও তার ধ্বংস-সাধনে প্রয়াসী হয়, তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে?” *(কুঃ ২/১১৪)*

৫। হদ্দ্‌ (ইসলামী দন্ডবিধি; যেমন মদখোরকে চাবুক মারা, চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীকে কোড়া মারা প্রভৃতি) কায়েম করা। মহানবী ﷺ মসজিদে হদ্দ্‌ কায়েম করতে নিষেধ করেছেন। *(হাঃ ৪/৩৬৯, আঃ ৩/৪৩৪, আদাঃ ৪৪৯০, মিঃ ৭৩৪ নং)*

উল্লেখ্য যে, আধুনিক যুগের মোবাইল টেলিফোন বা ব্লিফার সঙ্গে নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করার পূর্বে তা বন্ধ করে দেওয়া জরুরী। কারণ, এ সবে যে রিং বা মিউজিকের শব্দ আছে তাতে মসজিদবাসীর ডিষ্টার্ব হয়ে থাকে।

মসজিদে যা করা বৈধ

এমন কতক কাজ আছে, যে সম্বন্ধে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, তা মসজিদে করা হয়তো বৈধ নয়। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ। যেমন;

১। দ্বীনী কথাবার্তা, বৈধ আলোচনা, প্রয়োজনীয় সাংসারিক কথা। জাবের বিন সামুরাহ ؓ বলেন, ‘নবী ﷺ ফজরের নামায পড়ে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত মুসাল্লা থেকে উঠতেন না। সূর্য উঠে গেলে তিনি উঠে যেতেন। ঐ অবসরে লোকেরা আপোসে কথা বলত। বলতে বলতে তারা ইসলাম-পূর্ব জাহেলিয়াতের কথা শুরু করে দিত। এতে তারা হাসত এবং তিনিও মুচকি হাসতেন।’ *(মুঃ ৬৭০নং)*

অবশ্য নিছক দুনিয়াদারীর কথা বলা বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেন, “আখেরী যামানায়

এমন এক শ্রেণীর লোক হবে, যারা মসজিদে গোল-বৈঠক করে পার্থিব ও সাংসারিক গল্প-গুজব করবে। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে বসো না। কারণ, এমন লোকেদের নিয়ে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" *(ত্বাব, বাঃ, মিঃ ৭৪৩, সিসঃ ১১৬৩ নং)*

২। খাওয়া-পান করা। আব্দুল্লাহ বিন হারেস ﵁ বলেন, 'আমরা রসূল ﷺ এর আমলে মসজিদের ভিতর রুটী ও গোশ্ত্ খেতাম।' *(ইমাঃ ৩৩০০ নং)*

যে জিনিস খাওয়া হারাম, তা মসজিদে খাওয়া তথা সকল স্থানেই খাওয়া হারাম। মসজিদের সম্মান রক্ষার্থে সে সব হারাম জিনিস সঙ্গে নিয়ে বা পকেটে রেখে মসজিদে যাওয়া বা নামায পড়াও বৈধ নয়। যেমন গুল, জর্দা, বিড়ি, সিগারেট, তামাক প্রভৃতি খাওয়া বৈধ নয়, বিধায় তা মসজিদে খাওয়া বা নিয়ে যাওয়া অবৈধ। *(মবঃ ১৭/৫৮)*

৩। শয়ন করা। একদা আব্বাদ বিন তামীমের চাচা ﵁ দেখলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ মসজিদে এক পা অপর পায়ের উপর রেখে চিৎ হয়ে শয়ন করে আছেন। সাঈদ বিন মুসাইয়িব বলেন, 'উমার এবং উসমান (রাঃ)ও এরূপ করতেন।' *(বুঃ ৪৭৫ নং, মুঃ)*

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﵁ বলেন, 'আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ এর যুগে মসজিদে ঘুমাতাম। আর আমরা তখন ছিলাম অবিবাহিত যুবক।' *(বুঃ ৪৪০, তিঃ ৩২১, ইমাঃ ৭৫১নং, আদাঃ, নাঃ, আঃ)*

তবে ঘরে জায়গা থাকতে মসজিদকে অভ্যাসগতভাবে শয়নাগার ও বিশ্রামাগার বানানো উচিত নয়। কারণ, ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, 'কেউ যেন মসজিদকে শয়নাগার ও বিশ্রামাগার বানিয়ে না নেয়।' *(সতিঃ ১/১০৩)*

মসজিদ নির্মাণ বিষয়ক কিছু ফতোয়া

মুসলিম থাকতে কোন কাফের মিস্ত্রী-শ্রমিক দ্বারা মসজিদ নির্মাণ বৈধ নয়। *(মবঃ ২১/২০-৩৮)*

মুসলিমদের (সামাজিক, রাজনৈতিক) কোন ক্ষতির আশঙ্কা না হলে মসজিদ ও মাদ্রাসার জন্য অমুসলিমদের নিকট থেকে -তারা খুশী হয়ে হালাল অর্থ সাহায্য দিতে চাইলে- গ্রহণ করা বৈধ। *(ইবনে বায প্রমুখ, মবঃ ৩২/৯০)*

মসজিদ নির্মাণ হবে মুসলিমদের নিজস্ব পবিত্র মাল দ্বারা। এতে যাকাত ব্যবহার বৈধ নয়। কারণ, যাকাত হল গরীব-মিসকীন প্রভৃতি ৮ প্রকার খাতে ব্যয়িতব্য অর্থ। আর মসজিদ এ সব পর্যায়ে পড়ে না। *(মবঃ ৮/১৫২)*

ওয়াক্‌ফের যে কোনও বস্তু বিক্রয় করা যায় না, হেবা (দান) করা যায় না এবং কেউ তার ওয়ারিস হতেও পারে না। *(বুঃ ২৭৩৭ নং, মুঃ, আদাঃ, তিঃ, ইমাঃ)*

অবশ্য যদি কোন ওয়াক্‌ফের জিনিস এমন অবস্থায় পৌঁছে যায়, যাতে কোন প্রকার উপকারই অবশিষ্ট না থাকে এবং তার তরমীম ও সংস্কার সম্ভব না হয়, অনুরূপ কোন মসজিদ সংকীর্ণ হলে এবং প্রশস্ত করার জায়গা না থাকলে সেই ওয়াক্‌ফ বা মসজিদের জায়গা বিক্রয় করে সেই অর্থে অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ। কারণ, কোনও মসজিদ বা স্থান খামাখা ফেলে রাখা নিষ্ফল।

ইবনে রজব বলেন, ইমাম আহমাদ (রঃ) প্রমুখ যে কথা স্পষ্টাকারে বর্ণিত হয়েছে তা এই যে, পোড়ো মসজিদ বিক্রয় করে তার মূল্য দ্বারা অন্য মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। ঐ গ্রাম বা শহরে প্রয়োজন না থাকলে অন্য গ্রাম বা শহরে মসজিদ নির্মাণের খাতে ঐ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

মসজিদ স্থানান্তরিত করা সাহাবা কর্তৃকও প্রমাণিত। *(এ ব্যাপারে ইসলাহুল মাসাজিদ, উর্দু ৩১৫-৩১৭পৃঃ, মবঃ ১০/৬৩, ২৩/৯৯, ২৪/৬০, ফইঃ ২/৯ দ্রষ্টব্য)*

পক্ষান্তরে মসজিদ পোড়ো না হলে, নামায পড়া হলে বা চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রয়োজন না পড়লে মসজিদ ভেঙ্গে অন্য কিছু (মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা ইত্যাদি) করা বৈধ নয়, এমনকি ইমাম রাখার জন্য বাসাও নয়। *(মবঃ ১০/৮১, ২৩/১০৩)*

এক মসজিদের আসবাব-পত্র অন্য মসজিদে লাগানো বৈধ। মসজিদের প্রয়োজন না থাকলে অথবা মসজিদের সম্পদ উদ্বৃত্ত হলে তা হতে সাধারণ কল্যাণ-খাতে; যেমন ঈদগাহ বা দ্বীনী মাদ্রাসা নির্মাণ, কবরস্থান ঘেরা, এতীম-মিসকীনদের দেখাশুনা প্রভৃতি কাজে দান করা যায়। *(ইসলাহুল মাসাজিদ, উর্দু ৩১৬পৃঃ, মবঃ ৩/৩৬১, কিতাবুদ্দা'ওয়াহ, ইবনে বায ২০৩পৃঃ)*

মসজিদের বর্ধিত স্থান মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। উভয়ের মান সমান। তাই তো মহানবী ﷺ এর নির্মিত মসজিদে নামায পড়ে যে সওয়াব লাভ হয়, বর্তমানে ঐ মসজিদের বর্ধিত স্থানসমূহে নামায পড়লেও ঐ একই পরিমাণ সওয়াব লাভ হবে। অবশ্য প্রথম কাতারসমূহের ফযীলত তো পৃথক আছেই। *(মবঃ ১৫/৭২, ১৭/৬৯)*

ইসলামের স্বর্ণযুগে যদিও মসজিদে নারী-পুরুষের মুসাল্লা পৃথক ছিল না তবুও বর্তমানে ফিতনা ও ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য মহিলাদের মুসাল্লা পৃথক করে মাঝে পর্দা দেওয়া দূষণীয় নয়। *(মবঃ ১৯/১৪৭)* অবশ্য এই উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ও পৃথক দরজা হওয়া বাঞ্ছনীয়। *(আদাঃ ৪৬২ নং)*

মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হলে সমবেত হয়ে অনুষ্ঠান করে ফিতে কেটে বা অন্য কিছু করে উদ্বোধন করা বিদআত। এ ধরনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাহায্য ও যোগদান করাও বৈধ নয়। যেমন বিশেষভাবে কোন নূতন (বা পুরাতন) মসজিদে নামায পড়ার জন্য দূর থেকে সফর করাও বৈধ নয়। যেহেতু কা'বার মসজিদ, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসা (অনুরূপ কুবার মসজিদ) ছাড়া অন্য মসজিদের জন্য সফর বৈধ নয়। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৬৯৩, ফইঃ ১/১৮-১৯)*

উপরতলায় মসজিদ ও নিচের তলায় বসত-বাড়ি অথবা নিচের তলায় মসজিদ ও উপর তলায় বসত-বাড়ি হলে কোন দোষের কিছু নয়। *(ইসলাহুল মাসাজিদ, উর্দু, ৩১৩পৃঃ)*

তদনুরূপ উপরতলায় মসজিদ এবং নিচের তলায় দোকান ইত্যাদি করে তা ভাড়া দেওয়া এবং সেই অর্থ মসজিদের খাতে ব্যয় করা বৈধ। *(ঐ ৩১৭পৃঃ)* অবশ্য ঐ সমস্ত দোকানে যেন হারাম ও অবৈধ কোন কিছু ক্রয়-বিক্রয় না হয়। নচেৎ হারাম ব্যবসায় দোকান ভাড়া দিয়ে নেওয়া অর্থ হারাম তথা মসজিদে তা লাগানো অবৈধ হবে। বলাই বাহুল্য যে, সূদী ব্যাংক, মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, দাড়ি চাঁছার সেলুন, বাদ্যযন্ত্র বিক্রয়, কোন অশ্লীল কর্ম প্রভৃতি করার জন্য দোকান বা বাড়ি ভাড়া দেওয়া হারাম। *(আসইলাতুম মুহিম্মাহ, ইবনে উসাইমীন ১৪পৃঃ)*

মসজিদ দ্বিতল বা প্রয়োজনে আরো অধিকতল করা দূষণীয় নয়। তবে কাতার শুরু হবে

ইমামের নিকট থেকে। যে তলায় ইমাম থাকবেন, সে তলা পূর্ণ হলে তবেই তার পরের তলায় দাঁড়ানো চলবে। *(মবঃ ৬/২৬০)*

মসজিদ হবে সাদা-সিধে প্রকৃতির। এতে অধিক নক্সা ও চাকচিক্য পছন্দনীয় নয়। অধিক কারুকার্য-খচিত ও রঙচঙে করা বিধেয় নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি মসজিদসমূহকে রঙচঙে করতে আদিষ্ট হইনি।" ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, 'অবশ্যই তোমরা মসজিদসমূহকে সৌন্দর্য-খচিত করবে, যেমন ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানরা (তাদের গির্জাগুলোকে) করেছে।' *(আদাঃ ৪৪৮ নং)* অথচ তাদের অনুকরণ অবৈধ।

আনাস رضي الله عنه বলেন, '(কিছু মুসলমান হবে) তারা মসজিদের সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করবে। কিন্তু তা আবাদ করবে (নামায পড়বে) খুব কমই।' *(ইআশাঃ ৩১৪৭ নং)*

উমার رضي الله عنه বলেন, 'খবরদার! মসজিদকে লাল বা হলুদ রঙের বানিয়ে লোকদেরকে (নামাযের সময়) ফিতনায় (ঔদাস্যে) ফেলো না।' *(বুঃ, ফবাঃ ১/৬৪২)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তোমরা তোমাদের মসজিদসমূহকে সৌন্দর্য-খচিত করবে এবং কুরআন শরীফকে অলঙ্কৃত করবে, তখন তোমাদের উপর ধ্বংস নেমে আসবে।" *(ইআশাঃ ৩১৪৮ নং)*

তিনি আরো বলেন, "মসজিদ (তার নির্মাণ-সৌন্দর্য) নিয়ে গর্ব না করা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না।" *(আদাঃ ৪৪৯ নং)* অর্থাৎ এ কাজ হল কিয়ামতের একটি পূর্ব লক্ষণ।

অবশ্য তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান رضي الله عنه মসজিদে নববীর দেওয়াল নক্সা-খচিত পাথর ও চুনসুরকি দ্বারা নির্মাণ করেন। থামগুলোকেও নক্সাদার পাথর দিয়ে তৈরী করেন। আর ছাত করেন সেগুন কাঠের। *(বুঃ ৪৪৬, আদাঃ ৪৫১নং)*

ইবনে বাত্ত্বাল প্রমুখ বলেন, মসজিদ নির্মাণে সুন্নত হল মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা এবং তার সৌন্দর্যে অতিরঞ্জিত না করা। হযরত উমার رضي الله عنه নিজের আমলে বহু বিজয় ও ধন লাভ সত্ত্বেও তিনি মসজিদে নববীতে কিছু অতিরিক্ত বা বর্ধিত করেন নি। খেজুর ডালের ছাত নষ্ট হয়ে গেলে তিনি তা নতুন করে তৈরী করেছিলেন মাত্র। অতঃপর হযরত উসমান رضي الله عنه তাঁর নিজের আমলে অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিলে তিনি মসজিদের কিছু সৌন্দর্য বর্ধিত করেছিলেন। কিন্তু তাকে চাকচিক্য বা রঙচঙে বলা চলে না। এতদ্সত্ত্বেও অন্যান্য সাহাবীগণ তাঁর এ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

ইসলামে প্রথম মসজিদসমূহকে অধিক সৌন্দর্য-খচিত ও নক্সাদার করেন বাদশা অলীদ বিন আব্দুল মালেক। এ সময়টি ছিল সাহাবাদের যুগের শেষ সন্ধিক্ষণ। তখন ফিতনার ভয়ে বহু উলামা বাদশার কোন প্রতিবাদ না করতে পেরে চুপ থেকেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) প্রমুখ আহলে ইল্মদের নিকটে মসজিদের তা'যীম প্রদর্শনার্থে চাকচিক্য করণে অনুমতি রয়েছে। *(ফবাঃ ১/৬৪৪)*

মসজিদে শির্ক ও বিদআত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوْا مَعَ اللَّهِ أَحَداً﴾

অর্থাৎ, আর অবশ্যই মসজিদসমূহ আল্লাহর। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকে আহবান করো না। *(কুঃ ৭২/ ১৮)*

তিনি আরো বলেন, "নিজেদের উপর কুফ্‌রের সাক্ষ্য দিয়ে মুশরিকদের জন্য আল্লাহর মসজিদ আবাদ করা শুদ্ধ ও শোভনীয় নয়। ওরা তো এমন, যাদের সকল আমল ব্যর্থ এবং ওরা দোযখে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।" *(কুঃ ৯/ ১৭)*

মসজিদে কবর থাকা শির্কের এক অসীলা। তাই তো মসজিদে কোন মাইয়্যেত দাফন করা বৈধ নয়। বৈধ নয় কবর-ওয়ালা মসজিদে নামায পড়া। এ জন্য মসজিদে কবর থাকলে তা তুলে কবরস্থানে পুনর্দাফন করা ওয়াজেব। *(মবঃ ১০/৭৭)*

কা'বার মসজিদে বিবি হা-জার (হাজেরা) বা অন্য কারো কবর নেই। এ ব্যাপারে কোন কোন ঐতিহাসিকদের কথা মান্য নয়। কারণ, তাঁদের নিকট কোন দলীল ও প্রমাণ নেই। অনুরূপ মহানবী ﷺ এর কবর হযরত আয়েশার হুজরায় হয়েছে, মসজিদে নয়। *(মবঃ ১০/৮০, ২৬/৮৬)*

মৃত্যু-শয্যায় শায়িত থেকে মহানবী ﷺ উম্মতকে অসিয়ত করে বলেছেন, "আল্লাহ ইয়াহুদ ও খ্রীষ্টানদেরকে অভিশাপ করুন; তারা তাদের আম্বিয়ার কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৭১২নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের আম্বিয়া ও নেক লোকেদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিত। শোন! তোমরা যেন কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নিও না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করছি।" *(মুঃ, মিঃ ৭১৩ নং)*

তিনি বলেন, "তোমাদের নিজ নিজ ঘরে কিছু (নফল বা সুন্নত) নামায পড়; আর তা (ঘর)কে কবর করে নিওনা।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৭১৪নং)* অর্থাৎ কবরস্থানে যেমন নামায পড়া হয় না, ঠিক তেমনি নামায না পড়ে ঘরকে কবরের মত করে রেখো না।

তিনি আরো বলেন, "তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়ো না।" *(মুঃ ৯৭২ নং, প্রমুখ)*

ঈদগাহ বা মসজিদের সীমানার বাইরে কবর হলে এবং মাঝে দেওয়াল বা প্রাচীর থাকলে ঐ ঈদগাহ বা মসজিদে নামায দূষণীয় নয়। তবে যদি ঐ কবরবাসীর তা'যীমের উদ্দেশ্যে তার পাশে মসজিদ বানানো হয়ে থাকে, তাহলে তাতে নামায বৈধ নয়। *(মবঃ ১৫/৭৮-৭৯)*

রমযান, ঈদ, শবেকদর, শবেবরাত (?) প্রভৃতির দিবারাত্রে মসজিদকে ফুল বা অতিরিক্ত আলোকমালা দিয়ে সুসজ্জিত করা বিদআত। পরন্তু এমন কাজ কাফেরদের অনুরূপ। আর কাফেরদের অনুকরণ মুসলিমদের জন্য বৈধ নয়। *(ঐ ২৫/৬৮-৬৯)*

কোন মসজিদে বিদআত কর্ম হতে থাকলে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। সম্ভব না হলে সে মসজিদ ত্যাগ করে বিদআতশূন্য মসজিদে নামায পড়া কর্তব্য। *(ঐ ১৮/৮৯)* মুজাহিদ (রঃ) বলেন, একদা আমি ইবনে উমার ﷺ এর সঙ্গে ছিলাম। নামায পড়ার জন্য তিনি এক মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানকার মুআয্‌যিন যোহর বা আসরের আযানের পর পুনরায় নামাযের জন্য ডাক-হাঁক শুরু করলে তিনি বললেন, 'এখান হতে বের হয়ে চল।

কারণ এখানে বিদআত রয়েছে।' অন্য এক বর্ণনায় তিনি বললেন, '(এই মসজিদ থেকে) বিদআতে আমাকে বের করে দিল।' *(আদাঃ ৫৩৮, বাঃ ১/৪২৪, ত্বাব)*

বিদআতের বিরুদ্ধে লড়ে সফল না হয়ে বিদআতশূন্য সালাফী জামাআত পৃথক মসজিদ করলে, সে মসজিদকে 'মাসজিদে যিরার' বলা যাবে না। বরং বিদআত কর্মে সহমত প্রকাশ না করে ফিতনা দূর করার মানসে পৃথক মসজিদ করাই যুক্তিযুক্ত। *(মবঃ ৩৫/৮২)* যে মসজিদ সৎপথের পথিক হকপন্থী মুসলিমদের কোন ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে, জামাআতের প্রতি বিদ্রোহ করে, মুসলিমদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির ইচ্ছায় এবং আল্লাহ ও তদীয় রসূলের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করে তাদের গোপন ঘাঁটি স্বরূপ নির্মাণ করা হয়, তাই হল কুরআন মাজীদে উল্লেখিত 'মাসজিদে যিরার।' *(কুঃ ৯/১০৭ দ্রঃ)*

মসজিদ বিষয়ক আরো কিছু মাসায়েল

কোন প্রকার জুলুম ও অন্যায়ভাবে দখলকৃত জায়গার উপর মসজিদ নির্মাণ এবং জেনে-শুনে তাতে নামায পড়া বৈধ নয়। *(মবঃ ১৭/৫৩)*

মসজিদের কোন সম্পত্তি বা অন্য কোন জিনিস ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার কারো জন্য বৈধ নয়। *(ইসলাহুল মাসাজিদ, উর্দু ৩১১পৃঃ)*

কোনও বিষয় নিয়ে কারো সাথে বিরোধ ঘটলে তাকে মসজিদে আসতে বাধা দেওয়া উচিত নয়। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদে তাঁর নাম স্মরণ (যিক্‌র) করতে বাধা দেয় ও তার ধ্বংস-সাধনে প্রয়াসী হয়, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?" *(কুঃ ২/১১৪)*

কোন অমুসলিম যদি বাহ্যিক পবিত্র অবস্থায় আদবের সাথে মসজিদ প্রবেশ করতে চায়, তবে তাতে কোন ক্ষতি হয় না। অবশ্য মক্কা (ও মদীনার) হারাম ও মসজিদে তারা প্রবেশ করতে পারে না। *(কুঃ ৯/২৮, মবঃ ২১/২০, ৩২/৯৪, ১০৫)*

মসজিদের উপর দিয়ে রাস্তা করায় মসজিদের সম্মানহানি হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "যিক্‌র ও নামায ছাড়া অন্য কিছুর জন্য মসজিদসমূহকে রাস্তা করে নিও না।" *(ত্বাবঃ, সজাঃ ৭২১৫ নং)* মসজিদকে রাস্তায় পরিণত করে তার সম্মান নষ্ট করা কিয়ামতের অন্যতম পূর্বলক্ষণ। *(ত্বাবঃ আউসাত্ব, সজাঃ ৫৮৯৯ নং)*

প্রকাশ যে, মসজিদের প্রতি তা'যীম প্রদর্শনের অর্থ এই নয় যে, মসজিদকে সালাম (প্রণাম) করতে হবে বা তার ধুলো খেতে হবে অথবা তার মেঝে ধুয়ে পানি খেতে হবে। কারণ এসব কাজ শির্কের পর্যায়ভুক্ত।

মসজিদে কোন প্রকার খেলাও বৈধ নয়। অবশ্য যে খেলা জিহাদ বিষয়ক অথবা জিহাদের সহায়ক (অস্ত্রচালনার খেলা) তা বৈধ। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'একদা হাবশীদল মসজিদে তাদের যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলা করছিল। আর আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর পশ্চাতে আড়ালে হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে তাদের খেলা দেখছিলাম।' *(বুঃ ৪৫৪, ৪৫৫নং, প্রমুখ)*

প্রয়োজনে কোন রোগীর জন্য মসজিদে তাঁবু লাগিয়ে বা অন্য স্থানে স্থান দেওয়া দূষণীয়

নয়। এতে রক্ত পড়লেও ক্ষতি নেই, যা পরে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'দ ﵁ আহত হলে তাঁকে মসজিদে নববীতে রাখা হয়েছিল এবং সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়েছিল। *(বুঃ৪৬৩নং, প্রমুখ)*

যে পত্র-পত্রিকায় মানুষ বা পশু-পক্ষীর ছবি থাকে, তা মসজিদে পড়া বা রাখা বৈধ নয়। প্রয়োজনে কালি দ্বারা প্রাণীর মাথা নষ্ট করে রাখা যায়। অশ্লীল ছবি ও পত্রিকা তো কোন স্থানেই দেখা ও পড়া বৈধ নয়। মসজিদে আরো বেশী নয়। *(মবঃ ২২/১০১)*

বাড়ির কোন একটা কামরা বা নির্দিষ্ট জায়গাকে মসজিদ বানানো চলে। যাতে নফল নামায এবং মসজিদে যেতে না পারলে ফরয নামাযও পড়া যাবে। ইতবান বিন মালেক ﵁ এই রকমই একটি আবেদন আল্লাহর রসূল ﷺকে জানালেন। তিনি তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পছন্দমত এক স্থানে ২ রাকআত নামায পড়লেন। অনুরূপ বারা' বিন আযেব ﵁ নিজ বাড়িতে (বাড়ির লোকদের নিয়ে) জামাআত করে নামায পড়তেন। *(বুঃ ৪২৫নং)*

নূতন মসজিদ অপেক্ষা পুরাতন মসজিদের অধিক কোন ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য বা অধিক সওয়াব আছে-এর কোন দলীল নেই। *(মুমঃ ৪/২১৬, ফাতাওয়া নাযীরিয়্যাহ ১/৩৫৯)* তবে অপ্রয়োজনে যেহেতু একই মহল্লায় একাধিক মসজিদ বিদআত, সেহেতু এর ফলে যেখানে 'যিরার' হওয়ার আশঙ্কা থাকে সেখানে নূতন ছেড়ে পুরাতন মসজিদে নামায পড়া উত্তম। কিছু সাহাবা ও সলফ এই আশঙ্কাতেই কোন কোন স্থানে পুরাতন মসজিদে নামায পড়েছেন। অবশ্য সেই মসজিদে নামায পড়া উত্তম, যে মসজিদ বিদআতশূন্য, যার জামাআত সংখ্যা অধিক *(মুমঃ ৪/২১৩)* এবং যার ইমাম ফাসেক বা বিদআতী বলে আশঙ্কা নেই।

আল্লাহর রসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাবর্গের যুগে কোন মসজিদকে তালাবদ্ধ করা হতো না। তবে সে যুগে মসজিদের ভিতর এমন কোন মূল্যবান আসবাব-পত্র থাকত না, যা চুরি বা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করা যেত। পরন্তু সে যুগের লোকেরাও এমন হৃদয়বিশিষ্ট ছিলেন যে, তাঁদের দ্বারা মসজিদের কোন প্রকার ক্ষতি হবে, সে আশঙ্কাই ছিল না। কিন্তু বর্তমান যুগের অবস্থা তার বিপরীত। সুতরাং আসবাব-পত্র ও সম্মান রক্ষার্থে মসজিদকে তালাবদ্ধ করা দূষণীয় নয়। *(মবঃ ১৩/৭৯, ১৭/৭০)*

যে সব স্থানে নামায পড়া মকরূহ ও অবৈধ

১। গোরস্থানে নামায পড়া বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের আম্বিয়া ও আউলিয়াদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নিত। শোন! তোমরা যেন কবরসমূহকে মসজিদ (নামাযের স্থান) বানিয়ে নিও না। আমি তোমাদের উপর এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারী করে যাচ্ছি।" *(মুঃ, মিঃ ৭১৩নং)*

তিনি বলেন, "তোমাদের নিজ নিজ ঘরে কিছু (নফল বা সুন্নত) নামায পড়; আর তা (ঘর)কে কবর করে নিওনা।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৭১৪নং)* কারণ, কবরস্থানে নামায পড়া হয় না।

"তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়ো না।" *(মুঃ ৯৭২ নং, প্রমুখ)*

২। উট বাঁধার জায়গায় নামায নিষিদ্ধ। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা ছাগল-ভেঁড়া বাঁধার জায়গায় নামায পড়, আর উট বাঁধার জায়গায় নামায পড়ো না।" *(মুঃ, তিঃ, ইখুঃ প্রমুখ, মিঃ ৭৩৯নং)*

৩। গোসলখানায় নামায মকরূহ। যেহেতু এ স্থান সাধারণতঃ নাপাকী ধোওয়ার জন্য ব্যবহৃত। মহানবী ﷺ বলেন, "কবরস্থান ও গোসলখানা ছাড়া সারা পৃথিবীর সকল জায়গা মসজিদ (নামায পড়ার জায়গা)।" *(আদাঃ, তিঃ, দাঃ, মিঃ ৭৩৭নং)*

৪। কসাইখানা পবিত্র হলে তাতে নামায শুদ্ধ।

৫। রাস্তার মাঝে গাড়ি বা লোকজনের আসা-যাওয়া না থাকলে নামায নিষিদ্ধ নয়। অনুরূপ মসজিদ ভরে গেলে লাগালাগি রাস্তাতেও নামায শুদ্ধ। তবে কেউ যেন ইমামের সামনের দিকে রাস্তায় না দাঁড়ায়। কারণ, ইমামের সামনে দাঁড়ালে নামায শুদ্ধ হয় না। *(মবঃ ১৫/৬৪)*

৬। ময়লা ফেলার জায়গাতে যেহেতু নাপাকীই থাকার কথা, তাই সেখানে নামায শুদ্ধ নয়।

৭। কা'বা শরীফের ভিতরে এবং হাতীম বা হিজরে ইসমাঈল (কা'বা শরীফের পার্শ্বে যে জায়গাটা গোলাকার ঘেরা আছে সেই জায়গা) এর সীমার ভিতরেও নামায শুদ্ধ। আল্লাহর রসূল ﷺ একদা কা'বা-ঘরের ভিতরে ২ রাকআত নামায পড়েছেন। *(বুঃ, মুঃ, আঃ, মিঃ ৬৯১ নং)*

প্রকাশ যে, সাত জায়গায় নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যে হাদীস উল্লেখ করা হয়, তা খুবই দুর্বল। *(মিঃ ৭৩৭ নং হাদীসের টীকা, মুমঃ ২/২৫২ দ্রঃ)*

৮। অমুসলিমদের উপাসনালয়ে কোন মূর্তি বা ছবি না থাকলে তাতে নামায পড়া বৈধ। হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ মূর্তি না থাকলে গির্জায় নামায পড়েছেন। *(বুঃ বিনা সনদে, ফবাঃ ১/৬৩২)* হযরত আবূ মূসা আশআরী, উমার বিন আব্দুল আযীয কর্তৃকও গির্জায় নামায পড়ার ব্যাপারে বর্ণনা এসেছে। *(ইআশাঃ ১/৪২৩, নাআঃ, ফিসুঃ উর্দু ১৩৫ পৃঃ)*

প্রকাশ যে, নিরুপায় অবস্থা বা দাওয়াতী উদ্দেশ্য ছাড়া অমুসলিমদের কোন ভজনালয়ে যাওয়া বৈধ নয়। *(মবঃ ৩২/ ১০৪)*

অমুসলিমদের সমাজে এবং তাদের মালিকানাভুক্ত জায়গা-জমিতেও নামায শুদ্ধ। *(মবঃ ১৫/৬৮)* বরং তাদের বাড়ির ভিতরেও (মূর্তি না থাকলে) নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। *(ঐ ৩২/ ১০৪)* তবে পবিত্রতা ইত্যাদি অন্যান্য শর্তাবলী সর্বক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয়।

৯। নক্সাদার মুসাল্লায় নামায শুদ্ধ হলেও তাতে নামায পড়া মকরূহ (অপছন্দনীয়)। যেহেতু এতে নামাযীর মনে কেড়ে নিয়ে উদাসীন করে ফেলে। এই জন্যই বিশ্বনবী ﷺ নক্সাদার কাপড়ে নামায পড়াকে অপছন্দ করেছেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৭৫৭ নং দ্রঃ)*

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হুজরার দেওয়ালে ছবিযুক্ত পর্দা টাঙ্গা থাকতে দেখলে তিনি তাঁকে বললেন, "তোমার এই পর্দা আমাদের নিকট থেকে সরিয়ে নাও। কারণ, ওর ছবিগুলো আমার নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।" *(বুঃ ৩৭৪ নং, মবঃ ৫/২৯৩, ১৫/৭৪, ফইঃ ১/২৭৮)*

তদনুরূপ সামনে ছবিযুক্ত ক্যালেন্ডার ইত্যাদি রেখে নামায পড়া মকরূহ। *(ইআশাঃ ১/৩৯৯ দ্রঃ)*

বলা বাহুল্য, এ জন্যই মসজিদের সামনের দেওয়ালে কোন প্রকার দৃষ্টি-আকর্ষক নক্সা, বস্তু

বা বিজ্ঞপ্তি, সময়সূচী ইত্যাদি রাখাও মকরূহ।

১০। বিছানা পবিত্র হলে তাতে নামায পড়া দূষণীয় নয়। হযরত আনাস ﷺ নিজ বিছানায় নামায পড়েছেন। *(ইআশাঃ ২৮১০ নং, ফবাঃ ১/৫৮৬)*

১১। পেশাব-পায়খানা ঘরের ছাদে বা পিছনে (পেশাব-পায়খানা ঘরকে সামনে করে নামায শুদ্ধ। ছাত বা সামনের দেওয়াল পবিত্র হলে নামায মকরূহ নয়। *(ফইঃ ১/২৭০, কিদাঃ ৯৫পৃঃ)* আড়াল থাকলে প্রস্রাব-পায়খানার নালা বা পাইপ সামনে করে, অথবা তার উপর ব্রিজে, অথবা মলমূত্রের পাইপের নিচে নামায শুদ্ধ। *(বুঃ ৮-২পৃ দ্রঃ)*

১২। যে রুমে মাদকদ্রব্য থাকে সে রুমে নামায পড়তে হলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। *(ফউঃ ১/৪২৬)*

১৩। ভাড়া দেওয়া বাড়ির মালিক ভাড়া গ্রহণকারীকে ঐ ঘরে থাকতে না দিতে চাইলে এবং সে সেখান হতে বের হতে না চাইলে তথা জোরপূর্বক বাস করলেও সে ঘরে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে এ কাজে সে নিরুপায় না হলে গোনাহগার হতে পারে। *(মবঃ ১৯/ ১৫৫)*

সুতরাহ

নামাযীর সামনে বেয়ে কেউ পার হবে না এমন ধারণা থাকলেও সামনে সুতরাহ রেখে নামায পড়া ওয়াজেব। *(সিসানঃ ৮-২পৃঃ)* যেমন সফরে, বাড়িতে, মসজিদে, হারামের মসজিদদ্বয়ে সর্বস্থানে একাকী ও ইমামের জন্য সুতরাহ ব্যবহার করা জরুরী।

মহানবী ﷺ বলেন, “সুতরাহ ছাড়া নামায পড়ো না।” *(ইখুঃ ৮০০ নং)*

“যে ব্যক্তি সক্ষম হয় যে, তার ও তার কিবলার মাঝে কেউ যেন না আসে, তাহলে সে যেন তা করে।” *(আঃ, দারাঃ, ত্বাবাঃ)*

“যখন তোমাদের কেউ নামায পড়বে, তখন সে যেন সামনে সুতরাহ রেখে নামায পড়ে।” *(আঃ, আদাঃ, নাঃ, ইহিঃ, হাঃ, সজাঃ ৬৫০, ৬৫১ নং)*

পক্ষান্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ এর বিনা সুতরায় নামায পড়ার হাদীস যয়ীফ।

সুতরাহ বলে কোন কিছুর আড়ালকে। নামাযী যখন নামায পড়ে তখন তার হৃদয় জোড়া থাকে সৃষ্টিকর্তা মা’বূদ আল্লাহর সাথে। বিচ্ছিন্ন থাকে পার্থিব সকল প্রকার কর্ম ও চিন্তা থেকে। ইবাদত করা অবস্থায় সে যেন মা’বূদ আল্লাহকে দেখতে পায়। কিন্তু তার সম্মুখে যখন এমন কোন ব্যক্তি বা পশু এসে উপস্থিত হয়, যে তার একাগ্রতা ও ধ্যান ভঙ্গ করে দেয়, মনোযোগ কেড়ে নেয়, দৃষ্টি চুরি করে ফেলে এবং কোন ভয় বা কামনা তার মনে জায়গা নিয়ে তাকে আল্লাহর দরবার হতে সরিয়ে পার্থিব জগতে ফিরিয়ে দেয়, তখন তার জন্য জরুরী এমন এক আড়াল ও অন্তরালের, যার ফলে সে নিজের দৃষ্টি ও মনকে তার ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে। আর তার পশ্চাতে কোন কিছু অতিক্রম করলেও সে তা ভ্রূক্ষেপ না করতে পারে।

সুতরাং সুতরাহ রেখে নামায না পড়া গোনাহর কাজ। পরন্তু ঐ অবস্থায় নামাযীর সম্মুখ বেয়ে কেউ পার হয়ে গেলে তার নামাযের সওয়াব কম হয়ে যায়। *(ফবাঃ ১/৫৮৪)*

সুতরাহ কিসের হবে?

আল্লাহর রসূল ﷺ কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার সুতরাহ প্রমাণিত। যেমন, কখনো তিনি মসজিদের থামকে সামনে করে নামায পড়তেন। *(সিসানঃ ৮২পৃঃ)* ফাঁকা ময়দানে নামায পড়লে এবং আড়াল করার জন্য কিছু না পেলে সামনে বর্শা গেড়ে নিতেন। আর লোকেরা তাঁর পিছনে বিনা সুতরায় নামায পড়ত। *(বুঃ ৪৯৪, ৪৯৮নং, মুঃ, ইমাঃ)* কখনো বা নিজের সওয়ারী উটকে আড়াআড়ি দাঁড় করিয়ে তাকে সুতরাহ বানিয়ে নামায পড়তেন। *(বুঃ ৫০৭ নং, আঃ)* কখনো জিনপোশ (উটের পিঠে বসবার আসন)কে সামনে রেখে তার কাষ্ঠাংশের সোজাসুজি নামায পড়তেন। *(বুঃ ৫০৭নং, মুঃ, ইখুঃ, আঃ)* তিনি বলতেন, "তোমাদের কেউ যখন তার সামনে জিনপোশের শেষে সংযুক্ত কাষ্ঠখন্ডের মত কিছু রেখে নেয়, তখন তার উচিত, (তার পশ্চাতে) নামায পড়া এবং এরপর তার সম্মুখ বেয়ে কেউ পার হয়ে গেলে কোন পরোয়া না করা।" *(মুঃ ৪৯৯ নং, আদাঃ)* একদা তিনি একটি গাছকে সুতরাহ বানিয়ে নামায পড়েছেন। *(নাঃ, আঃ)* কখনো তিনি আয়েশা (রাঃ) এর খাটকে সামনে করে নামায পড়েছেন। আর ঐ সময় আয়েশা (রাঃ) তার উপর চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে থাকতেন। *(বুঃ ৫১১ নং, মুঃ)*

সুফয়্যান বিন উয়াইনাহ বলেন, তিনি শারীককে কোন ফরয নামায পড়ার সময় তাঁর টুপীকে সামনে রেখে সুতরাহ বানাতে দেখেছেন। *(আদাঃ ৬৯১নং)*

প্রকাশ যে, কিছু না পেলে দাগ টেনে নেওয়ার হাদীস সহীহ নয়। *(যআদাঃ ১৩৪, যইমাঃ ১৯৬, ৯৪৩, যজাঃ ৫৬৯নং)*

সুতরাহ হবে উটের পিঠে স্থাপিত জিনপোশের পেছনে সংযুক্ত কাষ্ঠখন্ডের মত (কম-বেশী এক হাত, আধ মিটার বা ৪৭ সেমি. উঁচু) কোন বস্তু। কোন দাগ সুতরাহ বলে গণ্য হবে না। তবে যে বস্তু মাটি বা মুসাল্লা থেকে একটুও উঁচু হয়ে থাকে তাকেই সুতরাহ বলে ধরে নেওয়া যাবে। *(মুমঃ ৩/৩৮৪)*

প্রকাশ যে, মুসাল্লা, চাটাই বা কার্পেটের শেষ প্রান্তকে সুতরাহ বলে গণ্য করা যাবে না। *(ফইঃ ১/৩১৭)*

সুতরাহ কতদূরে রাখতে হবে?

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামায পড়বে, তখন সে যেন সামনে সুতরাহ রেখে নামায পড়ে এবং তার নিকটবর্তী হয়। যাতে শয়তান যেন তার নামাযকে নষ্ট করে না দিতে পারে।" *(আঃ, আদাঃ, নাঃ, ইহিঃ, হাঃ, সজাঃ ৬৫০নং)*

একদা তিনি কা'বা শরীফের ভিতরে নামায পড়লে তাঁর ও দেওয়ালের মাঝে ৩ হাত ব্যবধান ছিল। *(বুঃ ৫০৬, আঃ, নাঃ)* তাঁর মুসাল্লা (সিজদার জায়গা) ও দেওয়ালের মাঝে একটি ছাগল (অথবা ভেঁড়া) পার হয়ে যাওয়ার মত (প্রায় আধ হাত) ফাঁক বা দূরত্ব থাকত। *(বুঃ ৪৯৬নং, মুঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, সুতরার একেবারে সোজাসুজি না দাঁড়িয়ে তার একটু ডানে বা বামে সরে

দাঁড়ানোর হাদীস শুদ্ধ নয়। *(যআদাঃ ১৩৬নং)*

ইমামের সুতরাই মুক্তাদীদের সুতরাহ

ইমামের সামনে সুতরাহ থাকলে মুক্তাদীদের জন্য পৃথক সুতরার দরকার হয় না। মহানবী ﷺ ঈদের দিন নামায পড়তে বের হলে তাঁর সামনে বর্শা গাড়া হত। তিনি তা সুতরাহ বানিয়ে নামায পড়তেন এবং লোকেরা তাঁর পশ্চাতে (বিনা সুতরায়) নামায পড়ত। *(বুঃ ৪৯৪, মুঃ ৫০১নং)*

একদা তিনি বাত্বহায় নামায পড়লেন। তাঁর সামনে (সুতরাহ) ছিল ছোট একটি বর্শা। আর তাঁর সম্মুখ বেয়ে মহিলা ও গাধা পার হয়ে যাচ্ছিল। *(বুঃ ৪৯৫নং, মুঃ ২৫২নং)*

বিদায়ী হজ্জের সময় মহানবী ﷺ মিনায় নামায পড়ছিলেন। ইবনে আব্বাস ؓ একটি গাধীর পিঠে চড়ে কিছু কাতারের সামনে বেয়ে পার হয়ে এসে নামলেন। অতঃপর গাধীটিকে চরতে ছেড়ে দিয়ে কাতারে শামিল হলেন। তা দেখে কেউ তাঁর প্রতিবাদ করল না। *(বুঃ ৪৯৩, মুঃ, মিঃ ৭৮০নং)*

নামাযীর সামনে বেয়ে পার হওয়া হারাম

মহানবী ﷺ বলেন, "যে নামাযীর সামনে বেয়ে পার হয়, সে যদি জানত যে, এতে তার কত পাপ হবে, তাহলে সে ৪০ (বছর বা মাস বা দিন নামাযীর সালাম ফিরার) অপেক্ষা করাকে ভাল মনে করত, তবুও নামাযীর সামনে বেয়ে অতিক্রম করত না।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৭৭৬ নং)*

অবশ্য নামাযীর সামনে সুতরা থাকলে পার হওয়া হারাম বা গোনাহর কাজ নয়। অনুরূপ সুতরাহ না থাকলেও যদি নামাযীর সামনে প্রায় ৩ হাত দূর থেকে পার হয়, তাহলেও গোনাহ হবে না। *(মাজমূ' ফাতাওয়া, ইবনে বায ২/২৬৭)*

কেউ সামনে বেয়ে পার হলে নামাযীর কর্তব্য

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ সামনে সুতরাহ রেখে নামায পড়লে এবং কেউ তার ঐ সুতরার ভিতর দিয়ে পার হতে চাইলে সে যেন তার বুকে ঠেলে পার হতে বাধা দেয় ও যথাসম্ভব রুখতে চেষ্টা করে।" এক বর্ণনায় আছে, "তাকে যেন দু' দু' বার বাধা দেয়। এর পরেও যদি সে মানতে না চায় (এবং ঐ দিকেই পার হতেই চায়) তাহলে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কারণ, (বাধাদান সত্ত্বেও যে বাধা মানে না) সে তো শয়তান।" *(বুঃ, মুঃ, ইখুঃ, মিঃ ৭৭৭নং)*

তিনি বলেন, "সুতরাহ ছাড়া নামায পড়ো না। কাউকে তোমার সামনে বেয়ে পার হতেও দিও না। (সুতরার ভিতর বেয়ে যেতে) সে যদি মানা না মানে, তবে তার সাথে লড়। কারণ, তার সাথে শয়তান আছে।" *(ইখুঃ ৮০০নং)*

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ জুমআর দিন একটি থামকে সুতরাহ করে নামায পড়ছিলেন। ইত্যবসরে বানী উমাইয়ার এক ব্যক্তি তাঁর ও থামের মাঝ বেয়ে পার হতে গেলে তিনি তাকে বাধা দিলেন। কিন্তু লোকটি পুনরায় পার হওয়ার চেষ্টা করল। তিনি তার বুকে এক থাপ্পড় দিলেন। লোকটি মদীনার গভর্নর মারওয়ানের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ জানাল। মারওয়ান আবূ সাঈদ ﷺ কে বললেন, 'আপনি আপনার ভাইপোকে মেরেছেন কি কারণে?' আবূ সাঈদ ﷺ বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কিছুকে সুতরাহ বানিয়ে নামায পড়ে, অতঃপর কেউ তার ঐ সুতরার ভিতর দিয়ে পার হতে চায়, তবে সে যেন তাকে বাধা দেয়। এতেও যদি সে না মানে, তাহলে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কারণ, সে তো শয়তান।" সুতরাং আমি শয়তানকেই তো মেরেছি!' *(ইখুঃ ৮১৭নং)*

শুধু মানুষই নয়, কোন পশুও সামনে বেয়ে পার হতে চাইলে তাকেও বাধা দেওয়া উচিত। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'একদা নবী ﷺ নামায পড়ছিলেন। এমন সময় একটি ছাগল (বা ভেঁড়া) তাঁর সামনে দিয়ে ছুটে পার হতে চাইল। কিন্তু তিনি তার আগেই তাকে ধরে ফেললেন। এমনকি তার পেটকে দেওয়ালের সাথে লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর ছাগল (বা ভেঁড়া)টি তাঁর পিছন দিক হতে পার হয়ে গেল।' *(আদাঃ ৭০৮-৭০৯, ইখুঃ ৮২৭নং, ত্বাবা, হাঃ)*

সুতরাং বাধা দেওয়া ওয়াজেব এবং তাতে একটু নড়া-সরা দূষণীয় নয়।

বিনা সুতরায় নামায বাতিল কখন?

সুতরা রেখে নামায পড়লে এবং তার পশ্চাৎ বেয়ে কেউ পার হয়ে গেলে নামাযীর নামাযে কোন ক্ষতি হয় না। *(বুঃ ৪৯৯, মুঃ ২৫২নং)*

সুতরার ভিতর দিয়েও কোন পুরুষ, শিশু বা পশু পার হয়ে গেলে নামাযীর মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটে ঠিকই, তবে নামায একেবারে নষ্ট হয়ে যায় না। পরন্তু বিনা সুতরায় নামায পড়লে এবং সামনে দিয়ে সাবালিকা মেয়ে, গাধা বা মিশমিশে কালো কুকুর পার হয়ে গেলে নামায বাতিল হয়ে যায়।

মহানবী ﷺ বলেন, "(সুতরাহ না হলে) সাবালিকা মেয়ে, গাধা ও কালো কুকুর নামায নষ্ট করে ফেলে।" আবূ যার্র বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! হলুদ ও লাল না হয়ে কালো কুকুরেই নামায নষ্ট করে তার কারণ কি?' বললেন, "কারণ, কালো কুকুর শয়তান।" *(মুঃ৫১০, আদাঃ, ইখুঃ)*

নাবালিকা মেয়ে অতিক্রম করলে নামায নষ্ট হয় না। একদা বানী আব্দুল মুত্তালিবের দু'টি ছোট মেয়ে মারামারি করতে করতে তাঁর সামনে এসে তাঁর হাঁটু ধরে ফেলল। তিনি উভয়কে দু'দিকে সরিয়ে দিলেন। আর এতে তিনি নামায ভাঙ্গলেন না। *(আদাঃ ৭১৬, ৭১৭, সনাঃ ৭২৭নং)*

যেমন নিজের স্ত্রী বা কোন মহিলা নামাযীর সামনে ঢাকা নিয়ে অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। আল্লাহর রসূল ﷺ রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়তেন, আর আয়েশা (রাঃ) তাঁর সামনে জানাযার লাশের মত শুয়ে ঘুমাতেন। *(বুঃ ৫০৮, মুঃ ৫১২, মিঃ ৭৭৯নং)* যেমন তিনি কখনো কখনো চাদরের ভিতর থেকে পায়ের দিকে চুপে চুপে নিজের প্রয়োজনে বের

হয়ে যেতেন। এতেও তাঁর নামাযের কোন ক্ষতি হতো না। (ঐ) এক বর্ণনায় আছে, 'তখন ঘরে বাতি ছিল না।' *(বুঃ ৫১৩, মুঃ ৫১২নং)*

প্রকাশ যে, কোন মহিলা-নামাযীর সামনে বেয়ে (বিনা সুতরায়) কোন (সাবালিকা) মেয়ে পার হলেও নামায নষ্ট হয় না। *(আরাঃ ২৩৫৬ নং, মুহাল্লা ৪/১২, ২০)*

ক্বিবলাহ

সমগ্র মুসলিম-জাতির জন্য রয়েছে একই ক্বিবলার বিধান। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ﴾.

অর্থাৎ, আর তুমি যেখান হতেই বের হও না কেন, মসজিদুল হারাম (কা'বা শরীফের) দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক না কেন, ঐ (কা'বার) দিকেই মুখ ফিরাবে। *(কুঃ ২/১৫০)*

আল্লাহর নবী ﷺ যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন (ফরয-নফল সকল নামাযেই) কা'বা শরীফের দিকে মুখ ফিরাতেন। *(ইগঃ ২৮৯নং)* তিনি এক নামায ভুলকারীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "যখন নামাযে দাঁড়াবার ইচ্ছা করবে তখন পরিপূর্ণরূপে ওযু কর। অতঃপর ক্বিবলার দিকে মুখ করে তকবীর বল---।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৭৯০নং)*

নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য ক্বিবলাহ-মুখ করা হল অন্যতম শর্ত। নামাযের সময় বান্দার থাকে দু'টি অভিমুখ; একটি হল হৃদয়ের এবং অপরটি হল দেহের। তার হৃদয়ের অভিমুখ থাকে আল্লাহর প্রতি। আর দেহ ও চেহারার অভিমুখ হয় আল্লাহরই এক বিশেষ নিদর্শন কা'বাগৃহের প্রতি। যে গৃহের তা'যীম করতে এবং যার প্রতি অভিমুখ করতে বান্দা আদিষ্ট হয়েছে। সারা বিশ্বের মুসলমানদের হৃদয় যেমন আল্লাহর অভিমুখী, তেমনিই নামাযে তাদের সকলের দেহ-মুখও একই গৃহের প্রতি অভিমুখী হয়। এতে রয়েছে সারা মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতির বহিঃপ্রকাশ এবং তাদের সকল বিষয়ে একাত্মতা অবলম্বন করার প্রতি ইঙ্গিত।

ক্বিবলার অভিমুখ

যারা কা'বার আশেপাশে নামায পড়ে এবং কা'বা তাদের দৃষ্টির সামনে থাকে, তাদের জন্য হুবহু কা'বার প্রতি মুখ ফেরানো জরুরী। পক্ষান্তরে যারা কা'বা দেখতে পায় না তাদের জন্য হুবহু কা'বার প্রতি মুখ ফেরানো জরুরী নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝামাঝি হল ক্বিবলার দিক।" *(তিঃ, হাঃ, মিঃ ৭১৫নং)*

তিনি বলেন, "প্রস্রাব-পায়খানা করার সময় তোমরা ক্বিবলাহকে সামনে বা পিছন করে বসো না; বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিককে সামনে বা পিছন করে বস।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৩৩৪নং)*

উক্ত হাদীস দু'টি হতে এ কথা বুঝা যায় যে, মদীনাবাসীদের জন্য ক্বিবলাহ হল পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে (দক্ষিণ) দিকে। যেহেতু মদীনা শরীফ থেকে কা'বার অবস্থান হল দক্ষিণে।

সুতরাং যদি মদীনায় কেউ দক্ষিণ মুখে নামায পড়ে তবে তার ক্বিবলাহ-মুখে নামায পড়া হবে। যদিও হুবহু কা'বা থেকে তার অভিমুখ একটু ডানে-বামে সরেও হয়। *(মুমঃ ২/২৬৭)*

অতএব পৃথিবীর মানচিত্রে যারা কা'বার যে দিকে অবস্থান করে তার ঠিক বিপরীত দিকে হবে তাদের ক্বিবলাহ। ভারত-বাংলাদেশ পড়ছে কা'বার পূর্বে, তাই এ দেশের লোকেদেরকে পশ্চিম দিকে মুখ করে নামায পড়তে হয়। বলা বাহুল্য, মাহাত্ম্য হল ক্বিবলার; পশ্চিম দিকের কোন মাহাত্ম্য নয়।

ক্বিবলাহ জানতে না পারলে

কোন অচেনা-অজানা স্থানে অন্ধকার বা মেঘের কারণে চাঁদ, সূর্য, তারা দেখতে না পাওয়ার ফলে ক্বিবলার দিক কোন্‌টা নির্ণয় করতে না পারলে এবং জানার মত সে রকম কোন যন্ত্র বা উপায় না থাকলে, মনে মনে সঠিক ধারণার উপর ভিত্তি করেই নামায পড়তে হবে। অবশ্য নামাযের পর ক্বিবলার সঠিক দিক অন্য বুঝতে পারলেও নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। পুনরায় ঐ নামায সঠিক ক্বিবলাহ-মুখে আর পড়তে হবে না।

হযরত জাবের ﵁ বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ এর সঙ্গে কোন এক সফর বা অভিযানে ছিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে (নামাযের সময়) আমরা ক্বিবলার দিক নির্ণয়ে মতভেদ করলাম। এতে প্রত্যেকে নিজ নিজ মতে পৃথক পৃথক নামায পড়ে নিল। (তখন নবী ﷺ সেখানে ছিলেন না।) সঠিক ক্বিবলার দিকে নামায হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য প্রত্যেকে নিজের নিজের সামনে দাগ দিয়ে রাখল। সকাল হলে সে দাগগুলো আমরা দেখলাম; দেখলাম, আমরা ক্বিবলার ভিন্ন দিকে মুখ করে নামায পড়ে ফেলেছি। অতঃপর ব্যাপারটি নবী ﷺ এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি আমাদেরকে ঐ নামায পুনরায় পড়তে আদেশ করলেন না। বরং তিনি বললেন, "তোমাদের নামায শুদ্ধ হয়ে গেছে।" *(দারাঃ, হাঃ, বাঃ, ইগঃ ২৯৬নং)*

নামায পড়া অবস্থায় যদি কারো বা কিছুর মাধ্যমে ক্বিবলার সঠিক দিক জানা যায়, তাহলে সাথে সাথে সেদিকে ফিরে যাওয়া জরুরী। মহানবী ﷺ শুরুতে বাইতুল মাক্বদেসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। তিনি মনে মনে চাইতেন যে, কা'বাই তাঁর ক্বিবলাহ হোক। সে সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ......﴾ الآية

অর্থাৎ, আকাশের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে আমি প্রায় লক্ষ্য করি। সুতরাং আমি তোমাকে এমন ক্বিবলার দিকে ফিরিয়ে দেব, যা তুমি পছন্দ কর। অতএব তুমি (এখন) মাসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও। *(কুঃ ২/১৪৪)* এরপর থেকে তিনি কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়তে লাগলেন। কুবার মসজিদে লোকেরা ফজরের নামায পড়ছিল। ইত্যবসরে এক আগন্তক তাদেরকে এসে বলল, 'আজ রাত্রে আল্লাহর রসূলের উপর কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়তে আদেশ করা

হয়েছে। সুতরাং শোন! তোমরা কা’বার দিকে মুখ ফেরাও।’ তখন তাদের মুখ ছিল শাম (বর্তমানে প্যালেস্টাইন)এর দিকে। সংবাদ শোনামাত্র তারা কা’বার দিকে ঘুরে গেল। *(বুঃ, মুঃ, আঃ, ইগঃ ২৯০নং)*

কোন্ কোন্ অবস্থায় ক্বিবলাহ-মুখ না হলেও নামায শুদ্ধ

১। অসুস্থ ও অক্ষম ব্যক্তি ক্বিবলার দিকে মুখ না করতে পারলে এবং তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার মত কেউ না থাকলে, সে যে মুখে নামায পড়বে সেই মুখেই নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। যেহেতু “আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতীত বোঝা বহনের ভার দেন না।” *(কুঃ ২/২৮৬)*

২। যুদ্ধ চলাকালীন হানাহানির সময় নামাযে ক্বিবলাহ-মুখ হওয়া জরুরী নয়। শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য রেখে তাদের দিকে মুখ করেই নামায পড়তে হবে। *(বুঃ, মুঃ, ইগঃ ৫৮৮নং)*

মহান আল্লাহ বলেন, “যদি তোমরা (শত্রুর) ভয় কর, তাহলে পথচারী অথবা আরোহী অবস্থায় (নামায পড়ে নাও)।” *(কুঃ ২/২৩৯)*

ইবনে উমার ﷺ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘ভয় খুব বেশী হলে তোমরা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় অথবা সওয়ার হওয়া অবস্থায় ক্বিবলার দিকে মুখ করে অথবা না করেই নামায পড়ে নাও।’ *(বুঃ ৪৫৩৫ নং)* আর মহানবী ﷺ বলেন, “শত্রুর সাথে যুদ্ধরত হলে (নামাযে) তকবীর ও মাথার ইশারাই যথেষ্ট।” *(বাঃ ৩/২৫৫)*

৩। সফরে উট, ঘোড়া বা গাড়ির উপর নফল বা সুন্নত নামায পড়ার সময়ও ক্বিবলাহ-মুখ হওয়া জরুরী নয়। যেহেতু নবী ﷺ সফরে নিজের সওয়ারীর উপর যে মুখে উট চলত, সেই মুখেই নফল ও বিত্‌র নামায পড়তেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১৩৪০ নং)*

এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদের এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, “পূর্ব ও পশ্চিম সব দিকই আল্লাহর। সুতরাং তুমি যে দিকেই মুখ ফেরাও, সে দিকই আল্লাহর।” *(কুঃ ২/১১৫)*

আর কখনো কখনো তিনি উটনীর উপর নফল পড়ার ইচ্ছা করলে উটনী সহ ক্বিবলাহ-মুখ হয়ে তকবীর দিতেন। তারপর বাকী নামায নিজের সওয়ারীর পথ অভিমুখেই সম্পন্ন করতেন। *(আদাঃ, ইহিঃ, প্রমুখ সিসানঃ ৭৫পৃঃ)* অবশ্য ফরয নামাযের সময় সওয়ারী থেকে নেমে ক্বিবলাহ-মুখ হয়ে নামায পড়তেন। *(বুঃ, আঃ, সিসানঃ ৭৫পৃঃ)*

নামাযের নিয়ত

যে কোনও আমলের জন্য নিয়ত জরুরী। নিয়ত ছাড়া কোন ইবাদত বা আমল শুদ্ধ হয় না। মহানবী ﷺ বলেন, “আমলসমূহ তো নিয়তের উপরেই নির্ভরশীল।” *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১নং)*

ইমাম নওবী (রঃ) বলেন, নিয়ত বলে মনের সংকল্পকে। (যার স্থূল হল হৃদয় ও মস্তিষ্ক।) সুতরাং নামাযী নির্দিষ্ট নামাযকে তার মন-মস্তিষ্কে উপস্থিত করবে। যেমন যোহর, ফরয ইত্যাদি নামাযের প্রকার ও গুণ মনে মনে স্থির করবে। অতঃপর প্রথম তকবীরের সাথে সাথে (মন-মস্তিষ্কে উপস্থিতকৃত কর্ম করার) সংকল্প করবে। *(রওযাতুত ত্বালেবীন ১/২২৪, সিসানঃ ৮৫পৃঃ)*

এই সংকল্প করার জন্য নির্দিষ্ট কোন শব্দ শরীয়তে বর্ণিত হয় নি। আরবীতে বাঁধা মনগড়া নিয়ত বা নিজ ভাষায় কোন নির্দিষ্ট শব্দাবলী দ্বারা রচিত নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা বা আওড়ানো বিদআত। *(ফিক্হ ১/৩১৪, ৩১৫)* সুতরাং নিয়ত করা জরুরী, কিন্তু পড়া বিদআত।

ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন, নবী ﷺ যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। এর পূর্বে তিনি কিছু বলতেন না এবং মোটেই নিয়ত মুখে উচ্চারণ করতেন না। তিনি এ কথাও বলতেন না যে, (নাওয়াইতু আন) 'উসাল্লী লিল্লাহি সালাতান---, আল্লাহর উদ্দেশ্যে অমুক নামায, কেবলাহ মুখে, চার রাকআত, ইমাম বা মুক্তাদী হয়ে পড়ছি।' আর না তিনি আদায়, কাযা বা বর্তমান ফরযের কথা উল্লেখ করতেন। উক্ত ১০ প্রকার বিদআতগুলির কোন একটি শব্দও তাঁর নিকট হতে কেউই বর্ণনা করেন নি; না সহীহ সনদ দ্বারা, না যয়ীফ দ্বারা, না মুসনাদ রূপে, আর না-ই মুরসাল রূপে। বরং তাঁর কোন সাহাবী হতেও ঐ নিয়তের কথা বর্ণিত হয় নি। কোন তাবেয়ীও তা বলা উত্তম মনে করেন নি, আর না-ই চার ইমামের কেউ---। *(যাদুল মাআদ ১/২০১)*

তিনি অন্যত্র বলেন, নিয়ত কোন বিষয়ের উপর মনের ইচ্ছা ও সংকল্পকে বলে; যার স্থান হল অন্তর। মুখের সাথে এর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। এ জন্যই নবী ﷺ হতে, আর না তাঁর কোন সাহাবী হতে কোন প্রকার (নিয়তের) একটিও শব্দ বর্ণিত হয় নি এবং আমরা তাঁদের নিকট হতে এর কোন উল্লেখও শুনি নি। পরন্তু ঐ সমস্ত শব্দাবলী যা পবিত্রতা (ওযু-গোসল) ও নামায শুরু করার সময় (নিয়ত করার জন্য) রচনা করা হয়েছে, তা শয়তান খুঁতে লোকদের জন্য প্রতিযোগিতার ময়দানরূপে সৃষ্টি করেছে। যেখানে সে তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখে, তাতে তাদেরকে কষ্টও দিয়ে থাকে এবং তা সহীহ-করণের পশ্চাতে তাদেরকে আপতিত করে রাখে। আপনি তাদের কাউকে দেখবেন, সে ঐ নিয়তকে মুখে বারবার আওড়াচ্ছে এবং তা উচ্চারণ করার জন্য নিজে কত কষ্ট স্বীকার করছে, অথচ তা নামাযের কোন কিছুই নয়। পক্ষান্তরে নিয়ত হল কোন কাজ করার জন্য সংকল্প করার নাম মাত্র---। *(ইগাসাতুল লাহফান ১/ ১৫৮)*

আবার বাস্তব এই যে, নিয়তের এত এত শব্দ-সম্ভার দেখে অনেকে নামায শিখতেও ভয় পায়। মুখস্থ করলেও অনেকের ঐ অনর্থক বিষয়ে সময় ব্যয় করা হয় মাত্র। পক্ষান্তরে সূরা মুখস্থ করে ৩টি কি ৪টি! তাছাড়া বহু সাধারণ মানুষের নিকটেই নিয়তের শব্দাবলীতে তালগোল খেয়ে যায়। অনেকে তার অর্থই বোঝে না। অথচ অর্থ না বুঝলে নিয়ত অর্থহীন। সুতরাং যা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ নয় তার পিছনে আমরা খামাখা ছুটব কেন?

নিয়তে পরিবর্তন

নামায পড়তে পড়তে যদি নিয়ত পরিবর্তনের দরকার হয়, তাহলে সীমাবদ্ধ কয়েকটি নামাযে তা করা যাবে। যেমন;

ফরয পড়তে পড়তে কারো প্রয়োজন হল তা নফল গণ্য করবে। এরূপ বড়র নিয়ত করে ছোটতে পরিবর্তন করতে পারে। তবে এর জন্য শর্ত এই যে, পরে যেন ঐ ফরয পড়ার মত

সময় অবশিষ্ট থাকে।

অনুরূপ নির্দিষ্ট সুন্নত (মুআক্কাদাহ) পড়তে পড়তে যদি কেউ তা সাধারণ নফল গণ্য করতে চায় তাও শুদ্ধ হবে।

পক্ষান্তরে এক ফরয পড়তে পড়তে অন্য ফরযের নিয়ত করা (যেমন, আসর পড়তে পড়তে মনে পড়ল যোহর কাযা আছে, সুতরাং তখনই যোহরের নিয়ত করে ঐ নামাযটাকে যোহরের ধরে নেওয়া) শুদ্ধ হবে না। উভয় নামাযই বাতিল গণ্য হবে।

তদনুরূপ সাধারণ নফল পড়তে পড়তে কোন নির্দিষ্ট সুন্নত বা নফল গণ্য করাও শুদ্ধ হবে না। যেমন কোন নির্দিষ্ট সুন্নত পড়তে পড়তে অন্য কোন নির্দিষ্ট সুন্নতের (যেমন এশার সুন্নত পড়তে পড়তে বিতরের) নিয়ত করা শুদ্ধ নয়। কারণ, শুরু থেকে নির্দিষ্ট নামাযের নিয়ত না হলে পূর্ণ নামায শুদ্ধ হয় না। *(মুমঃ ২/২৯৫-২৯৮, ফউঃ ১/৪১৬)*

তদ্রূপ ২ রাকআত সুন্নত পড়তে পড়তে ৪ বা ৪ রাকআত পড়তে পড়তে ২ রাকআত সুন্নতের নিয়ত শুদ্ধ নয়।

বলা বাহুল্য, তারাবীহর নামাযে ভুলে তৃতীয় রাকআতে উঠে গেলে মনে পড়ার সাথে সাথে বসে গিয়ে নামায পূর্ণ করে সহু সিজদাহ করতে হবে। নচেৎ ৪ রাকআতের নিয়ত করে নামায পড়লে তা বাতিল গণ্য হবে। *(মুমঃ ৪/১০৯-১১০)*

কিয়াম

আল্লাহর রসূল ফরয ও সুন্নত নামায দাঁড়িয়েই পড়তেন। মহান আল্লাহ বলেন, □

﴿ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطى وَقُوْمُوْا للهِ قَانِتِيْنَ﴾

অর্থাৎ, তোমরা নামাযসমূহের প্রতি এবং বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাযের প্রতি যত্নবান হও। আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দন্ডায়মান হও। *(কুঃ ২/২৩৮)*

অবশ্য অসুস্থ বা অক্ষম হলে বসে এবং মুসাফির হলে সওয়ারীর উপর বসে নামায পড়েছেন।

ইমরান বিন হুসাইন ﵁ বলেন, আমার অর্শ রোগ ছিল। আমি (কিভাবে নামায পড়ব তা) আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়। না পারলে বসে পড়। তাও না পারলে পার্শ্বদেশে শুয়ে পড়।" *(বুঃ, আদাঃ, আঃ, মিঃ ১২৪৮ নং)*

সুতরাং সক্ষম হলে ফরয নামাযে কিয়াম (দাঁড়িয়ে পড়া) ফরয। *(মুমঃ ৪/১১২)*

তাকবীরে তাহরীমা

নামাযে দাঁড়িয়ে নবী মুবাশ্‌শির ﷺ 'আল্লা-হু আকবার' বলে নামায শুরু করতেন। (এর পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বা অন্য কিছু বলতেন না।) নামায ভুলকারী সাহাবীকেও এই তকবীর পড়তে আদেশ দিয়েছেন। আর তাকে বলেছেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মানুষেরই নামায পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ঠিক যথার্থরূপে ওযু করেছে। অতঃপর 'আল্লাহু আকবার'

বলেছে।” *(ত্বাবাঃ, সিসানঃ ৮-৬পৃঃ)*

তিনি আরো বলেছেন, “নামাযের চাবিকাঠি হল পবিত্রতা (গোসল-ওযু), (নামাযে প্রবেশ করে পার্থিব কর্ম ও কথাবার্তা ইত্যাদি) হারাম করার শব্দ হল তকবীর। আর (নামায শেষ করে সে সব) হালাল করার শব্দ হল সালাম।” *(আদাঃ, তিঃ, হাঃ, ইগঃ ৩০১নং)*

এই তকবীরও নামাযে ফরয। ‘আল্লাহু আকবার’ ছাড়া অন্য শব্দে (যেমন আল্লাহ আজাল্ল, আল্লাহু আ’যাম প্রভৃতি সমার্থবোধক) তকবীর বৈধ ও যথেষ্ট নয়। *(মুমঃ ৩/২৬)*

ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন, ‘তাহরীমার সময় তাঁর অভ্যাস ছিল, ‘আল্লাহু আকবার’ শব্দ বলা। অন্য কোন শব্দ নয়। আর তাঁর নিকট হতে কেউই এই শব্দ ছাড়া অন্য শব্দে তকবীর বর্ণনা করেন নি।’ *(যাদুল মাআদ ১/২০১-২০২)*

তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় (একটু আগে, সাথে সাথে বা একটু পরে) মহানবী ﷺ তাঁর নিজ হাত দু’টিকে কাঁধ বরাবর তুলতেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৭৯৩নং)* আর কখনো কখনো কানের ঊর্ধ্বাংশ বরাবরও ‘রফয়ে য়্যাদাইন’ করতেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৭৯৫নং)* হাত তোলার সময় তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো লম্বা (সোজা) হয়ে থাকত। (জড়সড় হয়ে থাকত না)। আর আঙ্গুলগুলোর মাঝে (খুব বেশী) ফাঁক করতেন না, আবার এক অপরের সাথে মিলিয়েও রাখতেন না। *(আদাঃ, ইখুঃ ৪৫৯নং, হাঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, ‘রফয়ে য়্যাদাইন’ করার সময় কানের লতি স্পর্শ করা বিধেয় নয়। যেমন এই সময় মাথা তুলে উপর দিকে তাকানোও অবিধেয়। *(মবঃ ২৩/৯৫)* তদনুরূপ হাত তোলার পর নিচে ঝুলিয়ে দিয়ে তারপর হাত বাঁধাও ভিত্তিহীন। *(মুমঃ ৩/৪৩)* যেমন তকবীরের পূর্বে নামায শুরু করার সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলা বিদআত। *(ঐ ১/১৩৩)*

হস্ত-বন্ধন

এরপর নবী মুবাশ্শির ﷺ তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতেন। *(মুঃ, আদাঃ ইগঃ ৩৫২নং)* আর তিনি বলতেন, “আমরা আম্বিয়ার দল শীঘ্র ইফতারী করতে, দেরী করে সেহরী খেতে এবং নামাযে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতে আদিষ্ট হয়েছি।” *(ত্বাবাঃ, মাযাঃ ২/১০৫)*

একদা তিনি নামাযে রত এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে পার হতে গিয়ে দেখলেন, সে তার বাম হাতকে ডান হাতের উপর রেখেছে। তিনি তার হাত ছাড়িয়ে ডান হাতকে বাম হাতের উপর চাপিয়ে দিলেন। *(আঃ ৩/৩৮১, আদাঃ ৭৫৫নং)*

সাহ্ল বিন সা’দ رضي الله عنه বলেন, লোকেরা আদিষ্ট হত, তারা যেন নামাযে তাদের ডান হাতকে বাম প্রকোষ্ঠ (হাতের রলার) উপর রাখে। *(বুঃ ৭৪০নং)*

ওয়াইল বিন হুজর رضي الله عنه বলেন, তিনি ডান হাতকে বাম হাতের চেটোর পিঠ, কব্জি ও প্রকোষ্ঠের উপর রাখতেন। *(আদাঃ ৭২৭ নং, নাঃ, ইখুঃ, ইহিঃ)*

কখনো বা ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে ধারণ করতেন। *(আদাঃ ৭২৬নং, নাঃ, তিঃ ২৫২, দারাঃ)*

আল্লামা আলবানী বলেন, উক্ত হাদীস এই কথার দলীল যে, সুন্নত হল ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধারণ করা। আর পূর্বের হাদীস প্রমাণ করে যে, ডান হাত বাম হাতের উপর (ধারণ না করে) রাখা সুন্নত। সুতরাং উভয় প্রকার আমলই সুন্নত। পক্ষান্তরে একই সঙ্গে প্রকোষ্ঠের উপর রাখা এবং ধারণ করা -যা কিছু পরবর্তী হানাফী উলামাগণ উত্তম মনে করেছেন তা বিদআত। ওঁদের উল্লেখ মতে তার পদ্ধতি হল এই যে, ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখবে, কড়ে ও বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের প্রকোষ্ঠ (রলা)কে ধারণ করবে। আর বাকী তিনটি আঙ্গুল তার উপর বিছিয়ে দেবে। *(হাশিয়া ইবনে আবেদীন ১/৪৫৪)* সুতরাং উক্ত পরবর্তীগণের কথায় আপনি ধোকা খাবেন না। *(সিসানঃ ৮৮-পৃঃ, ৩নং টীকা)*

পক্ষান্তরে উভয় হাদীসের উপর আমল করতে হলে কখনো না ধরে রাখতে হবে এবং কখনো ধারণ করতে হবে। যেহেতু একই সঙ্গে ঐ পদ্ধতি হাদীসে বর্ণিত হয় নি।

প্রকাশ থাকে যে, ডান হাত দ্বারা বাম হাতের বাজু ধরারও কোন ভিত্তি নেই। *(মুমঃ ৩/৪৫)*

হাত রাখার জায়গা

এরপর মহানবী ﷺ উভয় হাতকে বুকের উপর রাখতেন। *(আদাঃ ৭৫৯ নং, ইখুঃ ৪৭৯ নং, আঃ, আবুশ শায়খ প্রমুখ)*

প্রকোষ্ঠের উপর প্রকোষ্ঠ রাখার আদেশ একথাও প্রমাণ করে যে, হাত বুকের উপরেই বাঁধা হবে। নচেৎ তার নিচে ঐভাবে রাখা সম্ভব নয়। মুহাদ্দিস আলবানী (রঃ) বলেন, বুকের উপরেই হাত বাঁধা সুন্নাহতে প্রমাণিত। আর এর অন্যথা হয় যয়ীফ, না হয় ভিত্তিহীন। *(সিসানঃ ৮৮-পৃঃ)*

বুকে রয়েছে হৃদয়। যার উপর হাত রাখলে অনন্ত প্রশান্তি, একান্ত বিনয় ও নিতান্ত আদব অভিব্যক্ত হয়।

ইস্তিফ্‌তাহর দুআ

নবী মুবাশ্‌শির ﷺ নামাযে তাঁর দৃষ্টি অবনত করে সিজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখতেন। *(বাঃ, হাঃ, ইগঃ ৩৫৪ নং)* নামাযের প্রারম্ভে তিনি বিভিন্ন রূপে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করতেন এবং প্রার্থনা করতেন। পরন্তু নামায ভুলকারী সাহাবীকেও তিনি বলেছিলেন, “কোন ব্যক্তিরই নামায ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তকবীর দিয়েছে, আল্লাহ আয্যা অজাল্লার প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করেছে এবং যথাসম্ভব কুরআন পাঠ করেছে।” *(আদাঃ ৮৫৭ নং, হাঃ)*

এই অবস্থায় তিনি বিভিন্ন সময় ও নামাযে বিভিন্ন দুআ পড়েছেন। যার কিছু নিম্নরূপঃ-

১। হযরত আবূ হুরাইরা رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন নামাযে (তাহরীমার)

তকবীর দিতেন, তখন ক্বিরাআত শুরু করার পূর্বে কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আপনি তকবীর ও ক্বিরাআতের মাঝে চুপ থেকে কি পড়েন আমাকে বলে দিন।' তিনি বললেন, "আমি বলি,

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বা-ইদ বাইনী অ বাইনা খাত্বা-য়্যা-য়্যা কামা বা-আত্তা বাইনাল মাশরিক্বি অল মাগরিব, আল্লা-হুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাত্বা-য়্যা, কামা য়্যুনাক্কাষ ষাওবুল আবয়্যাযু মিনাদ্ দানাস, আল্লাহু-ম্মাগ্‌সিল খাত্বা-য়্যা-য়্যা বিল মা-য়ি অষ্‌ষালজি অল্‌বারাদ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার মাঝে ও আমার গোনাহসমূহের মাঝে এতটা ব্যবধান রাখ যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে ব্যবধান রেখেছ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গোনাহসমূহ থেকে পরিষ্কার করে দাও যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহকে পানি, বরফ ও করকি দ্বারা ধৌত করে দাও।" *(বুঃ ৭৪৪, মুঃ ৫৯৮, আদাঃ ৭৮১, নাঃ, দাঃ, আআঃ ২/৯৮, ইমাঃ ৮০৫, আঃ ২/২৩১, ৪৯৪, ইআশাঃ ২৯১৯৯ নং)*

লক্ষ্যণীয় যে, উক্ত দুআটি তিনি ফরয নামাযে বলতেন। *(সিসানঃ ৯১পৃঃ)*

২। আবূ সাঈদ ও আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ নামাযের শুরুতে এই দুআ পাঠ করতেন,

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالى جَدُّكَ وَلاَ إِلهَ غَيْرُكَ.

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা অবিহামদিকা অতাবা-রাকাসমুকা অতাআ'-লা জাদ্দুকা অ লা ইলা-হা গায়রুক্।

অর্থঃ- তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার নাম অতি বর্কতময়, তোমার মাহাত্ম্য অতি উচ্চ এবং তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। *(আদাঃ ৭৭৬, তিঃ, ইমাঃ ৮০৬, ত্বাহাবী ১/১১৭, দারাঃ ১১৩, বাঃ ২/৩৪, হাঃ ১/২৩৫, নাঃ, দাঃ, ইআশাঃ)*

মহানবী ﷺ বলেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কথা হল বান্দার 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা---' বলা।" *(তাওহীদ, ইবনে মান্দাহ, নাঃ, সিসঃ ২৯৩৯ নং)*

৩। মহানবী ফরযে ও নফলে তাকবীরে তাহরীমার পর বলতেন,

﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيْفاً وَّمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّيْ وَ أَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ جَمِيْعاً إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ

إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِيْ لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِيْ لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيْ مَنْ هَدَيْتَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، لاَ مَنْجَا وَلاَ مَلْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণঃ- ﴿অজ্‌জাহ্‌তু অজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস্‌ সামা-ওয়া-তি অল্‌আরয্বা হানীফাঁউ অমা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালা-তী অনুসুকী অমাহয়্যা-য়্যা অমামা-তী লিল্লা-হি রাব্বিল আ'-লামীন। লা শারীকা লাহু অবিযা-লিকা উমিরতু অআনা আওয়ালুল মুসলিমীন।﴾ আল্লা-হুম্মা আন্তাল মালিকু লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত্। সুবহা-নাকা অবিহামদিকা আন্তা রাব্বী অ আনা আব্দুক। যালামতু নাফসী অ'তারাফতু বিযামবী, ফাগফিরলী যামবী জামীআন ইন্নাহু লা য়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্ত্। অহদিনী লিআহসানিল আখলা-ক্বি লা য়্যাহদী লিআহসিনহা ইল্লা আন্ত্। অস্বরিফ আন্নী সাইয়্যিআহা লা য়্যাস্বরিফু আন্নী সাইয়্যিআহা ইল্লা আন্ত্। লাব্বাইকা অ সা'দাইক, অলখায়রু কুল্লুহু ফী য়্যাদাইক। অশ্‌শার্রু লাইসা ইলাইক, অল-মাহদীয়্যু মান হাদাইত, আনা বিকা অ ইলাইক। লা মানজা অলা মালজাআ মিনকা ইল্লা ইলাইক, তাবা-রাকতা অতাআ'-লাইত, আস্তাগ্‌ফিরুকা অ আতূবু ইলাইক্।

অর্থঃ- আমি একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর প্রতি মুখ ফিরিয়েছি যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যই। তাঁর কোন অংশী নেই। আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের প্রথম। হে আল্লাহ! তুমিই বাদশাহ তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। তুমি আমার প্রভু ও আমি তোমার দাস। আমি নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার অপরাধ স্বীকার করেছি। সুতরাং তুমি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করে দাও, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি আমাকে পথ দেখাও, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ সুন্দরতম চরিত্রের প্রতি পথ দেখাতে পারে না। মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট হতে দূরে রাখ, যেহেতু তুমি ছাড়া অন্য কেউ মন্দ চরিত্রকে আমার নিকট থেকে দূর করতে পারে না। আমি তোমার আনুগত্যে হাজির এবং তোমার আজ্ঞা মানতে প্রস্তুত। যাবতীয় কল্যাণ তোমার হাতে এবং মন্দের সম্পর্ক তোমার প্রতি নয়। আমি তোমার অনুগ্রহে আছি এবং তোমারই প্রতি আমার প্রত্যাবর্তন। তুমি বরকতময় ও মহিমময়, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি। *(মুঃ ৭৭১, আআঃ, আদাঃ, নাঃ, ইহিঃ আঃ, শাফেয়ী, ত্বাবাঃ)*

৪- **اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْراً، اَلْحَمْدُ للهِ كَثِيْراً، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হু আকবারু কাবীরা, অলহামদু লিল্লা-হি কাসীরা, অ সুবহা-নাল্লা-হি

বুকরাতাঁউ অ আস্বীলা।

অর্থঃ- আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহর অনেক অনেক প্রশংসা, আমি সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি।

এই দুআটি দিয়ে নফল নামায শুরু করতে হয়। জনৈক সাহাবী এই দুআ দিয়ে নামায শুরু করলে মহানবী ﷺ বললেন, "এই দুআর জন্য আমি বিস্মিত হয়েছি। কারণ ওর জন্য আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হল।"

ইবনে উমার ؓ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট ঐ কথা শোনার পর থেকে আমি কোন দিন ঐ দুআ পড়তে ছাড়ি নি। *(মুঃ ৬০১, আআঃ, তিঃ)*

আবূ নুআইম 'আখবারু আসবাহান' গ্রন্থে *(১/২১০)* জুবাইর বিন মুত্বইম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নবী ﷺ কে উক্ত দুআ নফল নামাযে পড়তে শুনেছেন।

৫। হযরত আনাস ؓ বলেন, 'এক ব্যক্তি হাঁপাতে হাঁপাতে কাতারে শামিল হয়ে বলল,

اَلْحَمْدُ للهِ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُّبَارَكاً فِيْهِ.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হি হাম্‌দান কাসীরান ত্বাইয়্যিবাম মুবা-রাকান ফীহ।

অর্থঃ- আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা; যে প্রশংসা অজস্র, পবিত্র ও প্রাচুর্যময়।

আল্লাহর রসূল ﷺ নামায শেষ করার পর বললেন, "তোমাদের মধ্যে কে ঐ দুআ পাঠ করেছে?" লোকেরা সকলে চুপ থাকল। পুনরায় তিনি বললেন, "কে বলেছে ঐ দুআ? যে বলেছে, সে মন্দ বলে নি।" উক্ত ব্যক্তি বলল, 'আমিই হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলে ফেলেছি।' তিনি বললেন, "আমি ১২ জন ফিরিশ্তাকে দেখলাম, তাঁরা ঐ দুআ (আল্লাহর দরবারে) উপস্থিত করার জন্য প্রতিযোগিতা করছে!" *(মুঃ ৬০০, আআঃ)*

৬। তিনি তাহাজ্জুদের নামাযের শুরুতে পড়তেন,

اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اَللّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، أَنْتَ رَبُّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ، فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ أَنْتَ إِلهِيْ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা লাকাল হামদু আন্তা নূরুস সামা-ওয়া-তি অলআরয্বি অমান ফীহিন্ন। অলাকাল হামদু আন্তা কাইয়্যিমুস সামা-ওয়া-তি অলআরয্বি অমান ফীহিন্ন। অলাকাল হামদু আন্তা মালিকুস সামা-ওয়া-তি অলআরয্বি অমান ফীহিন্ন। অলাকাল হামদু আন্তাল হাক্ব, অওয়া'দুকাল হাক্ব, অক্বাওলুকাল হাক্ব, অলিক্বা-উকা হাক্ব, অলজান্নাতু হাক্ব,

অন্না-রু হাক্ক, অস্‌সা-আতু হাক্ক, অন্নাবিয়্যূনা হাক্ক, অমুহাম্মাদুন হাক্ক। আল্লা-হুম্মা লাকা আসলামতু অআলাইকা তাওয়াক্কালতু অবিকা আ-মানতু অইলাইকা আনাবতু, অবিকা খা-সামতু অইলাইকা হা-কামতু আন্তা রাব্বুনা অইলাইকাল মাসীর। ফাগ্‌ফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্‌খারতু অমা আসরারতু অমা আ'লানতু অমা আন্তা আ'লামু বিহী মিন্নী। আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অআন্তাল মুআখ্‌খিরু আন্তা ইলা-হী, লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা অলা হাওলা অলা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা। তুমি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর জ্যোতি। তোমারই সমস্ত প্রশংসা, তুমি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর নিয়ন্তা, তোমারই সমস্ত প্রশংসা। তুমি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর অধিপতি। তোমারই সমস্ত প্রশংসা, তুমিই সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতিই সত্য, তোমার কথাই সত্য, তোমার সাক্ষাৎ সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মদ (ﷺ) সত্য। হে আল্লাহ! আমি তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার উপরেই ভরসা করেছি, তোমার উপরেই ঈমান (বিশ্বাস) রেখেছি, তোমার দিকে অভিমুখী হয়েছি, তোমারই সাহায্যে বিতর্ক করেছি, তোমারই নিকট বিচার নিয়ে গেছি। তুমি আমাদের প্রতিপালক, তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তনস্থল। অতএব তুমি আমার পূর্বের, পরের, গুপ্ত, প্রকাশ্য এবং যা তুমি অধিক জান সে সব পাপকে মাফ করে দাও। তুমিই প্রথম, তুমিই শেষ। তুমি আমার উপাস্য, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং তোমার তওফীক ছাড়া পাপ থেকে ফিরার ও সৎকাজ (নড়া-সরা) করার সাধ্য নেই। *(বুঃ, মুঃ, আআঃ, আদাঃ, দাঃ, মিঃ ১২১১ নং)*

নিম্নোক্ত দুআগুলিও তিনি তাহাজ্জুদের নামাযের শুরুতে পাঠ করতেনঃ-

৭। 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা---' (২নং দুআ) পড়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ৩ বার, এবং 'আল্লাহু আক্‌বারু কাবীরা' ৩ বার। *(আদাঃ, ৭৭৫ নং, ত্বাহাঃ, সিসানঃ ৯৪পৃঃ)*

৮। اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَآئِيْلَ وَ مِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَآفِيْلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা রাব্বা জিবরা-ঈলা অমীকা-ঈলা অ ইসরা-ফীল। ফা-তিরাস সামা-ওয়া-তি অলআরয্‌, আ-লিমাল গায়বি অশ্‌শাহা-দাহ। আন্তা তাহকুমু বাইনা ইবাদিকা ফীমা কা-নূ ফীহি য়্যাখতালিফূন। ইহদিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্কি বিইযনিক, ইন্নাকা তাহদী মান তাশা-উ ইলা স্বিরা-ত্বিম মুসতাক্বীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু! হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃজনকর্তা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তুমি তোমার বান্দাদের মাঝে মীমাংসা কর যে বিষয়ে ওরা মতভেদ করে। যে বিষয়ে মতভেদ করা হয়েছে সে বিষয়ে তুমি আমাকে

তোমার অনুগ্রহে সত্যের পথ দেখাও। নিশ্চয় তুমি যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখিয়ে থাক। *(মুঃ, আআঃ, আদাঃ ৭৬৭, মিঃ ১২১২ নং)*

৯। 'আল্লাহু আকবার' ১০বার, 'আলহামদু লিল্লা-হ' ১০বার, 'সুবহা-নাল্লাহ' ১০বার, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ১০বার, 'আস্তাগফিরুল্লাহ' ১০বার, 'আল্লা-হুম্মাগফির লী অহদিনী অরযুক্বনী অআ-ফিনী' (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, হেদায়াত কর, রুজি ও নিরাপত্তা দাও) ১০ বার, এবং 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনায্‌য্বাইক্বি ইয়াউমাল হিসাব' (অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি হিসাবের দিনে সংকীর্ণতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি) ১০ বার। *(আঃ, ইআশাঃ, আদাঃ ৭৬৬ নং, ত্বাবঃ আউসাত্ব ২/৬২)*

১০। 'আল্লাহু আকবার' ৩ বার। অতঃপর,

ذُو الْمَلَكُوْتِ وَالْجَبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

উচ্চারণ- যুল মালাকূতি অলজাবারূতি অলকিবরিয়া-য়ি, অলআযামাহ।

অর্থ- (আল্লাহ) সার্বভৌমত্ব, প্রবলতা, গর্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী। *(আদাঃ ৮৭৪ নং)*

ক্বিরাআত শুরু করার পূর্বে ইস্তিআযাহ

উপরোক্ত একটি দুআ পড়ার পর নবী মুবাশ্‌শির ﷺ ক্বিরাআত শুরু করার জন্য শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, বলতেন,

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

উচ্চারণঃ- আঊযু বিল্লা-হি মিনাশ্‌ শাইত্বা-নির রাজীম, মিন হামযিহী অনাফখিহী অনাফষিহ।

আবার কখনো বলতেন,

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

উচ্চারণ- আঊযু বিল্লা-হিস সামীইল আলীম, মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম, মিন হামযিহী অনাফখিহী অনাফষিহ।

অর্থ- আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে তার প্ররোচনা ও ফুৎকার হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আদাঃ ৭৭৫, দারাঃ, তিঃ, হাঃ, ইআশাঃ, ইহিঃ, ইগঃ ৩৪২নং)*

'বিসমিল্লাহ' পাঠ

এরপর নবী মুবাশ্‌শির ﷺ (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) 'বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম' (অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।) পাঠ করতেন। এটিকে তিনি নিঃশব্দেই পড়তেন। এ ছাড়া সশব্দে 'বিসমিল্লাহ' পড়ার ব্যাপারে কোন স্পষ্ট ও

সহীহ হাদীস নেই। *(তামিঃ ১৯৬পৃঃ)*

আনাস ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ, আবূ বকর ও উমার ﷺ এর সাথে নামায পড়েছি। তাঁরা সকলেই 'আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল আ-লামীন' বলে ক্বিরাআত শুরু করতেন। *(বুঃ ৭৪৩, আদাঃ ৭৮২, তিঃ ২৪৬, নাঃ ৮৬৭ নং প্রমুখ)* অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, তাঁরা ক্বিরাআতের শুরুতে বা শেষেও 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উল্লেখ করতেন না। আর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, তাঁদের কাউকেই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলতে শুনি নি। *(মুঃ ৩৯৯, সনাঃ ৮৭০, ৮৭১নং, ইহিঃ)*

সূরা ফাতিহা পাঠ

অতঃপর মহানবী ﷺ জেহরী (মাগরিব, এশা, ফজর, জুমআহ, তারাবীহ, ঈদ প্রভৃতি) নামাযে সশব্দে ও সিরী (যোহর, আসর, সুন্নত প্রভৃতি) নামাযে নিঃশব্দে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন,

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلرَّحْمنِ الرَّحِيْم، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْن، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْن، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْم، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْن﴾.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল আ'-লামীন। আররাহমা-নির রাহীম। মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন। ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্তাঈন। ইহ্‌দিনাস্‌ স্বিরা-ত্বাল মুস্তাক্বীম। স্বিরা-ত্বাল্লাযীনা আন্‌আ'মতা আলাইহিম। গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায্‌ যা-ল্লীন।

অর্থঃ- সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও; তাদের পথ -যাদেরকে তুমি পুরস্কার দান করেছ। তাদের পথ নয় -যারা ক্রোধভাজন (ইয়াহুদী) এবং যারা পথভ্রষ্ট (খ্রিষ্টান)।

এই সূরা তিনি থেমে থেমে পড়তেন; 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে থামতেন। অতঃপর 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'-লামীন' বলে থামতেন। আর অনুরূপ প্রত্যেক আয়াত শেষে থেমে থেমে পড়তেন। *(আদাঃ, হাঃ, ইগঃ ৩৪৩নং)*

সুতরাং একই সাথে কয়েকটি আয়াতকে জড়িয়ে পড়া সুন্নতের পরিপন্থী আমল। পরস্পর কয়েকটি আয়াত অর্থে সম্পৃক্ত হলেও প্রত্যেক আয়াতের শেষে থেমে পড়াই মুস্তাহাব। *(সিসানঃ ৯৬পৃঃ)*

নামাযে সূরা ফাতিহার গুরুত্ব

মহানবী ﷺ বলতেন,

"সেই ব্যক্তির নামায হয় না, যে ব্যক্তি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।" *(বুঃ, মুঃ, আআঃ, বাঃ, ইগঃ ৩০২নং)*

"সেই ব্যক্তির নামায যথেষ্ট নয়, যে তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।" *(দারাঃ, ইহিঃ, ইগঃ ৩০২নং)*

"যে ব্যক্তি এমন কোনও নামায পড়ে, যাতে সে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার ঐ নামায (গর্ভচ্যুত ভ্রূণের ন্যায়) অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ।" *(মুঃ, আআঃ, মিঃ ৮২৩নং)*

"আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি নামায (সূরা ফাতিহা)কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' সুতরাং বান্দা যখন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'আররাহমা-নির রাহীম।' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল।' আবার বান্দা যখন বলে, 'মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল।' বান্দা যখন বলে, 'ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্তাঈন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'ইহদিনাস স্বিরা-ত্বাল মুস্তাকীম। স্বিরা-ত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম অলায্ যা-ল্লীন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এ সব কিছু আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চায়, তাই পাবে।" *(মুঃ ৩৯৫, আদাঃ, তিঃ, আআঃ, প্রমুখ, মিঃ ৮২৩নং)*

"উম্মুল কুরআন (কুরআনের জননী সূরা ফাতিহা) এর মত আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ তাওরাতে এবং ইঞ্জিলে কোন কিছুই অবতীর্ণ করেন নি। এই (সূরাই) হল (নামাযে প্রত্যেক রাকআতে) পঠিত ৭টি আয়াত এবং মহা কুরআন, যা আমাকে দান করা হয়েছে।" *(নাঃ, হাঃ, তিঃ, মিঃ ২১৪২ নং)*

নামায ভুলকারী সাহাবীকে মহানবী ﷺ এই সূরা তার নামাযে পাঠ করতে আদেশ দিয়েছিলেন। *(বুঃ জুযউল ক্বিরাআহ, সিসানঃ ৯৮পৃঃ)* অতএব নামাযে এ সূরা পাঠ করা ফরয এবং তা নামাযের একটি রুক্ন।

'দ্বা-ল্লীন' না 'যা-ল্লীন'

সূরা ফাতিহা পাঠের সময় যদি কেউ তার একটি হরফের উচ্চারণ অন্য হরফের মত করে পড়ে, তাহলে এই মহা রুক্ন আদায় সহীহ হবে না। ঐ হরফ (আয়াত)কে পুনঃ শুদ্ধ করে পড়া জরুরী। যেমন যদি কেউ ع কে أ , ح কে هـ , ط কে ت পড়ে তাহলে তার ফাতিহা শুদ্ধ হবে না। (অনুরূপ যে কোন সূরাই।)

আরবী বর্ণমালার সবচেয়ে কঠিনতম উচ্চারিতব্য অক্ষর হল ض। এরও বাংলায় কোন সম-উচ্চারণবোধক অক্ষর নেই। যার জন্য এক শ্রেণীর লেখক এর উচ্চারণ করতে 'য'

লিখেন এবং অন্য শ্রেণীর লেখক লিখে থাকেন 'দ' বা 'দ্ব'। অথচ উভয় উচ্চারণই ভুল। পক্ষান্তরে যাঁরা 'জ'-এর উচ্চারণ করেন, তাঁরাও ভুল করেন। অবশ্য স্পষ্ট 'দ'-এর উচ্চারণ আরো মারাত্মক ভুল।

আসলে ضএর উচ্চারণ হয় জিভের কিনারা (ডগা নয়) এবং উপরের মাড়ির (পেষক) দাঁতের স্পর্শে। যা 'য' ও 'দ'-এর মধ্যবর্তী উচ্চারণ। অবশ্য 'য' বা ظ এর মত উচ্চারণ সঠিকতার অনেক কাছাকাছি। পক্ষান্তরে 'দ'-এর উচ্চারণ জিভের উপরি অংশ ও সামনের দাঁতের মাড়ির গোড়ার স্পর্শে হয়ে থাকে। সুতরাং ضএর উক্ত উচ্চারণ করা নেহাতই ভুল। *(দেখুন মুমঃ ৩/৯১-৯৪)*

ضএর উচ্চারণ ظ বা 'য'-এর কাছাকাছি হওয়ার আরো একটি দলীল এই যে, আরবের লোক শ্রুতিলিখনের সময় শব্দের ض অক্ষরকে ظ লিখে এবং কখনো বা ظ অক্ষরের ক্ষেত্রে ض লিখে ভুল করে থাকেন। আর এ কথা পত্র-পত্রিকা এবং বহু বই-পুস্তকেও আরবী পাঠকের নজরে পড়ে।

সুতরাং আমি মনে করি যে, ض যখন ظ এর জাত ভাই এবং د এর জাত ভাই নয়, তখন তার উচ্চারণ লিখতে 'য' অক্ষর লিখাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্য তার নিচে ছোট 'ব' লাগিয়ে 'য্ব' লিখলে ظ থেকে পার্থক্য নির্বাচন করা সহজ হয়।

'আ-মীন' বলা

সূরা ফাতিহা শেষ করে নবী মুবাশ্শির ﷺ (জেহরী নামাযে) সশব্দে টেনে 'আ-মীন' বলতেন। *(বুঃ জুযউল ক্বিরাআহ, আদাঃ ৯৩২, ৯৩৩নং)*

পরন্তু তিনি মুক্তাদীদেরকে ইমামের 'আমীন' বলা শুরু করার পর 'আমীন' বলতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "ইমাম যখন 'গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায য্বা-ল্লীন' বলবে, তখন তোমরা 'আমীন' বল। কারণ, ফিরিশ্তাবর্গ 'আমীন' বলে থাকেন। আর ইমামও 'আমীন' বলে। (অন্য এক বর্ণনা মতে) ইমাম যখন 'আমীন' বলবে, তখন তোমরাও 'আমীন' বল। কারণ, যার 'আমীন' বলা ফিরিশ্তাবর্গের 'আমীন' বলার সাথে সাথে হয়- (অন্য এক বর্ণনায়) তোমাদের কেউ যখন নামাযে 'আমীন' বলে এবং ফিরিশ্তাবর্গ আকাশে 'আমীন' বলেন, আর পরস্পরের 'আমীন' বলা একই সাথে হয় -তখন তার পূর্বেকার পাপরাশি মাফ করে দেওয়া হয়।" *(দেখুন, বুঃ ৭৮০-৭৮২, ৪৪৭৫, ৬৪০২, মুঃ, আদাঃ ৯৩২-৯৩৩, ৯৩৫-৯৩৬, নাঃ, দাঃ)*

মহানবী ﷺ আরো বলেন, "ইমাম 'গাইরিল মাগযুবি আলাইহিম অলায য্বা-ল্লীন' বললে তোমরা 'আমীন' বল। তাহলে (সূরা ফাতিহায় উল্লেখিত দুআ) আল্লাহ তোমাদের জন্য মঞ্জুর করে নেবেন।" *(ত্বাবাঃ, সতাঃ ৫১৩নং)* বলাই বাহুল্য যে, 'আমীন' এর অর্থ 'কবুল বা

মঞ্জুর কর।'

ইবনে জুরাইজ বলেন, আমি আত্বা-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সূরা ফাতিহা পাঠের পর ইবনে যুবাইর 'আমীন' বলতেন কি?' উত্তরে আত্বা বললেন, 'হ্যাঁ, আর তাঁর পশ্চাতে মুক্তাদীরাও 'আমীন' বলত। এমনকি ('আমীন'-এর গুঞ্জরণে) মসজিদ মুখরিত হয়ে উঠত।' অতঃপর তিনি বললেন, 'আমীন' তো এক প্রকার দুআ। *(আরাঃ ২৬৪০ নং, মুহাল্লা ৩/৩৬৪, বুঃ তা'লীক, ফবাঃ ২/৩০৬)*

আবূ হুরাইরা ﷺ মারওয়ান বিন হাকামের মুআযযিন ছিলেন। তিনি শর্ত লাগালেন যে, 'আমি কাতারে শামিল হয়ে গেছি এ কথা না জানার পূর্বে (ইমাম মারওয়ান) যেন 'অলায যা-ল্লীন' না বলেন।' সুতরাং মারওয়ান 'অলায যা-ল্লীন' বললে আবূ হুরাইরা টেনে 'আমীন' বলতেন। *(বাঃ ২/৫৯, বুঃ তা'লীক, ফবাঃ ২/৩০৬)*

নাফে' বলেন, ইবনে উমার 'আমীন' বলা ত্যাগ করতেন না। তিনি তাঁর মুক্তাদীগণকেও 'আমীন' বলতে উদ্বুদ্ধ করতেন। *(বুঃ তা'লীক, ফবাঃ ২/৩০৬-৩০৭)*

পরের ঐশ্বর্য, উন্নতি বা মঙ্গল দেখে কাতর বা ঈর্ষান্বিত হয়ে সে সবের ধ্বংস কামনার নামই পরশ্রীকাতরতা বা হিংসা। ইয়াহুদ এমন এক জাতি, যে সর্বদা মুসলিমদের মন্দ কামনা করে এবং তাদের প্রত্যেক মঙ্গল ও উন্নতির উপর ধ্বংস-কামনা ও হিংসা করে। কোন উন্নতি ও মঙ্গলের উপর তাদের বড় হিংসা হয়। আবার কোনর উপর ছোট হিংসা। কিন্তু মুসলিমদের সমূহ মঙ্গলের মধ্যে জুমআহ, কিবলাহ, সালাম ও ইমামের পিছনে 'আমীন' বলার উপর ওদের হিংসা সবচেয়ে বড় হিংসা।

মহানবী ﷺ বলেন, "ইয়াহুদ কোন কিছুর উপর তোমাদের অতটা হিংসা করে না, যতটা সালাম ও 'আমীন' বলার উপর করে।" *(ইমাঃ, ইখুঃ, সতাঃ ৫১২নং)*

তিনি আরো বলেন, "ওরা জুমআহ -যা আমরা সঠিকরূপে পেয়েছি, আর ওরা পায় নি, কিবলাহ -যা আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকরূপে দান করেছেন, কিন্তু ওরা এ ব্যাপারেও ভ্রষ্ট ছিল, আর ইমামের পশ্চাতে আমাদের 'আমীন' বলার উপরে যতটা হিংসা করে, ততটা হিংসা আমাদের অন্যান্য বিষয়ের উপর করে না।" *(আঃ, সতাঃ ৫১২নং)*

প্রকাশ যে, 'আমীন' ও 'আ-মীন' উভয় বলাই শুদ্ধ। *(সতাঃ ২৭৮-পৃঃ)* ইমামের 'আমীন' বলতে 'আ-' শুরু করার পর ইমামের সাথেই মুক্তাদীর 'আমীন' বলা উচিত। ইমামের বলার পূর্বে বা পরে বলা ইমামের এক প্রকার বিরুদ্ধাচরণ, যা নিষিদ্ধ। *(মুমঃ ৩/৯৭, সিসঃ ৬/৮১)*

জোরে 'আমীন' না বলার একটি খোঁড়া যুক্তি

ইমামের পশ্চাতে নিঃশব্দে 'আমীন' বলার সমর্থকরা সশব্দে 'আমীন' বলার পিছনে ঝাল ধরানো যুক্তি পেশ করে থাকেন যে, 'সাহাবারা নবীর পিছুতে নামায পড়তে পড়তে পালিয়ে যেতেন! তাই তিনি সকলকে জোরে 'আমীন' বলতে আদেশ করেছিলেন, যাতে তিনি বুঝতে পারেন, তাঁরা পিছুতে মজুদ আছেন!!'

আলগা জিভের এই খোঁড়া যুক্তিতে রয়েছে দুটি অপবাদ; প্রথমতঃ সাহাবাগণের নামাযের

প্রতি অনীহা প্রকাশ তথা নামায ও রসূল ﷺ কে ত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়ার অপবাদ!

দ্বিতীয়তঃ মহানবী ﷺ এর তরবিয়তে ত্রুটি থাকার অপবাদ! অথচ তাঁর তরবিয়ত এমন ছিল যে, সাহাবাগণ তীরবিদ্ধ অবস্থাতেও নামায পড়ে গেছেন। কাতর হয়ে নামায ছেড়ে দেন নি। তাছাড়া আল্লাহর রসূল ﷺ নামাযের মধ্যে নবুঅতের মোহর দ্বারা নিজের পিছনে সাহাবাদের রুকু-সিজদা দেখতে পেতেন। *(বুঃ, মুঃ মিঃ ৮৬৮ নং)* অতএব তাঁরা নামাযে আছেন, না পালিয়ে যাচ্ছেন তা জানার জন্য জোরে 'আমীন' বলাকে ব্যবহার তাঁর কি প্রয়োজন ছিল? আর যদি তাই হয়, তাহলে মাগরেব ও এশার শেষ তৃতীয় ও চতুর্থ রাক্‌আতে এবং যোহর-আসরে কি ব্যবহার করতেন? পরন্তু তিনি স্বয়ং কেন জোরে 'আমীন' বলতেন?

বলাই বাহুল্য যে, এটা হল বক্তার সহীহ সুন্নাহর প্রতি অবজ্ঞা ও অনীহার বহিঃপ্রকাশ। আর এর ফল অবশ্যই ভালো নয়।

'সাক্‌তাহ' বা ক্ষণকাল নীরবতা

সূরা ফাতিহা পাঠের পর একটু সাকতাহ করা বা কিছু না পড়ে বিরতি নেওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সহীহ নয়। *(ইগঃ ৫০৫, যইমাঃ ৮৪৪, ৮৪৫, যআদাঃ ১৬৩/৭৭৭, যতিঃ ৪২, সিযঃ ৫৪৭নং)* সুতরাং অনুরূপ বিরতি এবং বিশেষ করে মুক্তাদীগণকে সূরা ফাতিহা পাঠের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইমামের বিরতি অবিধেয় তথা বিদআত। *(মিঃ ১/২৯৫, ৪নং টীকা, সিযঃ ২/২৬, মুমঃ ৩/১০২)*

ফাতিহার পর অন্য সূরা পাঠ

'আমীন' বলার পর নবী মুবাশ্‌শির ﷺ অন্য একটি সূরা পাঠ করতেন। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, 'আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে যে, আমরা যেন সূরা ফাতিহা এবং সাধ্যমত অন্য সূরা পাঠ করি।' *(আদাঃ ৮১৮নং)*

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে এই ঘোষণা করতে আদেশ করলেন যে, "সূরা ফাতিহা এবং অতিরিক্ত অন্য সূরা পাঠ ছাড়া নামায হবে না।" *(ঐ ৮২০নং)*

প্রত্যেক সূরা পাঠ করার পূর্বে 'বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম' বলা সুন্নত। *(আদাঃ ৭৮৪, ৭৮৮নং)* অবশ্য সূরার শুরু অংশ থেকে না পড়লে, অর্থাৎ সূরার মধ্য বা শেষাংশ হতে পাঠ করলে 'বিসমিল্লাহির---' বলা বিধেয় নয়। কারণ, সূরার মাঝে তা নেই। *(মুমঃ ৩/১০৫)* সূরা নামলের মাঝে 'বিসমিল্লাহ'র কথা স্বতন্ত্র।

এই সূরা নবী ﷺ কখনো কখনো লম্বা পড়তেন। তিনি বলতেন, "যে নামাযের কিয়াম লম্বা, সে নামাযই শ্রেষ্ঠতম নামায।" *(মুঃ, ত্বাহাঃ, মিঃ ৮০০নং)*

কখনো বা সফর, কাশি, অসুস্থতা অথবা কোন শিশুর কান্না শোনার কারণে সংক্ষিপ্ত ও ছোট সূরাও পড়তেন। যেমন আনাস ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ ফজরের নামাযে কুরআন মাজীদের সবচেয়ে ছোট সূরা দু'টি পাঠ করলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'এত সংক্ষেপ

করলেন কেন?’ তিনি বললেন, “এক শিশুর কান্না শুনলাম। ভাবলাম, ওর মা আমাদের সাথে নামায পড়ছে। তাই ওর মা-কে ওর জন্য (তাড়াতাড়ি) ফুরসত দেওয়ার ইচ্ছা করলাম।” *(আঃ, ইবনে আবী দাঊদ, মাসাহিফ, সিসানঃ ১০২-১০৩পৃঃ)*

তিনি আরো বলতেন যে, “আমি নামাযে মনোনিবেশ করে ইচ্ছা করি যে, নামায লম্বা করব। কিন্তু শিশুর কান্না শুনে নামায সংক্ষেপ করে নিই। কারণ, জানি যে, শিশু কাঁদলে (নামাযে মশগুল) তার মায়ের মন কঠিনভাবে ব্যথিত হবে।” *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১১৩০ নং)*

অধিকাংশ নামাযে তিনি সূরার প্রথম থেকে শুরু করে শেষ অবধি পাঠ করতেন। তিনি বলতেন, “প্রত্যেক সূরাকে তার রুকু ও সিজদার অংশ প্রদান কর।” *(ইআশাঃ ৩৭১১ নং, আঃ, মাকদেসী)* “এক-একটি সূরার জন্য এক-একটি রাকআত।” *(ইবনে নাস্‌র, ত্বাহাঃ)* অর্থাৎ, এক রাকআতে একটি পূর্ণ সূরা পড়া উত্তম। *(সিসানঃ ১০৩পৃঃ)*

আবার কখনো তিনি একটি সূরাকে দুই রাকআতে (আধাআধি ভাগ করে) পাঠ করতেন। কখনো বা একটি সূরাকেই উভয় রাকআতেই (পূর্ণরূপে) পড়তেন। *(ফজরের নামাযে ক্বিরাআত দ্রঃ)* আবার কোন কোন নামাযে এক রাকআতেই দুই বা ততোধিক সূরা একত্রে পড়তেন।

মহানবী ﷺ এক ব্যক্তিকে এক জিহাদের সেনাপতিরূপে প্রেরণ করলেন। সে তাদের নামাযে ইমামতিকালে প্রত্যেক সূরার শেষে *‘কুল হুঅল্লাহু আহাদ’* যোগ করে ক্বিরাআত শেষ করত। যখন তারা ফিরে এল তখন সে কথা আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট উল্লেখ করল। তিনি বললেন, “তোমরা ওকে জিজ্ঞাসা কর, কেন এমনটি করে?” সুতরাং তারা ওকে জিজ্ঞাসা করলে লোকটি বলল, ‘কারণ, সূরাটিতে পরম দয়ালু (আল্লাহর) গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। তাই আমি ওটাকে (বারবার) পড়তে ভালোবাসি।’ একথা শুনে তিনি বললেন, “ওকে সংবাদ দাও যে, আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লাও ওকে ভালো বাসেন।” *(বুঃ ৭৩৭৫ নং, মুঃ ৮১৩ নং)*

কুবার মসজিদে এক ব্যক্তি আনসারদের ইমামতি করত। (সূরা ফাতিহার পর) অন্য সূরা যা পড়ত, তা তো পড়তই। কিন্তু তার পূর্বে সূরা ইখলাসও প্রত্যেক রাকআতেই পাঠ করত। তার মুক্তাদীরা তাকে বলল, ‘আপনি এই সূরা প্রথমে পাঠ করছেন। অতঃপর তা যথেষ্ট মনে না করে আবার অন্য একটি সূরা পাঠ করছেন! হয় আপনি ওটাই পড়ুন, নচেৎ ওটা ছেড়ে অন্য সূরা পড়ুন।’ ইমাম বলল, আমি ওটা পড়তে ছাড়ব না। তোমরা চাইলে আমি তোমাদের নামাযে এইভাবেই ইমামতি করব, নচেৎ তোমাদের অপছন্দ হলে ইমামতিই ত্যাগ করব। লোকটি যেহেতু তাদের চেয়ে ভাল ও যোগ্য ছিল, তাই তারা ঐ ইমামকে ত্যাগ করতে অপছন্দ করল। কিন্তু মহানবী ﷺ তাদের নিকট উপস্থিত হলে তারা ঐ ব্যাপার খুলে বলল। নবী ﷺ তাকে বললেন, “হে অমুক! তোমার মুক্তাদীরা যা করতে বলছে, তা কর না কেন? আর কেনই বা ঐ সূরাটিকে নিয়মিত প্রত্যেক রাকআতে পাঠ করে থাক?” লোকটি বলল, ‘আমি সূরাটিকে ভালোবাসি।’ মহানবী ﷺ বললেন, “ঐ সূরাটির প্রতি ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।” *(বুঃ কাটা সনদে ৭৭৪ নং, সতিঃ ২৩২৩ নং)*

সূরার মাঝখান থেকেও কতক আয়াত পাঠ করা যায়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَاقْرَؤُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾

অর্থাৎ, ---কাজেই কুরআনের যতটুকু অংশ পাঠ করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু তোমরা পাঠ কর। *(কুঃ ৭৩/২০)*

নামায ভুলকারী সাহাবীকেও রসূল ﷺ বলেছিলেন, "অতঃপর কুরআন থেকে যতটুকু তোমার জন্য সহজ হয় ততটুকু পাঠ কর।" *(বুঃ, মুঃ, প্রমুখ, মিঃ ৭৯০ নং)* তাছাড়া তিনি ফজরের সুন্নতে প্রথম রাকআতে সূরা বাক্বারার ১৩৬ নং আয়াত এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আ-লে ইমরানের ৬৪ নং আয়াত পাঠ করেছিলেন। *(মুঃ, মিঃ ৮৪৩ নং)* আর এ কথা বিদিত যে, যা নফল নামাযে পড়া যায়, তা ফরয নামাযেও (কোন আপত্তির দলীল না থাকলে) পড়া যাবে। আর পড়া আপত্তিকর হলে নিশ্চয় তার বর্ণনা থাকত। যেমন সাহাবাগণ যখন মহানবী ﷺ এর উট ও সওয়ারীর উপর নফল এবং বিতর নামায পড়ার কথা বর্ণনা করেন, তখনই তার সাথে এ কথাও বর্ণনা করেন যে, 'অবশ্য তিনি সওয়ারীর উপর ফরয নামায পড়তেন না।' *(বুঃ ১০৯৮, মুঃ ৭০০নং)*

তবে এক রাকআতে পূর্ণ একটি সূরা এবং সূরার শুরু অংশ থেকে পাঠ করাই আফযল। *(মুমঃ ৩/ ১০৩- ১০৪, ৩৩৪, ৩৬০)*

ক্বিরাআতে যা মুস্তাহাব

আল্লাহর রসূল ﷺ (তাহাজ্জুদের) নামাযে যখন কুরআন পড়তেন, তখন ধীরে ধীরে পড়তেন। কোন তসবীহর আয়াত পাঠ করলে তসবীহ পড়তেন, কোন প্রার্থনার আয়াত পাঠ করলে প্রার্থনা করতেন এবং কোন আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত পাঠ করলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। *(মুঃ ৭৭২ নং)*

ব্যাপারটি নফল নামাযের হলেও ফরয নামাযেও আমল করা বৈধ। *(মুমঃ ৩/৩৯৬)*

তিনি সূরা কিয়ামাহ এর শেষ আয়াত, **﴿أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِـيَ الْمَوْتَى﴾** (অর্থাৎ যিনি এত কিছু করেন তিনি কি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?) পড়লে জওয়াবে বলতেন, **سُبْحَانَكَ فَبَلَى** (সুবহা-নাকা ফাবালা), অর্থাৎ তুমি পবিত্র, অবশ্যই (তুমি সক্ষম)।

সূরা আ'লার প্রথম আয়াত, **﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى﴾** অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর) পাঠ করলে জওয়াবে বলতেন, **سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى** (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা। অর্থাৎ আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি)। *(আদাঃ ৮৮৩, ৮৮৪নং, বাঃ)*

আল্লামা আলবানী বলেন, উক্ত আয়াতদ্বয়ের জওয়াবে উক্ত দুআ বলার ব্যাপারটা সাধারণ; অর্থাৎ, ক্বিরাআত নামাযে হোক বা তার বাইরে, ফরযে হোক বা নফলে সর্বক্ষেত্রে উক্ত জওয়াব দেওয়া যাবে। আবূ মূসা আশআরী এবং উরওয়াহ বিন মুগীরাহ ফরয নামাযে উক্ত

দুআ বলতেন। *(ইআশাঃ ৮৬৩৯, ৮৬৪০, ৮৬৪৫ নং)*

একদা মহানবী ﷺ সাহাবীদের নিকট সূরা রহমান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ নীরব বসে তেলাঅত শুনছিলেন। তিনি বললেন, “যে রাত্রে আমার নিকট জিনের দল আসে, সে রাত্রে আমি উক্ত সূরা ওদের নিকট পাঠ করলে ওরা সুন্দর জওয়াব দিচ্ছিল। যখনই আমি পাঠ করছিলাম,

﴿فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ﴾

(অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার কর?) তখনই তারাও এর জওয়াবে বলছিল,

لاَ بِشَيْءٍ مِّنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ.

উচ্চারণঃ- লা বিশাইইম মিন নিআ’মিকা রাব্বানা নুকাযযিবু, ফালাকাল হাম্‌দ্‌।

অর্থঃ- তোমার নেয়ামতসমূহের কোন কিছুকেই আমরা অস্বীকার করি না হে আমাদের প্রতিপালক! *(তিঃ, সিসঃ ২ ১৫০নং)*

এ তো গেল ইমাম বা একাকী নামাযীর কথা। কিন্তু মুক্তাদী হলে ইমাম চুপ থেকে ঐ সমস্ত দুআ পাঠ করলে সেও পড়তে পারে। নচেৎ ইমাম চুপ না হলে ইমামের ক্বিরাআত চলাকালে ঐ সমস্ত জওয়াব পড়া বৈধ নয়। কারণ, ক্বিরাআতের সময় ইমামের পশ্চাতে সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছু পড়ার অনুমতি নেই। *(মুমঃ ৩/৩৯৪)*

ক্বিরাআতে মুসহাফের তরতীব (অনুক্রম) বজায় রেখে পাঠ করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ, দ্বিতীয় সূরা বা দ্বিতীয় রাকআতে যে সূরা পাঠ করবে, তা যেন মুসহাফে প্রথমে পঠিত সূরার পরে হয়। অবশ্য এর বিপরীত করা দোষাবহ নয়; বরং বৈধ। যেমন মহানবী ﷺ এর তাহাজ্জুদের ক্বিরাআতে আমরা জানতে পারব। *(মবঃ ১৯/ ১৪৮, সিসানঃ ১০৪পৃঃ, ৪নং টীকা)*

মহানবী ﷺ আল্লাহর আদেশ অনুসারে ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ করতেন; তাড়াহুড়ো করে শীঘ্রতার সাথে নয়। বরং এক একটা হরফ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে পাঠ করতেন। *(ইবনুল মুবারক, যুহদ, আদাঃ, আঃ সিসানঃ ১২৪পৃঃ)*

তিনি বলতেন, “কুরআন তেলাঅতকারীকে পরকালে বলা হবে, ‘পড়তে থাক এবং মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। আর (ধীরে ধীরে, শুদ্ধভাবে কুরআন) আবৃত্তি কর, যেমন দুনিয়ায় অবস্থানকালে আবৃত্তি করতে। যেহেতু যা তুমি পাঠ করতে তার সর্বশেষ আয়াতের নিকট তোমার স্থান হবে।” *(আদাঃ, নাঃ, তিঃ, সজাঃ ৮১২২ নং)*

তিনি ‘হরফে-মাদ্দ্ ’ (আলিফ, ওয়াউ ও ইয়া)কে টেনে পড়তেন। *(বুঃ৫০৪৫, আদাঃ ১৪৬৫ নং)* কখনো কখনো বিনম্র সুরে ‘আ-আ-আ’ শব্দে অনুরণিত কণ্ঠে কুরআন তেলাঅত করতেন। *(বুঃ ৭৫৪০, মুঃ)*

তিনি কুরআন মধুর সুরে পাঠ করতে আদেশ করতেন; বলতেন ঃ-

“তোমাদের (সুমিষ্ট) শব্দ দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমন্ডিত কর। কারণ, মধুর শব্দ কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।” *(বুঃ তা’লীক, আদাঃ ১৪৬৮, দাঃ, হাঃ)*

“কুরআন পাঠে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আওয়াজ তার, যার কুরআন পাঠ করা শুনে মনে হয়, সে আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।” *(যুহদ, ইবনুল মুবারক, দাঃ, ত্বাবাঃ, প্রমুখ, সিসানঃ ১২৫ পৃঃ)*

“তোমরা আল্লাহর কিতাব শিক্ষা কর, (পাঠ করার মাধ্যমে) তার যত্ন কর, তা ঘরে রাখ এবং সুরেলা কণ্ঠে তা তেলাঅত কর। কারণ, উট যেমন রশির বন্ধন থেকে অতর্কিতে বের হয়ে যায়, তার চেয়ে অধিক অতর্কিতে কুরআন (স্মৃতি থেকে) বের হয়ে (বিস্মৃত হয়ে) যায়।” *(দাঃ, আঃ ৪/ ১৪৬, ১৫০, ১৫৩, ৩৯৭)*

তিনি আরো বলেন, “সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে সুরেলা কণ্ঠে কুরআন পড়ে না।” *(আদাঃ ১৪৭১, ১৪৭৯, হাঃ)*

কুরআন পাঠকালে তিনি প্রত্যেক আয়াত শেষে থামতেন। *(আদাঃ, হাঃ, ইগঃ ৩৪৩ নং)*

মহানবী ﷺ একই বা কাছাকাছি অর্থবোধক দুই সূরাকে কখনো কখনো একই রাকআতে পাঠ করতেন। *(বুঃ ৭৭৫, মুঃ ৭২২ নং)* সূরা রহমান (৫৫নং সূরা / ৭৮ আয়াত বিশিষ্ট) ও নাজ্‌ম (৫৩/৬২) এক রাকআতে, সূরা ইক্বতারাবাত (৫৪/৫৫) ও হা-ক্বাহ (৬৯/৫২) এক রাকআতে, সূরা ত্বুর (৫২/৪৯) ও যারিয়াত (৫১/৬০) এক রাকআতে, সূরা ওয়া-ক্বিআহ (৫৬/৯৬) ও নূন (৬৮/৫২) এক রাকআতে, সূরা মাআ-রিজ (৭০/৪৪) ও না-যিআত (৭৯/৪৬) এক রাকআতে, সূরা মুত্বাফ্‌ফিফীন (৮৩/৩৬) ও আবাসা (৮০/৪২) এক রাকআতে, সূরা মুদ্দাষ্‌ষির (৭৪/৫৬) ও মুয্‌যাম্মিল (৭৩/২০) এক রাকআতে, সূরা দাহ্‌র (৭৬/৩১) ও ক্বিয়ামাহ (৭৫/৪০) এক রাকআতে, সূরা নাবা (৭৮/৪০) ও মুরসালাত (৭৭/৫০) এক রাকআতে এবং সূরা দুখান (৪৪/৫৯) ও তাকবীর *(তাকভীর)* (৮১/২৯) এক রাকআতে পাঠ করতেন। *(আদাঃ ১৩৯৬ নং)*

আবার কখনো কখনো সূরা বাক্বারাহ, আ-লে ইমরান ও নিসার মত বড় বড় সূরাকেও একই রাকআতে পাঠ করতেন। *(মুঃ ৭৭২ নং)*

জেহরী ও সির্রী নামায

যে নামাযে ক্বিরাআত সশব্দে ও জোরে হয় তাকে জেহরী এবং যাতে নিঃশব্দে ও চুপেচুপে হয় তাকে সির্রী নামায বলা হয়।

ফজর ও জুমআর উভয় রাকআতে এবং মাগরিব ও এশার প্রথম দু’ রাকআতে জেহরী, আর যোহর ও আসরের সকল রাকআতে এবং মাগরেবের শেষ এক ও এশার শেষ দুই রাকআতে সির্রী ক্বিরাআত বিধেয়।

সাধারণ সুন্নত ও নফল নামাযের ক্বিরাআত সির্রী। বাকী নামাযের ক্বিরাআত বিষয়ক মসলা যথাস্থানে আলোচিত হবে ইন শাআল্লাহ।

নামাযী একাকী হলেও জেহরী নামাযে জেহরী ক্বিরাআত তার জন্য সুন্নত। অবশ্য সে এমন জোরে ক্বিরাআত করতে পারে না, যাতে অপর নামাযী, যিক্‌রকারী বা নিদ্রিত ব্যক্তির ডিষ্টার্ব হয়। *(ফইঃ ১/২৬৯)*

মহিলার ক্বিরাআতের শব্দ তার কোন বেগানা পুরুষ শুনতে পাবে -এই আশঙ্কা থাকলে সে জেহরী ক্বিরাআত করতে পারে না। এমন আশঙ্কা না থাকলে তার জন্যও জেহরী নামাযে

জেহরী ক্বিরাআত সুন্নত। *(ফউঃ ১/৩৫৩)*

সিরী নামাযে যদি কেউ জেহরী ক্বিরাআত ভুল করে করেই ফেলে, তাহলে তার জন্য শেষে আর সহু সিজদার প্রয়োজন নেই। যেহেতু কোন সুন্নত ত্যাগ বা মকরূহ আমল করে ফেললে সহু সিজদার দরকার হয় না। *(মবঃ ১৬/১৩৭)*

জেহরী নামাযের ক্বিরাআত জোরে, সিরী নামাযের ক্বিরাআত চুপেচুপে এবং কতক জেহরী নামাযের কয়েক রাকআতে সিরী ক্বিরাআত কেন হল তার হিকমত ও যুক্তি স্পষ্ট নয়। যেমন যোহর, আসর ও এশার নামায চার রাকআত, মাগরেবের তিন রাকআত এবং ফজরের দুই রাকআত কেন হল তারও কোন সঠিক জওয়াব নেই। সুতরাং এ সবের হিকমত আল্লাহই জানেন।

পাঁচ-অক্ত নামাযে সুন্নতী ক্বিরাআত

সূরা ফাতিহার পর নামাযী তার নিজের মুখস্থ ও সহজ মত অন্য যে কোন একটি সূরা পাঠ করতে পারে। অবশ্য কতকগুলি বিশিষ্ট সূরা মহানবী ﷺ বিশেষ নামাযে পাঠ করতেন বলে অনুরূপ পাঠ করাকে সুন্নতী ক্বিরাআত বলে। এ সকল নামায ও সূরার বিস্তারিত বিবরণ জানার পূর্বে কুরআন মাজীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষা জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

কুরআন মাজীদকে ৭ ভাগে বিভক্ত করলে শেষ ভাগে যে সব সূরা পড়ে তার সমষ্টিকে 'মুফাস্‌স্বাল' বলা হয়। 'ফাস্ব্‌ল' মানে পরিচ্ছেদ। এই অংশে সূরা ও পরিচ্ছেদের সংখ্যা অধিক বলে একে 'মুফাস্‌স্বাল' বা পরিচ্ছেদ-বহুল অংশ বলা হয়ে থাকে। সঠিক অভিমত অনুসারে এই অংশের প্রথম সূরা হল সূরা ক্বাফ।

এই মুফাস্‌স্বাল আবার ৩ ভাগে বিভক্ত; সূরা ক্বাফ থেকে সূরা মুরসালাত পর্যন্ত অংশকে 'ত্বিওয়ালে মুফাস্‌স্বাল' (দীর্ঘ পরিচ্ছেদ-বহুল অংশ), সূরা নাবা থেকে সূরা লাইল পর্যন্ত অংশকে 'আউসাত্বে মুফাস্‌স্বাল' (মাঝারি পরিচ্ছেদ-বহুল অংশ), আর সূরা যুহা থেকে শেষ সূরা (নাস) পর্যন্ত অংশকে 'ক্বিসারে মুফাস্‌স্বাল' (ছোট পরিচ্ছেদ-বহুল অংশ) বলা হয়। *(মুমঃ ৩/১০৫)*

ফজরের নামাযে সুন্নতী ক্বিরাআত

নবী মুবাশ্‌শির ﷺ ফজরের নামাযে 'ত্বিওয়ালে মুফাস্‌স্বাল' পাঠ করতেন। যেহেতু এই সময়টি হল পরিবেশ শান্ত এবং ঘুম পূর্ণ করার পর মনে স্ফূর্তি থাকার ফলে মনোযোগ সহকারে কুরআন তেলাঅতের সময়। তাছাড়া মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلىَ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْداً﴾

অর্থাৎ, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত তুমি নামায কায়েম কর; আর বিশেষ করে ফজরের কুরআন (নামায কায়েম কর)। কারণ, ফজরের কুরআন (নামাযে

ফিরিশ্তা) উপস্থিত হয়ে থাকে। *(কুঃ ১৭/৭৮)*

এখানে ফজরের কুরআন বলে ফজরের নামাযকে বুঝিয়ে এই কথার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, উক্ত নামাযে কুরআন অধিক সময় ধরে পড়া হবে। আর তার গুরুত্ব এত বেশী যে, তাতে ফিরিশ্তা উপস্থিত হয়ে থাকেন।

তিনি উক্ত নামাযে কখনো কখনো সূরা ওয়া-ক্বিআহ বা অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন। *(আঃ, ইখুঃ, হাঃ, সিসানঃ ১০৯পৃঃ)*

বিদায়ী হজ্জের এক ফজরের নামাযে তিনি সূরা ত্বূর পাঠ করেছেন। *(বুঃ ১৬১৯ নং)*

কখনো বা তিনি সূরা ক্বাফ বা অনুরূপ সূরা প্রথম রাকআতে পাঠ করতেন। *(মুঃ, তিঃ, মিঃ ৮৩৫ নং)*

কখনো কখনো সূরা তাকবীর (ইযাশ্ শামসু কুউবিরাত) পাঠ করতেন। *(মুঃ, আদাঃ, মিঃ ৮৩৬ নং)*

একদা ফজরে তিনি সূরা যিলযালকে উভয় রাকআতেই পাঠ করেন। বর্ণনাকারী সাহাবী বলেন, 'কিন্তু জানি না যে, তিনি তা ভুলে পড়ে ফেলেছেন, নাকি ইচ্ছা করেই পড়েছেন।' *(আদাঃ, বাঃ, মিঃ ৮৬২ নং)* সাধারণতঃ যা বুঝা যায় তা এই যে, মহানবী ﷺ ঐরূপ বৈধতা বর্ণনার উদ্দেশ্যেই ইচ্ছা করেই (একই সূরা উভয় রাকআতে পাঠ) করেছেন। *(সিসানঃ ১১০পৃঃ)*

একদা এক সফরে তিনি ফজরের প্রথম রাকআতে সূরা ফালাক্ব ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা নাস পাঠ করেছেন। *(আদাঃ ১৪৬২, নাঃ, ইখুঃ, ইআশাঃ, হাঃ ১/৫৬৭, আঃ ৪/১৪৯, ১৫০, ১৫৩, মিঃ ৮৪৮ নং)*

উক্ববাহ বিন আমের ﷺ কে তিনি বলেছেন, "তোমার নামাযে সূরা ফালাক্ব ও নাস পাঠ কর। (উভয় সূরায় রয়েছে বিভিন্ন অনিষ্টকর বিষয় থেকে আশ্রয় প্রার্থনা।) কারণ এই দুই (প্রার্থনার) মত কোন প্রার্থনা দ্বারা কোন প্রার্থনাকারী আশ্রয় প্রার্থনা করে নি।" *(আদাঃ, ১৪৬৩, আঃ, সিসানঃ ১১০পৃঃ)*

আবার কখনো কখনো এ সবের চেয়ে লম্বা সূরাও পাঠ করতেন। এই নামাযে তিনি এক রাকআতে অথবা উভয় রাকআতে ৬০ থেকে ১০০ আয়াত মত পাঠ করতেন। *(বুঃ ৭৭১ নং, মুঃ)*

কখনো তিনি সূরা রূম পাঠ করতেন। *(আঃ, নাঃ, বাযযার)* কখনো পাঠ করতেন সূরা ইয়াসীন। *(আঃ, সিসানঃ ১১০পৃঃ)*

একদা মক্কায় ফজরের নামাযে তিনি সূরা মু'মিনূন শুরু করলেন, অতঃপর মূসা ও হারূন অথবা ঈসা ﷺ এর বর্ণনা এলে (অর্থাৎ উক্ত সূরার ৪৫ অথবা ৫০ আয়াত পাঠের পর) তাঁকে কাশিতে ধরলে তিনি রুকূতে চলে যান। *(বুঃ, বিনা সনদে, ফবাঃ ২/২৯৮, মুঃ, মিঃ ৮৩৭নং)*

আবার কখনো কখনো তিনি সূরা স্বা-ফ্ফাত পাঠ করে ইমামতি করতেন। *(আঃ, আবূ য়্যা'লা, মাক্বদেসী, সিসানঃ ১১১পৃঃ)*

জুমআর দিন ফজরে তিনি প্রথম রাকআতে সূরা সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা দাহ্‌র পাঠ করতেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৮৩৮ নং)*

হযরত উসমান ﷺ ফজরের নামাযে অধিকাংশ সময়ে সূরা ইউসুফ ও সূরা হজ্জ ধীরে ধীরে পাঠ করতেন। অবশ্য তিনি ফজর উদয় হওয়ার সাথে সাথেই নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। *(মাঃ ৩৫, মিঃ ৮৬৪ নং)*

যোহরের নামাযে সুন্নতী ক্বিরাআত

যোহরের (প্রথমকার) উভয় রাকআতে ৩০ আয়াত মত অথবা সূরা সাজদাহ্ পাঠ করার মত সময় কুরআন পাঠ করতেন। *(আঃ, মুঃ, মিঃ ৮২৯ নং)*

কখনো তিনি সূরা ত্বা-রিক্ব, বুরূজ, লাইল বা অনুরূপ কোন সূরা পাঠ করতেন। *(আদাঃ ৮০৫, ৮০৬, তিঃ, ইখুঃ)* আবার কখনো কখনো পড়তেন সূরা 'ইযাস সামা-উন শাক্কাত' বা অনুরূপ কোন সূরা। *(ইখুঃ ৫১১নং)*

সাহাবাগণ ﷺ আল্লাহর রসূল ﷺ এর দাড়ি হিলা দেখে তাঁর ক্বিরাআত পড়া বুঝতে পারতেন। *(বুঃ ৭৬০, আদাঃ ৮০১ নং)*

কখনো কখনো তিনি মুক্তাদীগণকে আয়াত (একটু শব্দ করে পড়ে) শুনিয়ে দিতেন। *(বুঃ,মুঃ৮২৮)*

কখনো কখনো সাহাবাগণ ﷺ তাঁর নিকট হতে যোহরের নামাযে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ্‌র সুর শুনতে পেতেন। *(ইখুঃ ৫১২নং)*

কখনো কখনো তিনি যোহরের ক্বিরাআত এত লম্বা করতেন যে, নামায শুরু হওয়ার পর কেউ কেউ বাকী' (মহানবী ﷺ এর আমলে মদীনার পূর্বে এবং বর্তমানে মসজিদে নববীর পূর্ব দিকে অনতি দূরে অবস্থিত খালি জায়গা। বর্তমানে কবরস্থান) গিয়ে পায়খানা ফিরে এসে নিজের বাড়িতে ওযু করে যখন মসজিদে আসত, তখনও দেখত মহানবী ﷺ প্রথম রাকআতেই আছেন। *(মুঃ ৪৫৪ নং, বুঃ জুযউল ক্বিরাআহ)*

এ ব্যাপারে সাহাবাগণের ধারণা এই ছিল যে, তিনি সকলকে প্রথম রাকআত পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এত লম্বা ক্বিরাআত পড়তেন। *(আদাঃ ৮০০ নং, ইখুঃ)*

আসরের নামাযে সুন্নতী ক্বিরাআত

আসরের নামাযে নবী মুবাশ্‌শির ﷺ প্রায় ১৫ আয়াত পাঠ করার মত ক্বিরাআত করতেন। যোহরের প্রথম দু' রাকআতে যতটা পড়তেন তার অর্ধেক পড়তেন আসরের প্রথম দু' রাকআতে।

তিনি এ নামাযেও পড়তেন, সূরা আ'লা ও সূরা লাইল। *(মুঃ, মিঃ ৮৩০ নং)* সূরা ত্বারিক্ব ও বুরূজ। *(আদাঃ ৮০৫ নং)* এতেও তিনি কখনো কখনো মুক্তাদীদেরকে আয়াত শুনিয়ে দিতেন।

মাগরেবের নামাযে সুন্নতী ক্বিরাআত

মাগরেবের নামাযে কখনো কখনো তিনি 'ক্বিসারি মুফাস্‌স্বাল' থেকে পাঠ করতেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৮৫৩ নং)* এই সংক্ষেপের ফলেই সাহাবাগণ যখন নামায পড়ে ফিরতেন তখন কেউ তীর ছুঁড়লে তাঁর তীর পড়ার স্থানটিকে দেখেতে পেতেন। কারণ, তখনও বেশ উজ্জ্বল থাকত। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৫৯৬ নং)*

কখনো সফরে তিনি এর দ্বিতীয় রাকআতে সূরা তীন পাঠ করেছেন। *(ত্বায়ালেসী, আঃ, সিসানঃ ১১৫ পৃঃ)*

কখনো বা তিনি 'ত্বিওয়ালে মুফাস্‌স্বাল' ও আওসাত্বে মুফাস্‌স্বাল'-এর সূরাও পাঠ

করতেন। কখনো পড়তেন সূরা মুহাম্মাদ। *(ইখুঃ, ত্বাবাঃ, মাক্বদেসী, সিসানঃ ১১৬ পৃঃ)* কখনো পাঠ করতেন সূরা ত্বূর। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৮৩১ নং)*

তিনি তাঁর জীবনের শেষ মাগরেবের নামাযে পাঠ করেছেন সূরা মুরসালাত। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৮৩২ নং)*

কখনো উভয় রাকআতেই পড়েছেন সূরা আ'রাফ। *(বুঃ, আদাঃ, ইখুঃ, আঃ, মিঃ ৮৪৭ নং)* কখনো বা সূরা আনফাল। *(ত্বাবাঃ, সিসানঃ ১১৬ পৃঃ)*

এশার নামাযে সুন্নতী ক্বিরাআত

এশার নামাযে তিনি 'আওসাত্বে মুফাসস্বাল'-এর সূরা পাঠ করতেন। *(নাঃ, আঃ, মিঃ ৮৫৩ নং)* কখনো পড়তেন, সূরা শাম্‌স বা অনুরূপ অন্য কোন সূরা। *(আঃ, তিঃ ৩০৯ নং)* কখনো সূরা ইনশিক্বাক্ব পড়তেন এবং এর সিজদার আয়াতে তিনি তেলাঅতের সিজদা করতেন। *(বুঃ ৭৬৬, মুঃ, নাঃ)*

কখনো পাঠ করতেন সূরা তীন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৮৩৪ নং)*

তিনি মুআয ﷺ কে এশার ইমামতিতে লম্বা ক্বিরাআত পড়তে নিষেধ করে বলেছিলেন, "তুমি কি লোকদেরকে ফিতনায় ফেলতে চাও হে মুআয? তুমি যখন ইমামতি করবে তখন 'অশ্‌শামসি অযুহা-হা, সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা, ইক্বরা বিসমি রাব্বিকা, অল্লাইলি ইযা য়্যাগশা' পাঠ কর। কারণ তোমার পশ্চাতে বৃদ্ধ, দুর্বল ও প্রয়োজনে উদ্‌গ্রীব মানুষ নামায পড়ে থাকে। *(বুঃ, মুঃ, না, মিঃ ৮৩৩ নং)*

কেবল ফাতিহা পড়লেও চলে

১,২,৩ বা ৪ রাকআত বিশিষ্ট যে কোনও নামাযের প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা মিলানো চলে, প্রথম দু' রাকআতে ১টি মিলিয়ে শেষ দু' রাকআতে না মিলালেও চলে। আবার কোন রাকআতেই সূরা ফাতিহার পর অন্য কোন সূরা পাঠ না করলেও যথেষ্ট হয়। পূর্বোক্ত মুআয ﷺ এর ব্যাপারে অভিযোগকারী যুবককে আল্লাহর রসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি যখন নামায পড় তখন কিরূপ কর, হে ভাইপো?" বলল, 'আমি সূরা ফাতিহা পড়ি এবং (তাশাহ্‌হুদের পর) আল্লাহর নিকট বেহেশ্‌ত্‌ চাই ও দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আর আমি আপনার ও মুআযের গুঞ্জন বুঝি না। নবী ﷺ বললেন, "আমি ও মুআয এরই ধারে-পাশে গুন্‌গুন্‌ করি।" *(আদাঃ ৭৯৩ নং)*

পূর্বে উল্লেখিত এক হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, সূরা ফাতিহা-বিহীন নামায অপরিণত ও অসম্পূর্ণ। *(মুঃ, আআঃ, মিঃ ৮২৩ নং)* সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, সূরা ফাতিহাবিশিষ্ট নামায পরিণত ও সম্পূর্ণ। আর অন্য সূরা পাঠ জরুরী নয়। *(ইখুঃ ১/২৫৮)*

হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, 'প্রত্যেক নামাযেই ক্বিরাআত আছে। সুতরাং আল্লাহর রসূল ﷺ যা আমাদেরকে শুনিয়েছেন, তা আমি তোমাদেরকে শুনালাম এবং যা চুপেচুপে পড়েছেন, তা চুপেচুপে পড়লাম।' এক ব্যক্তি বলল, 'যদি আমি সূরা ফাতিহার পর অন্য কিছু না পড়ি?' তিনি বললেন, 'যদি অন্য কিছু পড় তাহলে উত্তম। না পড়লে সূরা ফাতিহাই যথেষ্ট।" *(বুঃ ৭৭২, মুঃ ৩৯৬ নং)*

দশটি সূরা এবং তার উচ্চারণ ও অনুবাদ

নিম্নে কয়েকটি ছোট ছোট সূরা উচ্চারণ ও অর্থসহ লেখা হল। এগুলি এবং অন্যান্য আরো বড় সূরা কুরআন মাজীদ থেকে অথবা কোন ক্বারীর মুখ থেকে শুনে মুখস্থ করা নেওয়া নামাযীর কর্তব্য। প্রকাশ থাকে যে, কুরআনী আয়াতের উচ্চারণ অন্য ভাষায় করা সম্ভব নয় এবং অনেক উলামার মতে তা বৈধও নয়।

(১) সূরা নাস

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) اَلَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

উচ্চারণঃ- ক্বুল আঊযু বিরব্বিন্ না-স। মালিকিন্ না-স। ইলা-হিন্ না-স। মিন্ শার্রিল অসওয়া-সিল খান্না-স। আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদূরিন্ না-স। মিনাল জিন্নাতি অন্ না-স।

অর্থঃ- তুমি বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, মানুষের প্রতিপালক, মানুষের অধীশ্বর, মানুষের উপাস্যের কাছে- তার কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে, যে সুযোগমত আসে ও (কুমন্ত্রণা দিয়ে) সরে পড়ে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের হৃদয়ে, জিন ও মানুষের মধ্য হতে।

(২) সূরা ফালাক্ব

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

উচ্চারণঃ- ক্বুল আঊযু বিরব্বিল ফালাক্ব। মিন শার্রি মা খালাক্ব। অমিন শার্রি গা-সিক্বিন ইযা অক্বাব। অমিন শার্রিন্ নাফ্‌ফা-ষা-তি ফিল উক্বাদ। অমিন শার্রি হা-সিদিন ইযা হাসাদ।

অর্থঃ- তুমি বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার প্রভুর নিকট। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। এবং রাতের অনিষ্ট হতে যখন তা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। এবং গ্রন্থিতে ফুৎকারিণী (যাদুকরী)দের অনিষ্ট হতে। এবং হিংসুকের অনিষ্ট হতে যখন সে হিংসা করে।

(৩) সূরা ইখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ (١) اَللّٰهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً

أَحَدٌ (٤)

উচ্চারণঃ- কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ। আল্লা-হুস সামাদ। লাম য়্যালিদ, অলাম ইউলাদ। অলাম য়্যাকুল্ লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থঃ- বল, তিনি আল্লাহ একক। আল্লাহ ভরসাস্থল। তিনি জনক নন এবং জাতকও নন। আর তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই।

(৪) সূরা লাহাব

تَبَّتْ يَدَا أَبِيْ لَهَبٍ وَّتَبَّ (١) مَا أَغْنى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (٢) سَيَصْلى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ (٣) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (٤) فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ (٥)

উচ্চারণঃ- তাব্বাৎ য়্যাদা আবী লাহাবিঁউ অতাব্ব্। মা আগ্না আনহু মা-লুহু অমা কাসাব। সায়্যাস্বলা না-রান যা-তা লাহাব। অমরাআতুহু হাম্মা-লাতাল হাত্বাব। ফী জীদিহা হাবলুম মিম মাসাদ।

অর্থঃ- ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও উপার্জিত বস্তু তার কোন উপকারে আসবে না। সে প্রবেশ করবে লেলিহান শিখাবিশিষ্ট অগ্নিকুন্ডে। আর তার স্ত্রীও -যে কাঠের বোঝা বহনকারিণী। ওর গলদেশে খেজুর চোকার রশি হবে।

(৫) সূরা নাস্বর

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجاً (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً (٣)

উচ্চারণঃ- ইযা জা-আ নাস্বরুল্লা-হি অল ফাত্‌হ। অরাআইতান্ না-সা য়্যাদ্‌খুলূনা ফী দীনিল্লা-হি আফওয়াজা। ফাসাব্বিহ বিহামদি রাব্বিকা অস্তাগফিরহু; ইন্নাহু কা-না তাউওয়া-বা।

অর্থঃ- যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। তুমি দেখবে মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে। তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল।

(৬) সূরা কা-ফিরূন

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ (١) لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ (٢) وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ (٤) وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (٦)

উচ্চারণঃ- কুল ইয়া আইয়ুহাল কা-ফিরূন। লা- আ'বুদু মা- তা'বুদূন। অলা- আন্তুম আ'-বিদূনা মা- আ'বুদ। অলা- আনা আ'-বিদুম মা আ'বাত্তুম। অলা- আন্তুম আ'-বিদূনা মা- আ'বুদ। লাকুম দীনুকুম অলিয়া দীন।

অর্থঃ- বল, হে কাফেরদল! আমি তার উপাসনা করি না, যার উপাসনা তোমরা কর। তোমরাও তাঁর উপাসক নও, যাঁর উপাসনা আমি করি। আমি তার উপাসক হব না, যার উপাসনা তোমরা কর। আর তোমরাও তাঁর উপাসক নও, যাঁর উপাসনা আমি করি। তোমাদের ধর্ম তোমাদের এবং আমার ধর্ম আমার (কাছে প্রিয়)।

(৭) সূরা কাউষার

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ (٣)

উচ্চারণঃ- ইন্না- আ'ত্বাইনা-কাল কাউষার। ফাস্বাল্লি লিরব্বিকা অন্‌হার। ইন্না- শা-নিআকা হুওয়াল আবতার।

অর্থঃ- নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে কাউসার (হওয) দান করেছি। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায পড় এবং কুরবানী কর। নিশ্চয় তোমার শত্রুই হল নির্বংশ।

(৮) সূরা কুরাইশ

لإِيْلاَفِ قُرَيْشٍ (١) إِيْلاَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِيْ أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَّآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ (٤)

উচ্চারণঃ- লিঈলা-ফি কুরাইশ্‌। ঈলা-ফিহিম রিহ্‌লাতাশ শিতা-ই অস্‌স্বাইফ্‌। ফাল য়্যা'বুদু রব্বা হা-যাল বাইত্‌। আল্লাযী আত্বআমাহুম মিন জূ'। অআ-মানাহুম মিন খাঊফ্‌।

অর্থঃ- যেহেতু কুরাইশের জন্য শীত ও গ্রীষ্মের সফরকে তাদের স্বভাবসুলভ করা হয়েছে, সেহেতু ওরা উপাসনা করুক এই গৃহের রক্ষকের। যিনি ক্ষুধায় ওদেরকে আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে নিরাপদ করেছেন।

(৯) সূরা ফীল

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيْلِ (١) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ (٢) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيْلَ (٣) تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ (٤) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ (٥)

উচ্চারণঃ- আলাম তারা কাইফা ফাআলা রব্বুকা বিআস্‌হা-বিল ফীল। আলাম য়্যাজ্‌আল্ কাইদাহুম ফী তায্‌লীল। অআরসালা আলাইহিম ত্বাইরান আবা-বিল। তারমীহিম বিহিজারাতিম মিন সিজ্জীল। ফাজাআলাহুম কাআস্‌ফিম মা'কূল।

অর্থঃ- তুমি কি দেখ নি, তোমার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর সঙ্গে কি করেছিলেন? তিনি কি ওদের কৌশলকে ব্যর্থ করে দেন নি? তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেন। যারা ওদের উপর নিক্ষেপ করে কঙ্কর। অতঃপর তিনি ওদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।

(১০) সূরা আস্‌র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ (٢) إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

উচ্চারণঃ- অল্ আস্‌র। ইন্নাল ইনসা-না লাফী খুস্‌র। ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ অআ'মিলুস স্বা-লিহা-তি অতাওয়াস্বাউ বিল হাক্বি অতাওয়াস্বাউ বিস্‌স্বাব্‌র।

অর্থঃ- মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করেছে এবং একে অপরকে সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।

রফউল য়্যাদাইন

সূরা পাঠ শেষ হলে দম নেওয়ার জন্য নবী মুবাশ্‌শির ﷺ একটু চুপ থাকতেন বা থামতেন। *(আদাঃ, হাঃ ১/২১৫)* অতঃপর তিনি নিজের উভয় হাত দুটিকে পূর্বের ন্যায় কানের উপরি ভাগ বা কাঁধ পর্যন্ত তুলতেন। এ ব্যাপারে এত হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, তা 'মুতাওয়াতির'-এর দর্জায় পৌঁছে।

ইবনে উমার رضي الله عنه বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ যখন নামায শুরু করতেন, যখন রুকূ করার জন্য তকবীর দিতেন এবং রুকূ থেকে যখন মাথা তুলতেন তখন তাঁর উভয় হাতকে কাঁধ বরাবর তুলতেন। আর (রুকূ থেকে মাথা তোলার সময়) বলতেন, "সামিআ'ল্লা-হু লিমান হামিদাহ।" তবে সিজদার সময় এরূপ (রফয়ে য়্যাদাইন) করতেন না।' *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৭৯৩নং)*

মহানবী ﷺ এর দেহে চাদর জড়ানো থাকলেও হাত দুটিকে চাদর থেকে বের করে 'রফয়ে

য়্যাদাইন’ করেছেন। সাহাবী ওয়াইল বিন হুজ্‌র ﷺ বলেন, তিনি দেখেছেন যে, নবী ﷺ যখন নামাযে প্রবেশ করলেন, তখন দুই হাত তুলে তকবীর বলে হাত দুটিকে কাপড়ে ভরে নিলেন। অতঃপর ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখলেন। তারপর যখন রুকূ করার ইচ্ছা করলেন, তখন কাপড় থেকে হাত দু’টিকে বের করে পুনরায় তুলে তকবীর দিয়ে রুকূতে গেলেন। অতঃপর যখন (রুকূ থেকে উঠে) তিনি ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বললেন, তখনও হাত তুললেন। আর যখন সিজদা করলেন, তখন দুই হাতের চেটোর মধ্যবর্তী জায়গায় সিজদা করলেন। *(মুঃ, মিঃ ৭৯৭ নং)*

এই সকল ও আরো অন্যান্য হাদীসকে ভিত্তি করেই তিন ইমাম এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের আমল ছিল এই সুন্নাহর উপর। কিছু হানাফী ফকীহও এই অনস্বীকার্য সুন্নাহর উপর আমল করে গেছেন। যেমন ইমাম আবূ ইউসুফের ছাত্র ইসাম বিন ইউসুফ, আবূ ইসমাহ বালখী রুকূ যাওয়া ও রুকূ থেকে ওঠার সময় ‘রফয়ে য়্যাদাইন’ করতেন। *(আল-ফাওয়াইদ ১১৬পৃঃ)* বলাই বাহুল্য যে, তিনি দলীলের ভিত্তিতেই ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) এর বিপরীতও ফতোয়া দিতেন। *(আল-বাহরুর রাইক্ব ৬/৯৩, রসমুল মুফতী ১/২৮)* বলতে গেলে তিনিই ছিলেন প্রকৃত ইমাম আবূ হানীফার ভক্ত ও অনুসারী। কারণ, তিনি যে বলে গেছেন, ‘হাদীস সহীহ হলেই সেটাই আমার মযহাব।’

আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ তাঁর পিতা ইমাম আহমাদ (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, উক্ববাহ বিন আমের হতে বর্ণনা করা হয়, তিনি নামাযে ‘রফয়ে য়্যাদাইন’ প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘নামাযীর জন্য প্রত্যেক ইশারা (হাত তোলার) বিনিময়ে রয়েছে ১০টি করে নেকী।’ *(মাসাইল ৬০পৃঃ)*

আল্লামা আলবানী বলেন, হাদীসে কুদসীতে উক্ত কথার সমর্থন ও সাক্ষ্য মিলে; “যে ব্যক্তি একটি নেকী করার ইচ্ছা করার পর তা আমলে পরিণত করে, তার জন্য ১০ থেকে ৭০০ নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়---।” *(বুঃ, মুঃ, সতাঃ ১৬ নং, সিসানঃ ৫৬ ও ১২৮-১২৯পৃঃ)* যেহেতু ‘রফয়ে য়্যাদাইন’ হল সুন্নাহ। আর সুন্নাহর উপর আমল নেকীর কাজ বৈকি?

দেহে শাল জড়ানো থাকলে শালের ভিতরেও কাঁধ বরাবর হাত তোলা সুন্নত।

ওয়াইল বিন হুজ্‌র ﷺ বলেন, ‘আমি শীতকালে নবী ﷺ এর নিকট এলাম। দেখলাম, তাঁর সাহাবীগণ নামাযে তাঁদের কাপড়ের ভিতরেই ‘রফয়ে য়্যাদাইন’ করছেন।’ *(আদাঃ ৭২৯ নং)*

‘রফয়ে য়্যাদাইন’ হল মহানবী ﷺ এর সুন্নাহ ও তরীকা। তার পশ্চাতে হিকমত বা যুক্তি না জানা গেলেও তা সুন্নাহ ও পালনীয়। তবুও এর পশ্চাতে যুক্তি দর্শিয়ে অনেকে বলেছেন, হাত তোলায় রয়েছে আল্লাহর প্রতি যথার্থ তা’যীম; বান্দা কথায় যেমন ‘আল্লাহ সবার চেয়ে বড়’ বলে, তেমনি তার ইশারাতেও তা প্রকাশ পায়। উক্ত সময়ে এই অর্থ মনে আনলে বান্দার নিকট থেকে দুনিয়া অদৃশ্য হয়ে যায়। নেমে আসে সে রাজাধিরাজ বিশ্বাধিপতির ভীতি ও তা’যীম।

কেউ বলেন, হাত তোলা হল বান্দা ও আল্লাহর মাঝে পর্দা তোলার প্রতি ইঙ্গিত। যেহেতু এটাই হল বিশেষ মুনাজাতের সময়। একান্ত গোপনে বান্দা আল্লাহর সাথে কথা বলে থাকে।

কেউ বলেন, এটা নামাযের এক সৌন্দর্য ও প্রতীক। *(মুমঃ ৩/৩৪)*

কেউ বলেন, ‘রফয়ে য়্যাদাইন’ হল আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করার প্রতি ইঙ্গিত।

অপরাধী যখন পুলিশের রিভালভারের সামনে হাতে-নাতে ধরা পড়ে, তখন সে আত্মসমর্পণ করে হাত দু'টিকে উপর দিকে তুলে অনায়াসে নিজেকে সঁপে দেয় পুলিশের হাতে। অনুরূপ বান্দাও আল্লাহর নিকট অপরাধী। তাই বারবার হাত তুলে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করা হয়। *(কাইফা তাখশাঈনা ফিস স্বালাহ ৩১পৃঃ দ্রঃ)*

পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর বিকৃত-প্রকৃতির চিন্তাবিদ রয়েছেন, যাঁরা এর যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলেন, 'সাহাবীরা বগলে মূর্তি (বা মদের বোতল) ভরে রেখে নামায পড়তেন! কারণ ইসলামের শুরুতে তখনো তাঁদের মন থেকে মূর্তির (বা মদের বোতলের)মহব্বত যায় নি। তাই নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে বারবার হাত তুলতে আদেশ করেছিলেন। যাতে কেউ আর বগলে মূর্তি (বা মদের বোতল) দাবিয়ে রাখতে না পারে।' (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক।) বক্তার উদ্দেশ্য হল, 'রফয়ে য়্যাদাইন'-এর প্রয়োজন তখনই ছিল। পরবর্তীকালে সাহাবীদের মন থেকে মূর্তি (বা মদের বোতলে)র মায়া চলে গেলে তা মনসূখ করা হয়!!

এই শ্রেণীর যুক্তিবাদীরা আরো বলে থাকেন, 'সে যুগে ক্ষুর-ব্লেড ছিল না বলেই দাড়ি রাখত! সে যুগের লোকেরা খেতে পেত না বলেই রোযা রাখত---!!' অর্থাৎ বর্তমানে সে অভাব নেই। অতএব দাড়ি ও রোযা রাখারও কোন প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা নেই। এমন বিদ্রূপকারী যুক্তিবাদীদেরকে মহান আল্লাহর দু'টি আয়াত স্মরণ করিয়ে দিই, তিনি বলেন, "আর যারা মু'মিন নারী-পুরুষদেরকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট গোনাহর ভার নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নেয়।" *(কুঃ ৩৩/৫৮)* "অতঃপর ওরা যদি তোমার (নবীর) আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না।" *(কুঃ ২৮/৫০)*

পরন্তু 'রফয়ে য়্যাদাইন' করতে সাহাবাগণ আদিষ্ট ছিলেন না। বরং হযরত রসূলে কারীম ﷺ খোদ এ আমল করতেন। সাহাবাগণ তা দেখে সে কথার বর্ণনা দিয়েছেন এবং আমল করেছেন। তাহলে বক্তা কি বলতে চান যে, 'তিনিও প্রথম প্রথম বগলে মূর্তি দেবে রেখে নামায পড়তেন এবং তাই হাত ঝাড়তেন?! (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক।)

পক্ষান্তরে ঐ শ্রেণীর নামাযী বক্তারাও তাকবীরে তাহরীমার সময় 'রফয়ে য়্যাদাইন' করে থাকেন। তাহলে তা কেন করেন? এখনো কি তাঁদের বগলে মূর্তিই থেকে গেছে? সুতরাং যুক্তি যে খোঁড়া তা বলাই বাহুল্য।

প্রকাশ থাকে যে, 'রফয়ে য়্যাদাইন' না করার হাদীস সহীহ হলেও তা নেতিবাচক এবং এর বিপরীতে একাধিক হাদীস হল ইতিবাচক। আর ওসূলের কায়দায় ইতিবাচক নেতিবাচকের উপর প্রাধান্য পায়। তাছাড়া কোন যয়ীফ হাদীস এক বা ততোধিক সহীহ হাদীসকে মনসূখ করতে পারে না। অতএব মনসূখের দাবী যথার্থ নয় এবং এ সুন্নাহ বর্জনও উচিত নয়।

রুকূ ও তার পদ্ধতি

‘রফয়ে য়্যাদাইন’ করে নবী মুবাশ্শির ﷺ তকবীর বলে রুকূতে যেতেন। রুকূ করা ফরয। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا.....﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদাগণ! তোমরা রুকূ ও সিজদা কর---। *(কুঃ ২২/৭৭)*

মহানবী ﷺ ও নামায ভুলকারী সাহাবীকে তকবীর দিয়ে রুকূ করতে আদেশ করে বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে কারো নামায ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে উত্তমরূপে ওযু করে---- অতঃপর তকবীর দিয়ে রুকূ করে এবং উভয় হাঁটুর উপর হাত রেখে তার হাড়ের জোড়গুলো স্থির ও শ্রান্ত হয়ে যায়।” *(আদাঃ ৮৫৭, নাঃ, হাঃ)*

রুকূতে ঝুঁকে তিনি হাতের চেটো দু’টোকে দুই হাঁটুর উপর রাখতেন। *(বুঃ, আদাঃ, তিঃ, মিঃ ৮০১ নং)* আর এইভাবে রাখতে আদেশও দিতেন। হাত দ্বারা হাঁটুকে শক্ত করে ধরতেন। *(বুঃ, আদাঃ, মিঃ ৭৯২ নং)* হাতের আঙ্গুলগুলোকে খুলে (ফাঁক ফাঁক করে) রাখতেন। *(হাঃ, সআদাঃ ৮০৯ নং)* আর এইরূপ করতে তিনি নামায ভুলকারী সাহাবীকে আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, “যখন রুকূ করবে তখন তুমি তোমার হাতের চেটো দু’টোকে তোমার দুই হাঁটুর উপর রাখবে। অতঃপর আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁক রাখবে। অতঃপর স্থির থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গ স্ব-স্ব স্থানে বসে না যায়।” *(ইখুঃ ৫৯৭ নং, ইহিঃ)*

এই রুকূর সময় তিনি তাঁর হাতের দুই কনুইকে পাঁজর থেকে দূরে রাখতেন। *(তিঃ, ইখুঃ, মিঃ ৮০১নং)* এই সময় তিনি তাঁর পিঠকে বিছিয়ে লম্বা ও সোজা রাখতেন। কোমর থেকে পিঠকে মচকে যাওয়া ডালের মত ঝুঁকিয়ে দিতেন। *(বুঃ ৮২৮, বাঃ, মিঃ ৭৯২নং)* তাঁর পিঠ এমন সোজা ও সমতল থাকত যে, যদি তার উপর পানি ঢালা হত তাহলে তা কোন দিকে গড়িয়ে পড়ে যেত না। *(ত্বাবা,কাবীরসাগীর,আঃ ১/১২৪,ইমাঃ ৮৭২)*

তিনি নামায ভুলকারী সাহাবীকে আদেশ করে বলেছিলেন, “যখন তুমি রুকূ করবে, তখন তোমার দুই হাতের চেটোকে দুই হাঁটুর উপর রাখবে, তোমার পিঠকে সটান বিছিয়ে দেবে এবং দৃঢ়ভাবে রুকূ করবে।” *(আঃ, আদাঃ)*

রুকূতে তিনি তাঁর মাথাকেও সোজা রাখতেন। পিঠ থেকে মাথা না নিচু হত, না উঁচু। *(আদাঃ, বুঃ জুযউল ক্বিরাআহ, মুঃ, আআঃ, মিঃ ৮০১ নং)* আর নামাযে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হত সিজদার স্থানে। *(বাঃ, হাঃ, ইগঃ ৩৫৪নং)*

রুকূতে স্থিরতার গুরুত্ব

নবী মুবাশ্শির ﷺ রুকূতে স্থিরতা অবলম্বন করতেন। এ ব্যাপারে তিনি নামায ভুলকারী সাহাবীকে আদেশও করেছেন। আর তিনি বলতেন, “তোমরা তোমাদের রুকূ ও সিজদাকে পরিপূর্ণরূপে আদায় কর। সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, আমি আমার পিঠের পিছন থেকে তোমাদের রুকূ ও সিজদাহ করা দেখতে পাই। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৮৬৮নং)*

তিনি এক নামাযীকে দেখলেন, সে পূর্ণরূপে রুকূ করে না, আর সিজদাহ করে ঠক্ঠক করে। বললেন, “যদি এই ব্যক্তি এই অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সে মুহাম্মাদের মিল্লত ছাড়া অন্য মিল্লতে থাকা অবস্থায় মারা যাবে। ঠক্ঠক্ করে নামায পড়ছে; যেমন কাক ঠক্ঠক্ করে রক্ত ঠুকরে খায়! যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে রুকূ করে না এবং ঠক্ঠক্ করে সিজদাহ করে, সে তো সেই ক্ষুধার্ত মানুষের মত, যে একটি অথবা দু’টি খেজুর খায়, যাতে তার ক্ষুধা মিটে না।” *(আবু য়্যা’লা, আজুরী, বাঃ, ত্বাবাঃ, যিয়া, ইবনে আসাকির, ইখুঃ, সিসানঃ ১৩১পৃঃ)*

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, ‘আমার বন্ধু আমাকে নিষেধ করেছেন যে, আমি যেন মোরগের দানা খাওয়ার মত ঠক্ঠক্ করে নামায না পড়ি, শিয়ালের মত (নামাযে) চোরা দৃষ্টিতে (এদিক-ওদিক) না তাকাই, আর বানরের বসার মত (পায়ের রলা খাড়া করে) না বসি।’ *(ত্বায়ালিসী, আঃ ২/২৬৫, ইআশাঃ)*

তিনি বলতেন, “সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হল সেই ব্যক্তি, যে তার নামায চুরি করে।” লোকেরা বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! নামায কিভাবে চুরি করবে?’ বললেন, “পূর্ণরূপে রুকূ ও সিজদাহ না করে।” *(ইআশাঃ ২৯৬০ নং, ত্বাবা, হাঃ)*

একদা তিনি নামায পড়তে পড়তে দৃষ্টির কোণে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি তার রুকূ ও সিজদায় মেরুদন্ড সোজা করে না। নামায শেষ করে তিনি বললেন, “হে মুসলিম দল! সেই নামাযীর নামায হয় না, যে রুকূ ও সিজদায় তার মেরুদন্ড সোজা করে না।” *(ইআশাঃ ২৯৫৭, ইমাঃ, আঃ, সিসঃ ২৫৩৬ নং)*

তিনি আরো বলেন, “সে নামাযীর নামায যথেষ্ট নয়, যে রুকূ ও সিজদায় তার পিঠ সোজা করে না।” *(আদাঃ ৮৫৫নং, আআঃ)*

রুকূর গুরুত্ব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি একটি রুকূ অথবা সিজদাহ করে, সে ব্যক্তির তার বিনিময়ে একটি মর্যাদা উন্নত হয় এবং একটি পাপ মোচন হয়ে যায়।” *(আঃ, বাযযার, দাঃ, সতাঃ ৩৮৫নং)*

রুকূর যিক্র

মহানবী ﷺ রুকূতে গিয়ে কয়েক প্রকার দুআ ও যিক্র পড়তেন। কখনো এটা কখনো ওটা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম দুআ পাঠ করতেন। যেমনঃ-

১। **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم**

উচ্চারণঃ- সুবহা-না রাব্বিয়াল আযীম।

অর্থঃ- আমি আমার মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

এটি তিনি ৩ বার পাঠ করতেন। *(আদাঃ, ইমাঃ, দারাঃ, ত্বাহা, বাযযার, ইখুঃ ৬০৪নং, ত্বাবাঃ)*

অবশ্য কোন কোন সময়ে তিনের অধিকবারও পাঠ করতেন। কারণ, কখনো কখনো তাঁর রুকূ ও সিজদাহ কিয়ামের মত দীর্ঘ হত। *(সিসানঃ ১৩২পৃঃ)*

২। **سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ.**

উচ্চারণ- সুবহা-না রাব্বিয়াল আযীম অবিহামদিহ।

অর্থ- আমি আমার মহান প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ৩ বার। *(আদাঃ ৮৮৫নং, দারাঃ, আঃ, ত্বাবাঃ, বাঃ)*

৩। سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

উচ্চারণঃ- সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি অর্রূহ।

অর্থ- অতি নিরঞ্জন, অসীম পবিত্র ফিরিশ্তামন্ডলী ও জিবরীল (আঃ) এর প্রভু (আল্লাহ)। *(মুঃ, আআঃ, মিঃ ৮৭২ নং)*

৪। سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللّهُمَّ اغْفِرْلِيْ.

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রব্বানা অবিহামদিকা,আল্লা-হুম্মাগ্‌ ফিরলী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাকে মাফ কর।

উক্ত দুআ তিনি অধিকাংশ পাঠ করতেন। এ ব্যাপারে তিনি কুরআনের নির্দেশ পালন করতেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৮৭১নং)* যেহেতু কুরআনে আল্লাহ তাঁকে আদেশ করেছেন,

﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি তোমার প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তিনি তওবা গ্রহণকারী। *(কুঃ ১১০/৩)*

৫। اَللّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ رَبِّيْ خَشَعَ سَمْعِيْ

وَبَصَرِيْ وَدَمِيْ وَلَحْمِيْ وَعَظْمِيْ وَ عَصَبِيْ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা লাকা রাকা'তু অবিকা আ-মানতু অলাকা আসলামতু অ আলাইকা তাওয়াক্কালতু আন্তা রাব্বী, খাশাআ সাময়ী, অ বাস্বারী অ দামী অ লাহমী অ আযমী অ আস্বাবী লিল্লা-হি রাব্বিল আলামীন।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকু করলাম, তোমারই প্রতি বিশ্বাস রেখেছি, তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তুমি আমার প্রভু। আমার কর্ণ, চক্ষু, রক্ত, মাংস, অস্থি ও ধমনী বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য বিনয়াবনত হল। *(মুঃ, সনাঃ ১০০৬ নং)*

৬। سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

উচ্চারণঃ- সুবহা-না যিল জাবারূতি অল মালাকূতি অল কিবরিয়া-ই অল আযামাহ।

অর্থ- আমি প্রবলতা, সার্বভৌমত্ব, গর্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী (আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণা করি।

এই দুআটি তিনি তাহাজ্জুদের নামাযের রুকূতে পাঠ করতেন। *(আদাঃ ৮৭৩, সনাঃ ১০০৪ নং)*

রুকূর আনুষঙ্গিক মাসায়েল

নবী মুবাশ্শির ﷺ এর রুকূ, রুকূর পর কওমাহ, সিজদাহ এবং দুই সিজদার মাঝের বৈঠক প্রায় সমপরিমাণ দীর্ঘ হত। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৮৬৯ নং)*

রুকূ ও সিজদাতে তিনি কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন, "শোন! আমাকে নিষেধ করা হয়েছে যে, আমি যেন রুকূ বা সিজদাহ অবস্থায় কুরআন না পড়ি। সুতরাং রুকূতে তোমার প্রতিপালকের তা'যীম বর্ণনা কর। আর সিজদায় অধিকাধিক দুআ করার চেষ্টা কর। কারণ তা (আল্লাহর নিকট) গ্রহণ-যোগ্য।" *(মুঃ, মিঃ ৮৭৩নং)*

যেহেতু আল্লাহর কালাম (বাণী)। সবচেয়ে সম্মানিত বাণী। আর রুকূ ও সিজদার অবস্থা হল বান্দার পক্ষে হীনতা ও বিনয়ের অবস্থা। তাই আল্লাহর বাণীর প্রতি আদব রক্ষার্থে উক্ত উভয় অবস্থাতেই কুরআন পাঠ সঙ্গত নয়। বরং এর জন্য উপযুক্ত অবস্থা হল কিয়ামের অবস্থা। *(মাদারিজুস সা-লিকীন ২/৩৮৫)*

উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ নামাযের একই রুকূতে কয়েক প্রকার যিক্র এক সঙ্গে পাঠ দূষণীয় নয়। *(মুমঃ ৩/ ১৩৩, সিসানঃ ১৩৪পৃঃ)*

কওমাহ

অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ রুকূ থেকে মাথা ও পিঠ তুলে সোজা খাড়া হতেন। এই সময় তিনি বলতেন,

سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَه.

"সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ।" (অর্থাৎ, আল্লাহর যে প্রশংসা করে তিনি তা শ্রবণ করেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৭৯৯ নং)*

নামায ভুলকারী সাহাবীকে তিনি এ কথা বলতে আদেশ করে বলেছিলেন, "কোন লোকেরই নামায ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তকবীর দিয়েছে ---- অতঃপর রুকূ করেছে --- অতঃপর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে সোজা খাড়া হয়েছে।" *(আদাঃ ৮৫৭ নং, হাঃ)*

এই সময়েও তিনি উভয় হাতকে কাঁধ অথবা কানের উপরিভাগ পর্যন্ত তুলতেন; যেমন এ কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

মালেক বিন হুয়াইরিস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ তাকবীরে তাহরীমার সময় কান বরাবর উভয় হাত তুলতেন। আর যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলতেন ও 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতেন তখনও অনুরূপ হাত তুলতেন।' *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৭৯৫নং)*

উক্ত কওমায় তিনি এরূপ খাড়া হতেন যে, মেরুদন্ডের প্রত্যেক (৩৩ খানা) হাড় নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যেত। *(বুঃ ৮২৮, আদাঃ, মিঃ ৭৯২নং)*

তিনি বলতেন, “ইমাম বানানো হয় তার অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে। সুতরাং ---সে যখন ‘সামিআল্লাহু ---’ বলবে তখন তোমরা ‘রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দ’ বল। আল্লাহ তোমাদের প্রশংসা শ্রবণ করবেন। কারণ, আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা তাঁর নবী ﷺ এর মুখে বলেছেন, ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ (অর্থাৎ, আল্লাহর যে প্রশংসা করে তিনি তা শ্রবণ করেন)। *(মুঃ ৪০৪, আআঃ, আঃ, আদাঃ ৯৭২নং)*

অন্য এক হাদীসে তিনি উক্ত কথা বলার ফযীলত প্রসঙ্গে বলেন, “---যার ঐ কথা ফিরিশ্তাবর্গের কথার সমভাব হবে, তার পূর্বেকার পাপসমূহ মাফ হয়ে যাবে।” *(বুঃ, মুঃ, তিঃ, আদাঃ, ইমাঃ, নাঃ, মিঃ ৮৭৪নং)*

পূর্বের বর্ণনা থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, ইমাম ‘সামিআল্লাহু ---’ বললে মুক্তাদী ‘রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দ’ বলবে। তবে এখানে এ কথা নিশ্চিত নয় যে, মুক্তাদী ‘সামিআল্লাহু ---’ বলবে না। বরং মুক্তাদীও উভয় বাক্যই বলতে পারে। যেহেতু আল্লাহর নবী ﷺ উভয়ই বলেছেন। *(দেখুন, মুঃ, আদাঃ, প্রভৃতি, মিঃ ৭৯৩নং, সিসানঃ ১৩৫-১৩৬পৃঃ)*

কওমার দুআ

১। **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৭৯৩, ৭৯৯নং)*

২। **ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ** *(বুঃ ৮০৩ নং, প্রমুখ)*

৩। **اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** *(বুঃ ৭৯৬, মুঃ, প্রভৃতি, মিঃ ৮৭৪নং)*

৪। **اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ** *(বুঃ ৭৯৫নং, মুঃ, প্রমুখ)*

উচ্চারণঃ- রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ, অথবা রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দ, অথবা আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ, অথবা আল্লাহুম্মা রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দ।

অর্থঃ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই নিমিত্তে যাবতীয় প্রশংসা।

৫। **رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْراً طَيِّباً مُّبَارَكاً فِيْهِ**

উচ্চারণঃ- রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দু হামদান কাসীরান ত্বাইয়িবাম মুবা-রাকান ফীহ। (বুঃ ৭৯৮, মাঃ ৪৯৪, আদাঃ ৭৭০নং)

অন্য এক বর্ণনায় নিম্নের শব্দগুলো বাড়তি আছে,

... مُبَارَكاً عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى.

‘---মুবারাকান আলাইহি কামা য়্যুহিব্বু রাব্বুনা অয়্যারয়া। *(আদাঃ ৭৭৩, তিঃ ৪০৫, সনাঃ ৮৯২-৮৯৩নং)* অবশ্য উক্ত বর্ণনায় হাঁচির কথাও উল্লেখ আছে। যাতে মনে হয় যে, বর্ণনাকারী রিফাআহ বিন রাফে’ ؓ এর হাঁচিও ঐ সময়েই এসেছিল। *(ফবাঃ ২/৩৩৪)* নামায শেষে নবী ﷺ বললেন, “নামাযে কে কথা বলল?” রিফাআহ বললেন, ‘আমি।’ বললেন, “আমি ত্রিশাধিক ফিরিশ্তাকে দেখলাম, তাঁরা দুআটিকে (আমলনামায়) প্রথমে লিখার জন্য আপোসে প্রতিযোগিতা করছে!”

পূর্ণ দুআটির অর্থঃ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা, অগণিত পবিত্রতা ও বর্কতময় প্রশংসা (যেমন আমাদের প্রতিপালক ভালোবাসেন ও সন্তুষ্ট হন।)

উক্ত হাদীসকে ভিত্তি করে অনেকে মনে করেন যে, কওমার দুআ সশব্দে পড়া চলবে। কিন্তু ব্যাপারটা ছিল আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। তাইতো রিফাআহ ছাড়া আর কেউ উক্ত দুআ সশব্দে বলেছেন বা ঐ দিন ছাড়া অন্য দিনও কেউ বলেছেন কি না তার কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং কওমার দুআ সশব্দে পড়া বিধেয় নয়। *(মবঃ ২৬/৯৮)* বড়জোর এ কথা বলা যায় যে, কেউ কেউ কোন কোন সময় সশব্দে পড়তে পারে। কিন্তু শর্ত হলো, যেন অপর নামাযীর ডিস্টার্ব না হয়। *(ফবাঃ ২/৩৩৫)* কারণ, পরস্পর ডিস্টার্ব করে কুরআন পাঠও নিষেধ। *(মাঃ, আঃ ২/৩৬, ৪/৩৪৪)* সুতরাং উত্তম হলো নিঃশব্দে পড়াই।

৬। **رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّماوَاتِ وَ مِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ**

উচ্চারণঃ- রাব্বানা অলাকাল হামদু মিলআস সামা-ওয়া-তি অমিলআল আরযি অ মিলআ মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দ।

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই নিমিত্তে যাবতীয় প্রশংসা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ভরে এবং এর পরেও তুমি যা চাও সেই বস্তু ভরে।

এক বর্ণনায় এই দুআও বাড়তি আছে,

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّي الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَس.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ত্বাহ্হিরনী বিষষালজি অলবারাদি অলমা-ইল বা-রিদ। আল্লাহুম্মা ত্বাহ্হিরনী মিনায যুনূবি অলখাত্বায়্যা কামা য়্যুনাক্কাষ ষাওবুল আবয়্যাযু মিনাদ্ দানাস।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে বরফ, শিলাবৃষ্টি ও ঠান্ডা পানি দ্বারা পবিত্র করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে গোনাহ ও ত্রুটিসমূহ থেকে সেইরূপ পবিত্র কর, যেরূপ সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়। *(মুঃ ৪৭৬নং, প্রমুখ)*

৭। **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَ مِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ: اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.**

উচ্চারণঃ- রাব্বানা লাকাল হামদু মিলআস সামা-ওয়া-তি অল আরযি অমিলআ মা শি'তা মিন শাইয়িন বা'দ, আহলাস সানা-য়ি অলমাজ্দ। আহাক্কু মা ক্বা-লাল আব্দ, অকুল্লুনা লাকা আব্দ, আল্লা-হুম্মা লা মা-নিআ লিমা আ'ত্বাইতা অলা মু'ত্বিআ লিমা মানা'তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ্।

অর্থ- হে আমাদের প্রভু! তোমারই নিমিত্তে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পূর্ণ এবং এর পরেও যা চাও তা পূর্ণ যাবতীয় প্রশংসা। হে প্রশংসা ও গৌরবের অধিকারী! বান্দার সব চেয়ে সত্যকথা -এবং আমরা প্রত্যেকেই তোমার বান্দা, 'হে আল্লাহ! তুমি যা প্রদান কর তা রোধ

করার এবং যা রোধ কর তা প্রদান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না।’ *(মুঃ ৪৭৭)*

উক্ত দুই প্রকার দুআর শুরুতে ‘আল্লাহুম্মা---’ শব্দও কিছু বর্ণনায় বাড়তি আছে। *(আদাঃ ৮৪৬, ৮৪৭নং)*

৮। لِرَبِّىَ الْحَمْدُ لِرَبِّىَ الْحَمْدُ.

উচ্চারণ- লিরাব্বিয়াল হামদ, লিরাব্বিয়াল হামদ্।

অর্থ- আমার প্রভুর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা, আমার প্রভুর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা।

তাহাজ্জুদের নামাযে তিনি বারবার এটি পাঠ করতেন। যার ফলে এই কওমাহ তাঁর কিয়ামের সমান লম্বা হয়ে যেত; যে কিয়ামে তিনি সূরা বাক্বারাহ পাঠ করতেন! *(আদাঃ, নাঃ, ইগঃ ৩৩৫নং)*

কওমায় স্থিরতার গুরুত্ব

আল্লাহর রসূল ﷺ এর এই কওমাহ প্রায় তাঁর রুকূর সমান হত। বরং তিনি কখনো কখনো এত লম্বা দাঁড়াতেন যে, অনেকে মনে করত, তিনি হয়তো বা সিজদায় যেতে ভুলে গেছেন। *(বুঃ, মুঃ, আঃ, ইগঃ ৩০৭নং)*

নামায ভুলকারী সাহাবীকে তিনি এই কওমায় স্থিরতা অবলম্বন করতে আদেশ করে বলেছেন, “---অতঃপর মাথা তুলে সোজা খাড়া হবে; যাতে প্রত্যেক হাড় তার নিজের জায়গায় ফিরে যায়।”

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “যখন (রুকূ থেকে পিঠ) উঠাবে তখন পিঠ (মেরুদন্ড)কে সোজা কর। মাথাকে এমন সোজা করে তোল, যাতে সমস্ত হাড় নিজ নিজ জোড়ে ফিরে যায়।” *(বুঃ, মুঃ, দাঃ, হাঃ, আঃ, শাফেয়ী)*

তিনি আরো বলেনে, “আল্লাহ তাআলা সেই বান্দার নামাযের প্রতি তাকিয়েও দেখেন না, যে তার মেরুদন্ড (পিঠ)কে রুকূ ও সিজদার মাঝে সোজা করে না।” *(আঃ ২/৫২৫, ত্বাবা কাবীর)*

সুতরাং যাঁরা রুকূ থেকে সম্পূর্ণ খাড়া না হয়ে বা আধা খাড়া হয়ে হাঁটু ভেঙ্গে চট্‌পট্ সিজদায় চলে যান তাঁদের নামায কেমন হবে তা সহজে অনুমেয়।

কওমায় হাত কোথায় থাকবে?

সুন্নাহতে এ কথা স্পষ্ট যে, নামাযীর উভয় হাত নামাযে কিয়াম অবস্থায় বক্ষস্থলে থাকবে। কিন্তু ‘নামায’ ও ‘কিয়াম’ নির্দিষ্ট করে কোন্ অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

কিয়ামে হাত বাঁধা বলতেও কি (রুকূর আগের ও পরের) উভয় কিয়ামকেই বুঝায়?

প্রত্যেক হাড় তার স্বস্থানে বা নিজ জোড়ে ফিরে যায় বলতে কি হাতও নিজের জায়গায় ফিরে যায়? নাকি এখানে শুধু মেরুদন্ডের হাড়ের কথাই বুঝানো হয়েছে? হাড়গুলোর নিজের

জায়গায় বা জোড়ে ফিরে যাওয়ার অর্থে পুনঃ হাত বাঁধাও কি শামিল? নাকি উদ্দেশ্য হল উক্ত অবস্থায় পিঠ সোজা করে স্থির হওয়া (ইত্বমিনান)? হাত নিজের জায়গায় ফিরে গেলে, তার নিজের জায়গা বুকে থাকা অবস্থাটা, নাকি স্বাভাবিকভাবে ঝুলে থাকা অবস্থাটা?

বাস্তবপক্ষে 'নামায' ও 'কিয়াম' বলতে যদি রুকূর আগের কিয়াম (লম্বা দাঁড়ানো) ও রুকূর পরের কওমাহ (একটু দাঁড়ানো) উভয়কে এবং হাড় বলতে যদি হাতকেও তথা তার নিজ জায়গা বলতে বুকের উপরকে বুঝা হয়, তাহলে কওমাতেও বুকে হাত বাঁধা সুন্নত।

তাছাড়া (রুকূর আগের) কিয়ামে হাত বুকের উপর, রুকূ অবস্থায় হাঁটুর উপর, সিজদাহ অবস্থায় চেহারার দুই পাশে মুসাল্লায়, বসা অবস্থায় হাঁটু বা রানের উপর রাখার ব্যাপারে দলীল স্পষ্ট। কিন্তু রুকূর পর কওমার অবস্থায় হাত কোথায় থাকবে সে ব্যাপারে কোন প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট দলীল সুন্নাহতে নেই। অতএব অস্পষ্ট দলীলকে ভিত্তি করে বলা যায়, এই কিয়াম (কওমাহ)ও ঐ কিয়ামেরই মত। তাই উভয় অবস্থায় বুকে হাত বাঁধা সুন্নত। *(ইবনে বায, মাজমূআতু রাসাইল ফিস্ স্বালাহ, ১৩৪পৃঃ, ইবনে উসাইমীন, মুম ৩/১৪৬)*

পক্ষান্তরে সাহাবাগণের এত এত হাদীসে রসূল ﷺ এর নামায-পদ্ধতির সূক্ষ্ম বর্ণনা ও প্রত্যেক স্থানে হাত রাখার কথা উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হাদীস বা বর্ণনা না থাকার ফলে তা বিদআতও হতে পারে। *(আলবানী, সিসানঃ ১৩৯পৃঃ)*

সুতরাং বিষয়টি যে বিতর্কিত তা বলাই বাহুল্য। ফায়সালা ইজতিহাদের উপর। আর "মুজতাহিদ (আলেম) যখন ইজতিহাদ করে (কোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর চেষ্টা করে) এবং সে সঠিকতায় পৌঁছে যায়, তখন তার ডবল সওয়াব লাভ হয়। কিন্তু ইজতিহাদ করে ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছলেও তার (গোনাহ হয় না, বরং) একটি সওয়াব লাভ হয়।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৩৭৩২ নং)* এ ব্যাপারে কেউই অপরাধী নয়।

ইবনে উমার ﵄ বলেন, খন্দকের যুদ্ধ শেষে যখন নবী ﷺ ফিরে এলেন, তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বনী কুরাইযাহ ছাড়া অন্য স্থানে (আসরের) নামায না পড়ে।" পথে চলতে চলতে আসরের সময় উপস্থিত হল। একদল বলল, সেখানে না পৌঁছে আমরা নামায পড়ব না। (কারণ, তিনি সেখান ছাড়া অন্য স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।) অপর দল বলল, বরং আমরা পথেই নামায পড়ে নেব। (কারণ, নামাযের সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। তাছাড়া) তাঁর উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, আসরের সময় হলেও আমরা নামায পড়ব না। (বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, আমরা যেন তাড়াতাড়ি বনী কুরাইযায় পৌঁছে যাই, যাতে সেখানে গিয়ে আসরের সময় হয়। ফলে প্রথম দল পথি মধ্যে নামায পড়ল না। আর দ্বিতীয় দল পড়ে নিল।) অতঃপর নবী ﷺ এর নিকট ঘটনাটি খুলে বলা হলে তিনি কোন দলকেই ভর্ৎসনা করলেন না। *(বুঃ ৯৪৬ নং, মুঃ)*

যেহেতু তাঁদের দলীল ছিল দ্ব্যর্থবোধক। তাই প্রত্যেকের ধারণা এবং সিদ্ধান্তও ছিল সঠিক। আর তার জন্যই নিন্দার্হও হলেন না কেউ।

কওমায় হাত বাঁধার ব্যাপারটিও অনুরূপ ইজতিহাদী পর্যায়ের। দ্ব্যর্থবোধক বা অস্পষ্ট দলীল নিয়ে একে অন্যের নিন্দা করা অবশ্যই উচিত নয়।

ব্যাপারটি স্পষ্ট দলীল-ভিত্তিক নয় বলেই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) বলেছেন, 'নামাযীর ইচ্ছা হলে রুকূর পর উঠে নিজের হাত দু'টিকে ছেড়ে রাখবে, নচেৎ চাইলে বুকের উপর রাখবে।' *(মাসাইলু আহমাদ, সালেহ বিন ইমাম আহমাদ ২/২০৫, ফুরূ' ১/৪৩৩, মুবদি' ১/৪৫১, ইনসাফ ২/৬৩, শারহু মুন্তাহাল ইরাদাত ১/১৮৫, মুমঃ ৩/১৪৬)* আর তাঁর নিকট কিয়াম ও কওমাহ এক নয় বলেই কওমায় এই এখতিয়ার।

সুতরাং আপনার জন্যও এখতিয়ার রয়েছে কওমায় হাত বাঁধা বা না বাঁধার। তবে মনে রাখবেন যে, এটি একটি সন্দিগ্ধ সুন্নত। সুন্নত হলে এবং তা পালন করলে আপনি তার সওয়াবের অধিকারী হবেন। না মানলে অপরাধী বা গোনাহগার হবেন না। পক্ষান্তরে বিদআত হলে তা আপত্তিকর। পরন্তু সেটাও সন্দিগ্ধ। অতএব এ নিয়ে বাড়াবাড়ি এবং আপোসে মনোমালিন্য তথা বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য আনা আদৌ সমীচীন নয়।

সিজদাহ ও তার পদ্ধতি

কওমার পর নবী মুবাশ্‌শির ﷺ তকবীর বলে সিজদায় যেতেন। নামায ভুলকারী সাহাবীকে সিজদাহ করতে আদেশ দিয়ে বলেছিলেন, "স্থিরতার সাথে সিজদাহ বিনা নামায সম্পূর্ণ হবে না।" *(আদাঃ ৮৫৭ নং, হাঃ)*

সিজদায় যাওয়ার পূর্বে 'রফয়ে য়্যাদাইন' করার বর্ণনাও সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়। *(সনাঃ ১০৪০ নং, দারাঃ)* সুতরাং কখনো কখনো তা করলে কোন দোষ হবে না।

সিজদায় যাওয়ার সময় আল্লাহর নবী ﷺ তাঁর হাত দু'টিকে নিজ পাঁজর থেকে দূরে রাখতেন। *(আবূ য়্যা'লা, ইখুঃ ৬২৫ নং)*

এ সময় সর্বপ্রথম তিনি তাঁর হাত দু'টিকে মুসাল্লায় রাখতেন। তারপর রাখতেন হাঁটু। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলি অধিকতর সহীহ। *(সআদাঃ ৭৪৬, সনাঃ ১০৪৪, মিঃ ৮৯৯, ইগঃ ৩৫৭, সিসানঃ ১৪০পৃঃ, উদ্দাহ ৯৬পৃঃ)*

প্রথমে হাঁটু রাখার হাদীসও বহু উলামার নিকট শুদ্ধ। তাই তাঁদের নিকট উভয় আমলই বৈধ। সুবিধামত হাত অথবা হাঁটু আগে রাখতে পারে নামাযী। *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২২/৪৪৯, ফবাঃ ২/২৯১, উদ্দাহ ৯৬পৃঃ, ইবনে বায; কাইফিয়্যাতু স্বালাতিন নাবী ﷺ, মারাসা ১২৭পৃঃ, ইবনে উসাইমীন; রিসালাতুন ফী সিফাতি স্বালাতিন নাবী ﷺ ৯পৃঃ, মুমঃ ৩/১৬৫-১৫৭, ফাতহুল মা'বূদ বিসিহ্‌হাতি তাক্বদীমির রুকবাতাইনি ক্বাবলাল য়্যাদাইনি ফিস সুজূদ)*

তিনি বলতেন, "হাত দু'টিও সিজদাহ করে, যেমন চেহারা করে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ যখন (সিজদার জন্য) নিজের চেহারা (মুসাল্লায়) রাখবে, তখন যেন সে তার হাত দু'টিকেও রাখে এবং যখন চেহারা তুলবে, তখন যেন হাত দু'টিকেও তোলে।" *(ইখুঃ, হাঃ, আঃ, ইগঃ ৩১৩ নং)*

সিজদাহ করার সময় তিনি উভয় হাতের চেটোর উপর ভর দিতেন এবং চোটো দু'টিকে বিছিয়ে রাখতেন। *(আদাঃ, হাঃ, সিসানঃ ১৪১পৃঃ)* হাতের আঙ্গুলগুলোকে মিলিয়ে রাখতেন। *(ইখুঃ, বাঃ, হাঃ ১/২২৭)* এবং কেবলামুখে সোজা করে রাখতেন। *(আদাঃ ৭৩২ নং, বাঃ, ইআশাঃ)*

হাতের চেটো দু'টিকে কাঁধের সোজাসুজি দুই পাশে রাখতেন। *(আদাঃ ৭৩৪, তিঃ, মিঃ ৮০১নং)* কখনো বা রাখতেন দুই কানের সোজাসুজি। *(আদাঃ ৭২৩, ৭২৬, সনাঃ ৮৫৬নং)*

কপালের সাথে নাকটিকেও মাটি বা মুসাল্লার সঙ্গে লাগিয়ে দিতেন। *(আদাঃ, ইগঃ ৩০৯ নং)*

তিনি বলতেন, "সে ব্যক্তির নামাযই হয় না, যে তার কপালের মত নাককেও মাটিতে ঠেকায় না।" *(দারাঃ ১৩০৪ নং, ত্বাবা)*

নামায ভুলকারী সাহাবীকে তিনি বলেছিলেন, "তুমি যখন সিজদাহ করবে, তখন তোমার মুখমন্ডল ও উভয় হাত (চেটো)কে মাটির উপর রেখো। পরিশেষে যেন তোমার প্রত্যেকটা হাড় স্বস্থানে স্থির হয়ে যায়।" *(ইখুঃ ৬৩৮ নং)*

এই সময় তাঁর উভয় হাঁটু এবং উভয় পায়ের পাতার শেষ প্রান্তও সিজদারত হত। পায়ের পাতা দু'টিকে তিনি (মাটির উপড়) খাড়া করে রাখতেন। *(আদাঃ ৮৭৯, সনাঃ ১০৫৩, ইমাঃ ৩৮৪১নং, বাঃ)* এবং খাড়া রাখতে আদেশও করেছেন। *(সতিঃ ২২৮নং, হাঃ)* পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কেবলার দিকে মুখ করে রাখতেন। *(বুঃ ৮২৮নং, আদাঃ)* গোড়ালি দু'টিকে একত্রে মিলিয়ে রাখতেন। *(ত্বাহা, ইখুঃ ৬৫৪ নং, হাঃ ১/২২৮)*

সুতরাং উক্ত ৭ অঙ্গ দ্বারা তিনি সিজদারত হতেন; মুখমন্ডল (নাক সহ কপাল) দুই হাতের চেটো, দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের পাতা।

তিনি বলেন, "আমি সাত অঙ্গ দ্বারা সিজদাহ করতে আদিষ্ট হয়েছি; কপাল, -আর কপাল বলে তিনি নাকেও হাত ফিরান- দুই হাত (চেটো), দুই হাঁটু এবং দুই পায়ের প্রান্তভাগ।" *(বুঃ, মুঃ, সজাঃ ১৩৬৯ নং)*

তিনি আরো বলেন, বান্দা যখন সিজদাহ করে, তখন তার সঙ্গে তার ৭ অঙ্গ সিজদাহ করে; তার চেহারা, দুই হাতের চেটো, দুই হাঁটু ও দুই পায়ের পাতা।" *(মুঃ, আআঃ, ইহিঃ, সনাঃ ১০৪৭, ইমাঃ ৮৮৫ নং)*

তিনি বলেন, আমি (আমরা) আদিষ্ট হয়েছি যে, (রুকূ ও সিজদার সময়) যেন পরিহিত কাপড় ও চুল না গুটাই।" *(বুঃ, মুঃ, সজাঃ ১৩৬৯ নং)*

এক ব্যক্তি তার মাথার লম্বা চুল পিছন দিকে বেঁধে রাখা অবস্থায় নামায পড়লে তিনি বলেন, "এ তো সেই ব্যক্তির মত, যে তার উভয় হাত বাঁধা অবস্থায় নামায পড়ে।" *(মুঃ ৪৯২, আআঃ, ইহিঃ, আদাঃ, ৬৪৭ নং, নাঃ, দাঃ, আঃ ১/৩০৪)* তিনি চুলের ঐ বাঁধনকে শয়তান বসার জায়গা বলে মন্তব্য করেছেন। *(আদাঃ ৬৪৬ নং, তিঃ, ইখুঃ, ইহিঃ)* এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আসছে 'নামাযে নিষিদ্ধ বা মকরূহ কর্মাবলী'র অধ্যায়ে।

আল্লাহর নবী ﷺ সিজদায় নিজের হাতের প্রকোষ্ঠ বা রলা দু'টিকে মাটিতে বিছিয়ে রাখতেন না। *(বুঃ ৮২৮ নং, আদাঃ)* বরং তা মাটি বা মুসাল্লা থেকে উঠিয়ে রাখতেন। অনুরূপ পাঁজর থেকেও দূরে রাখতেন। এতে পিছন থেকে তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখা যেত। *(বুঃ ৩৯০, মুঃ, ইগঃ ৩৫৯নং)* তাঁর হাত ও পাঁজরের মাঝে এত ফাঁক হত যে, কোন ছাগলছানা সেই ফাঁকে পার হতে চাইলে পার হতে পারত। *(মুঃ, আআঃ, আদাঃ ৮৯৮ নং, হাঃ ১/২২৮, ইহিঃ)*

সিজদার সময় তিনি কখনো কখনো হাত দুটিকে পাঁজর থেকে এত দূরে রাখতেন যে, তা দেখে কতক সাহাবী বলেন, 'আমাদের মনে (তাঁর কষ্ট হচ্ছে এই ধারণা করে) ব্যথা অনুভব হত।' *(আদাঃ ৯০০নং, ইমাঃ)*

এ ব্যাপারে তিনি আদেশ করে বলতেন, "যখন তুমি সিজদাহ কর, তখন তোমার হাতের

দুই চেটোকে (মাটির উপর) রাখ এবং দুই কনুইকে উপর দিকে তুলে রাখ।” *(মুঃ ৪৯৪নং, আআঃ)* “তোমরা সোজাভাবে সিজদাহ কর। তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কুকুরের মত দুই প্রকোষ্ঠকে বিছিয়ে না দেয়।” *(বুঃ ৮২২, মুঃ, আদাঃ, আঃ)* “তোমার দুই হাতের প্রকোষ্ঠকে হিংস্র জন্তুদের মত বিছিয়ে দিও না। দুই চেটোর উপর ভর কর ও পাঁজর থেকে (কনুই দু’টিকে) দূরে রাখ। এরূপ করলে তোমার সঙ্গে তোমার প্রত্যেক অঙ্গ সিজদাহ করবে।” *(ইখুঃ, হাঃ ১/২২৭)*

সিজদায় ধীরতার গুরুত্ব

ধীর-স্থিরভাবে সিজদাহ করা ওয়াজেব। তাড়াহুড়ো করে নামায শুদ্ধ হয় না। সিজদায় গিয়ে ধীরতা ও স্থিরতা অবলম্বন করে পিঠ সোজা না করলে এবং প্রত্যেক হাড় তার নিজের জোড়ে স্থিরভাবে বসে না গেলে মুরগীর দানা খাওয়ার মত নামায পড়া হয় ও নামায চুরি করা হয়। আর সিজদায় পিঠ সোজা না করলে নামাযও বাতিল পরিগণিত হয় -যেমন এসব কথা রুকূর বর্ণনায় আলোচিত হয়েছে।

সিজদার যিক্‌র ও দুআ

সিজদায় গিয়ে মহানবী ﷺ এক এক সময়ে এক এক রকম দুআ পাঠ করতেন। তাঁর বিভিন্ন দুআ নিম্নরূপঃ-

১। **سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلى.** (সুবহা-না রাব্বিয়্যাল আ’লা)

অর্থ- আমি আমার মহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। ৩ বার বা ততোধিক বার। (আদাঃ ৮৮৫নং, দারাঃ, ত্বাহা, বাযযার, ত্বাবা)

২। **سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلى وَ بِحَمْدِهِ.**

উচ্চারণঃ- সুবহা-না রাব্বিয়্যাল আ’লা অবিহামদিহ।

অর্থ- আমি আমার সুমহান প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি। ৩ বার। *(আদাঃ, আঃ, দারাঃ, বাঃ ২/৮৬, ত্বাবাঃ)*

৩। **سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.**

উচ্চারণঃ- সুব্বূহুন কুদ্দূসুন রাব্বুল মালা-ইকাতি অর্রূহ।

অর্থ- অতি নিরঞ্জন, অসীম পবিত্র ফিরিশ্তামন্ডলী ও জিবরীল (আঃ) এর প্রভু (আল্লাহ)। *(মুসলিম)*

৪। **سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللّهُمَّ اغْفِرْلِيْ.**

উচ্চারণঃ- সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রব্বানা অবিহামদিকা,আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাকে মাফ কর। *(বুখারী, মুসলিম)*

৫। **اَللّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ أَنْتَ رَبِّى سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِيْ**

خَلَقَهُ وَ صوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوْرَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা লাকা সাজাত্তু অ বিকা আ-মানতু অ লাকা আস্‌লামতু অ আন্তা রাব্বী, সাজাদা অজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু অ স্বাউওয়ারাহু ফাআহসানা সুয়ারাহু অ শাক্কা সামআহু অ বাস্বারাহু ফাতাবা রাকাল্লা-হু আহসানুল খা-লিক্বীন।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য সিজদাবনত, তোমাতেই বিশ্বাসী, তোমার নিকটেই আত্মসমর্পণকারী, তুমি আমার প্রভু। আমার মুখমন্ডল তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হল, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, ওর আকৃতি দান করেছেন এবং আকৃতি সুন্দর করেছেন। ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্‌গত করেছেন। সুতরাং সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! *(মুঃ ৭৭১, আদাঃ ৭৬০ নং, তিঃ, ইমাঃ, নাঃ, আঃ)*

৬। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ وَ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلاَنِيَّتَهُ وَسِرَّهُ.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী যামবী কুল্লাহ, অদিক্কাহু অজিল্লাহ, অআউওয়ালাহু অ আ-খিরাহ, অ আলা-নিয়্যাতাহু অসির্রাহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার কম ও বেশী, পূর্বের ও পরের, প্রকাশিত ও গুপ্ত সকল প্রকার গোনাহকে মাফ করে দাও। *(মুঃ ৪৮৩নং, আআঃ)*

৭। سَجَدَ لَكَ سَوَادِيْ وَخَيَالِيْ، وَآمَنَ بِكَ فُؤَادِيْ، أَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، هذِيْ يَدِيْ وَمَا □

جَنَيْتُ عَلى نَفْسِيْ.

উচ্চারণঃ- সাজাদা লাকা সাওয়া-দী অ খিয়ালী অ আ-মানা বিকা ফুআদী, আবূউ বিনি’মাতিকা আলাইয়্যা। হা-যী য়্যাদী অমা জানাইতু আলা নাফসী।

অর্থ- আমার দেহ ও মন তোমার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত, আমার হৃদয় তোমার উপর বিশ্বাসী। আমি আমার উপর তোমার অনুগ্রহ স্বীকার করছি। এটা আমার নিজের উপর অত্যাচারের সাথে (তোমার জন্য) আমার আনুগত্য। *(হাকেম, বাযযার, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/ ১২৮)*

৮। তাহাজ্জুদের নামাযের সিজদায় নিম্নের দুআগুলি পাঠ করা উত্তম।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ،

উচ্চারণ- সুবহা-কাল্লা-হুম্মা অ বিহামদিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত্।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করি, তুমি ছাড়া অন্য কোন সত্য মাবুদ নেই। *(মুঃ ৪৮৫নং, নাঃ, আআঃ)*

৯। سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ.

উচ্চারণঃ- সুবহা-না যিল জাবারূতি অল মালাকূতি অল কিবরিয়া-ই অল আযামাহ।

অর্থ- আমি প্রবলতা, সার্বভৌমত্ব, গর্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী (আল্লাহর) পবিত্রতা ঘোষণা করি। *(আবু দাউদ, নাসাঈ)*

১০। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী মা আসরারতু অমা আ’লানতু।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও। *(নাঃ ১০৭৬ নং, হাঃ, ইআশাঃ)*

১১। اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْراً وَّ فِيْ لِسَانِيْ نُوْراً وَّفِيْ سَمْعِيْ نُوْراً وَّفِيْ بَصَرِيْ نُوْراً وَّ مِنْ فَوْقِيْ نُوْراً وَّمِنْ تَحْتِيْ نُوْراً وَّعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْراً وَّعَنْ شِمَالِيْ نُوْراً وَّمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ

نُوْراً وَّمِنْ خَلْفِيْ نُوْراً وَّاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْراً وَّأَعْظِمْ لِيْ نُوْراً.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাজ্‌আল ফী ক্বালবী নূরাঁউ অফী লিসা-নী নূরাঁউ অফী সাময়ী নূরাঁউ অফী বাস্বারী নূরাঁউ অমিন ফাউক্বী নূরাঁউ অমিন তাহতী নূরাঁউ অ আঁই য়্যামীনী নূরাঁউ অ আন শিমা-লী নূরাঁউ অমিন বাইনি য়্যাদাইয়্যা নূরাঁউ অমিন খালফী নূরাঁউ অজ্‌আল ফী নাফসী নূরাঁউ অ আ’যিম লী নূরা।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার হৃদয় ও রসনায় কর্ণ ও চক্ষুতে, উর্ধ্বে ও নিম্নে, ডাইনে ও বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে জ্যোতি প্রদান কর। আমার আত্মায় জ্যোতি দাও এবং আমাকে অধিক অধিক নূর দান কর। *(মুঃ ৭৬৩, সনাঃ ১০৭৩ নং, আআঃ, ইআশাঃ)*

১২। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلى نَفْسِكَ.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিরিয়া-কা মিন সাখাত্বিক, অবিমুআফা-তিকা মিন উকূবাতিক, অ আঊযু বিকা মিন্‌কা লা উহ্‌স্বী ষানা-আন আলাইকা আন্তা কামা আষনাইতা আলা নাফসিক্।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার সন্তুষ্টির অসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার ক্ষমাশীলতার অসীলায় তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার সত্তার অসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার উপর তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করতে পারি না, যেমন তুমি নিজের প্রশংসা নিজে করেছ। *(মুঃ, ইআশাঃ, সনাঃ ১০৫৩, ইমাঃ ৩৮৪১ নং)*

রুকূ ও সিজদাতে কুরআন পাঠ করতে মহানবী ﷺ নিষেধ করতেন এবং সিজদাতে অধিকাধিক দুআ করতে আদেশ করতেন। আর এ কথা রুকূর বর্ণনায় আলোচিত হয়েছে। তিনি আরো বলতেন, “সিজদাহ অবস্থায় বান্দা আপন প্রভুর সবচেয়ে অধিক নিকটতম হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ অবস্থায় তোমরা বেশী-বেশী করে দুআ কর।” *(মুঃ ৪৮২, আআঃ, বাঃ, ইগঃ ৪৫৬নং)*

উল্লেখ্য যে, সিজদায় প্রার্থনামূলক দুআ করার জন্য ৪, ৬, ১০, ১১ ও ১২নং যিক্র পঠনীয়। এ ছাড়া কুরআনী দুআ বা অন্য কোন সহীহ হাদীসের দুআ পাঠ করা দূষণীয় নয়। যেমন সিজদায় কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ হলেও দুআ হিসাবে কোন কুরআনী আয়াত দ্বারা প্রার্থনা করা নিষেধের আওতাভুক্ত নয়। *(মুমঃ ৩/ ১৮৪-১৮৫)*

দীর্ঘ সিজদাহ

মহানবী ﷺ এর সিজদা প্রায় রুকূর সমান লম্বা হত। অবশ্য কখনো কখনো কোন কারণে তাঁর সিজদাহ সাময়িক দীর্ঘও হত। শাদ্দাদ ﷺ বলেন, একদা যোহর অথবা আসরের নামায পড়ার উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের মাঝে বের হলেন। তাঁর কোলে ছিল হাসান অথবা হুসাইন। তিনি সামনে গিয়ে তাকে নিজের ডান পায়ের কাছে রাখলেন। অতঃপর তিনি তকবীর দিয়ে নামায শুরু করলেন। নামায পড়তে পড়তে তিনি একটি সিজদাহ (অস্বাভাবিক) লম্বা করলেন। (ব্যাপার না বুঝে) আমি লোকের মাঝে মাথা তুলে ফেললাম। দেখলাম, তিনি সিজদাহ অবস্থায় আছেন, আর তাঁর পিঠে শিশুটি চড়ে বসে আছে! অতঃপর পুনরায় আমি সিজদায় ফিরে গেলাম। আল্লাহর রসূল ﷺ নামায শেষ করলে লোকেরা তাঁকে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি নামায পড়তে পড়তে একটি সিজদাহ (অধিক) লম্বা করলেন। এর ফলে আমরা ধারণা করলাম যে, কিছু হয়তো ঘটল অথবা আপনার উপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে।'

তিনি বললেন, "এ সবের কোনটাই নয়। আসলে (ব্যাপার হল), আমার বেটা (নাতি) আমাকে সওয়ারী বানিয়ে নিয়েছিল। তাই তার মন ভরে না দেওয়া পর্যন্ত (উঠার জন্য) তাড়াতাড়ি করাটাকে আমি অপছন্দ করলাম।" *(সনাঃ ১০৯৩ নং, ইবনে আসাকির, হাঃ)*

ইবনে মসঊদ ﷺ বলেন, তিনি নামায পড়তেন, আর সিজদাহ অবস্থায় হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠে চড়ে বসত। লোকেরা তাদেরকে এমন করতে মানা করলে তিনি ইশারায় বলতেন, "ওদেরকে (নিজের অবস্থায়) ছেড়ে দাও।" অতঃপর নামায শেষ করলে তাদের উভয়কে কোলে বসিয়ে বলতেন, "যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে, সে যেন এদেরকে ভালোবাসে।" *(ইখুঃ ৮৮৭নং, বাঃ ২/২৬৩)*

প্রকাশ থাকে যে, অকারণে একটি ছেড়ে অন্য সিজদাহটিকে লম্বা করা বিধেয় নয়। তাই শেষ সিজদাহকে লম্বা করা বিদআত। *(ফইঃ ১/২৮৫)*

সিজদার মাহাত্ম্য

মা'দান বিন আবী তালহা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূলের স্বাধীনকৃত (মুক্ত) দাস সওবান ﷺ এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা করলে আমি জান্নাত প্রবেশ করতে পারব, (অথবা বললেন, আমি বললাম, আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমলের কথা বলে দিন।) কিন্তু উত্তর না দিয়ে তিনি চুপ থাকলেন। পুনরায় আমি একই আবেদন রাখলাম। তবুও তিনি নীরব থাকলেন। আমি তৃতীয়বার আবেদন পুনরাবৃত্তি করলাম। এবারে তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছি। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "তুমি আল্লাহর জন্য অধিকাধিক সিজদা করাকে অভ্যাস বানিয়ে নাও; কারণ যখনই তুমি আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তোমাকে এক মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং তার দরুন একটি গোনাহ মোচন করবেন।" *(মুসলিম ৪৮৮নং তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক বান্দাই, যখন সে আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করে তখনই তার বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য একটি সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন, তার একটি গোনাহ ক্ষালন করে দেন এবং তাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন। অতএব তোমরা বেশী বেশী করে সিজদা কর।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৩৭৯নং)*

রবীআহ বিন কা'ব ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথে রাত্রিবাস করতাম এবং তাঁর ওযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস হাজির করে দিতাম। একদা তিনি আমাকে বললেন, "তুমি আমার নিকট কিছু চাও।" আমি বললাম, 'আমি জান্নাতে আপনার সংসর্গ চাই।' তিনি বললেন, "এছাড়া আর কিছু?" আমি বললাম, 'ওটাই (আমার বাসনা)।' তিনি বললেন, "তাহলে অধিক অধিক সিজদা করে (নফল নামায পড়ে) এ ব্যাপারে আমার সহায়তা কর।" *(মুসলিম ৪৮৯ নং, আবু দাউদ, প্রমুখ)*

উম্মতে মুহাম্মাদীর মুখমন্ডল সিজদাহ ও ওযুর ফলে কিয়ামতের দিন জ্যোতির্ময় ও উজ্জ্বল হবে। *(আঃ ৪/ ১৮৯, তিঃ)*

"আল্লাহ তাআলা যখন জাহান্নামবাসীদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা দয়া প্রদর্শনের ইচ্ছা করবেন, তখন ফিরিশ্তাদেরকে আদেশ করবেন যে, 'যারা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করত তাদেরকে দোযখ থেকে বের কর।' ফিরিশ্তাবর্গ সেই ইবাদতকারী ব্যক্তিবর্গকে বের করবেন। তাঁরা তাদের (কপালে) সিজদার চিহ্ন দেখে চিনতে পারবেন। কারণ, আল্লাহ দোযখের জন্য সিজদার চিহ্ন খাওয়াকে (জ্বালানোকে) হারাম করে দিয়েছেন। ফলে ঐ সকল লোককে দোযখ থেকে বের করা (ও নিস্কৃতি দেওয়া) হবে। সুতরাং আদম-সন্তানের প্রত্যেক অঙ্গ দোযখ খেয়ে (জ্বালিয়ে) ফেলবে, কিন্তু সিজদার চিহ্নিত অঙ্গ খাবে না।" *(বুঃ ৮০৬, মুঃ ১৮২নং)*

মাটি, কাপড় ও চাটাই-এর উপর সিজদাহ

নবী মুবাশ্শির ﷺ অধিকাংশ মাটির উপরই সিজদাহ করতেন। কারণ, তাঁর মসজিদের মেঝেই ছিল মাটির। না ছিল তা পলস্তরা করা। আর না ছিল চাটাই, চট বা গালিচা বিছানো। ঐ মসজিদের ছাদও ছিল খেজুর ডালের। বৃষ্টির সময় কখনো কখনো ছাদ বেয়ে মসজিদের ভিতরে পানি পড়ত। এক রমযানের ২১ তারীখের রাতে তিনি পানি ও কাদাতেই সিজদাহ করেছিলেন। আবু সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ এর কপাল ও নাকে পানি ও কাদার চিহ্ন আমার উভয় চক্ষু প্রত্যক্ষ করেছে।' *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ২০৮৬ নং)*

পক্ষান্তরে তিনি কখনো কখনো চাটাই-এর উপরেও নামায পড়েছেন, কখনো সিজদাহ করেছেন (সিজদার জন্য চেহারা রাখার মত) ছোট চাটাই-এর উপর। *(বুঃ ৩৮০, ৩৮১নং, মুঃ)*

সাহাবাগণ রসূল ﷺ এর সাথে প্রচন্ড গরমে নামায পড়েছেন। সিজদার স্থান গরম থাকায় কপাল-নাক রাখতে না পারলে তাঁরা নিজের কাপড় সিজদার জায়গায় বিছিয়ে নিয়ে তার উপর সিজদাহ করতেন। *(বুঃ ৩৮৫নং, মুঃ)*

হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, সাহাবাগণ পাগড়ী ও টুপীর উপর (কপালে রেখে) এবং হাত

দু’টিকে আস্তিনের ভিতরে রেখে সিজদাহ করতেন। *(বুঃ, ফবাঃ ১/৫৮৭)*

বলাই বাহুল্য যে, কতক ‘দরবেশ-পন্থী’দের উক্তি ‘শয়তানের সিজদার জায়গায় সিজদাহ করতে নেই। সে আসমানে-জমীনে সিজদাহ করে তিল বরাবরও স্থান বাকী রাখেনি। অতএব মাটিতে সিজদাহ বৈধ নয়---’ ভিত্তিহীন এবং নামাযের প্রতি বিতৃষ্ণা ও অনীহার বড় দলীল। মুসলিম এমন কথায় ধোকা খায় না।

সিজদাহ থেকে মাথা তোলা

অতঃপর (সিজদার পর) নবী মুবাশ্শির ﷺ ‘আল্লাহু আকবার’ বলে তকবীর দিয়ে সিজদাহ থেকে মাথা তুলতেন। এ ব্যাপারে তিনি নামায ভুলকারী সাহাবীকে আদেশ করে বলেছেন, “কোন ব্যক্তির নামায ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না --- সিজদাহ করেছে ও তাতে তার সমস্ত হাড়ের জোড় স্থির হয়েছে। অতঃপর ‘আল্লাহু আকবার’ বলে মাথা তুলে সোজা বসে গেছে।” *(আদাঃ ৮৫৭ নং, হাঃ)*

এই তকবীরের সাথেও তিনি কখনো কখনো ‘রফয়ে য়্যাদাইন’ করতেন। *(আঃ, আদাঃ ৭৪০নং, সনাঃ ১০৪১, ১০৯৫ নং)* অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক নামাযে বা সর্বদা এই সময়ে বা বসা অবস্থায় হাত তুলতেন না। কারণ, আব্দুল্লাহ বিন উমার ﵁ বলেন, ‘নবী ﷺ সিজদার সময় বা বসা অবস্থায় হাত তুলতেন না।’ *(বুঃ, মুঃ, প্রমুখ, মিঃ ৭৯৩নং)* অনুরূপ বলেন হযরত আলী ﵁ ও। *(আদাঃ ৭৬১নং)*

মাথা তোলার পর তিনি তাঁর বাম পা-কে বিছিয়ে দিতেন ও তার উপর স্থির হয়ে বসে যেতেন। *(বুঃ, মুঃ ইগঃ ৩১৬নং)* পরন্তু তিনি নামায ভুলকারী সাহাবীকেও উক্ত আমল করার আদেশ দিয়ে বলেছিলেন, “যখন তুমি সিজদাহ থেকে মাথা তুলবে, তখন তোমার বাম ঊরুর উপর বসবে।” *(আঃ, আদাঃ ৮৫৯ নং)*

এরপর ডান পায়ের পাতাকে তিনি খাড়া রাখতেন। *(বুঃ, বাঃ, সিসানঃ ১৫১পৃঃ)* আর এই পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কেবলামুখী করে রাখতেন। *(সনাঃ ১১০৯ নং)*

কখনো কখনো তিনি এই বৈঠকে দুই পায়ের পাতাকে খাড়া রেখে পায়ের দুই গোড়ালির উপর বসতেন। এই প্রকার বৈঠক প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস ﵁ কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ‘এরূপ বসা সুন্নত।’ ত্বাউস বলেন, আমরা তাঁকে বললাম, ‘আমরা তো এটা নামাযীর জন্য কষ্টকর মনে করি।’ কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, ‘পরন্তু এটা তোমার নবী ﷺ এর সুন্নত (তরীকা)।’ *(মুঃ ৫৩৬নং, আআঃ, আবুশ শায়খ, আদাঃ ৮৪৫ নং, তিঃ, বাঃ)*

এই বৈঠকে স্থিরতার গুরুত্ব

দুই সিজদার মাঝে এই বৈঠকে আল্লাহর নবী ﷺ স্থির হয়ে বসে যেতেন এবং এতে তাঁর প্রত্যেক হাড় নিজের জায়গায় ফিরে যেত। *(আদাঃ ৭৩৪ নং, বাঃ)* তিনি নামায ভুলকারী সাহাবীকেও উক্তরূপে বসার আদেশ দিয়ে বলেছিলেন, “এভাবে সোজা ও স্থির হয়ে না বসলে কারো নামায সম্পূর্ণ হবে না।” *(আদাঃ ৮৫৭, হাঃ)*

এই বৈঠকে তিনি প্রায় ততটা সময় বসতেন, যতটা সময় ধরে তিনি সিজদাহ করতেন। *(বুঃ ৭৯২, মুঃ)* কখনো কখনো এত লম্বা বসতেন যে, সাহাবীগণ মনে করতেন, হয়তো তিনি (দ্বিতীয় সিজদাহ করতে) ভুলেই গেছেন। *(বুঃ ৮২১ নং, মুঃ)*

দুই সিজদার মাঝে বৈঠকের দুআ

১। اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ (وَاجْبُرْنِيْ وَارْفَعْنِيْ) وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী অরহামনী (অজবুরনী অরফা’নী) অহদিনী অ আ-ফিনী অরযুক্বনী।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, (আমার প্রয়োজন মিটাও, আমাকে উঁচু কর), পথ দেখাও, নিরাপত্তা দাও এবং জীবিকা দান কর। *(আদাঃ ৮৫০, তিঃ ২৮৪, ইমাঃ ৮৯৮নং, হাঃ)*

কোন কোন বর্ণনায় উক্ত দুআর শুরুতে ‘আল্লাহুম্মা’র পরিবর্তে ‘রাব্বি’ ব্যবহার হয়েছে। *(ইমাঃ ৮৯৮ নং)*

২। رَبِّ اغْفِرْ لِيْ، رَبِّ اغْفِرْ لِيْ (রাব্বিগফিরলী, রাব্বিগফিরলী)

অর্থ- হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর, হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর। *(আদাঃ ৮৭৪, ইমাঃ ৮৯৭নং)*

উক্ত দুআ তিনি তাহাজ্জুদের নামাযে পড়তেন। অবশ্য ফরয নামাযেও পড়া চলে। কারণ, পার্থক্যের কোন দলীল নেই। *(সিসানঃ ১৫৩পৃঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, এই বৈঠকে আঙ্গুল ইশারা করার হাদীস সহীহ নয়। *(মুত্বাসাঃ ৮২পৃঃ)*

দ্বিতীয় সিজদাহ

অতঃপর ‘আল্লাহু আকবার’ বলে তকবীর দিয়ে তিনি দ্বিতীয় সিজদাহ করতেন। এ বিষয়ে তিনি নামায ভুলকারী সাহাবীকে আদেশ দিয়েও বলেছিলেন, “--- অতঃপর তুমি ‘আল্লাহু আকবার’ বলবে। অতঃপর এমন সিজদাহ করবে, যাতে তোমার সমস্ত হাড়ের জোড়গুলো (নিজের জায়গায়) স্থির হয়ে যায়।” *(আদাঃ ৮৫৭ নং, হাঃ)*

এই তকবীরের সাথেও তিনি কখনো কখনো হাত তুলতেন। *(আআঃ, আদাঃ ৭৩৯নং)*

এই সিজদায় তিনি তাই করতেন, যা প্রথম সিজদায় করতেন। অতঃপর তিনি তকবীর দিয়ে সিজদাহ থেকে মাথা তুলতেন। এ ব্যাপারে তিনি নামায ভুলকারী সাহাবীকে আদেশ দিয়েও বলেছিলেন, “--- অতঃপর তুমি এইরূপ প্রত্যেক রুকূ ও সিজদায় করবে। এইরূপ করলেই তোমার নামায সম্পূর্ণ হবে। অন্যথা যদি এ সবের কিছু তুমি কম কর, তাহলে সেই পরিমাণে তোমার নামাযও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।” *(আঃ, তিঃ ৩০২, আদাঃ ৮৫৬নং)*

এই তকবীরের সাথেও তিনি কখনো কখনো ‘রফয়ে য়্যাদাইন’ করতেন। *(আআঃ, আদাঃ ৭৩৯নং)*

জালসা-এ ইস্তিরাহাহ

দ্বিতীয় সিজদাহ থেকে মাথা তুলে নবী মুবাশ্‌শির ﷺ পুনরায় বাম পায়ের উপর সোজা হয়ে বসে যেতেন। এতে তাঁর প্রত্যেক হাড় নিজ নিজ জায়গায় ফিরে যেত। *(বুঃ ৬৭৭, ৮২৩, আদাঃ ৭৩০, ৮৪২-৮৪৪, আঃ, তিঃ নাঃ, মিঃ ৭৯৬ নং)*

এই বৈঠককে 'জালসা-এ ইস্তিরাহাহ' আরামের বৈঠক বলা হয়। কারণ, এতে প্রথম ও তৃতীয় রাক্‌আত শেষ করে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাক্‌আত শুরু করার পূর্বে একটু আরাম নেওয়া হয় তাই।

মালেক বিন হুয়াইরিস ﵁ মহানবী ﷺ কে দেখেছেন, তিনি যখন তাঁর নামাযের বিজোড় রাকআতে থাকতেন, তখন সোজা বসে না যাওয়া পর্যন্ত (পরের রাকআতের জন্য) উঠে দাঁড়াতেন না। *(ঐ)* অনুরূপ দেখেছেন আবূ হুমাইদ ও আরো ১০ জন সাহাবা। *(ইগঃ ৩০৫নং, তামিঃ ২১১-২১২পৃঃ)*

অবশ্য সুন্নতের এই বৈঠকটি দুই সিজদার মাঝের বৈঠকের মত লম্বা হবে না। কেবল সোজা হওয়ার মত হাল্কা একটু বসতে হবে। তবে এতে পঠনীয় কোন যিক্‌র বা দুআ নেই।

দ্বিতীয় রাকআত

অতঃপর নবী মুবাশ্‌শির ﷺ মাটির উপর (দুই হাতের চেটোতে) ভর করে দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠে খাড়া হতেন। *(শাফেয়ী, বুঃ ৮২৪নং)* এক্ষণে তিনি হাত দু'টিকে খমীর সানার মত মাটিতে রাখতেন। *(আবূ ইসহাক হারবী, বাঃ, তামিঃ ১৯৬পৃঃ)* আরযাক বিন কইস বলেন, আমি দেখেছি, ইবনে উমার নামাযে যখন (পরবর্তী রাকআতের) জন্য উঠতেন, তখন মাটির উপর (হাতের) ভর দিয়ে উঠতেন। *(ত্বাবাঃ আউসাত্ব, তামিঃ ২০১পৃঃ)*

ইমাম ইসহাক বিন রাহুয়াইহ বলেন, 'নবী ﷺ হতে এই সুন্নাহ প্রচলিত হয়ে আসছে যে, বৃদ্ধ, যুবক প্রত্যেকেই নামাযের মধ্যে ওঠার সময় দুই হাতের উপর ভর করে উঠবে। *(ইগঃ ২/৮২-৮৩, সিসানঃ ১৫৫পৃঃ)*

পক্ষান্তরে যাঁরা ওয়াইল বিন হুজ্‌রের হাতের পূর্বে হাঁটু রাখার হাদীসকেও হাসান মনে করেন তাঁরা বলেন, নামাযীর জন্য আসান হলে উরুর উপর হাত রেখে উঠে দাঁড়াবে। নচেৎ কষ্ট হলে মাটির উপর হাত রেখে উঠবে। *(উদ্দাহ ৯৬পৃঃ, ইবনে বায, মারাসাঃ ১২৭পৃঃ, ইবনে উসাইমীন, রিসালাতুন ফী সিফাতি স্বালাতিন্নাবী ﷺ ১১পৃঃ, মুমঃ ৩/১৯০-১৯১)*

দ্বিতীয় রাকআতের জন্য উঠে মহানবী ﷺ চুপ না থেকে (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে) সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। *(মুঃ ৫৯৯ নং, আআঃ)* শুরুতে 'আউযু বিল্লাহ---'ও পড়া যায়। না পড়লেও ধর্তব্য নয়। *(মুমঃ ৩/১৯৬)*

সূরা ফাতিহা প্রত্যেক রাকআতে পাঠ করা ওয়াজেব। কারণ, তিনি নামায ভুলকারী সাহাবীকে প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়তে আদেশ করার পর বলেছিলেন, "---অতঃপর এইরূপ তুমি প্রত্যেক রাকআতে বা তোমার পূর্ণ নামাযে কর।" *(বুঃ, মুঃ, আঃ, আদাঃ)*

তাঁর অন্যান্য কর্মও প্রথম রাকআতের অনুরূপ হত। তবে প্রথম রাকআতের তুলনায় দ্বিতীয় রাকআতটি সংক্ষেপ ও ছোট হত। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৮২৮নং)*

তাশাহ্‌হুদের বৈঠক

দ্বিতীয় রাকআতের সকল কর্ম (শেষ সিজদাহ) শেষ করে মহানবী ﷺ দুই সিজদার মাঝের বৈঠকের মত বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসে যেতেন এবং ডান পায়ের পাতাকে খাড়া করে রাখতেন। *(বুঃ, আদাঃ ৭৩১নং)*

তাশাহ্‌হুদের জন্য বসতে আদেশ দিয়ে নামায ভুলকারী সাহাবীকে তিনি বলেছেন, "--- অতঃপর তুমি যখন নামাযের মাঝে বসবে, তখন স্থির হবে এবং বাম উরুকে বিছিয়ে দিয়ে তাশাহ্‌হুদ পড়বে।" *(আদাঃ ৮৬০ নং, বাঃ)*

আবূ হুরাইরা رضي الله عنه বলেন, আমার দোস্ত্‌ ﷺ আমাকে কুকুরের মত (দুই পায়ের রলাকে খাড়া রেখে, দুই পাছার উপর ভর করে ও হাত দু'টিকে মাটিতে রেখে) বসতে নিষেধ করেছেন। *(আঃ ২/২৬৫, ত্বায়ালিসী, ইআশাঃ)* উক্ত প্রকার বসাকে তিনি শয়তানের বৈঠক বলে অভিহিত করেছেন। *(মুঃ ৪৯৮নং, আআঃ)*

তাশাহ্‌হুদে বসে তিনি ডান হাতের চেটোকে ডান উরু (জাং) বা হাঁটুর উপর রাখতেন, আর বাম হাতের চেটোকে রাখতেন বাম জাং বা হাঁটুর উপর বিছিয়ে। *(মুঃ ৫৮০নং, আআঃ)* ডান হাতের কনুই-এর শেষ প্রান্ত ডান জাং-এর উপর রাখতেন। *(আদাঃ ৯৫৭নং, নাঃ)* অর্থাৎ কনুইকে পায়ের রলার উপর না রেখে উরুর উপর পাঁজরে লাগিয়ে রাখতেন।

এক ব্যক্তি নামাযে বাম হাতের উপর মাটিতে ঠেস দিয়ে বসলে তিনি তাঁকে বারণ করে বলেছিলেন, "এরূপ হল ইয়াহুদীদের নামায।" *(বাঃ, হাঃ, ইগঃ ৩৮০নং)* "এরূপ বসো না। কারণ, এটা তো তাদের বৈঠক, যাদেরকে আযাব দেওয়া হবে।" *(আঃ, আদাঃ, ইগঃ ৩৮০নং)* "এটা হল তাদের বৈঠক, যাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত।" *(আদাঃ ৯৯৩ নং, আরাঃ)*

তাশাহ্‌হুদের বৈঠকে তর্জনীর ইশারা

তিনি বাম হাতের চেটোকে বাম হাঁটুর উপর বিছিয়ে দিতেন। কখনো বাম হাঁটুকে বাম হাতের লোকমা বা গ্রাস বানাতেন। ডান হাতের (তর্জনী ছাড়া) সমস্ত আঙ্গুলগুলোকে বন্ধ করে নিতেন। আর তর্জনী (শাহাদতের) আঙ্গুল দ্বারা কেবলার দিকে ইশারা করতেন এবং তার উপরেই নিজ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতেন। *(মুঃ ৫৭৯, ৫৮০নং, আআঃ, ইখুঃ)* কখনো বা ইশারার সময় তিনি তাঁর বুড়ো আঙ্গুলকে মাঝের আঙ্গুলের উপর রাখতেন। *(মুঃ ৫৭৯নং, আআঃ)* আর উক্ত উভয় আঙ্গুলকে মিলিয়ে গোল বালার মত গোলাকার করে রাখতেন। *(আদাঃ ৯৫৭নং, নাঃ, ইখুঃ, ইহিঃ প্রভৃতি)*

কখনো বা (আরবীয়) আঙ্গুল গণনার হিসাবের ৫৩ গোনার মত করে রাখতেন। অর্থাৎ, কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমাকে চেটোর সাথে লাগিয়ে তর্জনীকে লম্বা ছেড়ে এবং বৃদ্ধার

মাথাকে তর্জনীর গোড়াতে লাগিয়ে রাখতেন। *(মুঃ ৫৮০, মিঃ ৯০৬নং)*

তিনি তর্জনীকে তুলে হিলিয়ে হিলিয়ে এর মাধ্যমে দুআ করতেন। *(সনাঃ ৮৫৬, ১২০৩ নং, দাঃ, আঃ ৪/৩১৮, ৫/৭২)* সুতরাং দুআ শেষ না করা (সালাম ফিরার পূর্ব) পর্যন্ত তর্জনী হিলানো সুন্নত। যেহেতু দুআ সালাম ফিরার পূর্বেই শেষ হয়ে থাকে। *(সিসানঃ ১৫৮-১৫৯ পৃঃ)*

তিনি বলতেন, "অবশ্যই ঐ তর্জনী শয়তানের পক্ষে লোহা অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক (খোঁচার দন্ড)। *(আঃ ২/১১৯, বাযযার, মাক্বদিসী, বাঃ, প্রমুখ)*

ইবনে উমার ﷺ বলেন, 'ঐ আঙ্গুলটি শয়তানের জন্য আঘাত-দন্ড। যে এইভাবে ইশারা করে, সে (নামাযে) উদাসীন হয় না।'

হুমাইদী বলেন, মুসলিম বিন আবী মারয়্যামের নিকট এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছে যে, সে শামের এক গির্জায় নামাযরত অবস্থায় কিছু নবীর ছবি দেখেছে; তাঁদের তর্জনী আঙ্গুলটি ঐরূপ ইশারা করা অবস্থায় ছিল। *(মুসনাদে হুমাইদী, আবূ য়্যা'লা, সিসানঃ ১৫৮পৃঃ)*

তিনি তর্জনী দ্বারা এই ইশারা ও হরকত প্রত্যেক তাশাহহুদে করতেন। তবে ঠিক কোন্ সময়ে হরকত করতেন বা হিলাতেন, সে বিষয়ে কোন বর্ণনা নেই। সুতরাং যেখানেই দুআ (প্রার্থনার) অর্থ পাওয়া যাবে সেখানেই তর্জনী হিলানো সুন্নত। *(মুমঃ ৩/২০২)* আর দুআর অর্থ না থাকলেও একটানা ক্রমাগত হিলিয়ে যাওয়া বিধেয় নয়।

তর্জনীর একটি মাত্র আঙ্গুল হিলিয়েই দুআ করা বিধেয়। মহানবী ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে দুই আঙ্গুল হিলিয়ে দুআ করছে। তিনি তাকে বললেন, "একটি আঙ্গুল হিলাও, একটি আঙ্গুল হিলাও।" আর এই সঙ্গে তিনি তর্জনীর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। *(ইআশাঃ, নাঃ, তিঃ, বাঃ, হাঃ, মিঃ ৯১৩নং)*

তাশাহ্‌হুদের গুরুত্ব

নবী মুবাশ্‌শির ﷺ প্রত্যেক দুই রাকআতে 'তাহিয়্যাহ' (তাশাহহুদ) পাঠ করতেন। *(মুঃ ৪৯৮, আআঃ)* বৈঠকের শুরুতেই তিনি বলতেন, "আত্ তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি---।" *(বাঃ, সিসানঃ ১৬০পৃঃ)* দুই রাকআত পড়ে 'তাশাহ্‌হুদ' পাঠ করতে ভুলে গেলে তিনি তার জন্য ভুলের সিজদাহ করতেন। *(বুঃ, মুঃ, ইগঃ ৩৩৮ নং)*

তিনি তাশাহ্‌হুদ পড়তে আদেশও করতেন। বলতেন, "যখন তোমরা প্রত্যেক দুই রাকআতে বসবে তখন 'আত্ তাহিয়্যাতু---' বল। অতঃপর তোমাদের প্রত্যেকের পছন্দমত দুআ বেছে নিয়ে আল্লাহ আযযা অজাল্লার নিকট প্রার্থনা করা উচিত।" *(সনাঃ ১১১৪ নং, আঃ, ত্বাবাঃ কাবীর)* এই তাশাহ্‌হুদ পড়তে তিনি নামায ভুলকারী সাহাবীকেও আদেশ করেছিলেন।

তাছাড়া তিনি সাহাবাগণকে 'তাশাহ্‌হুদ' শিখাতেন, যেমন কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। *(বুঃ, মুঃ ৪০৩নং)* তাশাহ্‌হুদ নিঃশব্দে পড়া সুন্নত। *(আদাঃ, হাঃ, মিঃ ৯১৮নং)*

তাশাহ্হুদের দুআ

১। তিনি সাহাবাগণকে যে তাশাহ্হুদ শিখিয়েছিলেন তা কয়েক প্রকারের। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ ইবনে মাসউদ ﵁ ও ইবনে ইমার ﵁ এর তাশাহ্হুদঃ-

اَلتَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

উচ্চারণঃ- আত্-তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি অস্স্বালা-ওয়া-তু অত্ত্বাইয়্যিবা-তু, আসসালা-মু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহ, আসসালা-মু আলাইনা অ আলা ইবা-দিল্লা-হিস্ব স্বা-লিহীন, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।

অর্থ- মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে। হে নবী! আপনার উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও তাঁর বর্কত বর্ষণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের উপর সালাম বর্ষণ হোক। আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষি দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল।

নামাযী যখন 'আস্সালা-মু আলাইনা অআলা ইবা-দিল্লা-হিস স্বা-লিহীন' বলে, তখন আকাশ ও পৃথিবীর সকল নেক বান্দার নিকট ঐ সালাম পৌঁছে থাকে। ইবনে মাসউদ ﵁ বলেন, নবী ﷺ এর জীবদ্দশায় আমরা এরূপ বলতাম। অতঃপর তাঁর ইন্তেকাল হলে আমরা বলতে লাগলাম, 'আসসালা-মু আলান নাবিয়্যি---।' *(বুঃ, মুঃ, ইআশাঃ, আবূ য়্যা'লা, সিরাজ, ইগঃ ৩২১, মিঃ ৯০৯নং)*

২। ইবনে আব্বাস ﵁ এর তাশাহ্হুদঃ-

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ....

আত্ তাহিয়্যা-তুল মুবা-রাকা-তুস স্বালাওয়া-তুত ত্বাইয়িবা-তু লিল্লা-হি---। (বাকী প্রথমোক্ত তাশাহহুদের অনুরূপ।) *(মুঃ ৪০৩, আআঃ, শাফেয়ী, নাঃ, মিঃ ৯১০ নং)* অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় দ্বিতীয় শাহাদতে কেবল 'অআশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' উল্লেখিত হয়েছে। *(মিঃ ৯১০নং)*

৩। আবূ মূসা আশআরী ﵁ এর তাশাহ্হুদঃ-

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للهِ.....

'আত্ তাহিয়্যা-তুত ত্বাইয়িবা-তুস স্বালাওয়া-তু লিল্লা-হি--।'
বাকী প্রথমোক্ত তাশাহ্হুদের মতই। অবশ্য কোন কোন বর্ণনায় 'আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু'র পর 'অহদাহু লা শারীকা লাহু' বাক্য বাড়তি আছে। *(মুঃ ৪০৪নং, আআঃ, আদাঃ, ইমাঃ)*

৪। উমার বিন খাত্তাব ﵁ এর তাশাহ্হুদ। তিনি মিম্বরের উপর লোকদেরকে এই তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিতেনঃ-

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ....

আত্ তাহিয়্যাতু লিল্লা-হিয যা-কিয়া-তু লিল্লা-হিত ত্বাইয়িবা-তু লিল্লা-হ, আস্‌সালা-মু আলাইকা---।

বাকী প্রথমোক্ত তাশাহ্‌হুদের মত। *(মাঃ ৩০০নং, বাঃ ২/১৪২)*

৫। আয়েশা رضي الله عنها এর তাশাহ্‌হুদঃ-

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ.....

‘আত্ তাহিয়্যা-তুত ত্বাইয়িবা-তুস স্বালাওয়া-তুয যা-কিয়া-তু লিল্লা-হ, আস্‌সালা-মু আলান্নাবিয়্যি---।’

বাকী প্রথমোক্ত তাশাহ্‌হুদের মত। *(ইআশাঃ, সিরাজ, বাঃ ২/১৪৪)*

দরূদ

তাশাহ্‌হুদের পর নবী মুবাশ্‌শির ﷺ নিজের উপর দরূদ পাঠ করতেন। *(আঃ ৫/৩৭৪, ত্বাহাঃ)* আর উম্মতের জন্যও তাঁর উপরের সালামের পর দরূদ পড়াকে বিধিবদ্ধ করেছেন। মহান আল্লাহর সাধারণ আদেশ রয়েছে, “--- হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর দরূদ পাঠ কর এবং উত্তমরূপে সালাম পেশ কর।” *(কুঃ ৩৩/৫৬)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার উপর ১০ বার রহমত বর্ষণ করবেন।” *(মুঃ, মিঃ ৯২১ নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “---এবং তার ১০টি পাপ মোচন হবে ও সে ১০টি মর্যাদায় উন্নীত হবে।” *(নাঃ, হাঃ ১/৫৫০, মিঃ ৯২২নং)*

সাহাবাগণ তাঁকে বললেন, ‘আমরা আপনার উপর দরূদ কিভাবে পাঠ করব?’ তখন তিনি তাঁদেরকে দরূদ শিক্ষা দিলেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৯১৯-৯২০নং)*

দরূদের শব্দবিন্যাস কয়েক প্রকারঃ-

১। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা স্বাল্লাইতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা ইবরা-হীমা অ আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।

হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ কর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত। *(বুঃ, মিঃ ৯১৯নং)*

২। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى أَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অ আলা আযওয়া-জিহী অ যুর্রিয়্যাতিহী কামা স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা-হীম, অ বা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আযওয়া-জিহী অ যুর্রিয়্যাতিহী কামা বা-রাকতা আলা আ-লি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মাদ, তাঁর পত্নীগণ ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর যেমন তুমি হযরত ইবরাহীমের বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। এবং তুমি হযরত মুহাম্মাদ, তাঁর পত্নীগণ ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ কর যেমন তুমি হযরত ইবরাহীমের বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৯২০নং)*

৩। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ،

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আহলি বাইতিহি অআলা আযওয়া-জিহি অযুর্রিয়্যাতিহি কামা স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। অবা-রিক আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আহলি বাইতিহি অআলা আযওয়া-জিহি অযুর্রিয়্যাতিহি কামা বারাকতা আলা আ-লি ইবরা-হীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। *(আঃ ৫/৩৭৪, ত্বাহাঃ)*

এই দরূদের অর্থ প্রায় পূর্বেকার দরূদের মতই।

৪। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ

إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা স্বাল্লাইতা আলা ইবরা-হীমা অআ-লি ইবরা-হীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। অবা-রিক আলা

মুহাম্মাদিঁউ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা ইবরা-হীমা অআ-লি ইবরা-হীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

এ দরূদে তাঁর পত্নীগণের কথার উল্লেখ নেই। *(আঃ, নাঃ, আবূ য়্যা’লা)*

৫। **اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা-হীম। অবা-রিক আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা আ-লি ইবরা-হীমা ফিল আ’-লামীন। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

উক্ত দরূদে মুহাম্মাদ ﷺ এর গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নিরক্ষর নবী।

৬। **اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা অরাসূলিক, কামা স্বাল্লাইতা আলা আ-লি ইবরা-হীম। অবা-রিক আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা অরাসূলিকা অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা বা-রাকতা আলা ইবরা-হীমা অআলা আ-লি ইবরা-হীম। *(বুঃ, নাঃ, ত্বাহাঃ, আঃ, সিসানঃ ১৬৬পৃঃ)*

উক্ত দরূদে তাঁর গুণস্বরূপ ‘তোমার (আল্লাহর) দাস ও রসূল’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৭। **اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, অবা-রিক আলা মুহাম্মাদ অআলা আ-লি মুহাম্মাদ, কামা স্বাল্লাইতা অবা-রাকতা আলা ইবরা-হীমা অআ-লি ইবরা-হীম। ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। *(নাঃ, ত্বাহাঃ, প্রমুখ, দরূদের উক্ত শব্দবিন্যাসগুলি ‘সিসানঃ’ হতে গৃহীত।)*

লক্ষণীয় যে, উক্ত শব্দবিন্যাসের কোন স্থানেই ‘সাইয়িদিনা, মাওলানা, শাফীইনা’ বা ‘হাবীবিনা’ ইত্যাদি শব্দের উল্লেখ নেই। তিনি আমাদের ‘সাইয়িদিনা, মাওলানা, শাফীইনা’ ও ‘হাবীবিনা’ হওয়া সত্ত্বেও ঐ শ্রেণীর শব্দ দরূদে সংযোজন করা বিদআত।

দুআ মাসূরার পূর্বে দরূদের গুরুত্ব

মহানবী ﷺ এক ব্যক্তিকে তার নামাযে দুআ করতে শুনলেন, লোকটি মহান আল্লাহর গৌরব বর্ণনা করল না, আর তাঁর নবীর উপর দরূদও পড়ল না। তিনি বললেন, “এ তো

তাড়াতাড়ি করল।” অতঃপর তাকে ডেকে সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামায পড়বে, তখন সে যেন তার প্রতিপালকের প্রশংসা বর্ণনার মাধ্যমে আরম্ভ করে। অতঃপর নবী ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ করে। তারপর পছন্দ বা ইচ্ছামত দুআ করে।” *(আঃ, আদাঃ ১৪৮১ নং, নাঃ, ইখুঃ, হাঃ, মিঃ ৯৩০ নং)*

তিনি অন্য এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে নামাযে আল্লাহর প্রশংসা করল এবং নবী ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ করল। তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, “ওহে নামাযী! এবার দুআ কর। কবুল হবে।” *(ঐ)*

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, একদা আমি নামায পড়ছিলাম। পাশে আবূ বকর ﷺ ও উমার ﷺ সহ নবী ﷺ বসেছিলেন। অতঃপর যখন আমি (তাশাহ্হুদে) বসলাম, তখন আল্লাহর প্রশংসা শুরু করলাম, অতঃপর নবী ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ করলাম, তারপর নিজের জন্য দুআ করলাম। এ শুনে নবী ﷺ বললেন, “চাও, তোমাকে দান করা হবে। চাও, তোমাকে দান করা হবে।” *(তিঃ ৫৯৮, মিঃ ৯৩১ নং)*

আর এ জন্যই তিনি বলেছেন, “ফরয নামাযের পশ্চাতে দুআ অধিকরূপে শোনা (কবুল করা) হয়।” *(তিঃ ৩৭৪৬, মিঃ ৯৬৮-নং)* বলা বাহুল্য এটাই হল আল্লাহর সাথে প্রকৃত মুনাজাতের সময়। কারণ “নামাযী মাত্রই নামাযে আল্লাহর সাথে মুনাজাত করে।” *(মাঃ, আঃ ২/৩৬, ৪/৩৪৪)*

ওয়াজেব দুআয়ে মাসূরাহ

নবী মুবাশ্শির ﷺ বলেন, “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ (শেষ) তাশাহ্হুদ সম্পন্ন করবে, তখন সে যেন আল্লাহর নিকট চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। এরপর সে ইচ্ছামত দুআ করবে।”

দুআটি নিম্নরূপঃ-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, অ আঊযু বিকা মিন আযা-বিল ক্বাব্র, অ আঊযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জা-ল, অ আঊযু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহয়্যা অ ফিতনাতিল মামা-ত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, কানা দাজ্জাল, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(মুঃ, আআঃ ২/২৩৫, আদাঃ ৯৮৩, নাঃ ১৩০৯, ইমাঃ ৯০৯, দাঃ, ইবনুল জারূদ ১১০, সিরাজ, আঃ ২/২৩৭, ৪৪৭, বাঃ ২/১৫৪, মিঃ ৯৪০ নং)*

তিনি বলেন, “তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও, জাহান্নামের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও, মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও।” *(মুঃ ৫৮৮ নাঃ)*

সুতরাং নামাযের শেষ তাশাহহুদে দরূদের পর অন্যান্য দুআর পূর্বে উক্ত চার প্রকার আযাব ও ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা ওয়াজেব।

এই দুআ তিনি নিজেও তাশাহহুদে পাঠ করতেন। *(বুঃ, মুঃ, আদাঃ ৮৮০, ৯৮৪, আঃ, মিঃ ৯৩৯ নং)* পরন্তু সাহাবাগণকে কুরআনের সূরা শিখানোর মত উক্ত দুআও শিক্ষা দিতেন। *(মুঃ, আআঃ, মিঃ ৯৪১ নং)*

এ সব কিছু উক্ত দুআর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

দুআ-এ মাসূরাহ

নবী মুবাশ্‌শির ﷺ নামাযে বহু প্রকার দুআ (প্রার্থনা) করতেন। এক এক সময়ে এক এক প্রকার দুআ তিনি পাঠ করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন। সাহাবাগণকে 'তাহিয়্যাত' শিখানোর পর বলেছিলেন, "এরপর তোমাদের মধ্যে যার যা ইচ্ছা ও পছন্দ সেই দুআ বেছে নিয়ে দুআ করা উচিত।" *(বুঃ ৮৩৫, মুঃ, মিঃ ৯০৯নং)* অবশ্য সেই দুআ অপেক্ষা আর কোন্ দুআ অধিকতর পছন্দনীয় হতে পারে, যা তিনি নিজে পড়েছেন বা অপরকে শিখিয়েছেন? তাঁর ঐ সকল দুআকে 'দুআয়ে মাসূরাহ' বলা হয়, যা নিম্নরূপঃ-

১। **اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَ مِنَ الْمَغْرَمِ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিনাল মা'সামি অ মিনাল মাগরাম।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পাপ ও ঋণ হতে পানাহ চাচ্ছি। *(বুঃ, মুঃ, প্রভৃতি, মিঃ ৯৩৯নং)*

২। **اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিকা মিন শার্রি মা আমিলতু অ মিন শার্রি মা লাম আ'মাল।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার কৃত (পাপের) অনিষ্ট হতে এবং অকৃত (পুণ্যের) মন্দ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(নাঃ ১৩০৬)*

৩। **اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَاباً يَسِيْراً.**

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা হা-সিবনী হিসা-বাঁই য়্যাসীরা।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমার সহজ হিসাব গ্রহণ করো। *(আঃ ৬/৪৮, হাঃ)*

৪। **اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ، أَحْيِنِيْ مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْراً لِّيْ، اَللّٰهُمَّ وَ أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَ أَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضى، وَ أَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنى، وَ أَسْأَلُكَ نَعِيْماً لاَّ يَبِيْدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَّ تَنْفَدُ وَلاَ تَنْقَطِعُ، وَ أَسْأَلُكَ الرِّضى بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلى لِقَائِكَ، فِيْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا**

بِزِيْنَةِ الإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা বিইলমিকাল গাইবা অক্বুদরাতিকা আলাল খালক্ব, আহয়িনী মা আলিমতাল হায়্যাতা খাইরাল লী, অতাওয়াফ্‌ফানী ইযা কা-নাতিল অফা-তু খাইরাল লী। আল্লা-হুম্মা অ আসআলুকা খাশয়্যাতাকা ফিল গাইবি অশ্‌শাহা-দাহ। অ আসআলুকা কালিমাতাল হাক্কি অলআদলি ফিল গায্বাবি অররিয্বা। অ আসআলুকাল ক্বাসদা ফিল ফাক্বরি অলগিনা। অ আসআলুকা নাঈমাল লা য়্যাবীদ। অ আসআলুকা কুর্রাতা আইনিল লা তানফাদু অলা তানক্বাতি'। অ আসআলুকার রিয্বা বা'দাল ক্বাযা-ই, অ আসআলুকা বারদাল আইশি বা'দাল মাউত। অ আসআলুকা লায্‌যাতান নাযারি ইলা অজহিক, অশ্‌শাওক্বা ইলা লিক্বা-ইক, ফী গাইরি যার্রা-আ মুযির্রাহ, অলা ফিতনাতিম মুযিল্লাহ। আল্লা-হুম্মা যাইয়িন্না বিযীনাতিল ঈমান, অজ্‌আলনা হুদা-তাম মুহতাদীন।

অর্থ- হে আল্লাহ! তোমার অদৃশ্যের জ্ঞানে এবং সৃষ্টির উপর শক্তিতে আমাকে জীবিত রাখ যতক্ষণ জীবনকে আমার জন্য কল্যাণকর জান এবং আমাকে মৃত্যু দাও যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়। হে আল্লাহ আর আমি গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমার ভীতি চাই, ক্রোধ ও সন্তুষ্টিতে সত্য ও ন্যায্য কথা চাই, দারিদ্র ও ধনবত্তায় মধ্যবর্তিতা চাই, সেই সম্পদ চাই যা বিনাশ হয়না। সেই চক্ষুশীতলতা চাই যা নিঃশেষ ও বিচ্ছিন্ন হয় না। ভাগ্য-মীমাংসার পরে সন্তুষ্টি চাই, মৃত্যুর পরে জীবনের শীতলতা চাই, তোমার চেহারার প্রতি দর্শনের স্বাদ চাই, তোমার সাক্ষাতের প্রতি আকাঙ্খা চাই, বিনা কোন কষ্ট ও ক্ষতিতে, কোন ভ্রষ্টকারী ফিতনায়। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে সুন্দর কর এবং আমাদেরকে হেদায়াতকারী ও হেদায়াতপ্রাপ্ত কর। *(নাসাঈ ১৩০৮, আহমাদ৪/ ৩৬৪)*

৫। اَللّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْماً كَثِيْراً وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরাঁউ অলা য়্যাগফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা ফাগ্‌ফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইন্দিকা অরহামনী ইন্নাকা আন্তাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক অত্যাচার করেছি এবং তুমি ভিন্ন অন্য কেহ গোনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। অতএব তোমার তরফ থেকে আমাকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার উপর দয়া কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান। *(বুখারী, মুসলিম)*

৬। اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَ رَسُوْلُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَسْأَلُكَ مَا

قَضَيْتَ لِيْ مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ لِيْ رُشْداً.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিনাল খাইরি কুল্লিহী আ' জিলিহী অ আ-জিলিহী মা আলিমতু মিনহু অমা লাম আ'লাম। অ আউযু বিকা মিনাশ শার্রি কুল্লিহী আ'-জিলিহী অ আ-জিলিহী মা আলিমতু মিনহু অমা লাম আ'লাম, অ আসআলুকাল জান্নাতা অমা ক্বার্রাবা ইলাইহা মিন ক্বাউলিন আউ আমাল। অ আউযু বিকা মিনান্না-রি অমা ক্বার্রাবা ইলাইহা মিন ক্বাউলিন আউ আমাল। অ আসআলুকা মিনাল খাইরি মা সাআলাকা আব্‌দুকা অ রাসূলুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। অ আউযু বিকা মিন শার্রি মাসতাআ-যাকা মিনহু আব্‌দুকা অরাসূলুকা মুহাম্মাদুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। অ আসআলুকা মা ক্বাযাইতা লী মিন আমরিন আন তাজ্‌আলা আ-ক্বিবাতাহু লী রুশ্‌দা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আমার জানা ও অজানা, অবিলম্বিত ও বিলম্বিত সকল প্রকার কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং আমার জানা ও অজানা, অবিলম্বিত ও বিলম্বিত সকল প্রকার অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তোমার নিকট জান্নাত এবং তার প্রতি নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ প্রার্থনা করছি, এবং জাহান্নাম ও তার প্রতি নিকটবর্তীকারী কথা ও কাজ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার নিকট সেই কল্যাণ ভিক্ষা করছি যা তোমার দাস ও রসূল মুহাম্মদ ﷺ তোমার নিকট চেয়েছিলেন। আর সেই অকল্যাণ থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা থেকে তোমার দাস ও রসূল মুহাম্মদ ﷺ তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। যে বিষয় আমার উপর মীমাংসা করেছ তার পরিণাম যাতে মঙ্গলময় হয় তা আমি তোমার নিকট কামনা করছি। *(মুঃ আহমাদ ৬/ ১৩৪, ত্বায়ালিসী)*

৭। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা অ আউযু বিকা মিনান্না-র।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট জান্নাত চাচ্ছি এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(আবু দাউদ, সহীহ ইবনে মাজাহ ২/৩২৮)*

৮। اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবা-দাক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে সেদিনকার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো। *(মুঃ, মিঃ ৯৪৭নং)*

৯। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ يَا اللهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইয়া-ল্লা-হু বিআন্নাকাল ওয়া-হিদুল আহাদুস স্বামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ অলাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ, আন তাগ্‌ফিরা লী যুনূবী, ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রাহীম।

অর্থ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি, হে এক, একক, ভরসাস্থল আল্লাহ! যিনি জনক নন জাতকও নন এবং যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, তুমি আমার গোনাহসমূহকে ক্ষমা করে দাও, নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল দয়াবান।

এই দুআটি এক ব্যক্তি তাশাহ্হুদে পাঠ করেছিল। মহানবী ﷺ তা শুনে বললেন, "ওকে ক্ষমা করা হল, ওকে ক্ষমা করা হল।" (অর্থাৎ, আল্লাহ ওর দুআ কবুল করে নিয়েছেন।) *(আদাঃ ৯৮৫নং, সনাঃ ১২৩৪নং, আঃ, ইখুঃ, হাঃ)*

১০। **اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ. إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্না লাকাল হাম্দ, লা ইলা-হা ইল্লা আন্তাল মান্না-নু বাদীউস সামা-ওয়া-তি অল আরয্, ইয়া যাল জালা-লি অল ইকরা-ম, ইয়্যা হাইয়্যু ইয়া কায়্যুম। ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা অআউযু বিকা মিনান্না-র।

অর্থ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এই অসীলায় যে, সমস্ত প্রশংসা তোমারই, তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। তুমি পরম অনুগ্রহদাতা, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আবিষ্কর্তা, হে মহিমাময় এবং মহানুভব, হে চিরঞ্জীব অবিনশ্বর! আমি তোমার নিকট বেহেশ্ত্ প্রার্থনা করছি এবং দোযখ থেকে পানাহ চাচ্ছি।

এক ব্যক্তি তাশাহ্হুদে এই দুআ পাঠ করছিল। তা শুনে নবী ﷺ সাহাবাগণকে বললেন, "তোমরা কি জান, ও কি (বাক্য) দিয়ে দুআ করল?" তাঁরা বললেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই জানেন।' তিনি বললেন, "সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে। ও তো আল্লাহর নিকট তাঁর ইসমে আ'যম (বৃহত্তম নাম) দ্বারা প্রার্থনা করেছে; যা দ্বারা দুআ করলে তিনি কবুল করেন ও যা দ্বারা তাঁর কাছে চাইলে তিনি দিয়ে থাকেন।" *(আদাঃ ১৪৯৫, নাঃ, আঃ, ত্বাবাঃ, প্রমুখ)*

১১। মুআয বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমার হাত ধরে বললেন, "মুআয! আমি তোমাকে অবশ্যই ভালোবাসি।" আমি বললাম, আমিও আপনাকে ভালোবাসি, হে আল্লাহর রসূল! এরপর তিনি বললেন, "সুতরাং প্রত্যেক নামাযের পশ্চাতে তুমি এই দুআ বলতে ছেড়ো না,

১২। **اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আইন্নী আলা যিক্‌রিকা অশুকরিকা অহুসনি ইবা-দাতিক।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার যিক্‌র (স্মরণ), শুক্‌র (কৃতজ্ঞতা) এবং সুন্দর ইবাদত করতে সাহায্য দান কর। *(আঃ ৫/২৪৪, ২৪৫, ২৪৭, আদাঃ, নাঃ, ১৩০২ নং)*

১৩। **اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْقَبْرِ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বুখলি অ আউযু বিকা মিনাল জুবনি অ

আউযু বিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল উমুরি অ আউযু বিকা মিন ফিতনাতিদ্দুন্য়্যা অ আযা-বিল ক্বাব্‌র।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কার্পণ্য ও ভীরুতা থেকে পানাহ চাচ্ছি, স্থবিরতার বয়সে কবলিত হওয়া থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আর দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। *(বুঃ, মিঃ ৯৬৪নং)*

১৪। **اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْر.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির লী অতুব আলাইয়্যা, ইন্নাকা আন্তাত্‌ তাউওয়াবুল গাফূর।

অর্থঃ- আল্লাহ গো! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমি তওবাগ্রহণকারী, বড় ক্ষমাশীল।

এই দুআটি তিনি নামাযের শেষাংশে ১০০ বার পাঠ করতেন। *(আঃ ৫/৩৭১, ইআশাঃ, সিসঃ ২৬০৩নং)*

১৫। **اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.**

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কুফরি অলফাক্বরি অআযা-বিল ক্বাব্‌র।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট কুফরী, দারিদ্র ও কবরের আযাব থেকে পানাহ চাচ্ছি। *(হাঃ ১/৩৫, নাঃ, আঃ, তামিঃ ২৩৩পৃঃ)*

১৬। **اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ □وَمَا أَنْتَ**

أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু অমা আখ্‌খারতু অমা আসরারতু অমা আ’লানতু অমা আসরাফতু অমা আন্তা আ’লামু বিহী মিন্নী, আন্তাল মুক্বাদ্দিমু অ আন্তাল মুআখ্‌খিরু লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত্।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মার্জনা কর, যে অপরাধ আমি পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি, যা গোপনে করেছি এবং যা প্রকাশ্যে করেছি, যা অতিরিক্ত করেছি এবং যা তুমি অধিক জান। তুমি আদি তুমিই অন্ত। তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই।

এই দুআটি সবার শেষে পাঠ করে তিনি সালাম ফিরতেন। *(মুঃ ৭৭১নং)*

তাশাহ্হুদের পর

নামায ২ রাকআত বিশিষ্ট (যেমন ফজর, জুমআহ, ঈদ প্রভৃতি) হলে দুআ মাসূরার পর সালাম ফিরলে নামায শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ৩ বা ৪ রাকআত বিশিষ্ট (মাগরিব, এশা, যোহর, আসর, ইত্যাদি) হলে তাশাহ্হুদ পড়ে তৃতীয় রাকআতের জন্য উঠে যেতে হবে। ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, ‘---অতঃপর নামাযের মাঝে হলে নবী ﷺ তাশাহ্হুদ পাঠ করে উঠে যেতেন। নচেৎ নামাযের শেষে হলে তাশাহ্হুদের পর যতক্ষণ ইচ্ছা (মাশাআল্লাহ) দুআ পড়তেন, তারপর সালাম ফিরতেন।’ *(আঃ ১/৪৫৯, ইখুঃ ৭০৮নং, মাযাঃ ২/১৪২)*

প্রশ্ন ওঠে, দরূদও কি তাশাহ্হুদের শামিল?

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে তাশাহ্হুদ ও দরূদ একই জিনিস। অর্থাৎ, সব তাশাহ্হুদেই দরূদ পড়তে হবে। *(কিতাবুল উম্ম্ ১/১০২, সিসানঃ ১৭০পৃঃ)* তাছাড়া উপরোক্ত হাদীসে তাশাহ্হুদ ও দুআর কথা আছে, দরূদের কথা নেই। আর তার মানেই তাশাহ্হুদে দরূদ অবশ্যই শামিল আছে।

পরন্তু সাহাবাগণ তাশাহ্হুদে সালাম শিখার পর মহানবী ﷺ কে বললেন, (তাশাহ্হুদে) কেমন করে আমরা আপনার প্রতি সালাম পেশ করব তা (তাহিয়্যাত) তো শিখলাম। কিন্তু আপনার উপর দরূদ কিভাবে পাঠ করব (তা শিখিয়ে দিন)। তখন তিনি বললেন, "তোমরা বল, আল্লা-হুম্মা স্বাল্লি আলা মুহাম্মাদিঁউ---।" সুতরাং এখানেও স্পষ্টতঃ দরূদ তাশাহ্হুদেরই শামিল। তাছাড়া এখানে প্রথম না শেষ তাশাহ্হুদ তা নির্দিষ্ট নয়। অতএব বলা যায় যে, প্রথম তাশাহ্হুদেও দরূদ পড়তে হবে। *(সিসানঃ ১৬৪পৃঃ)*

অবশ্য মা আয়েশা رضي الله عنها এর একটি হাদীসে প্রথম তাশাহ্হুদে স্পষ্ট দরূদ পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ এর জন্য তাঁর মিসওয়াক ও ওযুর পানি প্রস্তুত রাখতাম। অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি রাত্রের কোন অংশে জেগে উঠতেন। তারপর মিসওয়াক করে ওযু করতেন। অতঃপর ৯ রাকআত নামায পড়তেন। এতে তিনি অষ্টম রাকআত ছাড়া পূর্বে আর কোথাও (তাশাহ্হুদের জন্য) বসতেন না। সুতরাং (অষ্টম রাকআতে বসে) আল্লাহর নিকট দুআ করতেন এবং তাঁর নবীর উপর দরূদ পাঠ করতেন। অতঃপর সালাম না ফিরে তিনি উঠে যেতেন। তারপর নবম রাকআত পড়ে বসতেন। অতঃপর তাঁর প্রতিপালকের প্রশংসা বর্ণনা করে তাঁর নবীর উপর দরূদ পাঠ করতেন এবং দুআ করতেন। অতঃপর আমাদেরকে শুনিয়ে সালাম ফিরতেন। *(আআঃ ২/৩২৪, ভিন্ন শব্দে ঘটনাটি রয়েছে মুসলিমে ৭৪৬ নং)*

উক্ত ব্যাপারটি তাহাজ্জুদ বা বিত্র নামাযের হলেও এর আমল ফরয নামাযেও চলবে। *(তামিঃ ২২৪-২২৫পৃঃ)* এ জন্যই ইবনে বায (রাহিমাহুল্লাহ)ও বলেন, নামাযী প্রথম তাশাহ্হুদে দরূদ পড়বে। *(মারাসাঃ ১২৯পৃঃ)*

আবার প্রথম তাশাহ্হুদে দুআ করার কথাও একাধিক হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। যেমন উপরোক্ত হযরত আয়েশা رضي الله عنها এর হাদীসেও দুআর কথা স্পষ্টভাবে রয়েছে। এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তোমরা প্রত্যেক দু' রাকআতে বসবে, তখন 'আত্-তাহিয়্যাতু---' বল। অতঃপর তোমাদের প্রত্যেকের পছন্দমত দুআ বেছে নিয়ে আল্লাহর নিকট দুআ কর।" *(সনাঃ ১১১৪ নং, আঃ, ত্বাবাঃ)*

সুতরাং প্রথম তাশাহ্হুদেও দুআ করা বিধেয়। *(সিসানঃ ১৬০পৃঃ)*

পরন্তু গরম পাথরের উপর বসে এত কিছু পড়া কি সম্ভব? কারণ নবী ﷺ প্রথম বৈঠক থেকে এত তাড়াতাড়ি উঠতেন যে, মনে হত তিনি যেন গরম পাথরের উপর বসেছিলেন। কিন্তু এ হাদীসটি যয়ীফ। *(যআদাঃ ১৭৭, যতিঃ ৫৭, যনাঃ ৫৫নং, তামিঃ ২২৪পৃঃ)*

তৃতীয় রাকআত

তাশাহ্হুদ শেষ করে তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযের জন্য যখন মহানবী ﷺ উঠতেন, তখন 'তকবীর' (আল্লাহু আকবার) বলতেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৭৯৯নং)* তিনি ওঠার পূর্বেই তকবীর দিতেন। *(আবূ য়্যা'লা, সিসঃ ৬০৪নং)* ওঠার পর নয়।

দুই হাত দ্বারা মাটির উপর ভর করে (খমীর সানার মত উভয় হাতকে মাটিতে রেখে) উঠে খাড়া হতেন। *(আবূ ইসহাক হারবী, বাঃ, তামিঃ ১৯৬পৃঃ)*

আযরাক বিন কাইস বলেন, আমি ইবনে উমার ﷺ কে দেখেছি, তিনি যখন দ্বিতীয় রাকআত থেকে (তৃতীয় রাকআতের জন্য) উঠতেন, তখন তাঁর উভয় হাত দ্বারা মাটির উপর ভর করতেন। পরে আমি তাঁর ছেলে ও তাঁর সঙ্গীদেরকে বললাম, 'সম্ভবতঃ এরূপ তিনি তাঁর বার্ধক্যের কারণে করে থাকেন।' কিন্তু তাঁরা বললেন, 'না, বরং এইরূপই হবে।' (অর্থাৎ, এইরূপ ওঠাই সুন্নত।) *(বাঃ ২/১৩৫, তামিঃ ২০০পৃঃ)*

এই সময় তিনি 'রফয়ে য়্যাদাইন' করতেন। *(বুঃ, আদাঃ, মিঃ ৭৯৪নং)* খাড়া হওয়ার পর তিনি দ্বিতীয় রাকআতের মত সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। কিন্তু এই রাকআতে অন্য সূরা পাঠ করতেন না। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৮২৮নং)*

অবশ্য কখনো কখনো যোহরের নামাযে (প্রায় ১৫) আয়াত মত অন্য সূরা পাঠ করতেন। *(মুঃ, আঃ, মিঃ ৮২৯, ইখুঃ ৫০৯, সিসানঃ ১১৩, ১৭৮পৃঃ)*

সুতরাং শেষ (তৃতীয় ও চতুর্থ) রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পাঠ করা ও না করা উভয়ই বৈধ। যোহরের নামাযের উপর কিয়াস করে অন্যান্য নামাযেও পড়া বৈধ। *(ইখুঃ ১/২৫৬, সিসানঃ ১১৩পৃঃ)*

তাছাড়া উক্ত হাদীসে সাহাবাগণ তাঁর যোহরের প্রথম দু' রাকআতে প্রায় ৩০ আয়াত মত, শেষ দু' রাকআতে তার অর্ধেক প্রায় ১৫ আয়াত মত, আসরের প্রথম দু' রাকআতে তার অর্ধেক প্রায় ৭/৮ আয়াত মত এবং শেষ দু' রাকআতে তার অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় ৩/৪ আয়াত মত পড়া আন্দাজ করতেন। এতে বুঝা যায় যে, আসরের শেষ দু' রাকআতেও অন্য সূরা (অপেক্ষাকৃত ছোট ধরনের) পড়া চলবে।

এ ছাড়া আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, 'প্রত্যেক নামাযে ক্বিরাআত আছে ----। কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল সূরা ফাতিহা পড়বে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যে ব্যক্তি এর বেশী পড়বে, তা তার জন্য উত্তম হবে।' *(বুঃ ৭৭২, মুঃ ৩৯৬ নং)* অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, 'পুরো নামাযেই ক্বিরাআত পড়া হয়---।' *(মুঃ ৩৯৬ নং)* অর্থাৎ প্রত্যেক রাকআতেই। হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, 'নামাযের সমস্ত রাকআতেই ক্বিরাআত মুস্তাহাব।' অবশ্য আবূ হুরাইরার এই হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ তাই ইঙ্গিত করে। *(ফবাঃ ২/২৯৫)* সুতরাং সূরা ফাতিহার পর মহানবী ﷺ এর অন্য এক সূরা পড়া ও না পড়ার ব্যাপারে উভয় প্রকার বর্ণনা থাকায় এ কথা বলা যায় যে, তিনি শেষ দু' রাকআতে কখনো কখনো সূরা পড়তেন, আবার কখনো পড়তেন না।

মোট কথা, তিন বা চার রাকআত নামাযে সূরা ফাতিহার পর প্রত্যেক রাকআতেই সূরা লাগানো যায়। কোন রাকআতেই না লাগালেও চলে। আবার কেবল প্রথম দু' রাকআতে

লাগিয়ে শেষ রাকআতগুলিতে না পড়লেও চলে। সব রকমই জায়েয।

ক্বিরাআতের পর মহানবী ﷺ বাকী রুকূ, কওমাহ, সিজদাহ ও বৈঠক প্রভৃতি পূর্বের রাকআতের মত করে মাটির উপর উভয় হাত দ্বারা ভর করে তকবীর বলে চতুর্থ রাকআতের জন্য উঠে খাড়া হতেন। আর এই সময় তিনি কখনো কখনো 'রফয়ে য়্যাদাইন' করতেন। *(আআঃ, নাঃ)*

চতুর্থ রাকআত

নামায ৩ রাকআত বিশিষ্ট (মাগরেবের) হলে ৩ রাকআত পড়ে, নচেৎ ৪ রাকআত বিশিষ্ট হলে তা তৃতীয় রাকআতের মত পড়ে শেষ তাশাহ্‌হুদের জন্য বসে যেতেন। এই বৈঠকে তিনি তাঁর বাম পাছার উপর বসতেন। এতে তাঁর দু'টি পায়ের পাতা এক দিকে হয়ে যেত। *(বুঃ ৮২৮, আদাঃ ৯৬৫নং, বাঃ)* বাম পা-কে ডান পায়ের রলা ও উরুর নিচে রাখতেন। *(মুঃ ৫৭৯ নং, আআঃ)* আর ডান পায়ের পাতাকে খাড়া রাখতেন। *(বুঃ ৮২৮নং)* কখনো কখনো খাড়া না রেখে বিছিয়েও রাখতেন। *(মুঃ ৫৭৯, আআঃ)* পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী করে রাখতেন। তাঁর হাত দু'টি প্রথম বৈঠকের মতই থাকত। অবশ্য বাম হাত দ্বারা বাম জানুর উপর ভরনা দিতেন। *(আদাঃ ৯৮৯, সনাঃ ১২০৫ নং)*

সুতরাং পাছার উপর বসা কেবল ৩ বা ৪ রাকআত (অন্য কথায় দুই তাশাহ্‌হুদ) বিশিষ্ট নামাযে সুন্নত। পক্ষান্তরে এক তাশাহহুদ বিশিষ্ট ২ রাকআত নামাযে বাম পায়ের পাতার তলদেশ বিছিয়ে তার উপর বসা সুন্নত। *(সিসানঃ ১৫৬, ১৮১, মুমঃ ৪/১০০, মারাসাঃ ১২৮পৃঃ)* কারণ পাছার উপর বসার কথা হাদীসে কেবল দুই তাশাহহুদ বিশিষ্ট নামাযের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। নচেৎ নামাযে বসার সাধারণ সুন্নত হল, বাম পায়ের পাতার উপরেই বসা। *(নাঃ ১১৫৬, ১১৫৭, ১১৫৮, ১২৬১, দাঃ ১৩৩০ নং)*

সালাম

অতঃপর নবী মুবাশ্‌শির ﷺ তাশাহ্‌হুদ ও দুআ আদি পড়ে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে বলতেন,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

'আস্‌সালা-মু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হ।'

অর্থাৎ, তোমাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক।

তিনি এতটা মুখ ফিরাতেন যে, (পেছন থেকে) তাঁর ডান গালের শুভ্রতা দেখা যেত। অতঃপর বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে অনুরূপ বলে সালাম ফিরতেন। আর এতেও তাঁর বাম গালের শুভ্রতা (পেছন থেকে) দেখা যেত। *(মুঃ ৫৮২, আদাঃ ৯৯৬ নং, নাঃ)*

কখনো কখনো তিনি ডান দিকের (প্রথম) সালামের সাথে '---অবারাকাতুহ'ও যোগ করতেন। *(আদাঃ ৯৯৭, ত্বাবা, আরাঃ, দারাঃ, আবূ য়্যা'লা ৩/১২৫২)*

আবার কখনো ডান দিকে 'আস্‌সালা-মু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হ' এবং বাম দিকে

কেবল 'আস্সালা-মু আলাইকুম' বলে সালাম ফিরতেন। *(নাঃ ১৩২০ নং, আঃ, সিরাজ)* আবার কখনো বা ডান দিকে একটু ঝুঁকে ঐ মুখেই 'আস্সালা-মু আলাইকুম' বলে মাত্র একটি সালাম ফিরতেন। *(ইখুঃ ৭২৯, বাঃ, মাক্বদেসী, আঃ, ত্বাবাঃ আউসাত্ব, হাঃ, ইগঃ ৩২৭ নং)* মা আয়েশা رضي الله عنها এরও এই আমল ছিল। *(ইখুঃ ৭৩০, ৭৩২, বাঃ ২/১৭৯)* অনুরূপ এক সালামের আমল ছিল যুবাইর ﷺ এরও। *(ইখুঃ ৭৩১ নং, বাঃ ২/১৭৯)* অতএব কখনো কখনো এ সুন্নাহ পালন করা আমাদেরও উচিত।

সালাম ফিরার সময় হাত দ্বারা ইশারা বৈধ নয়। একদা সাহাবাদেরকে এমন ইশারা করতে দেখলে তিনি বললেন, "কি ব্যাপার তোমাদের? দুরন্ত ঘোড়ার লেজের মত করে হাত দ্বারা ইশারা করছ? যখন তোমাদের কেউ সালাম ফিরবে, তখন সে যেন তার (পার্শ্ববর্তী) সঙ্গীর প্রতি চেহারা ফেরায় এবং হাত দ্বারা ইশারা না করে।" অতঃপর সাহাবাগণ এরূপ ইশারা করা হতে বিরত হয়ে যান।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, "তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, (সালাম ফিরার সময়) হাত নিজ উরুর উপর রাখবে। অতঃপর ডাইনে ও বামে (উপবিষ্ট) ভাই-এর প্রতি সালাম দেবে।" *(মুঃ ৪৩১, আআঃ, সিরাজ, ইখুঃ ৭৩৩ নং, ত্বাবাঃ)*

উক্ত হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জামাআতের নামাযে নামাযী সালাম দেয় পাশের নামাযীকে। কিন্তু একা নামাযে সালাম দেওয়া হয় ফিরিশ্তাকে। পরন্তু পাশের নামাযী সালাম ফিরলে তার জওয়াব দিতে হয় না। কারণ, সে সময় সকলেই একে অপরকে সালাম দিয়ে থাকে। অতএব জওয়াব থাকে তাতেই। *(মুমঃ ৩/২৮৮-২৮৯)*

যেরূপ সালাম ফেরার সময় হাতের ইশারা বৈধ নয়, তদ্রূপ বিধেয় নয় মাথা হিলানোও। *(মুত্বাসাঃ ১৮৯পৃঃ)*

সালাম ফিরেই নামাযের কাজ শেষ হয়ে যায়। তবে খেয়াল রাখার বিষয় যে, যে তরতীব ও পর্যায়ক্রমে মহানবী ﷺ নামায ও তার সকল আমল সম্পন্ন করেছেন, সেই পর্যায়ক্রমেই নামায পড়া নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত অথবা ফরয। *(ফিসুঃ উর্দু ৯৫পৃঃ)*

ফরয নামাযের পর পঠনীয় যিকর ও দুআ

১। **أَسْتَغْفِرُ الله** আস্তাগফিরুল্লাহ, (অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি) ৩বার।

২। **اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.**

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালা-মু অমিন্কাস সালা-মু তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি অল ইকরা-ম।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি শান্তি (সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র) এবং তোমার নিকট থেকেই শান্তি। তুমি বরকতময় হে মহিমময়, মহানুভব! *(মুসলিম ১/৪১৪)*

৩। لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّٰه وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَـهُ، لَـهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ وَ هُـوَ عَلى كُـلِّ شَـيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ- “ লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

৪। اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الَجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা লা মা-নিয়া লিমা আ’ত্বাইতা, অলা মু’ত্বিয়া লিমা মানা’তা অলা য়্যানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দ্।

অর্থ- হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা রোধ করার এবং যা রোধ কর তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানের ধন তোমার আযাব থেকে মুক্তি পেতে কোন উপকারে আসবে না। *(বুঃ, মুঃ , মিঃ ৯৬২ নং)*

৫। لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰه.

উচ্চারণঃ- লা হাউলা অলা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থঃ- আল্লাহর প্রেরণা দান ছাড়া পাপ থেকে ফিরার এবং সৎকাজ করার শক্তি নেই।

৬। لآ إِلهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অলা না’বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু লাহুন্নি’মাতু অলাহুল ফায্‌লু অলাহুস সানা-উল হাসান, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুখলিস্বীনা লাহুদ্দীনা অলাউ কারিহাল কা-ফিরূন।

অর্থ- আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। তাঁর ছাড়া আমরা আর কারো ইবাদত করি না, তাঁরই যাবতীয় সম্পদ, তাঁরই যাবতীয় অনুগ্রহ, এবং তাঁরই যাবতীয় সুপ্রশংসা, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমরা বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁরই উপাসনা করি, যদিও কাফেরদল তা অপছন্দ করে। *(মুঃ , মিঃ ৯৬৩ নং)*

৭। **سُبْحانَ اللّٰه** সুবহা-নাল্লাহ। অর্থাৎ, আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। ৩৩ বার। **اَلْحَمْدُ للّٰه** আলহামদু লিল্লা-হ। অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্তে। ৩৩ বার। **اَللّٰهَ أَكْبَرَ** আল্লা-হু আকবার। অর্থাৎ আল্লাহ সর্বমহান। ৩৩ বার।

আর ১০০ পূরণ করার জন্য উপরোক্ত ৩নং দুআ একবার পঠনীয়। এগুলি পাঠ করলে সমুদ্রের ফেনা বরাবর পাপ হলেও মাফ হয়ে যায়। *(মুঃ ১/৪১৮, আঃ ২/৩৭১)*

প্রকাশ যে, তসবীহ গণনায় বাম হাত বা তসবীহ মালা ব্যবহার না করে কেবল ডান হাত ব্যবহার করাই বিধেয়। *(সহীহুল জামে' ৪৮৬৫নং)*

৮। সুরা ইখলাস,ফালাক্ব ও নাস ১ বার করে। *(আবু দাউদ২/৮৬, সহীহ তিরমিযী ১/৮, নাসাঈ ৩/৬৮)*

৯। আয়াতুল কুরসী ১বার। প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াত পাঠ করলে মৃত্যু ছাড়া জান্নাত যাওয়ার পথে পাঠকারীর জন্য আর কোন বাধা থাকে না। *(সঃ জামে' ৫/৩৩৯, সিঃ সহীহাহ ৯৭২)*

১০। لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ- আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সমস্ত রাজত্ব ও প্রশংসা তাঁরই, তিনি জীবিত করেন, তিনিই মরণ দান করেন এবং তিনি সর্বোপরি শক্তিমান।

এটি ফজর ও মাগরিবের নামাযে সালাম ফিরার পর দশবার পড়লে দশটি নেকী লাভ হবে, দশটি গোনাহ ঝরবে, দশটি মর্যাদা বাড়বে, চারটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব লাভ হবে এবং শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে। *(সহীহ তারগীব ২৬২- ২৬৩ পৃঃ)*

১১- اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْماً نَّافِعاً وَّرِزْقاً طَيِّباً وَّعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান না-ফিআঁউ অ রিযক্বান ত্বাইয়িবাঁউ অ আমালাম মুতাক্বাব্বালা।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ফলদায়ক শিক্ষা, হালাল জীবিকা এবং গ্রহণযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।

ফজরের নামাযের পর এটি পঠনীয়। *(সইমাঃ ১/ ১৫২, ত্বাবা সাগীর, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/ ১১১)*

১২- اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ক্বিনী আযা-বাকা ইয়াওমা তাবআষু ইবা-দাক।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে পুনরুত্থিত করবে সেদিনকার আযাব থেকে আমাকে রক্ষা করো। *(মুসলিম)*

১৩- لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ- লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু য়্যুহয়ী অ য়্যুমীতু বিয়্যাদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থঃ- আল্লাহ ভিন্ন কেউ সত্য মা'বুদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব এবং তাঁরই নিমিত্তে সকল প্রশংসা। তিনিই জীবন দান করেন ও তিনিই মরণ দেন। তাঁর হাতেই সকল মঙ্গল। আর তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান।

এটি ফজরের নামাযের পর পা ঘুরিয়ে বসার পূর্বে ১০০ বার পড়লে পৃথিবীর মধ্যে ঐ দিনে সেই ব্যক্তিই অধিক উত্তম আমলকারী বলে গণ্য হবে। *(সহীহ তারগীব ২৬২-২৬৩ পৃঃ)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'ফরয নামাযের সালাম ফেরার পর সশব্দে যিক্‌র পাঠ আল্লাহর রসূল ﷺ এর যুগে প্রচলিত ছিল।' *(বুঃ ৮৪১নং, মুঃ)*
প্রকাশ থাকে যে, এই সকল যিক্‌রকে সুর করে পড়া বিদআত বলা হয়েছে।

কতিপয় অশুদ্ধ যিক্‌র

কিছু যিক্‌র আছে, যা লোক মাঝে প্রচলিত অথচ তা সহীহ সুন্নাহর অনুকূল নয়, অথবা তা মনগড়া; যা ত্যাগ করে সহীহ সুন্নাহভিত্তিক যিক্‌র ও দুআ পড়া কর্তব্য।

১। 'আল্লা-হুম্মা আজিরনী মিনান্না-র।' ফজর ও মাগরেব পর ৭ বার করে পাঠ করে ঐ দিনে বা রাতে মারা গেলে দোযখ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এ হাদীসটি সহীহ নয়, বরং যয়ীফ। *(সিযঃ ১৬২৪ নং)*

২। মাথায় হাত রেখে 'ইয়া ক্বাবিয়্যু' বা 'ইয়া নূরু' বলা। এটি মনগড়া।

৩। মাথায় হাত রেখে 'বিসমিল্লাহিল্লাযী ---- আল্লাহুম্মা আযহিব আন্নিল হাম্মা অলহুয্‌ন।' এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি খুব দুর্বল অথবা জাল। *(সিযঃ ৬৬০, ১০৫৯ নং)*

৪। এত এত বার দরূদ পড়া। দরূদ সালামের পূর্বে বা অন্যান্য অনির্দিষ্ট সময়ে পড়াই বিধেয়।

৫। মিলিত কণ্ঠে অথবা একাকী 'আস্‌সালা-তু অস্‌সালা-মু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলা। এটি বিদআত। *(মবঃ ১৭/৭০-৭১, ২০/১৪৭)*

প্রকাশ থাকে যে, তসবীহ ডান হাতে গোনাই হল সুন্নত। মহানবী ﷺ ডান হাতের আঙ্গুল দ্বারাই তসবীহ গুনেছেন এবং অপরকে ডান হাতের আঙ্গুল ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তিনি বলেছেন যে, ঐ আঙ্গুলগুলোকে কিয়ামতের দিন কথা বলার ক্ষমতা দেওয়া হবে এবং তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। *(আদাঃ ১৫০১, মিঃ ২৩১৬ নং)* সুতরাং তসবীহ মালা ব্যবহার করা বিধেয় নয়। এতে রয়েছে রিয়ার (লোক-প্রদর্শনের) গন্ধ, যা ছোট শির্ক। পক্ষান্তরে কাঁকর বা খেজুর আঁটি দ্বারা তসবীহ গোনার হাদীস সহীহ নয়। *(আদাঃ ১৫০০, মুত্বাসাঃ ১৯৩পৃঃ)*

ফরয নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত প্রসঙ্গে

নামাযী যখন নামায পড়ে তখন সে আল্লাহর নিকট মুনাজাত করে। আল্লাহর সাথে নিরালায় যেন কানে কানে কথা বলে। *(মুঅত্তা, মুসনাদে আহমদ ২/৩৬, ৪/ ৩৪৪)*

নামাযের মাঝেই আব্দ্‌ (দাস) মাবুদের (প্রভুর) ধ্যানে ধ্যানমগ্ন থাকে। যেন সে তাঁকে দেখতে পায়। যতক্ষণ সে নামাযে থাকে ততক্ষণ সে আল্লাহর সাথে কথা বলে। তিনি তার প্রতি মুখ ফিরান এবং সালাম না ফিরা পর্যন্ত তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন না। *(বাইহাকী, সহীহুল*

জামে’ ১৬১৪নং)

পরক্ষণে যখনই সে সালাম ফিরে দেয় তখনই সে মুনাজাতের অবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, দূর হয়ে যায় নৈকট্যের বিশেষ যোগসূত্র। বান্দা সরে আসে সেই মহান বিশ্বাধিপতির খাস দরবার থেকে। সুতরাং তার নিকট কিছু চাওয়া তো সেই সময়ে অধিক শোভনীয় যে সময়ে ভিখারী বান্দা তাঁর ধ্যানে তার নিকটে ও তাঁর খাস দরবারে থাকে। অতএব সেই নৈকট্যের ধ্যান ভগ্ন করে এবং মহানবী ﷺ এর নির্দেশিত মুনাজাত থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় মুনাজাত সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত নয়।

অবশ্য সহীহ হাদীসে বর্ণিত যে, একদা সাহাবাগণ আল্লাহর রসূল ﷺ কে কোন্ সময় দুআ অধিকরূপে কবুল হয় - সে বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, “গভীর রাতের শেষাংশে এবং সকল ফরয নামাযের পশ্চাতে।” *(তিঃ৩৪৯৯, নাঃ আমালুল ইয়াউমি অল্লাইলাহ ১০৮নং, মিঃ ৯৬৮ নং)* হাদীসটি অনেকের নিকট দুর্বল হলেও আসলে তা হাসান। *(সতিঃ২৭৮২নং)*

সুতরাং এটাই হচ্ছে ফরয নামাযের পর মুনাজাত করার প্রায় সহীহ ও সব চেয়ে বড় দলীল, যদিও এতে হাত তুলে দুআর কথা নেই। এইখান হতেই ধোকা খেয়ে মুনাজাত-প্রেমীরা উদ্ভাবন করেছেন যে, ‘ফরয নামাযের পর দুআ কবুল হয়। আর হাত তুলে দুআ করলে আল্লাহ খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। তাছাড়া নামাযের পর লোক ও জামাআত বেশী থাকে। আর জামাআতী দুআ বেশী কবুল হয়।’ ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে আযানের সময়, আযান ও ইকামতের মাঝে, ইকামতের সময়, বৃষ্টি বর্ষণের সময় ও আরো যে সব সময়ে দুআ কবুল হয় সে সব সময়ে কৈ জামাআতী দুআ নজরে পড়ে না। অভ্যাসে পরিণত হয়েছে কেবল ফরয নামাযের পর দুআ।

শুরুতে একটা কথা খেয়াল রাখা উচিত যে, ইবাদত যখন, যেভাবে, যে গুণ, সংখ্যা ও পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধ হয়েছে প্রত্যেকটি ইবাদত সেই গুণ, পদ্ধতি, সংখ্যা ও সময় অনুসারে করা জরুরী। অনির্দিষ্ট বা সাধারণ থাকলে তা কোন গুণ দ্বারা নির্দিষ্ট করা বিদআতের পর্যায়ভুক্ত।

সুতরাং দুআর এক সাধারণ নিয়ম হল, হাত তুলে দুআ করা। অর্থাৎ কেউ নিজ প্রয়োজন সাধারণ সময়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে হাত তুলে করবে। এখন যদি কেউ বলে, ‘আমি আমার প্রয়োজন নামাযে চাই বা না চাই, নামাযের পরে রসূলের বা নিজের ভাষায় হাত তুলে চাইব’- তাহলে তার প্রথমে জানা উচিত যে, নামাযের পর একটি নির্দিষ্ট সময়। আর তাতে রয়েছে নির্দিষ্ট ইবাদত (যিকর-আযকার)। অতএব ঐ নির্দিষ্ট সময়ে শরীয়ত কি করতে নির্দেশ করেছে? যা করতে নির্দেশ করেছে তার নিয়ম কি? ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে অনুরূপ সাধারণ নিয়ম সংযোজন করা যাবে না। করলেই তা অতিরঞ্জন তথা বিদআত রূপে পরিগণিত হবে। ফলকথা, তাকে দেখতে হবে যে, ঐ নির্দিষ্ট ইবাদতের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্টরূপে দুআ বা মুনাজাতের নির্দেশ শরীয়তে আছে কি? নচেৎ আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আমাদের এ (শরীয়তের) ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করে যা ওর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত।” *(বুখারী মুসলিম, মিশকাত১৪০নং)* “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার

উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।” *(মুসলিম ১৭১৮নং)*

এবার প্রশ্ন থাকছে উপরোক্ত হাদীস মুনাজাতের স্বপক্ষে দলীল কি না?

উক্ত হাদীসে যে ‘দুবুর’ শব্দ ব্যবহার হয়েছে তার অর্থ হল, পিঠ, পাছা, পশ্চাৎ বা শেষাংশ। যাঁদের অর্থে ‘দুবুর’ মানে ‘পরে’, তাঁদের মতে এই হাদীসটি ফরয নামাযের পর দুআ বা মুনাজাতের বড় দলীল। (যদিও হাত তুলে নয়।) কিন্তু উক্ত হাদীসে ‘দুবুর’ শব্দের অর্থ পরে করা ঠিক কি?

এখন যদি বলি, ‘গরুর দুবুর (পাছা)’, তাহলে শ্রোতা এই বুঝবে যে, গরুর পাছা দেহের অবিচ্ছেদ্য পিছনের অঙ্গ। তার দেহাংশের বাইরের কিছু নয়। সুতরাং নামাযের দুবুর, বা পাছা অথবা পশ্চাৎ বলতে বুঝা দরকার যে, তা নামাযেরই শেষ অঙ্গ বা অংশ। নামাযের বাইরে কিছু নয়; অর্থাৎ সালাম ফিরার পূর্বের অংশ।

অবশ্য ‘দুবুর’ (পশ্চাৎ) বলে পরের অংশকেও বুঝানো যায়। যেমন যদি বলি, ‘ইমাম সাহেব বাসের দুবুরে (পশ্চাতে বা পেছনে) দাঁড়িয়ে আছেন।’ তাহলে ইমাম সাহেবকে যে দেখেনি সে শ্রোতা দুই রকম বুঝতে পারে; প্রথমতঃ এই যে, ইমাম সাহেব বাসের পেছনের অংশে বাসের ভিতরেই দাঁড়িয়ে আছেন। আর দ্বিতীয়তঃ এই যে, ইমাম সাহেব বাসের পেছনে রোডে (বাসের বাইরে) দাঁড়িয়ে আছেন। আর এক্ষেত্রে শ্রোতার দুই প্রকার বুঝাই সঠিক, ভুল নয়। কিন্তু ইমাম সাহেবের আসল দাঁড়াবার জায়গা বাস্তবপক্ষে একটাই, বিধায় অপরটি অসম্ভব।

সুতরাং উক্ত হাদীসের অর্থ যদি ‘নামাযের পশ্চাতে অর্থাৎ সালাম ফিরার পূর্বে দুআ কবুল হয়’ বলি, তাহলে একথাও বলতে হয় যে, ‘সালাম ফেরার পূর্বেই তসবীহ-তাহলীলও করতে হবে।’ কারণ ওখানেও ‘দুবুর’ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যার অর্থে উলামাগণ নামাযের পর যিক্র পড়ার কথা বলে থাকেন। অতএব উক্ত দ্ব্যর্থবোধক শব্দের ব্যাখ্যা খুঁজতে আমাদেরকে শরীয়তের সাহায্য নিতে হবে। যেহেতু মহানবী ﷺ এর এক উক্তিকে তাঁর অপর উক্তি বা আমল ব্যাখ্যা করে। চলুন এবারে আমরা তাই দেখে ‘দুবুর’ এর সঠিক অর্থ নির্ধারণ করি।

সালাম ফেরার পরে কি করা উচিত সে ব্যাপারে আল্লাহর এক নির্দেশ হল, “অতঃপর যখন তোমরা নামায সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহর যিক্র কর----।” *(কুঃ ৪/১০৩)* “তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে এবং নামাযের পরেও।” *(কুঃ ৫০/৪০)* তাই তো আল্লাহর নবী ﷺ এর আমল ও অভ্যাস ছিল সালাম ফিরার পর আল্লাহর যিক্র করা।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ “আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালাম--- ” বলার মত সময়ের চেয়ে অধিক সময় সালাম ফেরার পর বসতেন না। *(মুঃ মিঃ ৯৬০ নং)*

সাওবান رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন নামায শেষ করতেন তখন তিনবার ইস্তিগফার করে “আল্ল-হুম্মা আন্তাস সালাম---- ” বলতেন।

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رضي الله عنه বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন সালাম ফিরতেন তখন উঁচু শব্দে বলতেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু ---।” *(মুসলিম, মিশকাত৯৬৩ নং)* (এ ব্যাপারে

ফরয নামাযের পর যিক্‌রের আলোচনা দেখুন।)

সালাম ফিরা হলে তিনি মহিলাদের জন্য একটু অপেক্ষা করতেন, যাতে তারা পুরুষদের আগেই মসজিদ ত্যাগ করতে পারে। অতঃপর তিনি উঠে যেতেন। *(বুখারী ৮৩৭)*

সামুরাহ বিন জুনদুব ﷺ বলেন, ফজরের নামায শেষ করে আল্লাহর নবী ﷺ আমাদের দিকে ফিরে বসে বলতেন, “গত রাত্রে তোমাদের মধ্যে কে স্বপ্ন দেখেছে?” অতঃপর কেউ দেখলে সে বর্ণনা করত। নচেৎ তিনি নিজে স্বপ্ন দেখে থাকলে তা বর্ণনা করতেন। *(বুখারী,মিশকাত ৪৬২১ নং)*

অবশ্য একদা কা’বা শরীফের নিকট মহানবী ﷺ এর নামায পড়া কালে কুরাইশের দুষ্কৃতীরা তাঁর সিজদারত অবস্থায় ঘাড়ে উটনীর (গর্ভাশয়) ফুল চাপিয়ে দিলে হযরত ফাতেমা (রাঃ) খবর পেয়ে ছুটে এসে তা সরিয়ে ফেলেন। এহেন দুর্ব্যবহারের ফলে আল্লাহর রসূল ﷺ নামায শেষ করে উচ্চস্বরে ঐ দুষ্কৃতীদের জন্য বদ্দুআ করেন এবং তা কবুলও হয়ে যায়। *(বুখারী ২৪০, মুসলিম ১৭৯৪ নং)*

কিন্তু সে নামায ফরয ছিল না নফল, তা নিশ্চিত নয়। পরন্তু এতে হাত তোলার কথা নেই। তাছাড়া এটি ছিল সাময়িক বদ্দুআ; যা তাদেরকে শুনিয়ে করা হয়েছিল।

আর একটি সহীহ হাদীসে এসেছে যে, তিনি ফজরের নামাযে সালাম ফিরে বলতেন, “আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান না-ফিআঁউ অরিযকান ত্বাইয়িবাঁউ অআমালাম মুতাক্বাব্বালা।” (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অবশ্যই ফলপ্রসূ জ্ঞান, উত্তম রুযী এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।) *(ত্বাবারানী, সাগীর, মাজমাউয যাওয়াইদ১০/১১১, সহীহ ইবনে মাজাহ ১/১৫২)* অবশ্য এখানেও হাত তোলার কথা নেই।

সুতরাং বলা যায় যে, সালাম ফিরার পর আল্লাহর নবী ﷺ অধিকাংশ সময়ে আল্লাহর যিক্‌র পড়েছেন। আর কখনো কখনো তিনি ফজরের পর ঐ দুআ (হাত না তুলে) পাঠ করেছেন।

পক্ষান্তরে সালামের পূর্বে তিনি (প্রার্থনামূলক) দুআ পড়তে আদেশ দিয়ে বলেন, “এরপর (তাশাহহুদের পর) তোমাদের যার যা ইচ্ছা ও পছন্দ সেই মত দুআ বেছে নিয়ে দুআ করা উচিত।” *(বুখারী ৮৩৫, মুসলিম,মিশকাত ৯০৯ নং)*

“যখন তোমাদের মধ্যে কেউ (শেষ) তাশাহহুদ সম্পন্ন করবে তখন সে যেন আল্লাহর নিকট চারটি জিনিস থেকে পানাহ চায়; জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। এরপর সে ইচ্ছামত দুআ করবে।” *(মুসলিম, আবু আওয়ানাহ, আবূ দাঊদ ৯৮৩নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, প্রমুখ, মিশকাত ৯৪০নং)*

সালাম ফিরার পূর্বে তাশাহহুদের পর তিনি নিজেও বিবিধ প্রকার দুআ পড়ে প্রার্থনা করেছেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৩৯নং) (দুআয়ে মাসুরা দ্রষ্টব্য)* এমন কি উক্ত চার প্রকার আযাব ও ফিতনা হতে পানাহ চাওয়ার দুআ আল্লাহর নবী ﷺ কুরআন কারীমের সূরা শিখানোর মত সাহাবাগণকে শিক্ষা দিতেন। তাই তো ৩ অথবা ৪ জন সাহাবী হতে উক্ত দুআর হাদীস বর্ণনাকারী তাবেয়ী ত্বাউস একদা তাঁর ছেলেকে বললেন, ‘তুমি তোমার নামাযে ঐ দুআ পড়েছ কি? বলল, না। তিনি বললেন তাহলে তুমি তোমার নামায ফিরিয়ে

পড়।' *(মুসলিম ১/৪১৩ নং)*

কেননা, তাঁর নিকট উক্ত দুআর এত গুরুত্ব ছিল যে, তিনি মনে করতেন, যে দুআ পড়তে আল্লাহর নবীর আদেশ, আমল ও শিক্ষা রয়েছে তা না পড়লে নামাযই হবে না!

একদা আল্লাহর রসূল ﷺ (মসজিদে) বসে ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করে নামায শুরু করল। (নামাযে) সে বলল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর।' তা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তাড়াহুড়ো করলে তুমি হে নামাযী! যখন তুমি নামাযে বসবে তখন আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রসংশা কর এবং আমার উপর দরূদ পড়, তারপর আল্লাহর নিকট দুআ কর।"

কিছুক্ষণ পরে আর এক ব্যক্তি নামায পড়তে শুরু করল, সে আল্লাহর প্রশংসা করে নবী ﷺ এর উপর দরূদ পাঠ করল। তখন তা শুনে তিনি বললেন, "হে নামাযী! (এবার তুমি) দুআ কর, কবুল হবে।" *(তিঃ ৩৪৭৬, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত ৯৩০ নং)*

ইবনে মসউদ ﷺ বলেন, 'একদা আমি নামায পড়ছিলাম, আর নবী ﷺ, আবু বকর ও উমর ﷺ (পাশেই বসে) ছিলেন। যখন আমি বসলাম তখন আল্লাহর প্রশংসা ও দরূদ শুরু করলাম। তারপর আমি নিজের জন্য দুআ করলাম। তা শুনে নবী ﷺ বললেন, "তুমি চাও, তোমাকে দান করা হবে, তুমি চাও, তোমাকে দান করা হবে।" *(তিরমিযী, মিশকাত ৯৩১ নং)*

আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় সে তখন তার রবের সাথে মুনাজাত করে। অতএব মুনাজাতে সে কি বলে, তা তার জানা উচিত। *(মুঅত্তা, মুসনাদে আহমদ ২/৩৬, ৪৯২৮-নং)* অতএব সঠিক মুনাজাতের স্থান ও দুআ কবুল হওয়ার সময় সালাম ফিরার পূর্বে নয় কি?

পরন্তু যদি 'দুবুর' শব্দের অর্থ 'পরে' ধরে নেওয়া যায় তবুও তাতে হাত তুলে মুনাজাত প্রমাণ হয় না। আর এখানে হাত তুলে দুআ করা দুআর আদব বলে এবং আল্লাহ (হাত তুলে দুআ করলে) খালি হাত ফিরিয়ে দেন না বলে এখানেও তোলা হবে বা তুলতে হবে, তা বলা যায় না। ঐ দেখুন না, জুমআর খুতবায় দুআ বিধেয়। নবী ﷺ বৃষ্টির জন্য হাত তুলে খুতবায় দুআও করেছেন। কিন্তু সাধারণ সময়ে খুতবায় তিনি হাত তুলতেন না। তাইতো উমারাহ বিন রুয়াইবাহ যখন বিশ্র বিন মারওয়ানকে জুমআর খুতবায় হাত তুলে দুআ করতে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ ঐ হাত দুটিকে বিকৃত করুক! আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে কেবল তাঁর আঙ্গুল দ্বারা এভাবে ইশারা করতে দেখেছি। *(মুসলিম ৮৭৪, আবূ দাউদ,তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে আবী শাইবাহ ৫৪৯৬ নং)*

সুতরাং হাত তুলে দুআর আদব হলেও যেহেতু ঐ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে তিনি হাত তুলেন নি, তাই সলফগণ তা বৈধ মনে করতেন না। যুহরী বলেন, 'জুমআর দিন হাত তোলা নতুন আমল (বিদআত)।' *(ইবনে আবী শাইবাহ ৫৪৯১ নং)* ত্বাউস জুমআর দিন হাত তুলে দুআকে অপছন্দ করতেন এবং তিনি নিজেও হাত তুলতেন না। *(ঐ ৫৪৯৩ নং)*

ইমাম ও মুক্তাদীগণের খুতবায় হাত তুলে দুআ প্রসঙ্গে মাসরূক বলেন, (যারা ঐভাবে দুআ করে) 'আল্লাহ তাদের হাত কেটে নিক।' *(ঐ ৫৪৯৪ নং)*

সুতরাং একথা স্পষ্ট হল যে, ফরয নামাযের পর দুআ বৈধ ধরা গেলেও হাত তুলে দুআর আদব বলে হাত তোলা এখানেও বিদআত হবে, যেমন জুমআর খুতবায় হবে। কারণ নামাযের পরে মহানবী ﷺ এর আদর্শ ও তরীকা আমাদের সামনে মজুদ।

এ তো গেল একাকী হাত তুলে মুনাজাতের কথা। অর্থাৎ একাকী নামাযীর জন্যও বিধেয় নয় ফরয নামাযের পর হাত তুলে মুনাজাত করা।

বাকী থাকল জামাআতী দুআর কথা, তো তার প্রমাণ আরো দুঃসাধ্য। যাঁরা করেন বা করা ভালো মনে করেন তাঁরা বলেন, যে, 'জামাআতের দুআ একটি সুবর্ণ সুযোগ।' এর প্রমাণে তাঁরা এই যুক্তি পেশ করেন যে, 'জামাআতে দুআ করলে দুআ কবুল হয়। একাকী অনেকের দুআ কবুল নাও হতে পারে। সুতরাং পাঁচজন ভালো লোকের ফাঁকে একজন মন্দলোকেরও দুআ কবুল হয়ে যায়!' তাঁরা আরো বলেন, 'কোন নেতার কাছে কোন দাবী বা আবেদনের ব্যাপারে একার চেয়ে যৌথ ও জামাআতী চেষ্টাতেই কৃতার্থ হওয়া অধিক সম্ভব।' ইত্যাদি।

কিন্তু প্রথমতঃ যুক্তিটি দলীল-সাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার ভীতু নেতাদের সাথে সার্বভৌম ক্ষমতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতার অধিকারী মহান আল্লাহকে তুলনা করা বেজায় ভুল ও হারাম।

পরন্তু যদি তাই হয়, তবে এ যুক্তি ও সুযোগের কথা মহানবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবাগণ কি জানতেন না? নাকি তাঁদের চেয়ে ওঁরা বেশী জানলেন? কই তাঁরা তো এই সুযোগ গ্রহণ করে অনুরূপ জামাআতী দুআ ফরয নামাযের পর করে গেলেন না?

পরন্তু তাঁরাও জামাআতবদ্ধভাবে দুআ করেছেন; বিপদ-আপদের সময় ফরয নামাযের শেষ রাকআতে রুকু থেকে উঠার পর কওমায় হাত তুলে মুসলিমদের জন্য জামাআতী দুআ ও কাফেরদের জন্য বদ্দুআ করেছেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২৮৮, ১২৮৯, ১২৯০ নং)*

সাহাবাগণ রমযানের বিত্র নামাযে রুকুর পূর্বে বা পরে হাত তুলে জামাআতী দুআ করেছেন। *(মুঅত্তা, মিশকাত ১৩০৩ নং)*

তাঁরা নামাযের ভিতরেই হাত তুলে জামাআতী দুআ করেছেন। কিন্তু নামাযের পর করা উত্তম হলে তা করতেন না কি?

একদা মহানবী ﷺ জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক মরুবাসী (বেদুঈন) উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! মাল-ধন ধ্বংস হয়ে গেল, আর পরিবার-পরিজন (খাদ্যের অভাবে) ক্ষুধার্ত থেকে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন।' তখন মহানবী ﷺ নিজের দুই হাত তুলে দুআ করলেন। ফলে এমন বৃষ্টি শুরু হল যে পরবর্তী জুমআতে উক্ত (বা অন্য এক) ব্যক্তি পুনরায় খাড়া হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ঘর-বাড়ি ভেঙে গেল এবং মাল-ধন ডুবে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দুআ করুন!' মহানবী ﷺ তখন তিনি নিজের হাত তুলে পুনরায় বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দুআ করলেন এবং বৃষ্টিও গেল থেমে। *(বুখারী ৯৩৩নং, মুসলিম, নাসাঈ, মুসনাদ আহমদ ৩/২৫৬, ২৭১)*

অতএব বুঝা গেল যে, নামাযের পর দুআর অভ্যাস ছিল না বলেই উক্ত সাহাবী যে সময় কথা বলা এবং কেউ কথা বললে তাকে চুপ করতে বলাও নিষিদ্ধ সেই সময় আল্লাহর নবী ﷺ কে দু' দু'বার দুআর আবেদন জানালেন।

সায়েব বিন য়্যাযীদ বলেন, একদা আমি মুআবিয়া ﷺ এর সাথে (মসজিদের) আমীর-কক্ষে জুমআর নামায পড়লাম। তিনি সালাম ফিরলে আমি উঠে সেই জায়গাতেই সুন্নত পড়ে নিলাম। অতঃপর তিনি (বাসায়) প্রবেশ করলে একজনের মারফৎ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'তুমি যা করলে তা আর দ্বিতীয়বার করো না। জুমআর নামায সমাপ্ত করলে কথা বলা অথবা বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার সাথে আর অন্য কোন নামায মিলিয়ে পড়ো না। কারণ, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, (মাঝে) কথা না বলে বা বের হয়ে না গেয়ে কোন নামাযকে যেন অন্য নামাযের সাথে মিলিয়ে না পড়ি।' *(মুসলিম ৮৮৩, আবু দাউদ ১১২৯নং, মুসনাদে আহমদ ৪/৯৫, ৯৯)*

উক্ত হাদীস নিয়ে একটু চিন্তা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, সাহাবাদের যুগেও ঐ মুনাজাতের ঘটা বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং তা যে নব-আবিষ্কৃত বিদ্‌আত তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

কিন্তু অজান্তে লোকেরা শাঁস ছেড়ে আঁটিতে কামড় মারছে! যেখানে দুআ করা ওয়াজিব বা বিধেয় সেখানে না করে অসময় ও অবিধেয় স্থানে দুআ করার জন্য মারামারি! আবার কেউ না করলে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি!! কিন্তু তাও কি বৈধ?

অতএব আপনি যদি জ্ঞান ও বিবেকের সাহায্যে শরীয়তের মাপকাঠিতে ইনসাফ করতে চান এবং দ্বিধাবিভক্ত সমাজের সংকীর্ণ মনের মানুষদের হৃদয়-দ্বারকে উদার ও উন্মুক্ত করে শৃঙ্খলা আনতে চান, তাহলে নিশ্চয় এ ব্যাপারে আসল সত্য আপনার নিকটও প্রকট হয়ে উঠবে ইন শা-আল্লাহ। পক্ষান্তরে আপনি তো চান আল্লাহর অনুগ্রহ, আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত। তবে তা যদি এ সময় ছাড়া অন্য সময়েই পাওয়া যায়, তাহলে তা সে সময়েই চেয়ে নিতে বাধা কোথায়? কথায় বলে, "ঢেঁকিশালে যদি মানিক পাই, তবে কেন পর্বতে যাই?" মোট কথা আপনার প্রয়োজন আপনি আপনার নামাযেই ভিক্ষা করুন। আপনার আপদে-বিপদে ও বালা-মসীবতে নামাযেই সাহায্য প্রার্থনা করুন। বিশেষ করে আল্লাহ যেহেতু বলেন, "তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" *(সূরা বাক্বারাহ ৪৫, ১৫৩ আয়াত)*

অতএব খেয়াল করে দেখুন হয়তো বা যে প্রয়োজন আপনি ভিক্ষা করবেন সেই প্রয়োজনের দুআ নামাযেই রয়েছে। নচেৎ অনুরূপ সহীহ দুআ বেছে নিয়ে আপনি দুআর স্থানে নামাযেই করতে পারেন। আর যদি নিজের ভাষাতেই দুআ করতে হয়, তাহলে দুআ কবুল হওয়ার আরো বহু সময় আছে। সেই সাধারণ সময়ে আপনি আপনার বিনয়ের হাত তুলে খুব করে যত পারেন আল্লাহর নিকট চেয়ে নিন। আপনি একা হলেও -আল্লাহর ওয়াদা- তিনি বান্দার দুআ কবুল করেন; যদি সঠিক নিয়মে হয়। নাইবা চাইলেন ঐ বিতর্কিত সময়ে!

তাছাড়া নামাযের ভিতর মুনাজাতের ঐ নয়নাভিরাম বাগিচায় প্রায় আটটি স্থানে দুআ করার সুযোগ রয়েছে; তাকবীরে তাহরীমার পর, রুকুতে, কওমাতে, সিজদায়, দুই সিজদার মাঝে, তাশাহহুদে, রুকুর পূর্বে অথবা পরে কুনূতে এবং কুরআন পাঠকালে রহমতের আয়াত এলে রহমত চেয়ে এবং আযাবের আয়াত এলে আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে নামাযী দুআ করে থাকে। *(ফতহুল বারী ১১/১৩৬)* আর উক্ত স্থানগুলিতে কি নিয়ে দুআ করবেন তা তো পূর্বের পরিচ্ছেদগুলিতে জেনেছেন। সুতরাং এতগুলো স্থান কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়?

কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকে সে সব দুআকে কেবল নামায বলেই জানে ও চেনে। দুআ বলে নয়। ফলে পূর্ণ সমর্থন করে জামাআতী দুআকে। হয়তো বা তার কারণ এই যে, মুখস্থ করে দুআ করা কষ্টকর ব্যাপার, অথচ নামাযের পর জামাআতে কেমন আরামসে কেবল 'আমীন-আমীন' বললেই দুআ ও সহজে কিস্তিমাত হয়ে যায়! পক্ষান্তরে ইমাম সাহেব কি দুআ করলেন তার খবর নেই, দুআর অর্থের প্রতি খোঁজ নেই, দুআর প্রতি মনোযোগ নেই - এমন দুআয় ফল কোথায়? মহানবী ﷺ বলেন, "আর জেনে রেখো যে, আল্লাহ বিস্মৃত ও উদাসীন হৃদয় থেকে দুআ মঞ্জুর করেন না।" *(তিরমিযী ৩৪৭৯ নং)*

দুআ বিদআতের ফতোয়া শুনে অনেকের অনেক রকম অভিযোগ। কেউ বলেন, 'দুআ উঠে যাচ্ছে, কিছু দিন পর নামাযও উঠে যাবে হয়তো!' অথচ দুআ ও নামায এক নয়। নামায হল দ্বীনের খুঁটি। আর নামাযের পর হাত তুলে দুআ তো ভিত্তিহীন। সুতরাং যার ভিত নেই, তা টিঁকে কেমনে?

এক মসজিদে জামাআতের সময় হয়ে এসেছিল। ওযু করতে দেরী হওয়ায় আমাদের অপেক্ষা করছিল জামাআত। এক সাহেব কারণ জানতে চাইলে কেউ বললেন, 'আরবের মাওলানা ওযু করছেন, একটু থামুন।' কিন্তু চট্ করেই এক সাহেব বলে উঠলেন, 'আরবের লোকদের দুআ না হলে চলে, ওযু না হলেও তো চলবে!'

অনেকে বলেন, 'কম্বলের রোঁয়া বাছতে সব শেষ।'

বক্তার ধারণামতে শরীয়তের সবকিছুই কম্বলের রোঁয়া। অর্থাৎ ফরয, সুন্নত, নফল, বিদআত সবই সমান! অথচ প্রকৃতপক্ষে বিদআত উচ্ছেদ কম্বলের রোঁয়া বাছা নয়; বরং ফুল বাগানের আগাছা অথবা ধানক্ষেতের ঝোড়া বাছা।

অনেকে বলেন, 'পায়জামা খাটাতে খাটাতে শেষকালে দেখছি আন্ডারপ্যান্ট হয়ে যাবে!' 'ছিল ঢেঁকি হল শূল, কাটতে কাটতে নির্মূল - হয়ে যাবে।'

অর্থাৎ ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ উঠে গেলে যেন দ্বীনের মূল অংশ বাদ পড়ে গেল! এঁদের নিকটে মুড়ি-মুড়কির সমান দর। কাক-কোকিলের কোন পার্থক্য নেই। অথচ ইসলামে অতিরঞ্জনের স্থান নেই। ইসলামে কোন কিছু এমন নেই যাতে সংযোজন করা যাবে অথবা কিছু হ্রাস করা যাবে। বাড়তি নখ-চুল কাটা অবশ্য বাঞ্ছিত, আঙ্গুল বা মাথা কাটা নয়। পায়জামা গাঁটের নিচে ঝুলে রাস্তার ময়লা লাগলে অবশ্যই জ্ঞানীগণ তা কেটে গাঁটের উপর পর্যন্ত করে নেন। কারণ তাঁরা জানেন যে, গাঁটের নিচে কাপড় পরা হারাম। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় বাড়তি অংশ কাটা তো সকলের নিকট জ্ঞান ও বিজ্ঞান-সম্মত। আর বাড়তি অংশ কাটলেই যে আসল অংশও কাটা যাবে তা জরুরী নয়। অবশ্য যাঁদের নিকটে আসল-নকলের কোন পার্থক্য-জ্ঞান নেই তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

তাছাড়া বাড়তি ও বেশী করার প্রয়োজন কোথায়? অল্প মেহনতে ফল ও কাজ একই হলে সেটাই যথেষ্ট ও ঈপ্সিত নয় কি? নচেৎ 'চাষার চাষ করা দেখে চাষ করলে গোয়াল, ধানের সঙ্গে খোঁজ নাই বোঝা বোঝা পোয়াল' হবে না কি?

অনেকে বলেন, 'ওঁরা কি জানতেন না, যাঁরা এতদিন নিয়মিতভাবে দুআ করে গেলেন?'

কিন্তু এর উত্তরে আমরাও প্রশ্ন করতে পারি, 'ওঁরা কি জানতেন না, যাঁরা কখনো মুনাজাত করে যান নি, বা জানেন না যাঁরা এখনো মুনাজাত করেন না ?' সুতরাং দলীলই প্রমাণ করবে কে জানতেন আর কে জানতেন না। পক্ষান্তরে যাঁরা ইজতিহাদে ভুল করে গেছেন, আল্লাহ তাঁদের ভুল ক্ষমা করবেন এবং তাঁরা একটি নেকীর অধিকারীও হবেন। অতএব যাঁরা না জেনে করে গেছেন তাঁদেরকে বিদআতী বলার অধিকারও কারো নেই। তবে সঠিকতা জানার পর তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা অবশ্যই ওয়াজেব।

অনেকে বলেন, দুআ তো ভালো জিনিস। ওতে ক্ষতি কি? কিন্তু ভালো হলেই যে বাড়তি করার অধিকার আছে, তা নয়। নামায ভালো বলে ২ রাকআতের স্থানে ৩ রাকআত বেশী পড়া যায় না। দরূদ ভালো হলেও জামাআতী সমস্বরে বা দাঁড়িয়ে কিয়াম করে দরূদ পড়া যায় না। এই বাড়তি করার নামই তো বিদআত।

অনেকে বলেন, 'দুআ উঠে গেল তাই তো নানা কষ্ট, নানা বিপদ-আপদ দেখা দিচ্ছে মুসলিম সমাজে।' অবশ্য এমন লোকেরা নামাযের পর হাত তুলে দুআ ছাড়া আর অন্য দুআ চেনেন না। তাই তো কেউ ফরয নামাযের পর মুনাজাত না করলে অনেকে কুরআনের আয়াত থেকে দলীল উদ্ধৃত করে তাকে জাহান্নামী বানিয়ে থাকেন! কারণ আল্লাহ বলেন, "তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার নিকট দুআ কর, আমি তা কবুল করব। যারা অহংকারে আমার ইবাদত (দুআ) করায় বিমুখ তারা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(সূরা মুমিন ৬০ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, এমন বক্তার নিকট দুআ এবং ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআর মাঝে কোন পার্থক্যই নেই। তাই তো ঝোঁপ না বুঝেই কোপ মেরে থাকেন!

অনেকে বলেন, 'ফরয নামাযের পর ঐরূপ দুআ করতে নিষেধ আছে কি?' কিন্তু নিষেধ না থাকলে যদি করা যেত, তাহলে তো বহু কিছু করা যায়। আযান ও নামায ভালো জিনিস বলে সকাল ৯টায় আযান দিয়ে জামাআত করে নামায পড়তে পারি কি? কারণ ঐ সময় ঐ আমল তো নিষেধ নয়। তবে দরূদে সমস্বরকে কেন বিদআত বলি, সমস্বরে দরূদ তো নিষেধ নয়--- ইত্যাদি। এরূপ মুনাজাত নেই তার প্রমাণ হল হাদীসে বা আসারে তার উল্লেখ নেই। পরন্তু কোন ইবাদত 'নেই' প্রমাণ করতে দলীলের প্রয়োজন হয় না; কারণ 'নেই' এর দলীলই হল কুরআন-হাদীসে এর উল্লেখ নেই। অবশ্য 'আছে' প্রমাণ করতে স্পষ্ট দলীল জরুরী। তাই তো যে কর্ম করতে নিষিদ্ধ বলে প্রমাণ আছে তা করাকে 'হারাম' বলে, 'বিদআত' নয়। পক্ষান্তরে যা 'আছে' বলে প্রমাণ নেই তা দ্বীন ও ভালো মনে করে করাকেই নতুনত্ব বা বিদআত বলে। আর মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার পর্যায়ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪০নং)* "যে ব্যক্তি এমন আমল করে, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম ১৭১৮-নং)* "আর নবরচিত কর্মসমূহ থেকে দূরে থেকো। কারণ, নবরচিত কর্ম হল বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" *(মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১৬৫নং)* "আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই হল জাহান্নামে।" *(সহীহ নাসাঈ ১৪৮৭নং)*

সুতরাং বিদআতের ভালো-মন্দ কিছু নেই। বরং তার সবটাই মন্দ। আর যা বিদআত, তা জরুরী মনে না করে করলেও বিদআত এবং কখনো কখনো করাও বিদআত। নচেৎ এর প্রমাণে দলীল জরুরী। যেমন যদি বলি, 'কিয়াম করা বিদআত, তবে জরুরী না মনে করে করা বিদআত নয় বা কখনো কখনো করা বিদআত নয়' তবে নিশ্চয় তা যুক্তিসঙ্গত নয়। তদনুরূপ ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ যদি বিদআতই হয় তবে তা অজরুরী মনে করে কখনো কখনো করা কোন যুক্তিকে দূষণীয় হবে না?

পরিশেষে এখানে ইবনে মসউদ ﷺ এর একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া সঙ্গত মনে করি; তিনি বলেন, "তোমরা অনুসরণ কর, নতুন কিছু রচনা করো না। কারণ তোমাদের জন্য তাই যথেষ্ট। আর তোমরা পুরাতন পন্থাই অবলম্বন কর।" *(সিলসিলা যয়ীফাহ ২/ ১৯)*

(ফরয নামাযের পর একাকী বা জামাআতী মুনাজাত বিদআত হওয়া প্রসঙ্গে ফতোয়া দেখুন। *(মবঃ ১৭/৫৫, ২০/১৪৭, ২৪/৭০, ৯২, ফউঃ ১/৩৬৭, মুমঃ ৩/২৭৭-২৮২, ফইঃ ১/৩১৯, প্রভৃতি)*

সবশেষে, হাত তুলে মুনাজাত নেই বলে সালাম ফিরার পরপরই উঠে সুন্নত পড়তে লাগা অথবা প্রস্থান করা এবং যিক্র-আযকার ত্যাগ করা অবশ্য উচিত নয়।

নারী-পুরুষের নামাযের পদ্ধতি একই

পুরুষ ও মহিলার নামাযের পদ্ধতি একই প্রকার। সুতরাং মহিলাও ঐরূপ একই তরীকায় নামায পড়বে, যেরূপ ও যে তরীকায় পুরুষ পড়ে থাকে। কারণ, (নারী-পুরুষ উভয় জাতির) উম্মতকে সম্বোধন করে রসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা সেইরূপ নামায পড়, যেরূপ আমাকে পড়তে দেখেছ।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৬৮৩নং)* আর উভয়ের নামায পৃথক হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীলও নেই।

সুতরাং যে আদেশ শরীয়ত পুরুষদেরকে করেছে, সে আদেশ মহিলাদের জন্যও এবং যে সাধারণ আদেশ মহিলাদেরকে করেছে তাও পুরুষদের ক্ষেত্রে পালনীয় -যদি বিশেষ হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার দলীল না থাকে। যেমন, "যারা সতী মহিলাদের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের জন্য শাস্তি হল ৮০ কোড়া---।" *(কুঃ ২৪/৪)* পরন্তু যদি কেউ কোন সৎ পুরুষকে অনুরূপ অপবাদ দেয়, তবে তার জন্যও ঐ একই শাস্তি প্রযোজ্য।

সুতরাং মহিলারাও তাদের নামাযে পুরুষদের মতই হাত তুলবে, পিঠ লম্বা করে রুকূ করবে, সিজদায় জানু হতে পেট ও পায়ের রলাকে দূরে রেখে পিঠ সোজা করে সিজদাহ করবে। তাশাহহুদেও সেইরূপ বসবে, যেরূপ পুরুষরা বসে। উম্মে দারদা (রাঃ) তাঁর নামাযে পুরুষের মতই বসতেন। আর তিনি একজন ফকীহ ছিলেন। *(আত্-তারীখুস স্বাগীর, বুখারী ৯৫পৃঃ, বুঃ, ফবাঃ ২/৩৫৫)* আর মহিলাদের জড়সড় হয়ে সিজদাহ করার ব্যাপারে কোন হাদীস সহীহ নয়। *(সিযঃ ২৬৫২ নং)* এ জন্যই ইবরাহীম নাখয়ী (রঃ) বলেন, 'নামাযে মহিলা ঐরূপই করবে, যেরূপ পুরুষ করে থাকে।' *(ইআশাঃ, সিসানঃ ১৮৯পৃঃ)*

পক্ষান্তরে দলীলের ভিত্তিতেই নামাযের কিছু ব্যাপারে মহিলারা পুরুষদের থেকে ভিন্নরূপ

আমল করে থাকে। যেমনঃ-

১। বেগানা পুরুষ আশে-পাশে থাকলে (জেহরী নামাযে) মহিলা সশব্দে কুরআন পড়বে না। *(মুমঃ ৩/৩০৪)* যেমন সে পূর্ণাঙ্গ পর্দার সাথে নামায পড়বে। তাছাড়া একাকিনী হলেও তার লেবাসে বিভিন্ন পার্থক্য আছে।

২। মহিলা মহিলাদের ইমামতি করলে পুরুষদের মত সামনে না দাঁড়িয়ে কাতারের মাঝে দাঁড়াবে।

৩। ইমামের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে মহিলা পুরুষের মত 'সুবহা-নাল্লাহ' না বলে হাততালি দেবে।

৪। মহিলা মাথার চুল বেঁধে নামায পড়তে পারে, কিন্তু (লম্বা চুল হলে) পুরুষ তা পারে না।

এ সব ব্যাপারে দলীলসহ বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

অনেক মহিলা আছে, যারা মসজিদে বা বাড়িতে পুরুষদের নামায পড়া না হলে নামায পড়ে না। এটা ভুল। আযান হলে বা নামাযের সময় হলে আওয়াল অক্তে নামায পড়া মহিলারও কর্তব্য। *(মুত্বাসা ১৮৮- ১৮৯পৃঃ)*

কুরআন মুখস্থ না হলে

কারো পক্ষে কুরআন মুখস্থ কোন প্রকারে সম্ভব না হলে, অথবা ফরয হওয়ার পর তৎপর মুখস্থ করার সুযোগ না হলে সে মুখস্থ করার পূর্বের নামাযগুলোতে ক্বিরাআতের স্থানে 'সুবহা-নাল্লাহ, অলহামদু লিল্লা-হ, অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অল্লা-হু আকবার, অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবে। *(আদাঃ ৮৩২ নং, ইখুঃ, হাঃ, ত্বাবাঃ, ইহিঃ, ইগঃ ৩০৩নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ নামায ভুলকারী সাহাবীকে বলেছিলেন, "অতঃপর যদি তোমার কুরআন মুখস্থ থাকে, তাহলে তা পাঠ কর। নচেৎ তাহমীদ (আলহামদু লিল্লা-হ), তাকবীর (আল্লা-হু আকবার) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পড়।" *(আদাঃ ৮৬১ নং, তিঃ)*

সুতরাং কুরআন মুখস্থ হয় না বলে বা কুরআন মুখস্থ নেই বলে এই ওজরে নামায মাফ নয়। তাসবীহ-তাহলীল পড়েও নামায পড়তে হবে এবং তার সাথে চেষ্টা থাকবে মহান আল্লাহর মহাবাণী মুখস্থ করার।

নামায কায়েম হবে কিভাবে?

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে ও তাঁর রসূলের মুখে আমাদেরকে নামায পড়তে ও কায়েম করতে বলেছেন। সুতরাং নামায পড়াই যথেষ্ট নয়; নামায কায়েম করা জরুরী। আর নামায কায়েম হবে তখনই, যখন নামাযী নামাযের শর্তাবলী, রুক্‌ন, ফরয বা ওয়াজেব প্রভৃতি পালন করে বাহ্যিকভাবে এবং তার আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী প্রতিষ্ঠা করে আন্তরিকভাবে নামায আদায় করবে। আর তখনই নামায সেই নামায হবে, যে নামায পাপ ও নোংরা কাজ হতে নামাযীকে বিরত রাখে।

নামাযের বাহ্যিক দিকটা কিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা আমরা পূর্বেই জেনেছি। এবারে তার আধ্যাত্মিক দিকটা কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে তাই আলোচিতব্য।

আন্তরিক বিষয়াবলীর মধ্যে হৃদয় উপস্থিত রেখে একাগ্রতা ও মনোনিবেশের সাথে নামায পড়াই প্রধান। এর সঙ্গে থাকবে মনের কাকুতি-মিনতি, অনুনয়-বিনয়, সর্বমহান বিশ্বাধিপতি এবং একমাত্র প্রভু ও উপাস্যের সম্মুখে দন্ডায়মান হয়ে অন্তরে থাকবে নিরতিশয় আদব, ভক্তি ও বিনতি। আল্লাহ তাআলা বলেন, "মু'মিনগণ অবশ্যই সফলকাম হয়েছে; যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র---।" *(কুঃ ২৩/১)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে মুসলিম ব্যক্তির নিকটে কোন ফরয নামায উপস্থিত হয়, অতঃপর সে ঐ নামাযের ওযু, কাকুতি-মিনতি ও রুকূ সুন্দরভাবে করে, তাহলে এর ফলে কাবীরা গোনাহ না করলে তার পূর্বেকার গোনাহসমূহের তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়। আর এরূপ হয় সব সময়ের জন্য। *(মুঃ, মিঃ ২৮৬ নং)*

"যে মুসলিম ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে, অতঃপর খাড়া হয়ে সে তার দেহ-মন নিয়ে একাগ্রতার সাথে ২ রাকআত নামায পড়ে, সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজেব হয়ে যায়।" *(মুঃ ২৩৪ নং)*

বিনতির মানে এই নয় যে, নামাযীকে নামাযে কাঁদতে হবে। বিনতি হল হৃদয়ের উপস্থিতি ও সর্বাঙ্গের স্থিরতার নাম। *(মুমঃ ৩/৪৫৬)*

অতএব একাগ্রতা, মনোযোগ ও বিনতির সাথে আপনি আপনার নামায কায়েম করতে চাইলে নিম্নোক্ত কয়েকটি উপদেশ গ্রহণ করুন ঃ-

১। আপনি যে নামায পড়ছেন তা নিশ্চয় একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, তাঁর হুকুম পালনার্থে, তাঁর প্রতি বিশেষ অনুরাগ, ভক্তি ও প্রেম প্রকাশার্থে, তাঁর নৈকট্য ও ভালোবাসা অর্জনের আশায়, তাঁর আযাবের ভয়ে, তাঁর সওয়াব ও ক্ষমার কামনাতেই আপনি নামায পড়ুন।

২। নামাযে দাঁড়িয়ে আপনি মনে করুন যে, আল্লাহর খাস দরবারে আপনি হাজির হয়েছেন। আপনি যেন তাঁকে দেখছেন, তিনি আরশের উপর রয়েছেন। সেখান হতেই তিনি সারা সৃষ্টির প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি আপনার নামায পড়াও দেখছেন। অবশ্য তাঁর কোন প্রকার আকার ও প্রতিমূর্তি মনে কল্পনা করবেন না। কারণ, তাঁর মত কোন কিছুই নেই।

আপনি আপনার মর্মমূলে ভাবুন যে, তিনি অবিনশ্বর, চিরঞ্জীব, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, মহাপরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়। তিনি আদেশ করেন, নিষেধ করেন, ভালোবাসেন আবার ক্রোধান্বিতও হন। বান্দার কোনও গোপন বা প্রকাশ্য কথা বা কর্ম তাঁর নিকট গুপ্ত নয়। সকল বিষয়ে তিনি সবিশেষ অবহিত। "চক্ষুর ছল-চাহনি এবং হৃদয় যা গোপন করে তা তিনি জানেন।" *(কুঃ ৪০/১৯)* এই প্রত্যয়ের সাথে সাথে তাঁর জন্য আপনার অন্তরে যথার্থ তা'যীম, ভক্তি, অনুরাগ, ভীতি, প্রেম, আগ্রহ, আশা, ভরসা, বিনতি প্রভৃতি সমবেত হবে। টুটে যাবে সাংসারিক সকল বন্ধন। শুধু টিকে থাকবে আল্লাহ ও আপনার মাঝে মুনাজাতের ও নিরালায় গভীর আলাপের বন্ধন।

৩। নামাযে দাঁড়িয়ে আপনি স্মরণ করুন, আপনাকে মরতেই হবে এবং ফিরে যেতে হবে সেই বিশাল বাদশার নিকট, যাঁর সামনে আপনি দন্ডায়মান আছেন, আর হিসাবও লাগবে তাঁর কাছে সকল কাজের। ধরে নিন্ হয়তো আপনার এটা শেষ নামায। সালাম ফিরে হয়তো আর নামাযের সুযোগ পাবেন না। যেন আপনি আপনার প্রিয়তমের নিকট থেকে বিদায়কালে শেষ সাক্ষাৎ করছেন, শেষ কথা বলছেন ও শেষ আবেদন জানিয়ে নিচ্ছেন। আর এই সময় কি আপনি আপনার চোখের পানি রুখে রাখতে পারেন? এই মুহূর্তে কি আপনার মন অন্য দিকে ছুটতে পারে?

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তুমি তোমার নামাযে মরণকে স্মরণ কর। কারণ, মানুষ যখন তার নামাযে মরণকে স্মরণ করে, তখন যথার্থই সে তার নামাযকে সুন্দর করে। আর তুমি সেই ব্যক্তির মত নামায পড়, যে মনে করে না যে, এ ছাড়া সে অন্য নামায পড়তে পারবে। তুমি প্রত্যেক সেই কর্ম থেকে দূরে থাক, যা করে তোমাকে (অপরের নিকটে) ক্ষমা চাইতে হয়। *(মুসনাদে ফেরদাউস, সিসঃ ১৪২১, সজাঃ ৮৪৯ নং)*

এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমাকে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, "যখন তুমি তোমার নামাযে দাঁড়াবে তখন (মরণ পথের পথিকের বিদায় নেওয়ার সময়) শেষ নামায পড়ার মত নামায পড়। এমন কথা বলো না, যা বলে (অপরের নিকট) ক্ষমা চাইতে হয়। আর লোকেদের হাতে যা আছে তা থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ হয়ে যাও।" *(বুঃ তারীখ, ইমাঃ ৪১৭১ নং, আঃ ৫/৪১২, বাঃ, সিসঃ ৪০১ নং)*

আর এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন, "তুমি (মরণ পথের পথিকের বিদায় নেওয়ার সময়) শেষ নামায পড়ার মত নামায পড়। (মনে মনে কর,) যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, নচেৎ তিনি তোমাকে দেখছেন---।" *(ত্বাবাঃ, বাঃ, প্রমুখ সিসঃ ১৯১৪ নং)*

৪। মনে করুন আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলছেন এবং আল্লাহ আপনার কথা শুনছেন ও জওয়াবও দিচ্ছেন। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি নামাযকে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি। আর আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে প্রার্থনা করে।' সুতরাং বান্দা যখন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ'-লামীন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল ---।' *(মুঃ, মিঃ ৮২৩ নং)*

আপনি মনে করুন, আপনি তাঁর সাথে একান্ত নিরালায় আলাপন করছেন। সুতরাং কারো সাথে নিভৃত আলাপে কানে-কানে কথা বলার সময় আপনার মন ও খেয়াল কি অন্য দিকে থাকতে পারে? মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই নামাযী তার প্রভুর সাথে নির্জনে আলাপ করে ---।" *(মাঃ, আঃ, মিঃ ৮৫৬ নং)*

৫। নামাযে খেয়াল করুন। আপনি এক অপরাধী, ক্ষমার ভিখারী। আপনি এক পলাতক দাস, অনুতপ্ত হয়ে তাঁর অনুগ্রহ-প্রার্থী। আপনি একজন দুর্বল ক্ষমতাহীন, ক্ষমতার ভিখারী। আপনি একজন নিঃস্ব অসহায়, সাহায্য ও সহায়তার অভিলাষী। পথভ্রষ্ট, পথ-নির্দেশের আশাধারী। ক্লিষ্ট ও পীড়িত, নিরাপত্তা ও নিরাময়ের ভিখারী। রুযীহীন, রুযীর ভিখারী। আর মনে রাখুন যে, এসব ভিক্ষা আপনি তাঁর দরজা ছাড়া অন্য কারো দরজায় পাবেন না, পেতে

পারেন না। তাই তো আপনি প্রত্যেক রাকআতে বলে থাকেন, “আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করে থাকি এবং তোমারই নিকট সাহায্য ভিক্ষা করি।” *(সূরা ফাতিহা/ ৪)*

৬। নামাযে আপনার চক্ষু শীতল হোক। হৃদয়-মন ভরে উঠুক শান্তি ও স্বস্তিতে। উপশম হোক সকল প্রকার ব্যথা ও বেদনার। মহানবী ﷺ বলেন, “নামাযে আমার চক্ষু শীতল করা হয়েছে।” *(আঃ, নাঃ, হাঃ, বাঃ, সজাঃ ৩১২৪ নং)* একদা তিনি বিলাল ؓ কে বললেন, “নামাযের ইকামত দিয়ে তদ্দ্বারা আমাদেরকে শান্তি দাও, হে বিলাল!” *(আদাঃ ৪৯৮৫, মিঃ ১২৫৩ নং)* অতএব আপনিও আপনার মনের পরম শান্তি নামাযেই খুঁজে পাবেন।

৭। এই সময় আপনি মিষ্টি সুরে সুন্দর ক্বিরাআত করুন। দেখবেন, যত পড়বেন তত আরো পড়তে মন হবে। ক্বিরাআত ছাড়তেই ইচ্ছা হবে না। সেই সময় মুনাজাতের এমন এক মিষ্ট স্বাদ আছে, যা ত্যাগ করতেই মন হবে না। ইমামের পশ্চাতে হলে মনে হবে নামায আরো লম্বা হোক।

৮। আর নামায যদি আপনার চক্ষুর শীতলতা হয় তাহলে নিশ্চয়ই কোন নামায আপনার পক্ষে ভারি হওয়া উচিত নয়। তা এক প্রকার বোঝা মনে করা এবং সময় হলে তা কোন রকম আদায় করে নামিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে থাকাও উচিত নয়। কারণ নামাযকে ভারি মনে করা মুনাফিকের চরিত্র ও লক্ষণ। ঐ দেখুন না, আল্লাহ তার সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, “মুনাফিকরা --- যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যের সাথে কেবল লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে।” *(কুঃ ৪/ ১৪২)* “আর তারা আলস্য ভরা মন নিয়ে নামাযে উপস্থিত হয়।” *(কুঃ ৯/৫৪)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “এশা ও ফজরের নামায মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে বেশী ভারি নামায।” *(আদাঃ, নাঃ, মিঃ ১০৬৬ নং)*

সুতরাং নামাযকে ভারি মনে করবেন না এবং দায় সারার মত চট্পট্ পড়ে নিয়ে কি করে অব্যাহতি মিলে সেই চেষ্টায় থাকবেন না। কারণ, জানেন যে, শান্তির সময় সংক্ষেপ হয় এবং কষ্টের সময় লম্বা। অতএব নামায যদি আপনার জন্য শান্তিপ্রদ হয়, তবে আপনাকে মনে হবে যে, তা চট্ করে শেষ হয়ে গেল। পক্ষান্তরে যদি তা ভারি ও কষ্টদায়ক মনে করে তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য অস্বস্তিবোধ করে থাকেন, তাহলে সে নামাযের সময় আপনাকে আরো লম্বা লাগারই কথা। পরন্তু মহান আল্লাহ যদি আপনার নিকট প্রিয়তম হন, তবে তাঁর সাথে নিরালায় আলাপ করতে তো বিরক্তি ও অস্বস্তিবোধ করার কথা নয়!

৯। কিন্তু প্রিয়তমের সাথে নিরালায় আলাপনের মিষ্ট স্বাদ তখনই পাবেন, যখন আপনি সজ্ঞানে তার সাথে কথা বলবেন। নচেৎ, পাগল যেমন প্রলাপ বকে কোন শান্তি পায় না, তেমনি আপনিও পাবেন না। সুতরাং নামাযে আপনি যা বলছেন, তা সম্পূর্ণ না হলেও মোটামুটি বুঝে বলুন। যা বলছেন, তা সঠিকভাবে বলুন। নচেৎ আপনি কি বলছেন, তা যদি আপনি নিজেই না বোঝেন অথবা ‘দাদা’ বলতে ‘গাধা’ বলেন, তাহলে নিশ্চয়ই সেই আলাপে মজা পাবেন না, বিধায় ফলও হবে অপরিণত বা বিপরীত।

ঐ দেখুন না, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “অবশ্যই নামাযী তার প্রতিপালকের সাথে নিরালায়

আলাপ করে। সুতরাং সে কি আলাপ করছে, তা যেন সে লক্ষ্য করে।” *(মাঃ, আঃ, মিঃ ৮৫৬ নং)*

যদি আপনি বুঝে ও খেয়াল করে সূরা তথা দুআ-দরূদ পড়েন, তাহলে তার ফল যে সুন্দর ও মিষ্ট হবে তা নিশ্চিত। ঐ ফলের ব্যাপারে রসূল ﷺ বলেন, “যখনই কোন মুসলিম পূর্ণরূপে ওযূ করে নামায পড়তে দাঁড়ায় এবং (তাতে) যা বলছে তা সে বুঝে, তখনই সে প্রথম দিনের শিশুর মত (নিষ্পাপ) হয়ে নামায সম্পন্ন করে।” *(আদাঃ, নাঃ, ইমাঃ, ইখুঃ, হাঃ, সতাঃ ১৮৩, ৫৪৪ নং)*

নামাযে ‘রূহ’ বা ‘জান’ আনতে যে জিনিস বেশী সাহায্য করে, তা হল নামাযে যা পড়া বা বলা হয় তার অর্থ বুঝা। অন্যথায় নারকেলের খোসা না ভেঙ্গে উপরে কামড় দিলে যেমন নারকেলের স্বাদ পাওয়া যায় না, পরন্তু মেহনত বরবাদ ও দাঁতে দরদ হয়, অনুরূপ আরবী ভেঙ্গে না বুঝে নামায পড়লে নামাযেরও কোন স্বাদ পাওয়া যায় না। তাতে বিশেষ তৃপ্তি ও ফললাভ হয় না।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “বান্দা নামায পড়ে, অথচ তার নামাযের ১০, ৯, ৮, ৭, ৬, ৫, ৪, ৩ অথবা ২ ভাগের ১ ভাগ মাত্র (কবুল বলে) লিপিবদ্ধ হয়!” *(আদাঃ ৭৯৬ নং, নাঃ)*

বলাই বাহুল্য যে, যার নামায যত মহানবী ﷺ এর সুন্নাহ মোতাবেক এবং রূহবিশিষ্ট হবে, তার নামায তত পূর্ণাঙ্গ ও বেশী শুদ্ধ হবে। নচেৎ, সেই কমি অনুসারে সওয়াবও কম হতে থাকবে।

মহান আল্লাহ বলেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কি বলছ তা বুঝতে পার---।” *(কুঃ ৪/৪৩)* সুতরাং মাদকদ্রব্যের মত ঔদাস্য, গাফলতি, খেল-তামাশা, পার্থিব সম্পদ এবং (নামাযী নামাযে যা বলছে তা বুঝতে চেষ্টা না করার) আলস্য যাকে নেশাগ্রস্ত করে রেখেছে সে কি নামাযের নিকটে আসার অযোগ্য নয়?

ফলকথা, সর্বপ্রকার মাদকতা, নেশা, ঔদাস্য ও অমনোযোগিতা থেকে পবিত্র হয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে আলাপ করাই মু’মিনের কর্তব্য।

১০। নামাযের ভিতর আপনি আপনার আত্মা ও শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করুন। আপনি নামাযে মন বসালেও শয়তান কিন্তু আপনার পিছন ছাড়ে না। তাই তো অনেক ভুলে যাওয়া কথা নামাযে মনে পড়ে থাকে। মহানবী ﷺ বলেন, “নামাযের জন্য আযান দেওয়া হলে শয়তান পাদতে পাদতে এত দূরে পালায়, যেখানে আযান শোনা যায় না। আযান শেষ হলে আবার ফিরে আসে। ইকামত শুরু হলে পুনরায় পালায়। ইকামত শেষ হলে নামাযীর কাছে এসে তার মনে বিভিন্ন কুমন্ত্রণা আনয়ন করে বলে, ‘এটা মনে কর, ওটা মনে কর।’ এইভাবে নামাযীর যা মনে ছিল না তা মনে করিয়ে দেয়। এর ফলে নামাযী শেষে কত রাকআত নামায পড়ল তা জানতে পারে না।” *(বুঃ ৬০৮ নং, মুঃ, আদাঃ, নাঃ, দাঃ, মাঃ, আঃ ২/৩১৩)*

উসমান বিন আবুল আস ﵁ মহানবী ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! শয়তান আমার ও আমার নামায এবং ক্বিরাআতের মাঝে অন্তরাল ও গোলমাল সৃষ্টি করে। (বাঁচার উপায় কি?)’ তিনি বললেন, “ওটা হল ‘খিনযাব’ নামক এক শয়তান। সুতরাং ঐরূপ অনুভব করলে তুমি আল্লাহর নিকট ওর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো

এবং তোমার বাম দিকে ৩ বার থুথু মেরো।” উসমান বলেন, এরূপ করলে আল্লাহ আমার নিকট থেকে শয়তানের ঐ কুমন্ত্রণা দূর করে দেন। *(মুঃ ২২০৩ নং)*

১১। নামাযে দাঁড়িয়ে আপনার দৃষ্টিকে ঠিক সিজদার জায়গায় নিবদ্ধ রাখুন। তাশাহহুদে বসে দৃষ্টি রাখুন শাহাদতের আঙ্গুলের উপর। এতে আপনার মন সজাগ ও সতর্ক থাকবে। এ ব্যাপারে হাদীস পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

১২। উপর দিকে খবরদার নজর তুলবেন না। আল্লাহর রসূল ﷺ নামায পড়তে পড়তে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে দেখতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, “লোকেদের কি হয়েছে যে, ওরা নামাযের মধ্যে ওদের দৃষ্টি আকাশের দিকে তোলে?” এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য খুব কঠোর হয়ে উঠল। পরিশেষে তিনি বললেন, “অতি অবশ্যই ওরা এ কাজ হতে বিরত হোক, নচেৎ ওদের চক্ষু ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে।” *(বুঃ৭৫০নং, আদাঃ, নাঃ, ইমাঃ)*

নবী ﷺ আরো বলেন, “নামাযের মধ্যে আকাশের (উপরের) দিকে দৃষ্টিপাত করা হতে লোকেরা অতি অবশ্যই বিরত হোক, নচেৎ ওদের দৃষ্টি আর ফিরে না-ও আসতে পারে। (ওরা অন্ধ হয়ে যেতে পারে!)” *(মুঃ৪২৮নং)*

১৩। আর এদিক-সেদিকও তাকাবেন না। চোরা ও টেরা নজরে কোন কিছু দেখবেন না। কারণ, এই দৃষ্টি আকর্ষণ ও চুরি করা শয়তানের কাজ। *(বুঃ ৭৫১নং, আদাঃ)*

বান্দা যদি তার নামাযে এদিক-ওদিক দৃষ্টি না ফিরায়, তাহলে আল্লাহ তার নামাযের প্রতি বিশেষ আগ্রহী হন। *(তিঃ, হাঃ, সতাঃ ৫৫০ নং)* বান্দার এদিক-ওদিক চেহারা ফিরিয়ে দিলে আল্লাহও আর সে নামাযের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। *(আদাঃ, ইখুঃ, ইহিঃ, সতাঃ ৫৫২ নং)* সুতরাং সাবধান! আপনার নামায থেকে মহান আল্লাহ যেন মুখ ফিরিয়ে না নেন এবং দুশমন শয়তানও যেন আপনার নামায ছিন্তাই করে না নেয়।

১৪। আপনি নামাযে দাঁড়াবার আগে আপনার সম্মুখ হতে সেই সমস্ত জিনিসকে দূরে সরিয়ে দেন, যা আপনার নজর কেড়ে নেবে, মনোযোগ ছিনিয়ে নেবে, খেয়াল আকর্ষণ করবে ও একাগ্রতা নষ্ট করবে বলে আশঙ্কা করেন। এই জন্যই প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “গৃহে (মসজিদে) এমন কোন জিনিস থাকা উচিত নয়, যা নামাযীকে মশগুল (অন্যমনস্ক) করে ফেলে।” *(আদাঃ, আঃ ৪/৬৮, ৫/৩৮০)* একদা তিনি নক্সাদার কাপড়ে নামায পড়ে বললেন, “আমি এর নক্সার দিকে একবার তাকালে আমাকে তা আমার নামায থেকে অমনোযোগী করে ফেলার উপক্রম করেছিল।” *(বুঃ, মুঃ, মাঃ, ইগঃ ৩৭৬ নং)* মা আয়েশা رضي الله عنها এর একটি ছবিযুক্ত কাপড় টাঙ্গানো থাকলে সেদিকে মুখ করে নামায পড়ার পর তিনি বললেন, “এটাকে আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দাও। কারণ, এর ছবিগুলো আমার নামাযে বাধা সৃষ্টি করছিল।” *(বুঃ, মুঃ, আআঃ, আঃ ৬/১৭২)*

১৫। নামাযের পূর্বে আপনি প্রস্রাব-পায়খানার কাজ সেরে নিন এবং প্রস্রাব বা পায়খানার চাপ নিয়ে নামাযে দাঁড়ান না। কারণ, এতে নামাযে মন বসে না। হয়তো বা তাড়াহুড়ো করে নামায শেষ করতে হয় অথবা নামাযে অন্যমনস্কতা আসে। অনুরূপ পেটে খিদে রেখে সামনে খাবার উপস্থিত থাকলে অথবা খাবারের দিকে মন পড়ে থাকলেও নামাযে দাঁড়ানো উচিত নয়।

কারণ এতে নামায হয় না। *(বুঃ, মুঃ, ইআশাঃ, ইগঃ ৮-নং)*

১৬। এমন কোন ভারী জিনিস সঙ্গে নিয়ে নামাযে দাঁড়াবেন না, যাতে নামাযের বদলে ঐ ভারের প্রতিই আপনার মন লেগে না থাকে।

১৭। এমন কোন স্থানে বা লেবাসে নামায পড়তে শুরু করবেন না, যার দুর্গন্ধ আপনাকে অতিষ্ঠ করে তোলে।

১৮। এমন টাইট্‌-ফিট্‌ লেবাস পরে নামায পড়বেন না, যাতে বসা-ওঠা কষ্টকর হয়।

১৯। বেপর্দা মহিলারা যখন গায়ে-মাথায় কাপড় বা চাদর নিয়ে নামায পড়ে, তখন স্বাভাবিকভাবে তাদেরকে গরম লাগে। এতে নামাযে মন বসে না এবং যত তাড়াতাড়ি শেষ করে চাদর খুলতে পায় সেই চেষ্টা করে। সুতরাং নামাযী হওয়ার সাথে সাথে আপনি পর্দানশীন মহিলা হতে চেষ্টা করুন। যেমন ওযু করার পর 'মেক-আপ' করলে যাতে নামাযের আগে ওযু ভেঙ্গে গিয়ে পুনরায় ওযুতে তা নষ্ট হয়ে না যায়, তার জন্য তাড়াতাড়ি নামায শেষ করা এবং মাথার চুল বেঁধে বা চুলে ফুল গুঁজে নামায পড়তে পড়তে চুলের ও ফুলের পারিপাট্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় বারবার ওড়নার প্রতি খেয়াল করাও নামাযে অমনোযোগিতার দলীল।

২০। পরনে এমন ওড়না, কাপড়, শাল, চাদর, বা শাড়ি হতে হবে, যেন নামাযের অবস্থায় তা বারবার পড়ে না যায়। নচেৎ, সোজা করতে করতেই নামায শেষ হবে অথচ নামাযে মন থাকার পরিবর্তে মন থাকবে কাপড় পড়ার দিকে। পক্ষান্তরে যদি মহিলাদের মাথা, বুক, পেট অথবা হাত বা পায়ের রলা থেকে কাপড় সরে যায়, তাহলে তো মূলে নামাযই নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং বিশেষ করে মহিলাদের জন্য এ বিষয়ে সতর্কতা জরুরী।

২১। কোন লটকে রাখা কাজ বন্ধ করে - যেমন চুলোর উপর হাঁড়ি রেখে নামায পড়বেন না। কারণ, এ অবস্থায় নামাযে মন না থেকে মন পড়ে থাকবে ঐ চুলোর হাঁড়ির উপরেই। পাছে উল্টে না যায় বা পুড়ে না যায়, ইত্যাদি।

২২। সম্ভব হলে এমন স্থানে নামায পড়ুন, যেখানে খুব গরম আপনাকে অতিষ্ঠ করবে না এবং খুব শীতও আপনাকে কাতর করে ফেলবে না। অনুরূপ যে স্থানে হৈ-হুল্লোড়, চেঁচামেচি বা গোলমাল-গন্ডগোলের ফলে আপনার নামাযে একাগ্রতার ব্যাঘাত ঘটে, সে স্থানে নামায পড়বেন না। *(কাইফা তাখশাঈনা ফিস স্বালাহ ১৯-২৪ দ্রঃ)*

২৩। আপনার সামনে কোন ঘুমন্ত ব্যক্তি থাকলে এবং তার কাপড় সরে যাওয়া বা ঘুমের ঘোরে আপনার নামাযের স্থান দখল করার আশঙ্কা হলে সে জায়গায় নামায পড়তে দাঁড়াবেন না। অনুরূপ যে ব্যক্তি কথা বলছে, তাকে সামনে করেও নামায পড়বেন না। এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাও এসেছে। *(আদাঃ ৬৯৪ নং)*

২৪। নামাযের সময় ঘুম এলে যথাসম্ভব তা দূর করে নামায পড়ুন। নচেৎ, মন যে আপনাকে ফাঁকি দেবে, তা বলাই বাহুল্য। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ নামায পড়া অবস্থায় ঘুমে ঢুলতে থাকলে সে যেন একটু শুয়ে ঘুম তাড়িয়ে নেয়। নচেৎ, ঢুলতে ঢুলতে নামায পড়তে থাকলে সে হয়তো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়ে নিজেকে গালি

দিয়ে বসবে।” *(বুঃ ২১২ নং, মুঃ, আদাঃ, তিঃ, ইমাঃ, মাঃ, দাঃ, আঃ ৬/৫৬)*

তিনি আরো বলেন, “কেউ নামাযে ঢুলতে লাগলে সে যেন ঘুমিয়ে নেয়। যাতে সে কি পড়ছে, তা বুঝতে পারে।” *(বুঃ ২১৩ নং)*

অবশ্য এমন ঘুম বৈধ নয়, যাতে নামাযের সময়ই পার হয়ে যায়।

২৫। আপনি নামায পড়ছেন তার জন্য নিজে নিজে গর্বিত না হয়ে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ হন। যেহেতু তাঁর তওফীক দানের ফলেই আপনি এত বড় ইবাদত পালনে সক্ষম হয়েছেন। ঈমান, ইবাদত প্রভৃতি এক একটি অমূল্য ধন ও এক একটি বিশেষ অনুগ্রহ। আর বান্দার যাবতীয় ধন ও অনুগ্রহ তো আল্লাহরই দান। *(কুঃ ১৬/৫৩)*

২৬। আপনি আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্ব করেছেন। এই দাসত্ব আপনার ঠিকমত হচ্ছে কি না, তা আপনি জানেন না। সুতরাং আপনি নিজের ত্রুটি ও অবহেলা স্বীকার করে মনকে ইবাদত কবুল না হওয়ার আশঙ্কা ও ভীতি দ্বারা পরিপূর্ণ রাখুন। মহান আল্লাহ বলেন, “আর যারা তাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাবে এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা ভয়-ভয় মনে দান করে। তারাই দ্রুত কল্যাণকর কাজ সম্পাদন করে এবং তারা ওতে অগ্রগামী হয়।” *(কুঃ ২৩/৬০-৬১)*

মা আয়েশা رضي الله عنها জিজ্ঞাসার ছলে আল্লাহর রসূল ﷺ কে বললেন, ‘ওরা কি তারা, যারা মদ খায়, চুরি করে (বা ব্যভিচার করে এবং এর কারণেই আল্লাহকে ভয় করে)?’ তিনি বললেন, “না, হে সিদ্দীক-তনয়া! বরং (আল্লাহ তাদের কথা বলেছেন) যারা রোযা করে, নামায পড়ে, দান-খয়রাত করে, অথচ তারা এই ভয় করে যে, হয়তো এসব তাদের কবুল হবে না।” *(আঃ, তিঃ ৩১৭৫, ইমাঃ ৪১৯৮ নং)*

আপনি যতই ইবাদত করুন না কেন, তা প্রয়োজনের তুলনায় নেহাতই কম। জান্নাতের মূল্য তো অবশ্যই নয়। এ জন্যই প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “কেউই তার আমলের জোরে জান্নাত যেতে পারবে না।” বলা হল, ‘আপনিও কি নন, হে আল্লাহর রসূল?’ বললেন, “আমিও নই। তবে যদি আল্লাহ তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন করেন তাহলে!” *(বুঃ ৫৬৭৩, ৬৪৬৩, মুঃ ২৮১৬ নং, প্রমুখ, দ্রঃ স্বালাতুল মুহিব্বীন, ইবনুল কাইয়িম)*

ইবনুল জাওযী বলেন, ‘হে সেই নামাযী! যে তার দেহ নিয়ে নামাযে দন্ডায়মান অথচ তার হৃদয় অনুপস্থিত! যেটুকু বন্দেগী তুমি করেছ তা তো বেহেশ্তের মোহর হওয়ার জন্যও যথেষ্ট নয়, বেহেশ্তের মূল্য হওয়া তো দূরের কথা। একদা একটি ইঁদুর এক উট দেখে তাকে পছন্দ করল। (বন্ধুত্ব গড়ার আশায়) সে তার লাগাম ধরে টান দিলে উটটি তার অনুসরণ করল। অতঃপর যখন উভয়ে ইঁদুরের ঘরের দরজায় সামনে উপস্থিত হল, তখন থমকে দাঁড়িয়ে উট যেন তার ভাব-জিভে বলতে লাগল, প্রেম করতে হলে তুমি প্রেমিকের জন্য এমন ঘর প্রস্তুত কর, যা তোমার প্রেমিকের জন্য উপযুক্ত অথবা এমন প্রেমিক নির্বাচন কর, যে তোমার ঘরের উপযুক্ত।

এই উদাহরণ থেকে তুমি শিক্ষা নাও, আর এমন নামায পড় যা তোমার সেই (বিশাল পরাক্রমশালী) মা’বূদের জন্য উপযুক্ত। নচেৎ এমন মা’বূদ দেখ, যে তোমার নামাযের

উপযুক্ত।' *(আল-মুদহিশ ৪৭২-৪৭৩পৃঃ)*

এই সকল উপদেশ যদি মেনে চলেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার নামাযে রূহ আসবে এবং তা কায়েম ও প্রতিষ্ঠা হবে। আর এই নামাযই হবে আপনাকে মন্দ কাজ হতে বিরতকারী।

এবার সলফে সালেহীনের নিকট থেকে একাগ্রতার কিছু উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত নিন। ইনশাআল্লাহ আপনি তাতে আরো উৎসাহ ও উদ্দীপনা পাবেন।

নামাযে সলফদের একাগ্রতার কিছু নমুনা

'যাতুর রিকা' অভিযানে মুসলিমদের এক ব্যক্তি এক মুশরিক মহিলাকে হত্যা করে ফেললে তার স্বামী প্রতিজ্ঞা করল যে, মুহাম্মাদের সঙ্গীদের মধ্যে কারো রক্ত না বহানো পর্যন্ত সে ক্ষান্ত হবে না। এই সংকল্প নিয়ে সে মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাদের খোঁজে বের হয়ে পড়ল। এদিকে মহানবী ﷺ এক মঞ্জিলে বিশ্রাম নিতে অবতরণ করলে সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে বললেন, "কে আমাদের (নিরাপত্তার) জন্য পাহারা দেবে?" এই আহবানে সাড়া দিয়ে মুহাজিরদের মধ্যে এক ব্যক্তি এবং আনসারদের মধ্য হতে আর এক ব্যক্তি পাহারা দিতে প্রস্তুত হলেন। তাঁদেরকে মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা এই উপত্যকার মুখে অবস্থান কর।"

অতঃপর তাঁরা দু'জন যখন উপত্যকার মুখে পৌঁছলেন, তখন মুহাজেরী (বিশ্রামের জন্য) শয়ন করলেন এবং আনসারী উঠে নামায পড়তে শুরু করলেন। এমতাবস্থায় উক্ত মুশরিক লোকটি কাছাকাছি এসে যখন তাঁর (নামাযীর) আবছা দেহ দেখতে পেল, তখন সে বুঝল, নিশ্চয় ও মুহাম্মাদের গুপ্তচর। সুতরাং তাঁর প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে তা সঠিক নিশানায় পৌঁছে আনসারীকে আঘাত করল। তিনি তীর দেহ থেকে বের করে দিয়ে নামাযেই মশগুল থাকলেন। এইভাবে পরপর তিন খানা তীর খেয়ে ও তা বের করে ফেলে রুকু-সিজদাহ করে সম্পন্ন করলেন। অতঃপর তার মুহাজেরী সঙ্গী জেগে উঠলেন। মুশরিকটি তার কথা ওঁরা জানতে পেরেছেন ভেবে পালিয়ে গেল। এরপর মুহাজেরী যখন আনসারীর রক্তাক্ত দেহের প্রতি লক্ষ্য করলেন, তখন বলে উঠলেন, 'সুবহানাল্লাহ! প্রথম বারেই যখন তীর মারল, তখনই কেন আমাকে জাগিয়ে দাও নি?' আনসারী উত্তরে বললেন, 'আমি এমন একটি সূরা পাঠ করছিলাম, যা শেষ না করে আমি ছাড়তে পছন্দ করলাম না!' *(আদাঃ ১৯৮ নং, আঃ, দারাঃ, ইখুঃ, ইহিঃ, হাঃ)*

আলী বিন হুসাইন (রঃ) যখন নামাযের জন্য ওযু সম্পন্ন করতেন, তখন তাঁর দেহে কম্পন শুরু হত! এ ব্যাপারে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, 'ধিক্ তোমাদের প্রতি! তোমরা জান কি, কার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি? কার সাথে মুনাজাত (নির্জনে আলাপ) করতে চলেছি?' *(হিলয়্যাতুল আওলিয়া ৩/ ১৩৩)*

মুহাম্মাদ বিন মুনকাদিরের ব্যাপারে কথিত আছে যে, তিনি এক রাত্রে নামায পড়তে দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করলেন এবং এত বেশী কাঁদতে লাগলেন যে, তাঁর ঘরের লোক ভয়

পেয়ে গেল। তারা তাঁকে এত কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু কোন উত্তর পেল না। অবশেষে তাঁকে চুপ না হতে দেখে তারা আবূ হাযেমের নিকট ব্যাপার খুলে বললে তিনি তাঁর নিকট এলেন। দেখলেন, তখনও তিনি কাঁদছেন। আবূ হাযেম বললেন, 'কি হল ভাই? কাঁদছ কেন? তোমার বাড়ির লোকেরা যে ভয় খেয়ে গেছে! কোন অসুখ তো করে নি? অথবা কি হয়েছে তোমার?'

মুহাম্মাদ বললেন, '(নামাযে কুরআন মাজীদের) একটি আয়াত পাঠ করে আমি কান্না রুখতে পারছি না।' আবূ হাযেম বললেন, 'কোন্ আয়াত?' বললেন,

(وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ)

অর্থাৎ, (সেদিন) আল্লাহর তরফ থেকে ওদের উপর এমন শাস্তি এসে পড়বে, যা ওরা (পূর্বে) কল্পনাও করে নি। *(কুঃ ৩৯/৪৭)*

এ কথা শুনে আবূ হাযেমও তাঁর সাথে কাঁদতে শুরু করে দিলেন এবং কান্নার ধারা আরো বেড়ে গেল! তা দেখে মুহাম্মাদের বাড়ির একটি লোক আবূ হাযেমকে বলল, 'ওর নির্জনতা কাটাবার জন্যই আপনাকে ডেকে আনলাম। (কিন্তু আপনিও যে ওর সাথে কাঁদতে লাগলেন?) অতঃপর তাঁরা তাদেরকে কান্নার কারণ বর্ণনা করলেন। *(হিলয়্যাতুল আওলিয়া ৩/ ১৪৬)*

অবশ্য মুনাজাতের এ মিঠা স্বাদ তখনই অনুভূত হবে, যখন নামাযী বুঝবে যে, সে তার নামাযে কাকে ও কি বলছে। নচেৎ গরম পানিতে ঘর পোড়া সম্ভব নয়। যেমন মুখে চিনি চিনি বললে চিনির মিষ্টি স্বাদ অনুভব হবে না।

মাইমূন বিন মিহরান বলেন, মুহাজেরদের এক ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে খুব হাল্কা নামায পড়তে দেখে তাকে ভর্ৎসনা করলেন। কিন্তু লোকটি অজুহাত দেখিয়ে বলল, 'আমার একটি দামী জিনিস নষ্ট হওয়ার কথা মনে পড়লে নামায তাড়াতাড়ি পড়ে নিলাম।' মুহাজেরী বললেন, 'কিন্তু তার চেয়ে অধিক মূল্যবান জিনিস তুমি নষ্ট করে দিলে!' *(ঐ ৪/৮৪)*

নামাযের মধ্যে যা করা বৈধ

নামায পড়তে পড়তে এমন কিছু কাজ আছে যা করা বৈধ, অথচ সাধারণতঃ তা অবৈধ মনে হয় বা বড় ভুল ভাবা হয়। এ রকম কিছু কাজ নিম্নরূপ ঃ-

১। কাঁদা;

নামায পড়তে পড়তে চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরা অথবা ডুকরে বা গুমরে কেঁদে ওঠা দূষণীয় নয়। আল্লাহর ভয়ে এমন কান্না কাঁদা তাঁর নেক ও বিনম্র বান্দার বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ বলেন, "--- তাদের নিকট করুণাময় (আল্লাহর) আয়াত পাঠ করা হলে তারা লুটিয়ে পড়ে সিজদা ও ক্রন্দন করত।" *(কুঃ ১৯/৫৮)*

আব্দুল্লাহ বিন শিখ্‌খীর বলেন, 'একদা আমি নবী ﷺ এর নিকটে এলাম। তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। আর তাঁর ভিতর থেকে চুলোর উপর হাঁড়িতে পানি ফোটার মত কান্নার শব্দ বের হচ্ছিল।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'যাঁতার শব্দের মত কান্নার শব্দ বের হচ্ছিল।' *(আঃ, আদাঃ, নাঃ, মিঃ ১০০০ নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ এর অসুখ যখন খুব বেড়ে গিয়েছিল, তখন তাঁকে নামাযের সময় হয়েছে বললে তিনি বললেন, "তোমরা আবূ বাকারকে নামায পড়াতে বল।" আয়েশা رضي الله عنها বললেন, 'আবূ বাকার তো নরম-দেলের মানুষ। উনি যখন কুরআন পড়েন, তখন কান্না রুখতে পারেন না।' মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা ওকে বল, ওই নামায পড়াবে।" আয়েশা رضي الله عنها পুনরায় ঐ একই কথা বললে মহানবী ﷺ ও পুনঃ বললেন, "ওকে বল, ওই নামায পড়াবে ---।" *(বুঃ, মিঃ ১১৪০ নং)*

এ কান্না দীর্ঘ হলেও তাতে নামায নষ্ট হয় না। *(ফইঃ ১/২৬১)*

২। হাঁচি ও তার জন্য দুআ;

নামাযের মধ্যে হাঁচি এলে হাঁচির পর নির্দিষ্ট দুআ পাঠ বৈধ। আর সেই দুআর বড় ফযীলতও রয়েছে। কওমার ৫নং দুআ দেখুন।

৩। হাই তোলা;

নামাযে যদিও হাই তোলা বৈধ, তবুও যেহেতু হাই আলস্যজনিত বা নিদ্রাজনিত কারণে মুখ ব্যাদানোর নাম, তাই তা যথাসম্ভব দমন করা কর্তব্য। কারণ, নামাযে নামাযী আলস্য প্রদর্শন করলে শয়তান খোশ হয়।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কারো যখন নামাযে হাই আসে, তখন তার উচিত, তা যথাসাধ্য দমন করা এবং 'হা-হা' না বলা। কেন না, হাই শয়তানের তরফ থেকে আসে। আর সে তা দেখে হাসে।" *(বুঃ, মিঃ ৯৮৬ নং)*

"তোমাদের কেউ হাই তুললে সে যেন তার মুখে হাত রেখে নেয়। কারণ, শয়তান হাই-এর সাথে (মুখে) প্রবেশ করে যায়!" *(আঃ, বুঃ, মুঃ, আদাঃ, সজাঃ ৪২৬ নং)*

৪। থুথু ফেলা;

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ নামাযে দাঁড়ালে সে যেন তার সম্মুখ দিকে থুথু না ফেলে। কারণ, সে যতক্ষণ নামাযের জায়গায় থাকে ততক্ষণ আল্লাহর সাথে মুনাজাত (নিরালায় আলাপ) করে। আর তার ডান দিকেও যেন থুথু না ফেলে। কারণ, তার ডানে থাকে (বামদিকের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সম্মানিত নেকী-লেখক) ফিরিশ্তা। বরং সে যেন (মসজিদের মেঝে কাঁচা মাটির হলে অথবা মাঠে-ময়দানে নামায পড়লে) তার বাম দিকে অথবা (সেদিকে কেউ থাকলে) তার (বাম) পায়ের নিচে ফেলে। যা পরে সে দাফন করে দেবে।" *(বুঃ, মুঃ, ৭১০, ৭১১নং)*

একদা তিনি মসজিদের কিবলার দিকে দেওয়ালে কফ লেগে থাকতে দেখে মর্মাহত হলেন এবং তা তাঁর চেহারাতেও ফুটে উঠল। তিনি উঠলেন এবং নিজ হাত দ্বারা তা পরিষ্কার করলেন। অতঃপর বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে নিরালায় আলাপ করে। তার প্রতিপালক থাকেন তার ও তার কিবলার মাঝে। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন তার সামনের দিকে অবশ্যই থুথু না ফেলে। বরং সে

যেন তার বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে থুথু ফেলে।” অতঃপর তিনি তাঁর চাদরের এক প্রান্ত ধরে তার উপর থুথু ফেললেন এবং পাশাপাশি কাপড় ধরে কচলে দিলেন, আর বললেন, “অথবা সে যেন এইরূপ করে।” *(বুঃ, মিঃ ৭৪৬নং)*

নাক ঝাড়লেও অনুরূপ করা উচিত। অবশ্য পৃথক রুমাল বা টিসু-পেপার ব্যবহার উত্তম।

৫। অনিষ্টকর জীব-জন্তু মারাঃ-

নামায পড়তে পড়তে সাপ, বিছা, বোলতা প্রভৃতি বিষধর ও অনিষ্টকর জন্তু মারা বৈধ। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “নামাযে দুই কালো জন্তু; সাপ ও বিছা মেরে ফেলো।” *(আঃ ২/২৩৩, আদাঃ ৯২১, তিঃ ৩৯০, নাঃ, ইমাঃ ১২৪৫, ত্বায়ালিসী ২৫৩৮, আরাঃ ১৭৫৪, দাঃ, ইখুঃ ৮৯৬, ইহিঃ ২৩৫১, হাঃ ১/২৫৬, বাঃ ২/২৬৬, প্রমুখ)*

অনুরূপ উকুন বা উকুন-জাতীয় পোকাও নামাযে মারা বৈধ। *(মুমঃ ৩/৩৫০)*

৬। চুলকানোঃ-

দেহে অস্বস্তিকর চুলকানি শুরু হলে নামায পড়া অবস্থাতেও চুলকানো বৈধ। কারণ, চুলকানিতে নামাযীর একাগ্রতা নষ্ট হয়। আর চুলকে দিলে অস্বস্তিবোধ দূর হয়ে যায়। সুতরাং এখানে ধৈর্য ধরা উত্তম নয়। *(মুমঃ ৩/৩৫০-৩৫১)*

৭। প্রয়োজনবোধে চলাঃ-

শত্রুর ভয় হলে (জিহাদের ময়দানে) চলা অবস্থায় নামায বৈধ। মহান আল্লাহ বলেন, “তোমরা নামাযসমূহের প্রতি -বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাযের প্রতি- যত্নবান হও এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনীতভাবে দাঁড়াও। কিন্তু যদি (শত্রুর) ভয় কর, তাহলে চলা অথবা সওয়ার অবস্থায় (নামায পড়)।” *(কুঃ ২/২৩৮-২৩৯)*

একদা মহানবী ﷺ স্বগৃহে দরজার খিল বন্ধ করে নফল নামায পড়ছিলেন। মা আয়েশা رضي الله عنها এসে দরজা খুলতে বললে তিনি চলে গিয়ে তাঁর জন্য দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর পুনরায় নিজের মুসাল্লায় ফিরে গেলেন। অবশ্য দরজা ছিল কিবলার দিকেই। *(আঃ ৬/২৩৪, আদাঃ ৯২২, তিঃ ৬০১, নাঃ, ইহিঃ, আবূ য়্যা’লা ৪৪০৬, দারাঃ, বাঃ ২/২৬৫, মিঃ ১০০৫ নং)*

একদা তিনি সূর্যগ্রহণের নামাযে বেহেশ্ত্ দেখে অগ্রসর এবং দোযখ দেখে পশ্চাদ্পদ হয়েছিলেন। *(বুঃ ১০৫২, মুঃ ৫২৫ নং)*

সাহাবাগণকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি মিম্বরে চড়ে নামায পড়েছেন। মিম্বরের উপর রুকূ করে পিছ-পায়ে নেমে নিচে সিজদাহ করেছেন। *(বুঃ ৯১৭, মুঃ ৫৪৪ নং)* একদা আবূ বাকার ﷺ এর ইমামতি কালে মহানবী ﷺ এসে উপস্থিত হলে তিনি (আবূ বাকার) পিছ-পায়ে সরে এসেছিলেন। *(বুঃ ৬৮০, ১২০৫ নং)* আবূ বারযাহ আসলামী ؓ ফরয নামায পড়তে পড়তে তাঁর ঘোড়া পালাতে শুরু করলে তিনি তার পিছনে পিছনে গিয়েছিলেন। *(বুঃ ১২১১ নং, আঃ, বাঃ)*

৮। ছেলে তোলাঃ-

নবী মুবাশ্শির ﷺ ইমামতি করতেন, আর আবুল আসের শিশুকন্যা তাঁর কাঁধে থাকত। অতঃপর যখন তিনি রুকূ করতেন, তখন তাকে নিচে নামিয়ে দিতেন। পুনরায় যখন সিজদাহ থেকে উঠতেন, তখন আবার কাঁধে তুলে নিতেন। *(বুঃ, মুঃ মিঃ ৯৮৪ নং)* এ ব্যাপারে ‘দীর্ঘ সিজদাহ’ শিরোনামে শাদ্দাদ ؓ এর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

৯। শিশুদের ঝগড়া থামানোঃ-

একদা বানী মুত্তালিবের দু'টি ছোট্ট মেয়ে মারামারি করতে করতে মহানবী ﷺ এর সামনে এসে তাঁর হাঁটু ধরে ফেলল। তিনি নামায পড়ছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি উভয়কে দু'দিকে সরিয়ে দিলেন। *(আদাঃ ৭১৬, ৭১৭, সনাঃ ৭২৭ নং)*

১০। খোঁচা দিয়ে সরে যেতে ইঙ্গিত করাঃ-

মা আয়েশা رضي الله عنها মহানবী ﷺ এর নামায পড়া কালে তাঁর সামনে কিবলার দিকে পা মেলে শুয়ে থাকতেন। তিনি (অন্ধকারে) যখন সিজদাহ করতেন, তখন হাতের খোঁচা দিয়ে তাঁকে (স্ত্রীকে) পা সরিয়ে নিতে ইঙ্গিত করতেন। *(বুঃ ৩৮২, ১২০৯ নং)*

১১। ইশারায় সালামের জওয়াব দেওয়াঃ-

নামাযী নামাযে রত থাকলেও তাকে সালাম দেওয়া বিধেয় এবং নামাযীর নামায পড়া অবস্থাতেই সালামের জওয়াব দেওয়া কর্তব্য। তবে মুখে নয়, হাত বা আঙ্গুলের ইশারায়। *(মুঃ ৫৩৮, আদা, মিঃ ৯৮৯ নং)*

ইবনে উমার ﷺ বলেন, আমি বিলাল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ এর নামাযে রত থাকা অবস্থায় ওঁরা (সাহাবীগণ) যখন সালাম দিতেন, তখন তিনি কিভাবে উত্তর দিতেন? বিলাল ﷺ বললেন, 'হাত দ্বারা ইশারা করে।' *(তিঃ, নাঃ, শাফেয়ী, মিঃ ৯৯১নং)*

একদা তিনি উটের উপর নামায পড়ছিলেন। জাবের ﷺ তাঁকে সালাম দিলে তিনি হাতের ইশারায় উত্তর দিয়েছিলেন। *(মুঃ ৫৪০নং, আঃ)*

একদা সুহাইব ﷺ তাঁকে নামায পড়া অবস্থায় সালাম দিলে তিনি আঙ্গুলের ইশারায় জওয়াব দিয়েছিলেন। *(তিঃ ৩৬৭নং, আঃ)*

একদা আবূ হুরাইরা ﷺ তাঁকে নামায পড়া অবস্থায় সালাম দিলে তিনি ইশারায় উত্তর দিয়েছিলেন। *(ত্বাবাঃ, সিসঃ ৬/৯৯৮)*

একদা ইবনে উমার ﷺ এক ব্যক্তির নিকট গেলেন, তখন সে নামায পড়ছিল। তিনি তাকে সালাম দিলে সে মুখে উত্তর দিল। পরে ইবনে উমার ﷺ তাকে বললেন, 'নামায পড়া অবস্থায় তোমাদের মধ্যে কাউকে সালাম দেওয়া হলে সে যেন মুখে উত্তর না দেয়। বরং সে যেন হাত দ্বারা ইশারা করে উত্তর দেয়।' *(মাঃ, মিঃ ১০১৩ নং)*

সালামের জওয়াব ছাড়া নামাযে প্রয়োজনে অন্য জরুরী কথাও ইঙ্গিত ও ইশারার মাধ্যমে বুঝানো যায়। একদা মহানবী ﷺ নামায পড়ছিলেন। তিনি সিজদাহ করলে হাসান ﷺ ও হুসাইন ﷺ তাঁর পিঠে চড়ে বসলে সাহাবীগণ বারণ করলেন। কিন্তু তিনি ইশারা করে বললেন, "ওদেরকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও।" অতঃপর নামায শেষ করলে তিনি উভয়কে কোলে রেখে বললেন, "যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসে, সে যেন এই দু'জনকেও ভালোবাসে।" *(ইখুঃ ৭৭৮ নং, বাঃ ২/২৬৩)*

১২। নামাযে কাউকে কোন জরুরী ব্যাপারে সতর্কীকরণঃ-

নামাযী নামাযে রত আছে এ কথা জানাতে অথবা ইমাম নামাযে কিছু ভুল করলে তার উপর তাঁকে সতর্ক করতে পুরুষদের জন্য 'সুবহা-নাল্লাহ' বলা এবং মহিলাদের জন্য

হাততালি দেওয়া বিধেয়।

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের নামাযের মধ্যে (অস্বাভাবিক) কিছু ঘটে গেলে পুরুষেরা যেন 'তসবীহ' পড়ে এবং মহিলারা যেন হাততালি দেয়।" *(বুঃ ৬৮৪, মুঃ, আঃ, আদাঃ, নাঃ, মিঃ ৯৮৮ নং)*

নারী এমন এক সৃষ্টি, যার রূপ, সৌরভ ও শব্দে পুরুষের মন প্রকৃতিগতভাবে চকিত হয়ে ওঠে। ফলে, যাতে নামাযের সময় তাদের মোহনীয় কণ্ঠস্বরে পুরুষরা সংকটে না পড়ে তার জন্য শরীয়তের এই বিধান। পক্ষান্তরে শয়তান মানুষের শিরায় শিরায় ফিরে বেড়ায়। *(বুঃ ৩২৮১, মুঃ ২১৭৫ নং)* এবং পুরুষদের জন্য নারী হল সবচেয়ে বড় ফিতনার জিনিস। *(বুঃ ৫০৯৬, মুঃ ২৭৪০ নং)*

এখান থেকে বুঝা যায় যে, মহিলাদের পৃথক জামাআত হলে এবং সেখানে কোন বেগানা পুরুষ না থাকলে হাততালি না দিয়ে তসবীহ পড়ে মহিলারা (মহিলা) ইমামকে সতর্ক করতে পারে। কারণ, তসবীহ হল নামাযের এক অংশ। *(মুমঃ ৩/৩৬২-৩৬৩)*

মুক্তাদীদের মধ্যেও কেউ কিছু ভুল করলে, (যেমন সিজদায় বা বৈঠকে ঘুমিয়ে পড়লে) তাকেও সতর্ক করার জন্য তসবীহ ব্যবহার চলবে। *(ঐ ৩/৩৬৭-৩৬৮)*

১৩। ইমামের ক্বিরাআত সংশোধনঃ-

নামাযে কুরআন পাঠ করতে করতে যদি ইমাম সাহেব কোন আয়াত ভুলে যান, থেমে যান অথবা ভুল পড়েন, তাহলে 'লুকমাহ' দিয়ে তা মনে পড়ানো, ধরিয়ে দেওয়া বা সংশোধন করা বিধেয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। আমিও ভুলে যাই, যেমন তোমরা ভুলে যাও। সুতরাং আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে মনে পড়িয়ে দিও।" *(বুঃ ৪০১, মুঃ ৫৭২নং)*

একদা তিনি নামাযে কুরআন পড়তে পড়তে ভুলে কিছু অংশ ছেড়ে দিলেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! অমুক অমুক আয়াত আপনি ছেড়ে দিয়েছেন, (পড়েন নি)। তিনি বললেন, "তুমি আমাকে মনে পড়িয়ে দিলে না কেন?" *(আদাঃ ৯০৭ নং, ইমাঃ)*

একদা নামাযে ক্বিরাআত পড়তে পড়তে তাঁর কিছু গোলমাল হল। সালাম ফেরার পর উবাই ؓ এর উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "তুমি আমাদের সাথে নামায পড়লে?" উবাই ؓ বললেন, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তবে ভুল ধরিয়ে দিলে না কেন?" *(আদাঃ ৯০৭, ইহি, ত্বাবাঃ, বাঃ ৩/২১২)*

উল্লেখ্য যে, সূরা ফাতিহা নামাযের একটি রুক্ন অথবা ফরয। সুতরাং তা পড়তে ইমাম কোন প্রকারের ভুল করলে (যাতে অর্থ বদলে যায় তা) মুক্তাদীদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া ওয়াজেব। *(মুমঃ ৩/৩৪৬)*

১৪। প্রয়োজনে কাপড় বা পাগড়ীর উপর সিজদাহ করাঃ-

অতি গ্রীষ্ম বা শীতের সময় সিজদার স্থানে কপাল রাখা কষ্টকর হলে চাদর, আস্তীন বা পাগড়ীর বাড়তি অংশ ঐ স্থানে রেখে সিজদাহ করা বৈধ।

মহানবী ﷺ এর যামানায় সাহাবাগণ এরূপ করতেন। *(বুঃ ৩৮৫, ৫৪২ নং, আদাঃ, তিঃ, নাঃ,*

ইমাঃ, দাঃ, আঃ ৩/১০০)

জাবের ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথে যোহরের নামায পড়তাম। আমার হাতের মুঠোয় কিছু কাঁকর রেখে ঠান্ডা করে নিতাম এবং প্রখর তাপ থেকে বাঁচার জন্য তা কপালের স্থানে (সিজদার জায়গায়) রেখে নিতাম। *(আদাঃ ৩৯৯, নাঃ, মিঃ ১০১১ নং)*

১৫। জুতা পরে নামাযঃ-

জুতা পাক-সাফ হলেও অনেকে বুযুর্গদের সাথে সাক্ষাতের সময় তা পায়ে রাখে না। যা শ্রদ্ধার অতিরঞ্জন এবং বিদআত। বলাই বাহুল্য, এমন লোকদের নিকট জুতা পায়ে নামায পড়া তাদের কল্পনার বাইরে।

কিন্তু হযরত আনাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ জুতা পায়ে নামায পড়তেন। *(বুঃ ৩৮৬, মুঃ)*

আব্দুল্লাহ বিন আম্র বলেন, আমি নবী ﷺ কে খালি পায়ে ও জুতা পায়ে উভয় অবস্থাতেই নামায পড়তে দেখেছি। *(আদাঃ ৬৫৩ নং, ইমাঃ)*

রসূল ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নামায পড়বে, তখন সে যেন তার জুতা পরে নেয় অথবা খুলে তার দু' পায়ের মাঝে রাখে। আর সে যেন তার জুতা দ্বারা অপরকে কষ্ট না দেয়।" *(আদাঃ ৬৫৫ নং, বাযযার, হাঃ)*

তিনি আরো বলেন, "তোমরা ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধাচরণ কর (এবং জুতা পরে নামায পড়)। কারণ, ওরা ওদের জুতো ও চামড়ার মোজায় নামায পড়ে না। *(আদাঃ ৬৫২ নং, বাযযার, হাঃ)*

জুতা খুলে নামায পড়লে এবং মসজিদে জুতা রাখার কোন নির্দিষ্ট জায়গা না থাকলে যদি বাম পাশে কেউ না থাকে তাহলে বাম পাশে, নচেৎ দুই পায়ের মাঝে রাখতে হবে। ডান দিকে রাখা যাবে না। *(আদাঃ ৬৫৪, ইখুঃ, হাঃ)*

অবশ্য জুতায় ময়লা বা নাপাকী লেগে থাকলে তা পরে নামায হয় না। নাপাকী বা ময়লা মাটিতে বা ঘাসে রগ্‌ড়ে মুছে দূর করে নিয়ে তাতে নামায পড়া যায়। নামাযের মাঝে জুতায় ময়লা লেগে আছে দেখলে বা জানতে পারলে তা সাথে সাথে খুলে ফেলা জরুরী। *(আদাঃ ৬৫০, ইখুঃ, হাঃ, ইগঃ ২৮৪ নং)*

খেয়াল রাখার বিষয় যে, মসজিদ পাকা ও গালিচা-বিছানো হলে তার ভিতরে জুতা পরে গিয়ে নোংরা করা বৈধ নয়। মসজিদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার খেয়াল অবশ্যই জরুরী।

১৬। মনে অন্য চিন্তা এসে পড়াঃ-

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামাযে অন্য চিন্তা এসে পড়লে নামায বাতিল হয়ে যায় না। অবশ্য অন্য চিন্তা এনে দেওয়ার কাজ শয়তানই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে করে থাকে। আর এ কথা আমরা 'নামায কিভাবে কায়েম হবে' শিরোনামে পড়েছি এবং শয়তান ও তার কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ও সেখানে জেনেছি।

হযরত উমার ﷺ স্বীকার করেন যে, তিনি কোন কোন নামাযে সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত ও প্রেরণ করার কথা চিন্তা করতেন। *(বুঃ বিনা সনদে ২৩৯পৃঃ)*

একদা আসরের নামাযে মহানবী ﷺ এর মনে পড়ল যে, তাঁর ঘরে কিছু সোনা বা চাঁদির টুকরা থেকে গেছে। তাই সালাম ফিরেই সত্বর তিনি কোন পত্নীর গৃহে প্রবেশ করে রাত্রি

আসার পূর্বেই দান করতে আদেশ করে এলেন! *(বুঃ ৮৫১, ১২২১ নং)*

সাহাবাগণের মধ্যে এমন অনেক সাহাবা ছিলেন, যাঁরা আল্লাহর রসূল ﷺ এর সাথে নামায পড়তেন। কিন্তু গত রাত্রে এশার নামাযে তিনি ﷺ কোন্ সূরা পড়েছেন তা খেয়াল রাখতে পারতেন না। *(বুঃ ১২২৩ নং)*

অবশ্য প্রত্যেকের উচিত, যথাসম্ভব অন্য চিন্তা এবং অন্যমনস্কতা দূর করা। নচেৎ অন্য খেয়াল বা চিন্তা যত বেশী হবে, নামাযের সওয়াব তত কম হয়ে যাবে।

১৭। সিজদার জায়গা সাফ করাঃ-

সিজদার জায়গা পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে নামাযের মাঝে (সিজদার সময়) ফুঁক দেওয়া বৈধ। আল্লাহর নবী ﷺ সূর্য-গ্রহণের নামাযের সিজদায় ফুঁক দিয়েছেন। *(আদাঃ ১১৯৪, নাঃ, আঃ ২/১৮৮, বুঃ বিনা সনদে ২৩৮পৃঃ)*

পক্ষান্তরে ফুঁক দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে হাদীস সহীহ নয়। *(তামিঃ ৩১৩পৃঃ)* অনুরূপ কাঁকর সরানো নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীসও যয়ীফ। *(ঐ)* পরন্তু সহীহ হাদীসে একবার মাত্র সরানোর অনুমতি আছে। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৯৮০ নং)* তবে না সরানো ১০০টি উৎকৃষ্ট উটনী অপেক্ষা উত্তম। *(ইখুঃ, সতাঃ ৫৫৫ নং)*

১৮। নামাযীর লেবাসের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক কাপড়ে এবং খালি মাথায় নামায পড়া বৈধ।

১৯। মুসহাফ হাতে দেখে দেখে কুরআন পাঠঃ-

তারাবীহ প্রভৃতি লম্বা নামাযে (লম্বা ক্বিরাআতের) হাফেয ইমাম না থাকলে 'কুল-খানী' করে ঠকাঠক্ কয়েক রাকআত পড়ে নেওয়ার চেয়ে মুসহাফ (কুরআন মাজীদ) দেখে দেখে পাঠ করে দীর্ঘ ক্বিরাআত করা উত্তম। (অবশ্য কুরআন খতমের উদ্দেশ্যে নয়।) অনুরূপ (জামাআতে অন্য হাফেয মুক্তাদী না থাকলে) হাফেয ইমামের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন মুক্তাদীর কুরআন দেখে যাওয়া বৈধ। এ সব কিছু প্রয়োজনে বৈধ; ফলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না।

মা আয়েশা رضي الله عنها এর আযাদকৃত গোলাম যাকওয়ান রমযানে (তারাবীহতে) দেখে দেখে কুরআন পাঠ করে তাঁর ইমামতি করতেন। *(মাঃ, ইআশাঃ ৭২১৫, ৭২১৬, ৭২১৭ নং)*

ইমাম হাসান, মুহাম্মদ, আত্বা প্রমুখ সলফগণ এরূপ (প্রয়োজনে) বৈধ মনে করতেন। *(ইআশাঃ ৭২১৪, ৭২১৮, ৭২১৯, ৭২২০, ৭২২১ নং)*

বর্তমান বিশ্ব তথা সঊদী আরবের উলামা ও মুফতী কমিটির সিদ্ধান্ত মতেও প্রয়োজনে মুসহাফ দেখে তারাবীহ পড়ানো বৈধ। *(ফিসুঃ ১/২৩৪, মবঃ ১৯/১৫৪, ২১/৫৬)* সঊদিয়ার প্রায় অধিকাংশ মসজিদে আমলও তাই।

হযরত আনাস ﷺ নামাযে ক্বিরাআত পড়তেন আর তাঁর গোলাম তাঁর পশ্চাতে মুসহাফ ধরে দাঁড়াতেন। তিনি কিছু ভুলে গেলে গোলাম ভুল ধরিয়ে দিতেন। *(ইআশাঃ ৭২২২ নং)*

নামাযের ভিতরে কুরআন খতম করলে খতমের পরে দুআ করার কোন দলীল নেই। তাই কুরআন খতমের দুআ নামাযের ভিতরে না করাই উচিত। *(মুমঃ ৪/৫৭-৫৮)* অবশ্য নামাযের

বাইরে হযরত আনাস ﷺ কুরআন খতম করলে তাঁর পরিবার-পরিজনকে সমবেত করে দুআ করতেন। *(ইবনুল মুবারাক, যুহদ ৮০৯ পৃঃ, ইআশাঃ ১০৮৭ নং, দাঃ, ত্বাবাঃ, মাযাঃ ৭/১৭২)*

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কুরআনের খতমের কোন নির্দিষ্ট দুআও নেই। *(মবঃ ২০/১৬৫, ১৮৬)* অতএব কুরআন মাজীদের শেষ পৃষ্ঠার পর 'দুআ-এ খতমিল কুরআন' নামে যে দুআ প্রায় মুসহাফে ছাপা থাকে তা মনগড়া।

নামাযে যা করা মকরূহ অথবা নিষিদ্ধ

১। নামাযে যে সমস্ত কার্যাবলী করা সুন্নত (যেমন রফয়ে য়্যাদাইন, ইস্তিরাহার বৈঠক, বুকে হাত বাঁধা ইত্যাদি) তার কোন একটিও ত্যাগ করা মকরূহ। *(ফিসুঃ উর্দু ১২৫পৃঃ)*

২। মুখ ঘুরিয়ে বা আড় চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখা, ঘড়ি বা অন্য কিছু দেখা বৈধ নয়।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, চোরা দৃষ্টিতে বা ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করার মাধ্যমে শয়তান নামাযীর নামায চুরি করে থাকে। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৯৮২নং)* যেমন অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করে মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহও মুখ ফিরিয়ে নেন। *(আঃ, আদাঃ, নাঃ, দাঃ, মিঃ ৯৯৫ নং)*

নফল নামাযেও এদিক-ওদিক দেখা বৈধ নয়। বৈধ হওয়ার ব্যাপারে হাদীসগুলি সহীহ নয়। *(তামিঃ ৩০৮-৩০৯পৃঃ)*

অবশ্য চোখের কোণে ডাইনে-বামের জিনিস দেখা বা নজরে পড়া নামাযের জন্য ক্ষতিকর নয়। কারণ, ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ নামায পড়া অবস্থায় ডাইনে ও বামে লক্ষ্য করতেন। আর পিঠের দিকে ঘাড় ঘুরাতেন না।' *(তিঃ, নাঃ, মিঃ ৯৯৮ নং)*

অনুরূপ ভয় ও প্রয়োজনের সময় দৃষ্টি নিক্ষেপ দূষণীয় নয়। একদা মহানবী ﷺ এক উপত্যকার দিকে জাসূস পাঠালেন। অতঃপর ফজরের নামায পড়তে পড়তে তার অপেক্ষায় সেই উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। *(আদাঃ ৯১৬ নং, হাঃ ১/২৩৭)*

আল্লাহর রসূল ﷺ যোহর ও আসরের নামাযে কুরআন পড়তেন তা সাহাবাগণ তাঁর দাড়ি হিলার ফলে বুঝতে পারতেন। *(বুঃ ৭৪৬, আদাঃ, আঃ)* অনুরূপ তাঁরা তাঁকে সিজদায় মাথা রাখতে না দেখার পূর্বে কেউ কওমা থেকে সিজদায় যেতেন না। *(বুঃ ৭৪৭ নং)*

অতএব শিশুর মা নামায পড়তে পড়তে যদি তার শিশুর গতিবিধি লক্ষ্য রাখতে আড় নয়নে তাকায়, তাহলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। *(মুমঃ ৩/৩১২)*

৩। আকাশের (বা উপর) দিকে তাকানোঃ-

নবী মুবাশ্শির ﷺ বলেন, "লোকেরা যেন অবশ্য অবশ্যই নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে তাকানো হতে বিরত হয়, নচেৎ তাদের চক্ষু ছিনিয়ে নেওয়া হবে!" *(বুঃ ৭৫০, মুঃ, মিঃ ৯৮৩ নং)* অতএব নামায পড়তে পড়তে উপর বা আকাশ দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম। *(মুমঃ ৩/৩১৫)*

৪। চোখ বুজাঃ-

মহানবী ﷺ যখন নামায পড়তেন, তখন তিনি তাঁর চোখ দু'টিকে খুলে রাখতেন। তাঁর দৃষ্টি থাকত সিজদার জায়গায়। তাশাহ্হুদে বসার সময় তিনি তাঁর তর্জনী আঙ্গুলের উপর নজর রাখতেন। এ ছাড়া তিনি চোখ খুলে রাখতেন বলেই মা আয়েশা رضي الله عنها এর দেওয়ালে টাঙ্গানো ছবিযুক্ত পর্দা তাঁর সম্মুখ থেকে সরিয়ে নিতে বলেছিলেন। সুতরাং সুন্নত হল, চোখ খোলা রেখে নামায পড়া।

তবে হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন পড়ে; যেমন সামনে কারুকার্য, নক্সা, ফুল বা এমন কোন জিনিস থাকে, যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে অথবা মনোযোগ কেড়ে নেয় অথবা ক্বিরাআত ভুলিয়ে দেয় এবং তা দূর করা সম্ভব না হয়, তাহলে চোখ বন্ধ করে নামায পড়ায় কোন দোষ নেই। বরং এই ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করেই নামায পড়া উত্তম হওয়া শরীয়ত এবং তার উদ্দেশ্য ও নীতির অধিক নিকটবর্তী। *(যামাঃ ১/২৯৩-২৯৪, মুমঃ ৩/৪৮, ৫২, ৩১৬, ফইঃ ১/২৮৯-২৯০, মুত্বাসা ১৩০-১৩১পৃঃ)*

৫। এমন জিনিস (যেমন নক্সাদার মুসাল্লা, সৌন্দর্য ও কারুকার্যময় দেওয়াল বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যপূর্ণ কাপড় ইত্যাদি) সামনে রেখে নামায পড়া, যাতে নামাযীর মনোযোগ ও একাগ্রতা নষ্ট হয়। এ ব্যাপারে 'যে সব স্থানে নামায পড়া মকরূহ' শিরোনাম দেখুন।

৬। কোন প্রাণীর বা মানুষের ছবি, মূর্তি বা আগুন সামনে করে নামায পড়া। কারণ, এতে থাকে শির্কের গন্ধ এবং অমুসলিমদের সদৃশতা। *(মাসাইঃ ২৫০-২৫১পৃঃ)*

৭। কোন প্রাণী বা মানুষের ছবি চিত্রিত কাপড় পরে নামায পড়া। *(ঐ ২৫১পৃঃ)*

৮। নিজের বা আর কারো ছবি পকেটে রেখেও নামায মকরূহ। অবশ্য কোথাও রেখে নামায পড়লে চুরি হয়ে বা হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে নিরুপায় অবস্থায় ছবিযুক্ত টাকা-পয়সা, পাশপোর্ট, পরিচয়-পত্র প্রভৃতি সঙ্গে নিয়ে নামায পড়ায় দোষ নেই। *(মবঃ ১২/৯৮, ১৯/১৬১)*

৯। দুই হাতের আঙ্গুলসমূহকে পরস্পর খাঁজাখাঁজি করাঃ-

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সুন্দরভাবে ওযু করে মসজিদের উদ্দেশে বের হয়, তখন সে যেন অবশ্যই তার (দুই হাতের) আঙ্গুলসমূহকে খাঁজাখাঁজি না করে। কারণ, সে নামায অবস্থায় থাকে।" *(আঃ ৪/২৪২, ২৪৩, আদাঃ ৫৬২, তিঃ ৩৮৬, আরাঃ ৩৩৩৪, দাঃ, ইখুঃ ৪৪১নং, ত্বাবাঃ, বাঃ ৩/২৩০, হাঃ ১/২০৬, ইগঃ ২/১০২)* অর্থাৎ নামায পড়া অবস্থায় ঐরূপ নিষিদ্ধ।

নামাযের জন্য ওযূ করার পর থেকে নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঐরূপ করা নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে আরো হাদীস দেখুন। *(সতাঃ ২৯২, সিসঃ ১২৯৪, সজাঃ ৪৪৫, ৪৪৬ নং)*

১০। আঙ্গুল ফুটানোঃ-

নামাযের মধ্যে আঙ্গুল ফুটানো মকরূহ। কারণ, এটি একটি বাজে ও নিরর্থক কর্ম এবং অপর নামাযীদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়। *(মুমঃ ৩/৩২৪)*

১১। কোমরে হাত রাখাঃ-

আল্লাহর নবী ﷺ নামায পড়ার সময় কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করেছেন। *(বুঃ ১২১৯, ১২২০, মুঃ ৫৪৫, মিঃ ৯৮১ নং)* এর কারণ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এমন কাজ ইয়াহুদীদের। *(বুঃ*

৩৪৫৮, ইআশাঃ ৪৫৯১, ৪৬০০ নং) অথবা জাহান্নামীরা জাহান্নামে এরূপ কোমরে হাত রেখে আরাম নেবে। *(ইআশাঃ ৪৫৯২, ৪৫৯৫ নং)* সুতরাং তাদের সদৃশতা অবলম্বন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। অনেকে বলেন, নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ, এরূপ কাজ অহংকারী, বিপদগ্রস্ত অথবা ভাবনা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্তদের। তাই নামাযে এরূপ প্রদর্শন অবৈধ। *(মুমঃ ৩/৩২৩, মুত্বাসাঃ ১৫৫পৃঃ)*

১২। কুকুরের মত বসাঃ-

দুই পায়ের রলা খাড়া রেখে, হাত দু'টিকে মাটিতে রেখে এবং দুই পাছার উপর ভর করে কুকুরের মত বৈঠক নিষিদ্ধ। কারণ এমন বৈঠক শয়তানের। *(মুঃ, আআঃ, ইগঃ ৩১৬নং)* এ ব্যাপারে অধিক জানতে তাশাহহুদের বৈঠকের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

১৩। বাম হাত দ্বারা ভর করে বসাঃ-

নামাযের বৈঠকে বাম হাতকে মাটি বা মুসাল্লার উপর রেখে ঠেস দিয়ে বসা নিষিদ্ধ। কারণ এমন বৈঠক আল্লাহর ক্রোধভাজন ইয়াহুদীদের। *(বাঃ, হাঃ, ইগঃ ৩৮০ নং)* অতিরিক্ত তাশাহহুদের বৈঠকের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

১৪। কাপড় গাঁটের নিচে ঝুলানোঃ-

পুরুষদের জন্য তাদের কাপড়; লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট, চোগা প্রভৃতি গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে পরা সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ। পরন্তু মহান বাদশার সামনে নামাযে দাঁড়িয়ে অহংকারীদের মত এমনভাবে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা অধিকভাবে নিষিদ্ধ। *(নামাযীর লেবাস দ্রষ্টব্য)*

১৫। কাপড় (শাল বা চাদর) না জড়িয়ে দুই কাঁধে দু' দিকে ঝুলিয়ে রাখা অথবা চাদরে জড়িয়ে থাকা অবস্থায় হাত দু'টিকেও তার ভিতরে রেখেই রুকূ-সিজদা করাঃ-

হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, নবী ﷺ নামাযে এইভাবে কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। *(আদাঃ ৬৪৩, তিঃ, ইমাঃ, আঃ, হাঃ, মিঃ ৭৬৪ নং)* এর কারণ বর্ণনায় বলা হয়েছে, এরূপ অভ্যাস ইয়াহুদীদের।

১৬। চাদর, শাল, কম্ফর্টার প্রভৃতির মাধ্যমে মুখ ঢাকাঃ-

নামায পড়া অবস্থায় মুখ ঢাকতে মহানবী ﷺ নিষেধ করেছেন। *(আদাঃ ৬৪৩, ইমাঃ, মিঃ ৭৬৪ নং)*

মদীনার ফকীহ সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার কাউকে নামাযে মুখ ঢেকে থাকতে দেখলে তার মুখ থেকে তার কাপড়কে সজোরে টেনে সরিয়ে দিতেন। *(মাঃ ৩০নং)*

১৭। পুরুষের লম্বা চুল পেছন দিকে বেঁধে নামায পড়াঃ-

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার (লম্বা) চুলকে পেছন দিকে বেঁধে নামায পড়ে, সে সেই ব্যক্তির মত যে তার দুই হাত বাঁধা অবস্থায় নামায পড়ে।" *(মুঃ, আআঃ, ইহিঃ)* তিনি আরো বলেন, "ঐ বাঁধা চুল হল শয়তান বসার জায়গা।" *(আদাঃ, তিঃ, ইখুঃ, ইহিঃ, সিজদার বিবরণ দ্রষ্টব্য)*

ইবনুল আষীর বলেন, লম্বা চুল খোলা অবস্থায় থাকলে সিজদাহ অবস্থায় সেগুলিও মাটিতে পড়ে যাবে। ফলে সিজদাহকারীকে ঐ চুলের সিজদাহ করার সওয়াব দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে বাঁধা বা গাঁথা থাকলে সেগুলো সিজদায় পড়তে পারবে না। তাই বাঁধতে নিষেধ করা হয়েছে। *(নাআঃ ২/৩৪০)*

আল্লামা আলবানী (রঃ) বলেন, মনে হয় এ বিধান কেবল পুরুষদের জন্যই, মহিলাদের

জন্য নয়। ইবনুল আরাবী থেকে এ কথা উদ্ধৃত করে শওকানী তাই বলেন। *(সিসানঃ ১৪৩পৃঃ)* কারণ, মেয়েদের চুল থাকবে বাঁধা ও কাপড়ের পর্দার ভিতরে। যা বের হলে মহিলার নামাযই বাতিল হয়ে যাবে। *(নাআঃ ২/৩৪০)*

১৮। কাপড় গুটানোঃ-

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি ৭ অঙ্গ দ্বারা সিজদাহ করি --- এবং কাপড় ও চুল না গুটাই।" *(বুঃ, মুঃ, ইখুঃ ৭৮-২, সজাঃ ১৩৬৯ নং)*

মুহাদ্দিস আলবানী (রঃ) বলেন, 'এই নিষেধ কেবল নামায অবস্থাতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং নামাযের পূর্বেও যদি কেউ তার চুল বা কাপড় গুটায় অতঃপর নামাযে প্রবেশ করে, তাহলে অধিকাংশ উলামাগণের মতে সে ঐ নিষেধে শামিল হবে। আর চুল বেঁধে নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার হাদীস উক্ত মতকে সমর্থন করে। *(সিসানঃ ১৪৩পৃঃ)*

এখান থেকেই বহু উলামা বলেছেন যে, জামার আস্তীন বা হাতা গুটিয়ে নামায পড়া মকরূহ। কারণ মহানবী ﷺ ও তাঁর উম্মত নামাযে কাপড় না গুটাতে আদিষ্ট হয়েছেন। আর জামার হাতা গুটানো কাপড় গুটানোরই শামিল।

ইমাম নওবী বলেন, উলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, কাপড় বা জামার আস্তীন গুটিয়ে, চুল বেঁধে বা পাগড়ীর নিচে গুটিয়ে রেখে নামায পড়া নিষিদ্ধ। অবশ্য এই নিষেধের মান হল মকরূহ। অর্থাৎ, এতে নামায নষ্ট হয় না। *(শারহু মুসলিম ৪/২০৯, আমাঃ ২/২৪৭)*

উক্ত নিষেধের কারণ বর্ণনায় অনেকে বলেন যে, কাপড় গুটানো বা তোলা অহংকারীদের লক্ষণ। তাই তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন নিষিদ্ধ। *(ফবাঃ ২/৩৪৬)*

অবশ্য কাপড় খুলে গেলে তা পরা উক্ত নিষেধের আওতাভুক্ত নয়। বরং লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার আশঙ্কা হলে তো নামায অবস্থাতেও পরা ওয়াজেব। অনুরূপ উলঙ্গ নামাযী নামাযের মাঝে যদি কাপড় পায়, তাহলে সেই অবস্থাতেই তার জন্যও তা পরা ওয়াজেব। কারণ, কাপড় বর্তমান থাকতে লজ্জাস্থান বের করে নামায পড়লে নামায বাতিল। *(মুমঃ ৩/৩৪৭-৩৪৮)*

নামায পড়তে পড়তে খুব শীত লাগলে এবং পাশে কাপড় থাকলে নামাযী নামাযের মধ্যেই তা পরতে বা গায়ে নিতে পারে। কারণ না পরলে তার মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটবে। *(ঐ ৩/৩৪৮)* অনুরূপ খুব গরম লাগলেও অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় কাপড় নামায অবস্থাতেই সরিয়ে ফেলতে পারে।

১৯। কাঁধ খোলা রেখে নামাযঃ-

কাঁধ খোলা রেখে নামায নিষিদ্ধ। (এ ব্যাপারে 'নামাযীর লেবাস' প্রসঙ্গে আলোচনা দেখুন।) সুতরাং বহু হাজীদের ইহরাম পরে এক কাঁধ খোলা অবস্থায় নামায পড়া বৈধ নয়। *(মাসাইঃ ২৫১পৃঃ)*

২০। সশব্দে কুরআন পাঠঃ-

অনেকে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা ইত্যাদি পড়ার সময় মাঝে মাঝে গুন্‌গুন্ করে বা ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে। যাতে পাশের নামাযীর বড় ডিষ্টার্ব হয়। এমন করাও হাদীস থেকে নিষিদ্ধ। মহানবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই নামাযী তার প্রতিপালকের সাথে নিরালায় আলাপ করে।

সুতরাং কি নিয়ে আলাপ করছে, তা যেন সে লক্ষ্য করে। আর তোমাদের কেউ যেন অপরের পাশে কুরআন সশব্দে না পড়ে।” *(আঃ, মাঃ, প্রমুখ মিঃ ৮৫৬ নং)*

২১। খাবার সামনে রেখে নামাযঃ-

খাবার জিনিস সামনে হাজির থাকলে এবং খাওয়ার ইচ্ছা ও আকাঙ্খা থাকলে তা না খেয়ে নামায পড়া মকরূহ। কারণ, সে সময় খাবারের দিকে মন পড়ে থাকে এবং নামাযে যথার্থ মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটে।

মহানবী ﷺ বলেন, “যখন তোমাদের রাতের খাবার প্রস্তুত থাকে এবং সেই সময়ে নামাযের ইকামতও হয়, তখন তোমরা প্রথমে খাবার খাও। আর খাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত কেউ যেন তাড়াহুড়ো না করে।” ইবনে উমার ﷺ এর জন্য খাবার বাড়া হলে সেই সময় যদি নামাযের ইকামত হত, তাহলে তা খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত নামাযে আসতেন না। সেই সময় তিনি ইমামের ক্বিরাআতও শুনতে পেতেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১০৫৬ নং)*

২২। প্রস্রাব-পায়খানা আটকে রেখে নামায পড়াঃ-

প্রস্রাব-পায়খানার চাপ থাকলে সেই অবস্থায় নামায পড়া বৈধ নয়। সময় বা জামাআত ছুঠে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলেও প্রস্রাব-পায়খানার কাজ না সেরে নামাযে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। মহানবী ﷺ বলেন, “খাবার সামনে রেখে নামায নেই। আর তারও নামায নেই, যাকে প্রস্রাব-পায়খানার বেগ পেয়েছে।” *(মুঃ ৫৬০, মিঃ ১০৫৭ নং, মুমঃ ৩/৩২৫-৩২৮)*

তিনি আরো বলেন, “তোমাদের কারো পায়খানার তলব হলে এবং অন্য দিকে নামাযের ইকামত হলে প্রথমে সে যেন পায়খানাই করে।” *(তিঃ, আদাঃ ৮৮, নাঃ, মাঃ, মিঃ ১০৬৯ নং)*

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে তার জন্য প্রস্রাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে এবং (প্রয়োজন সেরে) হাল্কা হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত নামায পড়া বৈধ নয়।” *(আদাঃ ৯১নং, প্রমুখ)*

২৩। ঢুল বা তন্দ্রা অবস্থায় নামাযঃ-

ঘুমের ঘোর থাকলে বা ঢুল এলে (নফল) নামায পড়া উচিত নয়। বরং একটু ঘুমিয়ে নিয়ে পড়া উচিত। অবশ্য ফরয নামাযের ক্ষেত্রে জামাআত ও নির্দিষ্ট সময় খেয়াল রাখা একান্ত জরুরী। *(এ ব্যাপারে 'নামায কিভাবে কায়েম হবে' শিরোনামের আলোচনা দ্রষ্টব্য)*

২৪। মাদকদ্রব্য বা কোন হারাম বস্তু বহন করাঃ-

হকপ্রিয় ও সত্যানুসন্ধানী উলামাগণের নিকট কুরআন, সুন্নাহ, বিবেক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক বহু দলীল বর্তমান থাকার কারণে বিড়ি, সিগারেট, গালি, তামাক, গুল-জর্দা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য মাকরূহে তাহরীমী অর্থাৎ হারাম। তাই এ সব জিনিস পকেটে রেখে মসজিদে যাওয়া ও নামায পড়া মকরূহ। *(ফইঃ ১/১৯৯-২০০)*

২৫। হেলা-দোলাঃ-

নামায পড়তে পড়তে আগে-পিছে বা ডানে-বামে হেলা-দোলা বৈধ নয়। কেন না, এ কাজ নামাযে একাগ্রতা ও স্থিরতার প্রতিকূল। *(মুত্বাসাঃ ২২০পৃঃ)*

অনেকে কেবল ডান অথবা বাম পায়ের উপর ভরনা দিয়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়ায়; যাতে কাতারের পাশের নামাযীরও ডিষ্টার্ব হয়। পক্ষান্তরে প্রিয় নবী ﷺ নামায শুরু করার পূর্বে

সাহাবাগণের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন, "তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও। বিভিন্নরূপে দাঁড়ায়ো না। নচেৎ তোমাদের হৃদয়ও বিভিন্ন হয়ে যাবে।" *(মুঃ, মিঃ ১০৮৮ নং)*

অবশ্য নামায লম্বা হলে পা ধরার ফলে দু-একবার পা বদলে আরাম নেওয়া দূষণীয় নয়। তবে শর্ত হল, যেন এক পা অপর পায়ের চেয়ে বেশী আগা-পিছা না হয়ে যায়। বরং উভয় পা যেন বরাবর থাকে এবং এ কাজ বারবারও না হয়। *(মুমঃ ৩/৩২৩-৩২৪)* তাছাড়া যেন পাশের মুসল্লীর ডিষ্টার্ব না হয়।

২৬। নামাযের প্রতিকূল কিছু আচরণঃ-

নামায পড়তে পড়তে মাথা বা দাড়ি চুলকানো, বারবার মাথার টুপী, পাগড়ী বা রুমাল সোজা করা, ঘড়ি হিলানো ও দেখা, নখ, দাঁত, নাক ও ব্রণ খোঁটা প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় কর্ম বৈধ নয়। *(মুত্বাসাঃ ১৭২-১৭৫পৃঃ)* একটি কথা খুবই সত্য যে, হৃদয় চাঞ্চল্যময় থাকলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চঞ্চল থাকে। আর হৃদয়কে যদি শান্ত ও স্থির রাখা যায়, তাহলে বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সেই মহান বাদশার জন্য শান্ত ও স্থির থাকবে।

২৭। সালাম ফেরার সময় হাতের ইশারা মকরূহ। *(সালামের বিবরণ দ্রষ্টব্য)*

নামায যাতে বাতিল হয়

এমন বহু কর্ম আছে, যা নামাযের ভিতরে করলে নামায বাতিল হয়ে যায়। সে সব কর্মের কিছু নিম্নরূপঃ-

১। অপ্রয়োজনে নামাযের ভিতর এত বেশী নড়া-সরা বা চলা-ফেরা করা যাতে অন্য কেউ দেখলে এই মনে করে যে, সে নামায পড়ে নি। *(মুমঃ ৩/৩৫২-৩৫৩)* কারণ, কথা বলার মত নামাযের বহির্ভূত অন্যান্য কর্ম করলে নামায বাতিল হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, "--- আর তোমরা আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দাঁড়াও।" *(কুঃ ২/২৩৮)*

২। নামাযের কোন রুক্‌ন বা শর্ত ত্যাগ করাঃ-

ধীর-স্থিরভাবে নামায না পড়ার কারণে মহানবী ﷺ নামায ভুলকারী সাহাবাকে তিন-তিনবার ফিরিয়ে নামায পড়তে আদেশ করেছিলেন। *(বুঃ, মুঃ, প্রমুখ, মিঃ ৭৯০ নং)* কারণ, ধীর-স্থির ও শান্তভাবে নামায পড়া নামাযের এক রুক্‌ন ও ফরয। যা ত্যাগ করার পর সহু সিজদাহ করলেও সংশোধন হয় না।

অনুরূপ সূরা ফাতিহা, রুকূ, কোন সিজদাহ, সালাম বা অন্য কোন রুক্‌ন ত্যাগ করলে নামাযই হয় না। অবশ্য প্রয়োজনের চাপে কিছু অবস্থা ব্যতিক্রমও আছে, যাতে দু-একটি রুক্‌ন (যেমন কিয়াম, সূরা ফাতিহা) বাদ গেলেও নামায হয়ে যায়। সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি নাপাক হয়ে যায়, সে ব্যক্তি পুনরায় ওযূ না করা পর্যন্ত তার নামায কবুল হয় না।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৩০০নং)* "পবিত্রতা বিনা নামাযই কবুল হয় না।" *(মুঃ, মিঃ*

৩০১নং)

সুতরাং নামায পড়তে পড়তে কারো ওযু ভেঙ্গে গেলে তার নামায বাতিল। নামায ত্যাগ করে পুনরায় ওযূ করে এসে নতুনভাবে নামায পড়তে হবে। *(আদাঃ, হাঃ, মিঃ ১০০৭ নং)*

অবশ্য ওযূ ভাঙ্গার নিছক সন্দেহের কারণে নামায বাতিল হয় না। নিশ্চিতরূপে ওযূ নষ্ট হওয়ার কথা না জানা গেলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, " (নামাযে হাওয়া বের হওয়ার সন্দেহ হলে) শব্দ না শোনা অথবা দুর্গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত কেউ যেন নামায ত্যাগ না করে।" *(বুঃ ১৩৭নং, মুঃ, আদাঃ, ইমাঃ, নাঃ)*

নামায পড়তে পড়তে শরমগাহ বের হয়ে পড়লে, মহিলাদের পেট, পিঠ, হাতের বাজু, চুল ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়লে (তা কোন বেগানা পুরুষ দেখতে পাক্ অথবা না পাক) নামায বাতিল হয়ে যায়।

নামায পড়তে থাকা কালে কাপড়ে বীর্য (স্বপ্নদোষের) চিহ্ন অথবা (মহিলা) মাসিকের দাগ দেখলে নামায ত্যাগ করা জরুরী।

নামায অবস্থায় দেহ বা লেবাসের কোন স্থানে নাপাকী লেগে থাকতে নজর পড়লে যদি তা সত্বর দূর করা সম্ভব হয়, তাহলে তা দূর করে নামায হয়ে যাবে। যেমন অতিরিক্ত লেবাসে; অর্থাৎ টুপী, রুমাল, গামছা বা পাগড়ী অথবা জুতায় নাপাকী দেখলে এবং সত্বর তা খুলে ফেলে দিলে নামায শুদ্ধ।

একদা নামায পড়তে পড়তে জিবরীল ؑ মারফৎ মহানবী ﷺ তাঁর জুতায় নাপাকী লেগে থাকার সংবাদ পেলে তিনি তা খুলে ফেলে নামায সম্পন্ন করেছিলেন। *(আদাঃ, দাঃ, মিঃ ৭৬৬ নং)*

সত্বর খোলা সম্ভব না হলে অথবা পূর্ণ লেবাস পরিবর্তন করা দরকার হলে নামায ত্যাগ করে পবিত্র লেবাস পরে পুনরায় নামায পড়তে হবে। *(ফইঃ ১/২৮৯)*

কারো নামায পড়ার পর যদি মনে পড়ে যে সে বিনা ওযূতে নামায পড়েছে, অথবা কাপড়ে (নিজের) বীর্য (স্বপ্নদোষ) বা (মহিলা) মাসিকের চিহ্ন দেখে, তাহলে নামায শুদ্ধ হয় নি। যথা নিয়মে পবিত্র হওয়ার পর সে নামায পুনরায় পড়তে হবে। কারণ, দেহ নাপাক রেখে নামাযই হয় না।

পক্ষান্তরে নামায পড়ার পর যদি দেখে, কাপড়ে প্রস্রাব, পায়খানা বা অন্য কোন নাপাকী লেগে আছে; অর্থাৎ সে তা নিয়েই নামায পড়েছে, তাহলে না জানার কারণে তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর ফিরিয়ে পড়তে হবে না। কারণ, বাইরের কাপড়ে (অনুরূপ কোন অঙ্গে) নাপাকী লেগে থাকলেও তার দেহ আসলে পাক ছিল। *(ফইঃ ১/১৯৮, ২৯৮)*

৪। জেনেশুনে ইচ্ছাকৃত কথা বলাঃ-

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ؓ বলেন, নবী ﷺ এর নামায পড়া অবস্থায় আমরা তাঁকে সালাম দিতাম এবং তিনি সালামের উত্তরও দিতেন। অতঃপর যখন নাজাশীর নিকট থেকে ফিরে এলাম, তখন সালাম দিলে তিনি উত্তর দিলেন না। পরে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "নামাযে মগ্নতা আছে।" *(বুঃ ১১৯৯ নং, মুঃ প্রমুখ)*

যায়দ বিন আরকাম ؓ বলেন, নবী ﷺ এর যুগে আমরা নামাযে কথা বলতাম; আমাদের

মধ্যে কেউ কেউ তার সঙ্গীকে নিজের প্রয়োজনের কথা বলত। অতঃপর যখন আল্লাহর এই নির্দেশ অবতীর্ণ হল, "তোমরা নামাযসমূহ এবং বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আসরের) নামাযের প্রতি যত্নবান হও। আর আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও।" তখন আমরা চুপ থাকতে (নামাযের সূরা, দুআ, দরূদ ছাড়া অন্য কথা না বলতে) আদিষ্ট হলাম। *(বুঃ ১২০০ নং, মুঃ প্রমুখ)*

অবশ্য নামাযে কথা বলা হারাম তা না জেনে যদি কেউ কথা বলেই ফেলে, তাহলে তার নামায বাতিল নয়। এক ব্যক্তি নামাযে হাঁচলে (ছিঁকি মারলে) মুআবিয়া বিন হাকাম নামাযের অবস্থাতেই ঐ ব্যক্তির জন্য 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলে দুআ করলে সাহাবাগণ নিজেদের জানুতে আঘাত করে তাঁকে চুপ করাতে চাইলেন। নামায শেষ হলে আদর্শ শিক্ষক প্রিয় রসূল ﷺ তাঁকে নরমভাবে বুঝিয়ে বললেন, "এই নামাযে লোক-সমাজের কোন কথা বলা বৈধ (সঙ্গত) নয়। এতে যা বলতে হয় তা হল; তসবীহ, তকবীর ও কুরআন পাঠ।" *(মুঃ, মিঃ ৯৭৮ নং)*

উক্ত হাদীসে এ কথা উল্লেখ নেই যে, তিনি তাঁকে নামায ফিরিয়ে পড়তে বলেছিলেন। সুতরাং বুঝা গেল, অজান্তে কেউ কথা বলে ফেললে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে না। *(ফিসুঃ ১/২৩৯)*

উল্লেখ্য যে, নামাযের সূরা, দুআ-দরূদ ইত্যাদির অনুবাদও যদি নামাযে বলা হয়, তাহলেও নামায বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, অনুবাদও মানুষের সাধারণ কথার শামিল।

প্রকাশ থাকে যে, কথা যদি নামায সংশোধন করার মানসেও বলা প্রয়োজন হয়, তবুও বলা বৈধ নয়। যেমন যদি ইমাম আসরের সময় জোরে ক্বিরাআত পড়তে শুরু করে এবং কোন মুক্তাদী তা সংশোধনের উদ্দেশ্যে বলে, 'এটা আসরের নামায' অথবা যদি ইমাম এক সিজদার পর বসে যায় এবং কোন মুক্তাদী 'তসবীহ' বলার পরও বুঝতে না পারে যে, দ্বিতীয় সিজদাহ করতে হবে; ফলে সে উঠতে যায়। এ ক্ষেত্রে কোন মুক্তাদীর 'সিজদাহ' বা 'সিজদাহ করুন' বলাও বৈধ নয়। এরূপ বললে নামায বাতিল। কারণ, পূর্বেই আমরা জেনেছি যে, নামাযে কিছু ঘটলে মহানবী ﷺ আমাদেরকে (পুরুষের জন্য) তসবীহ এবং (মহিলার জন্য) হাততালি বিধেয় করেছেন। *(মুমঃ ৩/৩৬৪-৩৬৫)*

এ বিষয়ে একটি ব্যতিক্রান্ত ব্যাপার এই যে, কোন জামাআতের লোক ভুল করে চার রাকআতের জায়গায় তিন রাকআত পড়ে সালাম ফিরার পর মুক্তাদীদের কেউ এই ভুল সম্বন্ধে স্মরণ দিলে এবং ইমামও নিশ্চিত হওয়ার জন্য অন্যান্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সংশোধনের উদ্দেশ্যে আরো এক রাকআত নামায অবশ্যই পড়বে এবং সহু সিজদাহ করবে। আর এর মাঝে ইমাম-মুক্তাদীর ঐ কথোপকথন নামাযের জন্য ক্ষতিকর হবে না। যেহেতু এ কথা তখনই বলা হয়, যখন সালাম ফিরে দেওয়া হয়। আর তখন কথা বলা বৈধ। পক্ষান্তরে নিশ্চিত জানা যায় না যে, সত্যই নামায কম পড়া হয়েছে কি না। এ রকমই হয়েছিল মহানবী ﷺ ও সাহাবাগণের। *(দেখুন, বুঃ ৭১৪, মুঃ ৫৭৩ নং)*

৫। পানাহার করাঃ-

নামায পড়তে পড়তে খেলে অথবা পান করলে নামায বাতিল হয়ে যায়। মুখের ভিতর পান, গালি (?), চুইংগাম প্রভৃতি রেখে নামায হয় না। কারণ এ কাজ নামাযের পরিপন্থী। *(ফিসুঃ ১/২৪০, ফিসুঃ উর্দু ১৩০ পৃঃ)*

৬। হাসাঃ-

হাসলেও অনুরূপ কারণে নামায বাতিল পরিগণিত হয়। *(ফিসুঃ ১/২৪০, ফিসুঃ উর্দু ১৩০পৃঃ)* অবশ্য কোন হাস্যকর জিনিস দেখে অথবা হাস্যকর কথা শুনে হাসি চেপে রাখতে না পেরে যদি কেউ মুচকি হাসি (শব্দ না করে) হেসে ফেলে, তাহলে তার নামায বাতিল হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, নামাযীকে হাসাবার চেষ্টা করা তথা তার নামায নষ্ট করার কাজ শয়তানের। কোন মুসলিম মানুষের এ কাজ হওয়া উচিত নয়।

৭। পিতার হারাম উপায়ে উপার্জিত অর্থ খেলে ও ব্যয় করলে পুত্রের নামায বাতিল নয়। তবে সেই অর্থ ব্যবহার না করতে যথাসাধ্য প্রয়াস থাকতে হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে পরহেযগারী অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য চলার পথ সহজ করে দেন। আর তিনি তাকে এমন জায়গা থেকে রুযী দান করে থাকেন, যা সে বুঝতে ও কল্পনাই করতে পারে না। *(ফইঃ ১/২৬৪)*

৮। 'যাতে ওযূ নষ্ট হয় না' শিরোনামে আলোচিত হয়েছে যে, গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে নামায পড়লে ওযূ ও নামায কিছুই বাতিল হয় না। অবশ্য এমন কাজ করলে তার উপর থেকে মহান আল্লাহর সুনজর ও দায়িত্ব উঠে যায়। আর ওযূ ও নামায বাতিল হওয়ার ব্যাপারে দলীলের হাদীস সহীহ নয়। *(ফইঃ ১/৩০১)*

৯। কোন কারণে ইমামের নামায বাতিল হলে পশ্চাতে মুক্তাদীদের নামায বাতিল নয়। *(মুমঃ ২/৩১৫-৩১৭) এ বিষয়ে ইমামতির বিবরণ দ্রষ্টব্য।*

১০। নামাযী যদি জানে যে তার সামনে দিয়ে কোন মহিলা, গাধা বা কালো কুকুর অতিক্রম করবে এবং এ জানা সত্ত্বেও বিনা সুতরায় নামায পড়ে, তাহলে ঐ তিনটের একটাও তার সামনে বেয়ে পার হয়ে গেলে তার নামায বাতিল। কারণ, সুতরার বিবরণে আমরা জেনেছি যে, ঐ তিনটি জিনিস নামায নষ্ট করে দেয়। *(মুমঃ ৩/৩৪৩, ৩৯২)*

অনুরূপ মুক্তাদীর সুতরাহ ইমামের সুতরাই। অতএব ইমাম সুতরাহ রেখে নামায না পড়লে এবং ঐ তিনটের একটা সামনে বেয়ে অতিক্রম করলে ইমাম-মুক্তাদী সকলের নামায বাতিল।

প্রকাশ যে, নামায পড়তে পড়তে নামায বাতিল হওয়া জানা গেলে অথবা ওযূ নষ্ট হওয়া বুঝতে পারলে সাথে সাথে নামায ছেড়ে বেরিয়ে আসা ওয়াজেব। লজ্জায় বা অন্য কারণে নামায শেষ করা হারাম এবং তা এক প্রকার আল্লাহর সাথে ব্যঙ্গ করা! কারণ, যা তিনি গ্রহণ করবেন না, তা জেনেশুনেও নিবেদন করতে থাকা উপহাস বৈকি? *(মুমঃ ৩/৩৯২-৩৯৩)*

অবশ্য জামাআতে থাকলে লজ্জা হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ করে হাওয়া বের হওয়ার ফলে ওযূ নষ্ট হলে অনেকে নামায বা জামাআত ত্যাগ করে কাতার ভেঙ্গে আসতে লজ্জা ও সংকোচবোধ করে। কিন্তু মহানবী ﷺ এই লজ্জা ঢাকার জন্য এক কৃত্রিম উপায়ের কথা বলে দিয়েছেন; তিনি বলেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার নামাযে নাপাক হয়ে যাবে তখন সে যেন তার নাক ধরে নেয়। অতঃপর বের হয়ে আসে।" *(আদাঃ ১১১৪, হাঃ ১/ ১৮৪, মিঃ ১০০৭ নং)*

ত্বীবী বলেন, এই নির্দেশ এই জন্য যে, যাতে লোকেরা মনে করে তার নাকে রক্ত আসছে (তাই বের হয়ে যাচ্ছে)। আর এরূপ করা মিথ্যা নয়, বরং তা 'তাওরিয়াহ' বা বৈধ অভিনয়।

শয়তান যাতে তার মনে লোকদেরকে শরম করার কথা সুশোভিত না করে ফেলে (এবং নামায পড়তেই থেকে যায়)। তাই তার জন্য এ কাজের অনুমতি ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। *(আমাঃ, মিরকাত, মিশকাতের টীকা ১নং, ১/৩১৮)*

কার নামায কবুল নয়?

কিছু নামাযী আছে, যারা নামায তো পড়ে; কিন্তু তাদের নামায আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে কবুল ও গৃহীত হয় না। নামাযী অথবা নামাযের অবস্থা দেখে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন না। এমন কতকগুলি নামাযী নিম্নরূপঃ-

১। পলাতক ক্রীতদাসঃ-

২। এমন স্ত্রী, যার স্বামী তার উপর রাগ করে আছে। স্ত্রী স্বামীকে সর্বদা খোশ রাখবে, তার (ভালো কথা ও কাজে) আনুগত্য করবে, তার সব কথা মেনে চলবে, যৌনসুখ দিয়ে তাকে সর্বদা তৃপ্ত রাখবে, কোন বিষয়ে রাগ হলে তা সত্বর মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে সব কিছুতে তাকে সন্তুষ্ট রাখবে-এটাই হল স্ত্রীর ধর্ম। মহানবী ﷺ বলেন, তোমাদের (সেই) স্ত্রীরাও জান্নাতী হবে, যে স্ত্রী অধিক প্রণয়িনী, সন্তানদাত্রী, বারবার ভুল করে বারবার স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণকারিণী, যার স্বামী রাগ করলে সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে, আপনি রাজী (ঠান্ডা) না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাব না।” *(সিসঃ ২৮৭ নং)*

কিন্তু এমন বহু মহিলা আছে, যারা তাদের স্বামীর খেয়ে-পরেও এমন রাগ-রোষকে পরোয়া করে না। নারী-স্বাধীনতার পক্ষপাতিনী স্বামীর সংসারেও পরম স্বাধীনতা-সুখ ভোগ করতে গিয়ে স্বামীকে নারাজ রাখে। ফলে বিশ্বস্বামীও নারাজ হন এবং সেই স্ত্রীর শয্যাসঙ্গী স্বামীকে খোশ করার আগে নামায পড়লেও সে নামাযে তিনি খোশ হন না। কারণ, ‘হুকূকুল ইবাদ’ আদায় না করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ বান্দার তাওবাতে সন্তুষ্ট হন না। যার প্রতি অন্যায় করা হয়, তার নিকট আগে ক্ষমা পেলে তবেই মহান আল্লাহ ক্ষমা করেন। নচেৎ না।

৩। এমন লোক যে কারো বিনা অনুমতি ও আদেশেই কারো জানাযা পড়ায় (ইমামতি করে)। এমন ইমাম, যার ইমামতি অধিকাংশ মুক্তাদীরা পছন্দ করে না। তার পিছনে নামায পড়তে তাদের রুচি হয় না। ইমামতিতে ভুল আচরণ অথবা চরিত্রগত কোন কারণে অধিকাংশ লোকে তাকে ইমামতি করতে দিতে চায় না। এমন ইমামের নামায তার কান অতিক্রম করে না, মাথার উপরে যায় না, আকাশের দিকে ওঠে না, সাত আসমান পার হয়ে আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়া তো বহু দূরের কথা।

মহানবী ﷺ বলেন, “তিন ব্যক্তির নামায তাদের কান অতিক্রম করে না; পলাতক ক্রীতদাস, যতক্ষণ না সে ফিরে এসেছে, এমন স্ত্রী যার স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করেছে, (যতক্ষণ না সে রাজী হয়েছে), (অথবা যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচরণ করেছে, সে তার বাধ্যা না হওয়া পর্যন্ত) এবং সেই সম্প্রদায়ের ইমাম, যাকে লোকে অপছন্দ করে।” *(তিঃ, ত্বাবা, হাঃ, সিসঃ ২৮৮, ৬৫০নং)*

৪।এমন লোক, যে কোন গণকের কাছে ভাগ্য ও ভবিষ্যত জানার আশায়

গণককে ‘ইল্‌মে গায়বের মালিক’ মনে করে হাত দেখায়। এমন ব্যক্তির - কেবল গণকের কাছে যাওয়ার কারণেই- তার ৪০ দিনের (২০০ অক্তের) নামায কবুল হয় না! তার উপর গণক যা বলে তা বিশ্বাস করলে তো অন্য কথা। বিশ্বাস করলে তো সে মূলেই ‘কাফের’-এ পরিণত হয়ে যায়। আর কাফেরের নামায-রোযা অবশ্যই মকবূল নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন গণকের নিকট উপস্থিত হয়ে কোন (ভূত-ভবিষ্যৎ বা গায়বী) বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, সে ব্যক্তির ৪০ দিনের নামায কবুল হয় না।” *(মুঃ ২২৩০নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন গণক বা জ্যোতিষীর নিকট উপস্থিত হয়ে সে যা বলে তা সত্য মনে (বিশ্বাস) করল, সে ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ এর উপর অবতীর্ণ (কুরআনের) প্রতি কুফরী করল।” *(আহমদ, হাকেম, সহীহুল জামে’ ৫৯৩৯নং)*

৫। শারাবী, মদ্যপায়ীঃ-

মহানবী ﷺ বলেন, “আমার উম্মতের যে ব্যক্তি মদ পান করবে, আল্লাহ তার ৪০ দিন নামায কবুল করবেন না।” *(নাঃ, সজাঃ ৭৭১৭ নং)*

৬। এমন নামাযী, যে নামায পড়ে কিন্তু নামায চুরি করে। দায় সারা করে পড়ে। ঠিকমত রুকূ-সিজদাহ করে না। রুকূতে স্থির হয় না, সিজদায় স্থির থাকে না। কোমর বাঁকানো মাত্র তুলে নেয়। ‘সু-সু-সু’ করে দুআ পড়ে চট্‌পট্‌ উঠে যায়! কারো কোমর ঠিকমত বাঁকে না। মাথা উঁচু করেই রুকূ করে। কারো সিজদার সময় নাক মুসাল্লায় স্পর্শ করে না। কারো পা দু’টি উপর দিকে পাল্লায় হাল্কা হওয়ার মত উঠে যায়। কেউ রুকূ ও সিজদার মাঝে স্থির হয়ে দাঁড়ায় না। হাফ দাঁড়িয়ে সিজদায় যায়।

মহানবী ﷺ বলেন, “হে মুসলিম দল! সে ব্যক্তির নামায হয় না, যে ব্যক্তি রুকূ ও সিজদাতে নিজ পিঠ সোজা করে না।” *(আঃ, ইমাঃ, ইখুঃ, ইহিঃ, সতাঃ ৫২৪ নং)*

“আল্লাহ সেই বান্দার নামাযের দিকে তাকিয়েও দেখেন না, যে রুকূ ও সিজদার মাঝে নিজ পিঠকে সোজা করে (দাঁড়ায়) না।” *(আঃ ৪/২২, ত্বাবা, সতাঃ ৫২৫, সিসঃ ২৫৩৬ নং)*

“মানুষ ৬০ বছর ধরে নামায পড়ে, অথচ তার একটি নামাযও কবুল হয় না! কারণ, হয়তো বা সে রুকূ পূর্ণরূপে করে, কিন্তু সিজদাহ পূর্ণরূপে করে না। অথবা সিজদাহ পূর্ণরূপে করে, কিন্তু রুকূ ঠিকমত করে না।” *(আসবাহানী, সিসঃ ২৫৩৫ নং)*

“নামায ৩ ভাগে বিভক্ত; এক তৃতীয়াংশ পবিত্রতা, এক তৃতীয়াংশ রুকূ এবং আর এক তৃতীয়াংশ হল সিজদাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি তা যথার্থরূপে আদায় করবে, তার নিকট থেকে তা কবুল করা হবে এবং তার অন্যান্য সমস্ত আমলও কবুল করা হবে। আর যার নামায রদ্দ করা হবে, তার অন্য সকল আমলকে রদ্দ্‌ করে দেওয়া হবে।” *(বাযযার, সিসঃ ২৫৩৭ নং)*

৭। আযান শুনেও যে নামাযী বিনা ওজরে মসজিদের জামাআতে নামায পড়ে নাঃ-

জামাআতে নামায পড়া ওয়াজেব। এই ওয়াজেব ত্যাগ করলে তার নামায কবুল নাও হতে পারে। মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আযান শোনা সত্ত্বেও মসজিদে জামাআতে এসে নামায আদায় করে না, কোন ওজর না থাকলে সে ব্যক্তির নামায কবুল হয় না।” *(আদাঃ ৫৫১, ইমাঃ,*

ইহিঃ, হাঃ, সজাঃ ৬৩০০ নং)

৮। এমন মহিলা, যে আতর বা সেন্ট মেখে মসজিদের জন্য বের হয়ঃ-

এমন মহিলা যতক্ষণ পর্যন্ত না নাপাকীর গোসল করার মত গোসল করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না। *(ইমাঃ, সজাঃ ২৭০৩ নং)*

৯। পিতামাতার অবাধ্য সন্তান।

১০। দান করে যে দানের কথায় গর্বভরে প্রচার করে বেড়ায়।

১১। তকদীর অস্বীকারকারী ব্যক্তি। *(ত্বাবা, সজাঃ ৩০৬৫ নং)*

১২। পরের বাপকে যে নিজের বাপ বলে দাবী করে। *(বুঃ, মুঃ)*

১৩। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে হত্যা করে এবং তাতে সে গর্ববোধ করে ও খুশী হয়। *(বাঃ ৮/২১, সজাঃ ৬৪৫৪ নং)*

১৪। খুনের বদলে খুনের বদলা নিতে যে ব্যক্তি (শাসনকর্তৃপক্ষকে) বাধা দেয়। *(আদাঃ, নাঃ, সজাঃ ৬৪৫১ নং)*

১৫। যে ব্যক্তি মদীনায় কোন বিদআত কাজ করে অথবা কোন বিদআতীকে আশ্রয় দেয়। অথবা কোন দুষ্কর্ম করে বা দুষ্কৃতীকে আশ্রয় দেয়।

১৬। যে ব্যক্তি মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। *(বুঃ, মুঃ ১৩৭০ নং)*

উপর্যুক্ত ব্যক্তিবর্গের কোন ফরয-নফল নামায ও ইবাদতই (অথবা তওবা ও মুক্তিপণ কিয়ামতে) কবুল করা হবে না।

কাযা নামায

কেউ যথাসময়ে নামায পড়তে ঘুমিয়ে অথবা ভুলে গেলে এবং তার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে, পরে যখনই তার চেতন হবে অথবা মনে পড়বে তখনই ঐ (ফরয) নামায কাযা পড়া জরুরী।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন নামায পড়তে ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে তার কাফ্ফারা হল স্মরণ হওয়া মাত্র তা পড়ে নেওয়া।” অন্য এক বর্ণনায় বলেন, “এ ছাড়া তার আর কোন কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) নেই।” *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৬০৩ নং)*

তিন আরো বলেন, “নিদ্রা অবস্থায় কোন শৈথিল্য নেই। শৈথিল্য তো জাগ্রত অবস্থায় হয়। সুতরাং যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন নামায পড়তে ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তার উচিত, স্মরণ হওয়া মাত্র তা পড়ে নেওয়া। কেন না, আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে তুমি নামায কায়েম কর।” *(কুঃ ২০/১৪, মুঃ, মিঃ ৬০৪নং)*

অতএব কাযা নামায পড়ার জন্য কোন সময়-অসময় নেই। দিবা-রাত্রের যে কোন সময়ে চেতন হলে বা মনে পড়লেই উঠে সর্বাগ্রে নামায পড়ে নেওয়া জরুরী। অন্যথা পরবর্তী সময়ের অপেক্ষা বৈধ নয়।

বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃত নামায ছেড়ে দিলে বা সুযোগ ও সময় থাকা সত্ত্বেও না পড়ে অন্য অক্ত্ এসে গেলে পাপ তো হবেই; পরন্তু সে নামাযের আর কাযা নেই। পড়লেও তা

গ্রহণযোগ্য নয়। বিনা ওজরে যথাসময়ে নামায না পড়ে অন্য সময়ে কাযা পড়ায় কোন লাভ নেই। বরং যে ব্যক্তি এমন করে ফেলেছে তার উচিত, বিশুদ্ধচিত্তে তওবা করা এবং তারপর যথাসময়ে নামায পড়ায় যত্নবান হওয়ার সাথে সাথে নফল নামায বেশী বেশী করে পড়া। *(মুহাল্লা, ফিসুঃ ১/২৪১-২৪৩, ফিসুঃ উর্দু ৭৮পৃঃ, ১নং টীকা, মবঃ ৫/৩০৬, ১৫/৭৭, ১৬/১০৫, ২০/১৭৪, মিঃ ৬০৩নং হাদীসের আলবানীর টীকা দ্রঃ)*

কেউ অজ্ঞান থাকলে জ্ঞান ফিরার পূর্বের নামায কাযা পড়তে হবে না। কারণ, সে জ্ঞানহীন পাগলের পর্যায়ভুক্ত। আর পাগলের পাপ-পুণ্য কিছু নেই। *(আদাঃ, তিঃ, মিঃ ৩২৮৭ নং, মবঃ ২৬/১২৮, ফিসুঃ ১/২৪১, মুমঃ ২/১২৬)* ইবনে উমার ﷺ অজ্ঞান অবস্থায় কোন নামায ত্যাগ করলে তা আর কাযা পড়তেন না। *(আরাঃ, ফিসুঃ ১/২৪১)*

অবশ্য নামায পড়তে পারত এমন সময়ের পর অজ্ঞান হলে জ্ঞান ফিরার পর সেই সময়ের নামায কাযা পড়া জরুরী। *(মুমঃ ২/১২৬-১২৭)*

পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি কোন কারণে কোন বস্তু ব্যবহার করে স্বেচ্ছায় বেহুশ হয়, তাহলে তার জন্য কাযা পড়া জরুরী। *(ঐ ২/১৮)*

কাযা নামায পড়ার জন্য আযান ও ইকামত বিধেয়। কয়েক অক্তের নামায কাযা পড়তে হলে, প্রথমবার আযান ও তারপর প্রত্যেক নামাযের জন্য পূর্বে ইকামত বলা কর্তব্য।

এক সফরে আল্লাহর রসূল ﷺ সহ সাহাবাগণ ঘুমিয়ে পড়লে ফজরের নামায ছুটে যায়। তাঁদের চেতন হয় সূর্য ওঠার পর। অতঃপর একটু সরে গিয়ে তাঁরা ওযূ করেন। বিলাল ﷺ আযান দেন। *(মুঃ ৬৮১, আঃ, আদাঃ)* অতঃপর সুন্নত কাযা পড়ে ইকামত দিয়ে ফজরের ফরয কাযা পড়েন। *(বুঃ ৩৪৪, মুঃ ৬৮০ নং, নাআঃ ২/২৭)*

খন্দকের যুদ্ধের সময় মহানবী ﷺ ও সাহাবাগণের চার অক্তের নামায ছুটে গেলে গভীর রাত্রিতে তিনি বিলাল ﷺ কে আযান দিতে আদেশ করেন। *(শাফেয়ী, ইখুঃ, ইহিঃ)* অতঃপর প্রত্যেক নামাযের পূর্বে ইকামত দিতে বলেন। এইভাবে প্রথমে যোহর, অতঃপর আসর, মাগরেব ও এশার নামায পরপর কাযা পড়েন। *(নাঃ, আঃ, বাঃ প্রমুখ, ইগঃ ১/২৫৭)*

উল্লেখ্য যে, ফজরের আযান দিনে দিতে হলেও 'আস্সালাতু খাইরুম মিনান নাউম" বলতে হবে। কারণ ফজরের ঐ কাযা নামাযে মহানবী ﷺ ফজরের সময় যা করেন, দিনেও তাই করে নামায আদায় করেছেন বলে প্রমাণ আছে। *(মুঃ ৬৮১নং, মুমঃ ১/২০৪)*

যে নামায যে অবস্থায় কাযা হয়, সেই নামাযকে সেই অবস্থা ও আকারে পড়া জরুরী। সুতরাং রাতের নামায দিনে কাযা পড়ার সুযোগ হলে রাতের মতই করে জোরে ক্বিরাআত করতে হবে। কারণ, মহানবী ﷺ যখন ফজরের নামায দিনে কাযা পড়েছিলেন, তখন ঠিক সেইরূপই পড়েছিলেন, যেরূপ প্রত্যেক দিন ফজরের সময় পড়তেন। *(মুঃ ৬৮১নং)* তদনুরূপ ছুটে যাওয়া নামায রাতে কাযা পড়ার সুযোগ হলে দিনের মতই চুপেচুপে ক্বিরাআত পড়তে হবে। *(নাআঃ ২/২৭, মুমঃ ৪/২০৪, ফইঃ ১/৩১০)*

তদনুরূপ কেউ মুসাফির অবস্থায় নামায কাযা করে বাড়ি ফিরলে, বাড়ি ফিরার পর নামায কসর করে না পড়ে পুরোপুরি পড়বে; কিন্তু ঐ কাযা নামায কসর করেই আদায় করবে।

কারণ, সফর অবস্থায় তার কসর নামাযই কাযা হয়েছে। আর বাড়িতে থাকা অবস্থায় কোন ছুটে যাওয়া নামায সফরে মনে পড়লে বা কাযা পড়ার সুযোগ হলে তা পুরোপুরিই আদায় করতে হবে। মোট কথা যেমন নামায কাযা হবে, ঠিক তেমনিভাবে তা আদায় করতে হবে। *(মুমঃ ৪/৫১৮)*

কাযা নামাযে তরতীব জরুরী

কোন নামায ছুটে গেলে সে নামায কাযা পড়ার পরই বর্তমান নামায পড়া যাবে। অনুরূপ কয়েক অক্তের নামায এক সঙ্গে কাযা পড়তে হলে অনুক্রম ও তরতীব অনুযায়ী প্রথমে ফজর, অতঃপর যোহর, অতঃপর আসর, মাগরেব, এশা -এই নিয়মে আদায় করতে হবে। আগা-পিছু করে পড়া বৈধ নয়। খন্দকের যুদ্ধে মহানবী ﷺ ও সাহাবাগণের কয়েক অক্তের নামায ছুটলে ঐ তরতীব খেয়াল রেখেই পরপর আদায় করেছিলেন। *(বুঃ, মুঃ, প্রমুখ, নাআঃ ২/২৯)*

এখন যদি কেউ যোহরের নামায কাযা রেখে আসরের অক্তে মসজিদে আসে, তাহলে সে প্রথমে যোহরের নামায পড়ে নেবে। তারপর পড়বে আসরের নামায। কিন্তু কেউ যদি এমন সময় মসজিদে আসে, যে সময় আসরের জামাআত চলছে, তাহলে সে একাকী কাযা পড়তে পারে না। কারণ, জামাআত চলাকালে একই স্থানে দ্বিতীয় জামাআত বা পৃথক একাকী (জামাআতী) নামায হয় না। *(মুঃ, মিঃ ১০৫৮ নং)* আবার কাযা রেখে আসরের নামায জামাআতে পড়লে যোহরের পূর্বে আসর পড়া হয়। আর তা হল তরতীব ও অনুক্রমের পরিপন্থী। সুতরাং সে ব্যক্তি তরতীব বজায় রেখে যোহরের কাযা আদায়ের নিয়তে জামাআতে শামিল হবে এবং তারপর একাকী আসর পড়ে নেবে। *(তুইঃ ৬৬পৃঃ)*

এ ক্ষেত্রে ইমামের নিয়ত ভিন্ন হলেও উক্ত মুক্তাদীর নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ, ইমাম-মুক্তাদীর নিয়ত পৃথক পৃথক হলেও উভয়ের নামায যে শুদ্ধ, তার প্রমাণ সুন্নাহতে মজুদ।

মহানবী ﷺ একদা এক ব্যক্তিকে একাকী নামায পড়তে দেখলে তিনি অন্যান্য সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "এমন কেউ কি নেই, যে এর সাথে নামায পড়ে একে (জামাআতের সওয়াব) দান করবে?" এ কথা শুনে এক ব্যক্তি উঠে তার সাথে নামায পড়ল। *(আদাঃ ৫৭৪, তিঃ, মিঃ ১১৪৬ নং)* অথচ সে মহানবী ﷺ এর সাথে ঐ নামায পূর্বে পড়েছিল। সুতরাং ইমামের ছিল ফরয এবং মুক্তাদীর নফল।

একদা তিনি সালাম ফিরে দেখলেন, মসজিদের এক প্রান্তে দুই ব্যক্তি জামাআতে নামায পড়ে নি। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আমরা আমাদের বাসায় নামায পড়ে নিয়েছি।' তিনি বললেন, "এমনটি আর করো না। বরং যখন তোমাদের কেউ নিজ বাসায় নামায পড়ে নেয়, অতঃপর (মসজিদে এসে) দেখে যে, ইমাম নামায পড়ে নি, তখন সে যেন (দ্বিতীয়বার) তাঁর সাথে নামায পড়ে। আর এ নামায তার জন্য নফল হবে।" *(আদাঃ ৫৭৫, তিঃ, নাঃ, মিঃ ১১৫২ নং)*

অনুরূপ মুআয বিন জাবাল رضي الله عنه মহানবী ﷺ এর সাথে তাঁর মসজিদে (নববীতে) নামায

পড়তেন। অতঃপর নিজ গোত্রে ফিরে এসে ঐ নামাযেরই ইমামতি করতেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১১৫০ নং)* অতএব বুঝা গেল যে, এক নামাযের পশ্চাতে অন্য নামায পড়া দোষাবহ ও অশুদ্ধ নয়। সুতরাং উক্ত ক্ষেত্রে তরতীবের ওয়াজেব উল্লংঘন না করে যোহরের কাযা নামায আসরের জামাআতে পড়ে নেওয়াই উত্তম।

পক্ষান্তরে মহানবী ﷺ এর এই হাদীস "যখন নামায খাড়া হয়, তখন ফরয (বা সেই) নামায ছাড়া অন্য কোন নামায নেই।" *(বুঃ বিনা সনদে, ফবাঃ ২/১৭৪, মুঃ ৭১০ নং, আঃ ২/৩৫২, প্রমুখ)* এর অর্থ হল জামাআত খাড়া হলে ফরয বা (ঐ নামায তাকে পড়তে হলে) ঐ নামাযে শামিল হওয়া ছাড়া পৃথক করে কোন নফল বা সুন্নত নামায পড়া বৈধ নয়। অর্থাৎ ইকামতের পর আর কোন সুন্নত বা নফল নামায শুদ্ধ হবে না। হাদীসের ব্যাখ্যাতাগণ এরূপই ব্যাখ্যা করেছেন। *(দেখুন, শরহুন নওবী ৫/২২১, ফবাঃ ২/১৭৫, আমাঃ ৪/১০১)* এখানে এক নামাযের জামাআতে অন্য নামাযের নিয়ত করে নামায হবে না -সে উদ্দেশ্য নয়। *(এ ব্যাপারে ইমামতির বিবরণও দ্রষ্টব্য।)* তাছাড়া ইমাম-মুক্তাদীর নিয়ত ভিন্ন হলেও যে উভয়ের নামায শুদ্ধ, তা পূর্বেই প্রতিপাদিত হয়েছে।

এশার জামাআতে মাগরেবের নামায

মাগরেব কাযা রেখে কেউ মসজিদে এলে এবং এশার জামাআত শুরু দেখলে সে মাগরেবের কাযা আদায় করার নিয়তে শামিল হবে। অতঃপর তার তিন রাকআত পড়া হলে বসে যাবে। ইমাম তাশাহহুদে বসলে তার সঙ্গে তাশাহহুদ আদি পড়ে ইমামের সাথে সালাম ফিরবে। *(ইবনে বায, কিদাঃ ৯৬পৃঃ)*

পক্ষান্তরে ইমামের এক রাকআত হয়ে যাওয়ার পর জামাআতে শামিল হলে ইমামের সাথেই সালাম ফিরলে ৩ রাকআত মাগরেবের কাযা আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর উঠে একাকী এশার নামায পড়বে। অথবা অন্য লোক থাকলে দ্বিতীয় জামাআতে পড়ে নেবে।

অনুরূপভাবে কেউ আসরের নামায কাযা রেখে মসজিদে এসে মাগরেবের জামাআত খাড়া দেখলে আসর কাযা পড়ার নিয়তে শামিল হবে। অতঃপর ইমাম সালাম ফিরলে সে আর এক রাকআত উঠে পূর্ণ ৪ রাকআত আসরের নামায আদায় করে নেবে। *(ফইঃ ১/৩১০)* পরে একাকী অথবা দ্বিতীয় জামাআতে মাগরেব পড়বে।

তরতীব কখন বিবেচ্য নয়?

জামাআতে শামিল হয়ে কাযা নামায পড়ার পর সময় অভাবে যে নামায একাকী বা দ্বিতীয় জামাআতে আদায় করা সম্ভব নয়, সে নামায জামাআতেই আদায় করা জরুরী। আর এ ক্ষেত্রে তরতীব বিবেচ্য নয়। যেমন, কেউ জুমআর নামায পড়তে এসে জামাআত খাড়া দেখে তার ফজরের নামায কাযা আছে তা মনে পড়ল। এখন তরতীব বজায় রেখে জামাআতে

ফজরের কাযা আদায় করার নিয়তে শামিল হলে পরে একাকী বা দ্বিতীয় জামাআতে জুমআর নামায পড়া সম্ভব নয়। অতএব তখন সে জুমআহ পড়ার নিয়তেই জামাআতে শামিল হবে এবং তার পরই ফজরের নামায কাযা পড়তে পারবে। *(মুমঃ ২/১৪১)*

তদনুরূপ বর্তমান নামাযের অক্ত্ চলে যাওয়ার আশঙ্কা হলেও তরতীব বিবেচ্য নয়। যেমন, এক ব্যক্তি ফজরের নামায পড়তে এমন সময় উঠল যখন সূর্য উঠতে চলেছে। এই সময় তার মনে পড়ল যে, তার এশার নামায কাযা আছে। তখন কাযা পড়তে গেলে সূর্য উঠে যাবে এবং ফজরের নামাযও কাযা হয়ে যাবে। সুতরাং দু'টো নামাযকে কাযা না করে ফজরের নামায তার যথা (শেষ) সময়ে আদায় করে তারপর এশার নামায কাযা পড়বে। *(মুমঃ ২/১৪০-১৪১, তুইঃ ৬৬পৃঃ, মবঃ ৫/২৯৭)*

একইভাবে আসরের নামাযের শেষ সময়ে যোহর কাযা আছে মনে পড়লে, আসর আগে পড়ে তারপর যোহর পড়তে হবে। যাতে আসরও কাযা না হয়ে যায়।

বর্তমান নামায পড়তে শুরু করার পর অথবা পড়ে নেওয়ার পর পূর্বের নামায কাযা আছে মনে পড়লে আর তরতীব বিবেচ্য নয়। ভুলের জন্য তা ক্ষমার্হ হবে; ধর্তব্য হবে না। অতএব বর্তমান নামায শেষ করে কাযা নামায পড়ে নিতে হবে। *(মবঃ ৫/২৯৭)*

কাযা উমরী ও নামাযের কাফ্ফারা

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগ করলে সে নামাযের কাযা নেই। অতএব তওবার পর কাযা উমরী বলে শরীয়তে কোন নামায নেই। বিধায় তা বিদআত।

অবশ্য এই তওবাকারী ব্যক্তির উচিত, বেশী বেশী করে নফল নামায পড়া এবং অন্যান্য নফল ইবাদতও বেশী বেশী করে করা। *(কিদাঃ ২/৪২)* তার জন্য ওয়াজেব এই যে, সে সর্বদা নামায ত্যাগ করার ঐ অবহেলাপূর্ণ পাপ ও ক্ষতির কথা মনে রেখে তার প্রতিকারের উদ্দেশ্যে (নফল ইবাদতের মাধ্যমে) সদা সচেতন থাকবে। সম্ভবতঃ তার ঐ হারিয়ে দেওয়া দিনের কিছু ক্ষতিপূরণ অর্জন হয়ে যাবে। *(মুমঃ ২/১৩৫)*

রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট থেকে তার আমলসমূহের মধ্যে যে আমলের হিসাব সর্বাগ্রে নেওয়া হবে, তা হল নামায। নামায ঠিক হলে সে পরিত্রাণ ও সফলতা লাভ করবে। নচেৎ (নামায ঠিক না হলে) ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং (হিসাবের সময়) ফরয নামাযে কোন কমতি দেখা গেলে আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা ফিরিশ্তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন, 'দেখ, আমার বান্দার কোন নফল (নামায) আছে কি না।' অতএব তার নফল নামায দ্বারা ফরয নামাযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর আরো সকল আমলের হিসাব অনুরূপ গ্রহণ করা হবে।" *(সআদাঃ ৭৭০, সতিঃ ৩৩৭, সইমাঃ ১১৭নং, সতাঃ ১/১৮৫)*

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির নামায অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছুটে যায়, তার জন্য কাযা আছে। আল্লাহ বান্দার অন্তরের খবর রাখেন। তার মনে অবহেলা ও শৈথিল্য না থাকলে তিনি তার কাযা গ্রহণ করবেন। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "(এই কাযা আদায় করা ছাড়া) এর জন্য আর অন্য কোন কাফ্ফারা নেই।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৬০৩নং)*

পক্ষান্তরে কাযা আদায় করার সময় ও সুযোগ না পেলে কোন পাপ হয় না। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে, মরণের সময় অথবা পরে বেনামাযী অথবা কিছু নামায ত্যাগকারীর তরফ থেকে নামায-খন্ডনের উদ্দেশ্যে রাকআত হিসাব করে কাফ্‌ফারা স্বরূপ কিছু দান-খয়রাত ইত্যাদি করা নিরর্থক ও নিষ্ফল। বরং এই উদ্দেশ্যে পাপ-খন্ডনের ঐ অনুষ্ঠান ও প্রথা এক বিদআত। *(ইসলাহুল মাসাজিদ, আল্লামা আলবানীর টীকা সহ উর্দু তর্জমাঃ ২৯৬পৃঃ, আহকামুল জানাইয, আলবানী ১৭৪, ২৭৫পৃঃ, মু'জামুল বিদা' ১৬৪পৃঃ)* বলা বাহুল্য এমন পাপক্ষালনের রীতি তো অমুসলিমদের; যারা ইয়া বড় বড় পাপ করে কোন পানিতে ডুব দিলে অথবা কিছু অর্থ ব্যয় করলে নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে!

জামাআত সম্পর্কীয় মাসায়েল

ইসলাম জামাআতবদ্ধ জীবন পছন্দ করে; অপছন্দ করে বিচ্ছিন্নতাকে। কারণ, শান্তি ও শৃঙ্খলা রয়েছে জামাআতে। আর নামায একটি বিশাল ইবাদত। (শিশু, ঋতুমতী মহিলা ও পাগল ছাড়া) নামায পড়তেও হয় সমাজের সকল শ্রেণীর সভ্যকে। তাই সমষ্টিগতভাবে এই ইবাদতের জন্যও একটি সুশৃঙ্খল নিয়ম-নীতির প্রয়োজন ছিল। বিধিবদ্ধ হল জামাআত।

পাঁচ অক্ত নামায ফরয হয় ইসরা' ও মি'রাজের রাত্রে। ঠিক তার পরের দিন যোহরের সময় জিবরীল ﷷ প্রিয় নবী ﷺ-কে নিয়ে জামাআত সহকারে প্রথম নামায পড়েন। অনুরূপভাবে মুসলিমরাও মহানবী ﷺ-এর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে তাঁর অনুসরণ করেন। আর জিবরীলের ইমামতির পর মহানবী ﷺ মক্কা মুকার্রামায় কোন কোন সাহাবীকে নিয়ে কখনো কখনো জামাআত সহকারে নামায আদায় করেছেন। কিন্তু মদীনায় হিজরত করার পর জামাআত একটি বাঞ্ছিত নিয়ম ও ইসলামী প্রতীকরূপে গুরুত্ব পেল। আর সকল নামাযীকে জামাআতবদ্ধ ও জমায়েত করার জন্য বিধিবদ্ধ হল আযান।

ইসলামী শরীয়তের একটি মাহাত্ম্য এই যে, তার বিভিন্ন ইবাদতে জামাআত ও ইজতিমা বিধিবদ্ধ রয়েছে। যা আসলে এক একটি সম্মেলন। যে সম্মেলনে মুসলিম নিয়মিতভাবে জমায়েত হয়। তাতে তারা এক অপরের অবস্থা জানতে পারে। একে অন্যকে উপদেশ দিতে পারে। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সলা-পরামর্শ করতে পারে। উপস্থিত সমস্যার সঠিক সমাধান অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে পরস্পর সহযোগিতা করতে পারে। এক সাথে বসে পরস্পর মত-বিনিময় করতে পারে।

জামাআতে উপস্থিত হয়ে অজ্ঞ ব্যক্তি ইসলামী জ্ঞান লাভ করতে পারে। দরিদ্র সাহায্য পেতে পারে। ঐক্যের মহামিলন দেখে মুসলিমের হৃদয় নরম হয়ে থাকে। প্রকাশ পায় ইসলামী শান-শওকত, সমতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা।

জামাআতে ভেঙ্গে চুরমার হয় বর্ণ-বৈষম্যের সকল প্রাচীর। একাকার হয় সকল জাত-পাত। আমীর-গরীব, আতরাফ-আশরাফ, বাদশা-ফকীরের কোন ভেদাভেদ নেই এখানে। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের মহান আদর্শের অভিব্যক্তি ঘটে এই জামাআতে।

সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, সুশৃঙ্খলতা এই জামাআতের মহান বৈশিষ্ট্য। সভ্য জাতির

আদর্শ শিক্ষা লাভ হয় এই পুনঃ পুনঃ ইজতিমায়।

জামাআতে উপস্থিত হয়ে একে অপরের দেখাদেখি আল্লাহর ইবাদতের জন্য প্রতিযোগিতামূলক মন-মানসিকতা সৃষ্টি হয় মুসলিমের।

জামাআতের এই মহা মিলনক্ষেত্রে ইসলামী সম্প্রীতির যে সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিবেশ পরিলক্ষিত হয়, তাতে সামাজিক জীবনের চলার পথে নিজেকে একাকী ও অসহায় বোধ হয় না। মনে জাগে খুশী, প্রাণে জাগে উৎফুল্লতা, ইবাদতে আসে মনোযোগ, উৎসাহ, উদ্দীপনা ও স্ফূর্তি।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। শান্তি মুসলিমের কাম্য। অপর ভায়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে উভয় মুসলিম এক অপরের জন্য শান্তি কামনা করে দুআ দিয়ে থাকে। 'আস্‌-সালামু আলাইকুম, অআলাইকুমুস সালাম' বলার মাধ্যমে আল্লাহর তরফ থেকে এবং উভয়ের হৃদয়-মনেও শান্তি লাভ হয় এই জামাআতে হাজির হলে।

জামাআতের মান ও গুরুত্ব

নামাজ জামাআত সহকারে আদায় করা ওয়াজেব। বিধায় বিনা ওজরে জামাআত ত্যাগ করা কাবীরাহ গোনাহ। মহান আল্লাহ বলেন,

(وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ)

অর্থাৎ, তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকূকারিগণের সাথে রুকূ কর। *(কুঃ ২/৪৩)*

বরং জামাআতে নামায না পড়লে নামায কবুল নাও হতে পারে। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আযান শোনে অথচ (মসজিদে জামাআতে) উপস্থিত হয় না, সে ব্যক্তির কোন ওজর ছাড়া (ঘরে নামায পড়লেও তার) নামাযই হয় না।" *(ইমাঃ, ইহিঃ, হাঃ ১/২৪৫, সতাঃ ৪২২নং)*

"যে ব্যক্তি মুআযযিনের (আযান) শোনে এবং কোন ওজর (ভয় অথবা অসুখ) তাকে জামাআতে উপস্থিত হতে বাধা না দেয়, তাহলে যে নামায সে পড়ে সে নামায কবুল হয় না।" *(আদাঃ ৫৫১নং)*

"যে কোন গ্রাম বা মরু-অঞ্চলে তিনজন লোক বাস করলে এবং সেখানে (জামাআতে) নামায কায়েম না করা হলে শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাআতবদ্ধ হও। অন্যথা ছাগ পালের মধ্য হতে নেকড়ে সেই ছাগলটিকে ধরে খায়, যে (পাল থেকে) দূরে দূরে থাকে।" *(আঃ, আদাঃ ৫১১, নাঃ, ইহিঃ, হাঃ ১/২৪৫, সতাঃ ৪২২নং)*

যারা নামাযের জামাআতে মসজিদে হাজির হয় না, মহানবী ﷺ তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

হযরত আবূ হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মুনাফিকদের পক্ষে সবচেয়ে ভারী নামায হল এশা ও ফজরের নামায। ঐ দুই নামাযের কি মাহাত্ম্য আছে, তা যদি তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও অবশ্যই তাতে উপস্থিত হত। আমার ইচ্ছা ছিল যে, কাউকে নামাযের ইকামত দিতে আদেশ দিই, অতঃপর একজনকে নামায পড়তেও

হুকুম করি, অতঃপর এমন একদল লোক সঙ্গে করে নিই; যাদের সাথে থাকবে কাঠের বোঝা। তাদের নিয়ে এমন সম্প্রদায়ের নিকট যাই, যারা নামাযে হাজির হয় না। অতঃপর তাদেরকে ঘরে রেখেই তাদের ঘরবাড়িকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিই।” *(বুঃ ৬৫৭, মুঃ ৬৫১নং)*

হযরত উসামা বিন যায়দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “লোকেরা জামাআত ত্যাগ করা হতে অবশ্য অবশ্যই বিরত হোক, নচেৎ আমি অবশ্যই তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেব।” *(ইমাঃ, সতাঃ ৪৩০নং)*

কোন অন্ধ মানুষকেও মহানবী ﷺ জামাআতে অনুপস্থিত থেকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দেননি। অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম ﷺ মহানবী ﷺ-এর দরবারে আরজ করলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! মসজিদে হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার মত আমার উপযুক্ত মানুষ নেই। তাছাড়া মদীনায় প্রচুর হিংস্র প্রাণী (সাপ-বিছা-নেকড়ে প্রভৃতি) রয়েছে। (মসজিদের পথে অন্ধ মানুষের ভয় হয়)। সুতরাং আমার জন্য ঘরে নামায পড়ার অনুমতি হবে কি?’ আল্লাহর নবী ﷺ তাঁর ওজর শুনে তাঁকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দিলেন। তিনি চলে যেতে লাগলে মহানবী ﷺ তাঁকে ডেকে বললেন, “কিন্তু তুমি কি আযান ‘হাইয়্যা আলাস স্বালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ’ শুনতে পাও।” তিনি উত্তরে বললেন, ‘জী হ্যাঁ।’ মহানবী ﷺ বললেন, “তাহলে তুমি (মসজিদে) উপস্থিত হও, তোমার জন্য কোন অনুমতি পাচ্ছি না।” *(মুঃ, আদাঃ ৫৫২, ৫৫৩নং)*

যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদলের সম্মুখেও জামাআত মাফ নয়। মহান আল্লাহ বিধিবদ্ধ করলেন স্বালাতে খওফ। *(কুঃ ৪/১০২)* জামাআত সহকারে নামায একান্ত বাঞ্ছিত ও জরুরী কর্তব্য না হলে ঐ ভীষণ সময়ে মরণের মুখে তিনি তা মাফ করতেন।

তদনুরূপ জামাআত বাঞ্ছিত বলেই প্রয়োজনে নামায জমা করে পড়া বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। মসজিদের পথে শত্রুর ভয় হলে, প্রচুর ঠান্ডা বা বৃষ্টি হলে অথবা সফরে থাকলে যোহর-আসর এবং মাগরেব-এশাকে জমা করে পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে জামাআতের ফযীলত লাভ করার জন্যই।

জামাআত ত্যাগ করা মুমিনের গুণ নয়; বরং তা মুনাফিকের গুণ। মহান আল্লাহ এদের গুণ বর্ণনা করে বলেন,

(... وَلاَ يَأْتُوْنَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنْفِقُوْنَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُوْنَ)

অর্থাৎ, ---ওরা (মুনাফেকরা) নামাযে শৈথিল্যের সাথে হাজির হয় এবং অনিচ্ছাকৃতভাবেই দান করে থাকে। *(কুঃ ৯/৫৪)*

বিশেষ করে এশা ও ফজরের নামায মুনাফেকের জন্য অধিক ভারী। আর একথা পূর্বে এক হাদীসে আলোচিত হয়েছে।

ইবনে উমার ﷺ বলেন, ‘আমরা যখন কোন লোককে ফজরের নামাযে অনুপস্থিত দেখতাম, তখন তার প্রতি কুধারণা করতাম।’ *(ত্বাব, ইআশাঃ, বাযঃ, মাযাঃ ২/৪০)*

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি কাল আল্লাহর সাথে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করতে

আনন্দবোধ করে তার উচিত, যেখানে আহবান করা হয় সেখানে (অর্থাৎ মসজিদে) ঐ নামাযগুলির হিফাযত করা। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর জন্য বহু হেদায়াতের পথ ও আদর্শ বিধিবদ্ধ করেছেন এবং ঐ (নামায)গুলি হেদায়াতের পথ ও আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা তোমাদের স্বগৃহে নামায পড়ে নাও; যেমন এই পশ্চাদ্‌গামী তার স্বগৃহে নামায পড়ে থাকে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ও তরীকা বর্জন করে ফেলবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ও তরীকা বর্জন করে ফেল, তাহলে তোমরা ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন (ওযু) করে এই মসজিদসমূহের কোন মসজিদের প্রতি (যেতে) প্রবৃত্ত হয়, আল্লাহ তার প্রত্যেক পদক্ষেপের পরিবর্তে একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করেন, এর দ্বারায় তাকে এক মর্যাদায় উন্নীত করেন ও এর দ্বারায় তার একটি পাপ হ্রাস করেন। আমরা দেখেছি যে, বিদিত কপটতার কপট (মুনাফিক) ছাড়া নামায থেকে কেউ পশ্চাতে থাকত না। আর মানুষকে দুটি লোকের কাঁধে ভর করে হাঁটিয়ে এনে কাতারে খাড়া করা হত।' *(মুঃ ৬৫৪নং)*

হযরত ওসমান বিন আফ্‌ফান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির মসজিদে থাকা অবস্থায় আযান হয়, অতঃপর বিনা কোন প্রয়োজনে বের হয়ে যায় এবং ফিরে আসার ইচ্ছা না রাখে, সে ব্যক্তি মুনাফিক।" *(ইমাঃ, সতাঃ ১৫৭নং)*

যারা আহবানকারী মুআযযেনের আযানে সাড়া দিয়ে জামাআতে উপস্থিত হয় না, কিয়ামতে তাদের বিশেষ অবস্থা ও শাস্তি রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

(يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ، خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَالِمُوْنَ)

অর্থাৎ, যেদিন পদনালী উন্মুক্ত করা হবে এবং ওদেরকে সিজদা করার জন্য আহবান করা হবে, কিন্তু ওরা তা করতে সক্ষম হবে না। হীনতাগ্রস্ত হয়ে ওরা ওদের দৃষ্টি অবনত করবে। অথচ যখন ওরা সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, তখন তো ওদেরকে সিজদা করতে আহবান করা হয়েছিল। *(কুঃ ৬৮/৪২-৪৩) (বুঃ ৪৯১৯ নং)*

এমন কি মসজিদে জামাআতে উপস্থিত থেকে মুআযযিনের আযান শুনেও যে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, সে আল্লাহর নবীর অবাধ্য ও নাফরমানরূপে পরিগণিত হয়। একদা মসজিদে আযান হলে এক ব্যক্তি সেখান থেকে উঠে চলে যেতে লাগল। সে মসজিদ থেকে বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আবূ হুরাইরা ﷺ তার দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। পরিশেষে তিনি বললেন, 'আসলে এ ব্যক্তি তো আবুল কাসেম ﷺ-এর নাফরমানী করল।' *(মুঃ ৬৫৫নং)* আর এ কথা বিদিত যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে, সে আসলে স্পষ্টরূপে ভ্রষ্ট হয়ে যায়।" *(কুঃ ৩৩/৩৬)*

অবশ্য যদি কেউ তার জরুরী কাজে; যেমন, প্রস্রাব-পায়খানা বা ওযূ করতে মসজিদের বাইরে যায়, তাহলে তা নাফরমানীর আওতাভুক্ত নয়। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ১২/২০০)*

আল্লাহর নবী ﷺ-এর সাহাবাগণও ফরয নামাযের জন্য জামাআতে উপস্থিত হওয়াকে

ওয়াজেব মনে করতেন।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, 'আমরা দেখেছি যে, বিদিত কপটতার কপট (মুনাফিক) ছাড়া (জামাআতে) নামায থেকে কেউ পশ্চাতে থাকত না।' *(মুসলিম ৬৫৪নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ, আবূ মূসা আশআরী, আলী বিন আবী তালেব, আবূ হুরাইরা, আয়েশা ও ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শোনে অথচ (মসজিদে জামাআতে) উপস্থিত হয় না, সে ব্যক্তির কোন ওজর ছাড়া (ঘরে নামায পড়লেও তার) নামাযই হয় না।' *(তিঃ ২১৭নং, যামাঃ)*

ইবনে আব্বাস ﷺ-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে ব্যক্তি রোযা রাখে, তাহাজ্জুদ পড়ে; কিন্তু জামাআত ও জুমআয় হাজির হয় না। উত্তরে তিনি বললেন, 'এ অবস্থায় মারা গেলে সে জাহান্নামবাসী হবে!' *(তিঃ ২১৮নং, এটির সনদ দুর্বল)*

আত্বা বিন আবী রাবাহ (রঃ) বলেন, 'আল্লাহর সৃষ্টি কোন শহর বা গ্রামবাসীর জন্য এ অনুমতি নেই যে, সে আযান শোনার পর জামাআতে নামায ত্যাগ করে।'

হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, 'কারো আম্মা যদি তাকে মায়া করে এশার নামায জামাআতে পড়তে বারণ করে, তাহলে সে তার ঐ বারণ শুনবে না।' *(বুঃ)*

আওযায়ী (রঃ) বলেন, 'জুমআহ ও জামাআত ত্যাগ করার ব্যাপারে পিতার আনুগত্য নেই, চাহে সে আযান শুনতে পাক, আর না-ই পাক।'

অবশ্য জেনে রাখা ভাল যে, যে ব্যক্তি জামাআত ছাড়াই নামায পড়ে, তার নামায শুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু জামাআত ত্যাগ করার জন্য সে (কাবীরা) গোনাহগার হয়। তবে তার ঐ নামায কবুল হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপার তো আল্লাহর কাছে। *(মারাঃ ১৭২পৃঃ)*

জামাআতের আসল মর্যাদা ছিল সলফে সালেহীনের কাছে। তাঁরা জামাআতের এত গুরুত্ব দিতেন যে, তা ছুটে গেলে অথবা নষ্ট হয়ে গেলে কেউ কেউ কেঁদে ফেলতেন। একে অপরকে দেখা করে সান্তনা দিতেন।

সাঈদ বিন আব্দুল আযীয জামাআত ছুটে গেলে কাঁদতেন।

হাতেম আল-আসাম্ম্ বলেন, 'একদা আমার এক নামাযের জামাআত ছুটে গেল। এর জন্য আবূ ইসহাক বুখারী আমাকে দেখা করতে এলেন। অথচ আমার কোন ছেলে মারা গেলে দশ হাজারেরও বেশী লোক আমাকে দেখা করতে আসত। কেন না, মানুষের নিকট দুনিয়ার মসীবতের তুলনায় দ্বীনের মসীবত নেহাতই হাল্কা।'

নামাযের জামাআত কোনক্রমেই তাঁদের নিকট কোন পার্থিব জিনিসের সমতুল্য ছিল না; যে তুচ্ছ জিনিসের পশ্চাতে আমরা অনেক ক্ষেত্রে লালসার নিরলস প্রচেষ্টা নিয়ে অপেক্ষমাণ থাকি। যার জন্য কখনো বা নামায যথা সময়ে পড়তে পারি না। কেউ বা তারই জন্য মূলেই নামায ত্যাগ করে বসে। ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কারবার, খেলাধূলা, সরগরম মজলিসে আজেবাজে গল্প, রাজনৈতিক পরিকল্পনা, সংবাদ ও সমীক্ষা প্রভৃতি নামাযের জামাআত; কখনো বা নামায নষ্ট করে ফেলে বর্তমান যুগের বহু সংখ্যক মানুষের!

একদা মাইমূন বিন মিহরান মসজিদে এলেন। দেখলেন, নামায শেষ হয়ে গেলে নামাযীরা

মসজিদ থেকে ফিরে গেছে। এ দেখে তিনি বললেন, 'ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিঊন! অবশ্যই আমার নিকট এই জামাআতের মর্যাদা ইরাকের রাজত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।'

ইউনুস বিন আব্দুল্লাহ বলেন, 'আমার কি হল যে, মুরগী নষ্ট হলে আমি তার জন্য দুঃখিত হব, অথচ নামায (জামাআত) নষ্ট হলে তার জন্য দুঃখিত হব না?'

সলফে সালেহীন অধীর আগ্রহে অপেক্ষার পর আযান শুনলে মসজিদে যাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করতেন। যাতে ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা ছুটে না যায়, তার বিশেষ খেয়াল রাখতেন।

সাঈদ বিন মুসাইয়েব বলেন, 'পঞ্চাশ বছর ধরে আমার নামাযের প্রথম তাকবীর ছুটেনি! আর পঞ্চাশ বছর ধরে নামাযে কোন মানুষের পিঠ দেখিনি।' অর্থাৎ, পঞ্চাশ বছর যাবৎ তিনি প্রথম কাতারেই নামায পড়েছেন!

অকী' বিন জার্রাহ বলেন, 'প্রায় সত্তর বছর ধরে আ'মাশের প্রথম তাকবীর ছুটে নি!'

ইবনে সামাআহ বলেন, 'যে দিন আমার আম্মা মারা যান, সে দিন ছাড়া চল্লিশ বছর ধরে আমার প্রথম তাকবীর ছুটে নি!' *(ফাযায়িলু অযামারাতুস স্বালাতি মাআল জামাআহ ৬পৃঃ)*

ইবরাহীম নাখয়ী বলেন, 'যখন কোন মানুষকে দেখবে, সে প্রথম তাকবীরের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করছে, তখন তুমি তার ব্যাপারে হাত ধুয়ে নাও।'

আব্দুল আযীয বিন মারওয়ান আদব শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর ছেলে উমারকে মদীনায় পাঠালেন। আর তার দেখাশোনা করার জন্য সালেহ বিন কায়সানকে চিঠি লিখলেন। তিনি তাকে নামায পড়তে বাধ্য করতেন। একদিন সে এক নামাযে পিছে থেকে গেলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তোমাকে আটকে রেখেছিল?' উমার বলল, 'আমার দাসী আমার চুল আঁচড়াচ্ছিল।' তিনি বললেন, 'ব্যাপার এত দূর গড়িয়ে গেল যে, তোমার চুল আঁচড়ানো তোমার নামাযকে প্রভাবান্বিত করে ফেলল?' এরপর সে কথা জানিয়ে তিনি তার আব্বা (আব্দুল আযীয)কে চিঠি লিখলেন। তা জেনে আব্দুল আযীয একটি দূত পাঠালেন এবং কোন কথা বলার আগেই সে দূত উমারের মাথা নেড়া করে দিল! *(সিআনুঃ ৫/ ১১৬)*

যে ব্যক্তি মসজিদে জামাআত সহকারে নামায পড়তে আসত না তাকে মক্কার আমীর আত্তাব বিন উসাইদ উমাবী ﷺ তার গর্দান উড়িয়ে দেওয়ার ধমকি দিতেন। *(গায়াতুল মারাম, ইয্যুদ্দীন হাশেমী ১/ ১৮- ১৯)*

হযরত আলী ﷺ প্রত্যহ রাস্তায় পার হওয়ার সময় 'আস্-স্বালাত, আস্-স্বালাত' বলে লোকেদেরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগাতেন। *(তারীখুল ইসলাম, যাহাবী ৬৫০পৃঃ)* যেমন আজও সঊদী আরবে আযান হলেই নির্দিষ্ট অফিসের নিযুক্ত লোক ঐ একই কথা বলে নামাযের জন্য দোকান-পাট বন্ধ করতে তাকীদ করে থাকে। তাতে মুসলিমরা সাথে সাথে দোকান বন্ধ করে মসজিদে যায়। আর মুনাফিক ও কাফেররা যায় নিজ নিজ বাসায়। আর নামাযের সময়টুকু বন্ধ থাকে সমস্ত দোকান-পাট।

বলাই বাহুল্য যে, তাঁদের ও আমাদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে বিরাট। তাঁদের নিকট নামাযের গুরুত্ব আমাদের তুলনায় অনেক বেশী। তাঁদের ছিল আগ্রহ, আশা ও অধিক সওয়াব লাভের

বাসনা। পক্ষান্তরে আমাদের মাঝে আছে পার্থিব প্রেম ও দুনিয়া লাভের কামনা। তাই আমরা নামাযের উপর দুনিয়াকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি, আমাদের নিকট গুরুত্ব পায় পার্থিব ভোগ-বিলাস ও তার জন্য কর্ম-ব্যস্ততা।

অবশ্য এ কথা বলা অত্যুক্তি নয় যে, আমাদের জামাআতে হাজির হয়ে নামায না পড়া আমাদের দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। আমাদের হৃদয়ে আল্লাহর সে তা'যীম নেই, আল্লাহর প্রতি সে প্রেম, ভক্তি ও ভয় নেই, তাঁর আদেশ ও অধিকার পালনে সে আগ্রহ ও উৎসাহ নেই, তাই আমরা এমন শৈথিল্য প্রদর্শন করতে লজ্জাও করি না।

জামাআতের ফযীলত ও মাহাত্ম্য

ওয়াজেব হওয়ার সাথে সাথে জামাআতের বিভিন্নমুখী কল্যাণ ও মাহাত্ম্য রয়েছে; যা জেনে জ্ঞানী নামাযীকে জামাআতে উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করতে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হওয়া উচিত।

জামাআতে হাজির হয়ে যারা আল্লাহর ঘর মসজিদ আবাদ রাখে, তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত; মহান আল্লাহ তাদের প্রশংসা করে বলেন,

(إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ، فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ)

অর্থাৎ, আসলে তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করে না। আর আশা করা যায়, তারাই হল হেদায়াত-প্রাপ্ত। *(কুঃ ৯/ ১৮)*

জামাআতে উপস্থিতি দোযখ ও মুনাফেকী থেকে মুক্তি দেয়; মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে ৪০ দিন জামাআতে নামায আদায় করবে এবং তাতে তাহরীমার তকবীরও পাবে, (সেই ব্যক্তির জন্য দুটি মুক্তি লিখা হবে; দোযখ থেকে মুক্তি এবং মুনাফেকী থেকে মুক্তি।" *(তিঃ, সতাঃ ৪০৪নং)*

জামাআতে উপস্থিত নামাযীদেরকে নিয়ে মহান আল্লাহ তাঁর ফিরিশ্তাসভায় গর্ব করেন। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই যে তোমাদের পালনকর্তা আসমানের দরজাসমূহের একটি দরজা খুলে তাঁর ফিরিশ্তামন্ডলীর কাছে তোমাদেরকে নিয়ে গর্ব করছেন; বলছেন, 'তোমরা আমার বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য কর, তারা এক ফরয (নামায) আদায় করেছে এবং অন্য এক ফরয আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে। *(আঃ, ইমাঃ ৮০১নং)*

মহান আল্লাহ জামাআতের নামায দেখে মুগ্ধ হন। মহানবী ﷺ বলেন, "জামাআতের নামাযে আল্লাহ মুগ্ধ হন।" *(আঃ, সিসঃ ১৬৫২নং)*

জামাআতে উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করলে একাকীর তুলনায় ২৫ থেকে ২৭ গুণ সওয়াব বেশী পাওয়া যায়। মহানবী ﷺ বলেন, "পুরুষের জামাআত সহকারে নামাযের মান একাকী নামাযের মান অপেক্ষা ২৭ গুণ অধিক।" *(বুঃ, মুঃ, প্রমুখ সজাঃ ৩৮-২০নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "একাকীর নামায অপেক্ষা জামাআতের নামায সাতাশ গুণ উত্তম।" *(বুখারী ৬৪৫নং, মুসলিম ৬৫০নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পুরুষের স্বগৃহে বা তার ব্যবসাক্ষেত্রে নামায পড়ার চেয়ে (মসজিদে) জামাআতে শামিল হয়ে নামায পড়ার সওয়াব পঁচিশ গুণ বেশি। কেন না, যে যখন সুন্দরভাবে ওযু করে কেবল মাত্র নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদের পথে বের হয় তখন চলামাত্র প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে তাকে এক-একটি মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং তার এক-একটি গোনাহ মোচন করা হয়। অতঃপর নামায আদায় সম্পন্ন করে যতক্ষণ সে নামাযের স্থানে বসে থাকে ততক্ষণ ফিরিশ্তাবর্গ তার জন্য দুআ করতে থাকে; 'হে আল্লাহ ওর প্রতি করুণা বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা কর। আর সে ব্যক্তি যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষা করে, ততক্ষণ যেন নামাযের অবস্থাতেই থাকে।" *(বুখারী ৬৪৭নং, মুসলিম ৬৪৯নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি নামাযের জন্য পরিপূর্ণরূপে ওযু করে কোন ফরয নামায পড়ার উদ্দেশ্যে যায় এবং তা লোকেদের সাথে অর্থাৎ জামাআত সহকারে অথবা মসজিদে পড়ে, আল্লাহ তার গোনাহসমূহ মাফ করে দেন।" *(মুঃ ২৩২নং)*

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি পরিপূর্ণরূপে ওযু করে কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে (মসজিদে) যায়, অতঃপর তা ইমামের সাথে আদায় করে সে ব্যক্তির পাপরাশি মাফ হয়ে যায়।" *(ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৪০১নং)*

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি স্বগৃহ থেকে ওযূ করে কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হয়, তার সওয়াব হল ইহরাম বাঁধা হাজীর মত।" *(আদাঃ ৫৫৮নং)*

"যে ব্যক্তি জামাআতে কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে (মসজিদে) যায়, সে ব্যক্তির সওয়াব হয় একটি হজ্জ করার মত এবং যে ব্যক্তি কোন নফল (চাশ্তের) নামায পড়ার জন্য পায়ে হেঁটে (মসজিদে) যায়, তার সওয়াব হয় নফল উমরাহ করার মত।" *(আঃ, বাঃ, ত্বাব, সজাঃ ৬৫৫৬নং)*

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি স্বগৃহে ওযূ করে ফরয নামায আদায় করার জন্য প্রত্যহ ৫ বার মসজিদে যায় এবং সে তাতে ঐ বিশাল সওয়াবের আশা রাখে, সে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন ৫টি করে; অর্থাৎ বছরে প্রায় ১৮০০টি হজ্জ করার সওয়াব লাভ করে! আর ৬০ বছরের জীবনে প্রায় ১ লক্ষ ৮ হাজার বার হজ্জ করা হয় একজন মসজিদ-ভক্ত নামাযীর! অতএব অনায়াসে সে ৬০ বছরেই যেন ১০৮০০০ বছরের জীবন লাভ করে থাকে। বরং এত বছর বাঁচলেও সে হয়তো প্রত্যেক বছর হজ্জ করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু জামাআতের ঐ নামায তাকে এত দীর্ঘ জীবন দান করে থাকে।

মহানবী ﷺ বলেন, "এই নামাযের জামাআতে অনুপস্থিত ব্যক্তি যদি জানত যে, তাতে উপস্থিত ব্যক্তির জন্য কত সওয়াব নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই সে হাতে-পায়ে হামাগুড়ি দিয়েও হাজির হত। *(ত্বাবঃ,সতাঃ ৪০৩নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরকে কি সেই কথা বলে দেব না; যার দরুন

আল্লাহ গোনাহসমূহকে মোচন করে দেন এবং মর্যাদা আরো উন্নত করেন?” সকলে বলল, ‘অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “কষ্টের সময় পরিপূর্ণ ওযু করা, মসজিদের দিকে অধিকাধিক পদক্ষেপ করা (চলা), আর এক নামাযের পর আগামী নামাযের অপেক্ষা করা। উপরন্তু এগুলোই হল প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কাজের ন্যায়, এগুলোই হল প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কাজের ন্যায়, এগুলোই হল প্রতিরক্ষা-বাহিনীর কাজের ন্যায়।” *(মাঃ, মুঃ ২৫১নং, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ, অনুরূপ অর্থে।)*

মহানবী ﷺ বলেন, “আজ রাত্রে আমার কাছে আমার প্রতিপালকের এক দূত এসে বললেন, ‘হে মুহাম্মাদ! আপনি জানেন কি, নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তামন্ডলী কি নিয়ে মতভেদ করছেন?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ, (তাঁরা মতভেদ করছেন) পাপমোচন, মর্যাদাবর্ধন, জামাআতে শামিল হওয়ার জন্য পদক্ষেপ, প্রচন্ড ঠান্ডার সময় পরিপূর্ণরূপে ওযূ এবং নামাযের অপেক্ষা নিয়ে। যে ব্যক্তি উক্ত কর্মসমূহ সম্পাদন করতে যত্নবান হবে, সে ব্যক্তির জীবন হবে কল্যাণময় এবং মরণ হবে কল্যাণময়। আর সে তার পাপ থেকে পবিত্র হয়ে সেই দিনকার মত নিষ্পাপ হবে, যেদিন তার মা তাকে ভূমিষ্ঠ করেছিল।” *(আঃ, তিঃ ৩২৩৩নং)*

এ ব্যাপারে আরো মাহাত্ম্য ‘মসজিদে যাওয়ার মাহাত্ম্য’ শিরোনামে দ্রষ্টব্য।

জামাআতে লোক যত বেশী হবে তত বেশী সওয়াব লাভ হবে নামাযীদের। মহানবী ﷺ বলেন, “---এক ব্যক্তির কোন অন্য ব্যক্তির সাথে জামাআত করে পড়া নামায একাকী পড়া নামায অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। অনুরূপ অন্য দুই ব্যক্তির সাথে জামাআত করে পড়া নামায এক ব্যক্তির সাথে জামাআত করে পড়া নামায অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। এইভাবে জামাআতের লোক সংখ্যা যত অধিক হবে ততই আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট অধিক প্রিয়।” *(আঃ, আদাঃ, নাঃ, ইখুঃ, ইহিঃ, হাঃ, সতাঃ ৪০৬নং)*

তিনি বলেন, “ ১ জনের ইমামতিতে ২ জনের নামায আল্লাহর নিকট একাকী ৪ জনের নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, ১ জনের ইমামতিতে ৪ জনের নামায আল্লাহর নিকট একাকী ৮ জনের নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এবং ১ জনের ইমামতিতে ৮ জনের নামায আল্লাহর নিকট একাকী ১০০ জনের নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।” *(বাঃ, বাযঃ, ত্বাবঃ, সজাঃ ৩৮৩৬নং)*

বিশেষ করে ফজর ও এশার নামায জামাআতে পড়ার পৃথক মাহাত্ম্য রয়েছে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “লোকে যদি আযান ও প্রথম কাতারের মাহাত্ম্য জানত অতঃপর তা লাভের জন্য লটারি করা ছাড়া কোন অন্য উপায় না পেত তাহলে লটারিই করত। আর তারা যদি (নামাযের জন্য মসজিদের প্রতি) সকাল-সকাল আসার মাহাত্ম্য জানত, তাহলে অবশ্যই তার জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর যদি এশা ও ফজরের নামাযের মাহাত্ম্য তারা জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে চলেও তারা উভয় নামাযে উপস্থিত হত।” *(বুঃ ৬১৫নং, মুঃ ৪৩৭নং)*

তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি এশার নামায জামাআতের সঙ্গে পড়ল, সে যেন অর্ধ রাত্রি (নফল) নামায পড়ল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়ল, সে যেন পুরো রাত্রিই নামায পড়ল।” *(মাঃ, মুঃ ৬৫৬নং, আদাঃ)*

মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের জামাআতের নামায একাকী নামাযের তুলনায় ২৫ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে। আর রাত্রি ও দিনের ফিরিশ্তা ফজরের নামাযে একত্রিত হন।”

উক্ত হাদীস বর্ণনার পর আবূ হুরাইরা বলেন, ‘তোমাদের ইচ্ছা হলে তোমরা পড়ে নাওঃ

(إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْداً)

অর্থাৎ, নিশ্চয় ফজরের নামাযে ফিরিশ্তা হাযির হয়। *(কুঃ ১৭/৭৮) (বুঃ ৬৪৮, নাঃ, সজাঃ ২৯৭৪নং)*

নবী ﷺ বলেন, “(ফজরের সময়) যে ব্যক্তি (স্বগৃহে) ওযু করে। অতঃপর মসজিদে এসে ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়ে। অতঃপর বসে (অপেক্ষা ক’রে) ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ে, সেই ব্যক্তির সেদিনকার নামায নেক লোকদের নামাযরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তার নাম পরম করুণাময় (আল্লাহর) প্রতিনিধিদলের তালিকাভুক্ত হয়।” *(ত্বাবঃ, সতাঃ ৪১৩নং)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ে, সে ব্যক্তি (সন্ধ্যা পর্যন্ত) আল্লাহর দায়িত্বে থাকে।” *(মুঃ ৬৫৭, তিঃ, ত্বাবঃ, সজাঃ ৬৩৪৩নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, অতঃপর সূর্যোদয় অবধি বসে আল্লাহর যিক্র করে তারপর দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ হয়।” বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ।” অর্থাৎ কোন অসম্পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব নয় বরং পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব। *(তিঃ, সতাঃ ৪৬১নং)*

হযরত আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “ইসমাঈলের বংশধরের চারটি মানুষকে দাসত্বমুক্ত করা অপেক্ষা ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিক্রকারী দলের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক প্রিয়। অনুরূপ চারটি জীবন দাসমুক্ত করার চেয়ে আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যিক্রকারী সম্প্রদায়ের সাথে বসাটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।” *(আদাঃ, সতাঃ ৪৬২নং)*

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ফজরের নামায জামাআতে পড়ার জন্য কয়েকটি জিনিস জরুরীঃ

১। আল্লাহর আযাবের ভয় এবং তার সওয়াবের লোভ মনের মাঝে স্থান দিতে হবে।

২। অবৈধ কাজে তো নয়ই; বরং বৈধ কাজেও বেশী রাত না জেগে আগে আগে ঘুমাতে হবে।

৩। জামাআত ধরার পাক্কা এরাদা হতে হবে।

৪। ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয় এমন অসীলা ব্যবহার করতে হবে; যেমন এলার্ম ঘড়ি, কোন সুহৃদ সাথী ইত্যাদি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, দুনিয়ার কাজের জন্য ফজরের আগেও উঠতে মানুষ অসুবিধা বোধ করে না, অথচ যত অসুবিধা বোধ করে আল্লাহর কাজে যথা সময়ে জাগতে। সুতরাং এমন মানুষের এমন অবহেলা তার ঈমানী দুর্বলতার পরিচয় নয় কি?

এখানে প্রসঙ্গতঃ ফজরের নামায যথা সময়ে না পড়ার যে বিধান, সে সম্পর্কিত একটি

ফতোয়া উল্লেখ করা সমীচীন বলে মনে করি।

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য প্রত্যেক নামায তার যথাসময়ে মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করা ওয়াজেব। আর প্রত্যেক সেই বিষয় থেকে দূরে থাকা জরুরী, যে বিষয় তাকে কোন নামায তার নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা থেকে বাধা দিতে পারে। বিশেষ করে ফজরের নামাযের জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত, যাতে ঘুমিয়ে থেকে জামাআত ছুটে না যায় বা তার সময় পার না হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ফজরের নামাযকে কোন মুসলিমের জন্য ভারী মনে করা উচিত নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "মুনাফিকের জন্য সবচেয়ে বেশী ভারী নামায হল, এশা ও ফজরের নামায। ঐ উভয় নামাযে কি রাখা আছে তা যদি ওরা জানতো তাহলে হাঁটু গেড়ে হলেও তার জামাআতে এসে উপস্থিত হত।" *(বুঃ, মুঃ, আঃ, আদাঃ, ইমাঃ)*

সুতরাং এমন সব উপায় ও অসীলা অবলম্বন করা উচিত, যাতে যথা সময়ে উঠে ফজরের নামায জামাআত সহকারে পড়া সহজ হয়। যেমন সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়া, বেশী রাত না জাগা, কাউকে জাগিয়ে দিতে অনুরোধ করা, এলার্ম ঘড়ি ব্যবহার করা, ইত্যাদি।

এত বেশী রাত জেগে কুরআন তেলাঅত বা কোন ইল্‌মী আলোচনা করাও বৈধ নয়, যার ফলে ফজরের নামায ছুটে যাওয়ার ভয় থাকে। সুতরাং টি,ভি-ভিসিআর দেখে, তাস খেলে অথবা অন্য কোন অবৈধ কারণে রাত জেগে ফজরের নামায নষ্ট করা যে কত বড় পাপের কাজ -তা অনুমেয়। পক্ষান্তরে যদি ইচ্ছা করে কেউ ফজরের আযান শুনেও না ওঠে, অথবা তাকে জাগিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও না ওঠে, পরন্তু যে জাগিয়ে দেয় তার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়, অথবা ইচ্ছা করেই ঘড়িতে এলার্ম ফজরের সময় না দিয়ে সূর্য উদয় হওয়ার পর ঠিক তার ডিউটির সময়ে দেয়, তাহলে এমন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট থেকে শাস্তির উপযুক্ত এবং শাসনকর্তৃপক্ষের নিকটেও শাস্তিযোগ্য।

আর ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা ওযরে ফজরের নামায সূর্য ওঠার পর আদায় করলেও যথাসময়ে নামায ত্যাগ করার জন্য (বহু উলামার ফতোয়া মতে) সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ, মহানবী ﷺ বলেন, "আমাদের ও তাদের (কাফেরদের) মাঝে চুক্তি হল নামায। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করবে সে কাফের হয়ে যাবে।" *(আঃ, আদাঃ, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ)* আর মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন, "নামাযীদের জন্য রয়েছে 'ওয়াইল' দোযখ; যে নামাযীরা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন।" *(সূরা মাঊন)* অর্থাৎ, যারা নামায যথাসময়ে আদায় করে না। *(দ্রঃ ফইঃ ১/৩৫২, ৩৬৫)*

অতএব গাফলতি ছাড়ুন এবং যে কোন প্রকারে ফজর ও অন্যান্য নামায যথাসময়ে আদায় করুন। আল্লাহ আমাদেরকে খাঁটি মুসলমান করুন এবং আমাদের নামায কবুল করে নিন। আমীন।

কোন্ জামাআতে সওয়াব বেশী?

১। জায়গার গুরুত্ব হিসাবে জামাআতের সওয়াব কম-বেশী হয়ে থাকে; যেমন মাসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী, বায়তুল মাকদেস, মসজিদে কুবা প্রভৃতি।

২। অমসজিদের তুলনায় মসজিদের জামাআতে সওয়াব বেশী। অবশ্য জনহীন মরুভূমীতে রুকূ-সিজদাহ ইত্যাদি পরিপূর্ণরূপে করলে তার সওয়াব ৫০ গুণ বেশী। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, জামাআতে পড়া নামায পঁচিশটি নামাযের সমতুল্য। আর যদি কেউ সেই নামায কোন জনশূন্য প্রান্তরে পড়ে এবং তার রুকু ও সিজদা পূর্ণরূপে আদায় করে, তবে ঐ নামায পঞ্চাশটি নামাযের সমমানে পৌঁছায়।" *(আদাঃ ৫৬০, সতাঃ ৪০৭নং)*

৩। বাসা থেকে মসজিদ যত দূরে হবে, পদক্ষেপ হিসাবে জামাআতের সওয়াব তত বেশী হবে। *(আদাঃ ৫৫৬নং)*

৪। জামাআতের লোকসংখ্যা যত বেশী হবে, তার সওয়াবও তত বেশী হবে।

৫। তাকবীরে তাহরীমা সহ পূর্ণ নামাযের জামাআতের সওয়াব কিছু অংশ বাদ যাওয়া নামাযের জামাআতের সওয়াব অপেক্ষা বেশী।

৬। নামায অনুযায়ীও জামাআতের সওয়াব কম-বেশী হয়ে থাকে। যেমন, ফজরের জামাআত এশার তুলনায় এবং এশার জামাআত অন্যান্য অক্তের জামাআতের তুলনায় সওয়াবে অধিক বেশী।

কার উপর এবং কোন্ নামাযের জামাআত ওয়াজেব?

স্বাধীন জ্ঞানসম্পন্ন মুসলিম পুরুষের জন্য সুস্থতা-অসুস্থতা, ঘরে-সফরে, বিপদে-নিরাপদে সর্বাবস্থায় যথাসাধ্য জামাআতে শামিল হয়ে নামায আদায় করা ওয়াজেব।

অবশ্য জামাআত কেবল ফরয নামাযের জন্য ওয়াজেব। এ ছাড়া (মুআক্কাদাহ ও গায়র মুআক্কাদাহ) সুন্নত এবং নফল নামাযের জন্য; যেমন সুনানে রাওয়াতেব, বিত্র, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, তাহিয়্যাতুল উযূ, তাহিয়্যাতুত ত্বাওয়াফ, স্বালাতুত তাসবীহ (?) স্বালাতুত তাওবাহ, ইশরাক, চাশ্ত, আওয়াবীন প্রভৃতি নামাযের জন্য জামাআত বিধিবদ্ধ নয়।

পক্ষান্তরে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নামায, ঈদ, ইস্তিস্কা ও তারাবীহর নামাযের জন্য জামাআত সুন্নত। যেমন কাযা ও তাহাজ্জুদের নামাযেও জামাআত চলে। আর এ সব কথা যথাস্থানে আলোচিত হবে ইন শাআল্লাহ।

আবার সাধারণ অতিরিক্ত নফল নামায জামাআত করে পড়া যায়। দলীল স্বরূপ দেখুন, বুখারী ১১৮৬ ও মুসলিম ৫৬৮নং হাদীস।

জামাআতে মহিলাদের অংশ গ্রহণ

(ঈদের নামায ছাড়া অন্য নামাযের জন্য) মহিলাদের মসজিদের জামাআতে শামিল হওয়ার চাইতে স্বগৃহে; বরং গৃহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অন্দর মহলে নামায পড়াই হল উত্তম। মহানবী ﷺ বলেন, "মহিলাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মসজিদ তার গৃহের ভিতরের কক্ষ।" *(আঃ, হাঃ ১/২০৯, বাঃ, সজাঃ ৩৩২৭নং)*

তিনি বলেন, "মহিলা স্বগৃহে থেকে তার রবের অধিক নিকটবর্তী থাকে।" *(ইখুঃ, ইহিঃ, ত্বাবঃ,*

সতাঃ ৩৩৯, ৩৪১নং)

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, “মহিলা তার ঘরে থেকে রবের ইবাদত করার মত ইবাদত আর অন্য কোথাও করতে পারে না।” *(ত্বাবঃ, সতাঃ ৩৪২নং)*

তিনি মহিলাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, “তোমাদের খাস কক্ষের নামায সাধারণ কক্ষে নামায অপেক্ষা উত্তম, তোমাদের সাধারণ কক্ষের নামায বাড়ির ভিতরে কোন জায়গায় নামায অপেক্ষা উত্তম এবং তোমাদের বাড়ির ভিতরের নামায মসজিদে জামাআতে নামায অপেক্ষা উত্তম।” *(আঃ, ত্বাব, বাঃ, সজাঃ ৩৮৪৪নং)*

উল্লেখ্য যে, সাহাবিয়া উম্মে হুমাইদ উক্ত হাদীস শোনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর বাড়ির সব চাইতে অধিক অন্দর ও অন্ধকার কামরাতে নামায পড়েছেন।

মহানবী ﷺ বলেন, “মহিলা হল গোপনীয় জিনিস। বাইরে বের হলে শয়তান তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে নির্নিমেষ তাকিয়ে দেখতে থাকে।” *(ত্বাব, ইহিঃ, ইখুঃ, সতাঃ ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২নং)*

এ তো ইবলীস জিনের কথা। পক্ষান্তরে বর্তমান যুগের দ্বীনহীন যুবকদল; যারা মহিলার জন্য হাজার শয়তান অপেক্ষা বেশী ক্ষতিকর, তাদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে গোপনে থাকা নারীর একান্ত কর্তব্য।

তবে যদি সে একান্ত মসজিদের জামাআতে শরীক হয়ে নামায পড়তে চায়, তাহলে তাতে অনুমতি আছে। অবশ্য এর জন্য কয়েকটি শর্ত আছে ঃ

১। মসজিদের পথে যেন (লম্পটদের) কোন অশুভ ফিতনার আশঙ্কা না থাকে।

২। মহিলা যেন সাদাসিধাভাবে পর্দার সাথে আসে। অর্থাৎ, সেজেগুজে প্রসাধন-সেন্ট্‌ লাগিয়ে না আসে। (নামাযীর লেবাস দ্রষ্টব্য।)

৩। এতে যেন তার স্বামীর অনুমতি থাকে।

স্বামীর জন্যও উচিত, যদি তার স্ত্রী মসজিদে যেতে অনুমতি চায়, তাহলে তাকে বাধা না দেওয়া। সাহাবাদের মহিলাগণ মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘মুমিন মহিলারা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ফজরের নামায পড়ার জন্য দেহে চাদর জড়িয়ে হাযির হত। অতঃপর নামায শেষ হলে তারা নিজ নিজ বাসায় ফিরে যেত, আবছা অন্ধকারে তাদেরকে কেউ চিনতে পারত না।’ *(বুঃ ৫৭৮, মুঃ, আদাঃ ৪২৩, তিঃ ১৫৩, নাঃ, ইমাঃ ৬৬৯নং)*

পরন্তু এতে মসজিদের দর্স ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করার উপকারিতাও রয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেন, “যদি তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের কাছে রাত্রে মসজিদে আসার অনুমতি চায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দাও।” *(বুঃ, মুঃ, আদাঃ, তিঃ, নাঃ)*

“আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করো না, যদিও তাদের ঘরই তাদের জন্য ভালো।” *(আঃ, আদাঃ ৫৬৭, হাঃ, সজাঃ ৭৪৫৮নং)*

“আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করো না, তবে তারা যেন খোশবূ ব্যবহার না করে সাদাসিধাভাবে আসে।” *(আঃ, আদাঃ, সজাঃ ৭৪৫৭নং)*

একদা আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

তিনি বলেছেন, “তোমাদের মহিলারা যদি মসজিদে যেতে অনুমতি চায়, তাহলে তাদেরকে বাধা দিও না।” এ হাদীস শোনার পর তাঁর ছেলে বিলাল বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমরা ওদেরকে বাধা দেব।’ এ কথা শুনে আব্দুল্লাহ তার মুখোমুখি হয়ে এমন গালি দিলেন, যেমনটি আর কোনদিন শোনা যায়নি। অতঃপর তিনি বললেন, ‘আমি তোকে আল্লাহর রসূল ﷺ থেকে খবর দিচ্ছি। আর তুই বলিস্, ‘আল্লাহর কসম! আমরা ওদেরকে বাধা দেব।’ *(মুঃ ৪৪২নং)*

অবশ্য সত্যপক্ষে ফিতনা, নজরবাজি বা নষ্টিফষ্টির আশঙ্কা থাকলে অথবা মহিলা সেজেগুজে বেপর্দায় কিংবা সেন্ট্ ব্যবহার করে যেতে চাইলে অভিভাবক বা স্বামী তাকে অনুমতি দেবে না।

অনুরূপভাবে যে মহিলারা জামাআতে হাযির হবে, তাদের জন্য জরুরী এই যে, তারা পুরুষদের ইমামের সালাম ফেরা মাত্র উঠে বাড়ি রওনা দেবে। যাতে পুরুষদের সাথে মসজিদের দরজায় বা পথে কোন প্রকার দেখা-সাক্ষাৎ না হয়। হযরত উম্মে সালামাহ বলেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে মহিলারা যখন ফরয নামাযের সালাম ফিরত, তখন তারা উঠে চলে যেত। আর রসূল ﷺ এবং তাঁর সাথে অন্যান্য নামাযীরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন। অতঃপর আল্লাহর রসূল উঠে গেলে পুরুষরা উঠে যেত।’ *(বুঃ ৮৬৬, ৮৭০নং)*

অবশ্য মহিলাদের পর্দাযুক্ত পৃথক মুসাল্লা ও পৃথক দরজা হলে সালাম ফেরামাত্র সত্বর উঠে যাওয়া জরুরী নয়। *(আনিঃ ১/২৮৭)*

প্রকাশ যে, মহিলা সঙ্গে তার ছোট শিশুকেও মসজিদে আনতে পারে। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, যাতে মসজিদের কোন জিনিস, কুরআন, পবিত্রতা আদি নষ্ট এবং নামাযীদের কোন প্রকার ডিষ্টার্ব না করে।

জামাআত তথা মসজিদে যাওয়ার কিছু আদব

মসজিদের বর্ণনায় মসজিদে যাওয়ার কিছু আদব আলোচিত হয়েছে। জামাআতের প্রাসঙ্গিকতায় এখানে আরো কিছু কথা উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি।

জামাআতে হাযির হওয়ার জন্য বাসা থেকে ওযূ করে বিনয়ের সাথে বের হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ, বাসা থেকে ওযূ করে নামাযে যাওয়ার কথা একাধিক হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।

এ সময়ে সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লেবাস পরিধান করা কর্তব্য। এ বিষয়ে মহান আল্লাহর আদেশ রয়েছে। *(কুঃ ৭/৩১)*

সর্বশরীর থেকে সর্বপ্রকার দুর্গন্ধ দূর করে নেওয়া জরুরী। লেবাসের, মুখের, ঘামের, কাঁচা পিঁয়াজ ও রসুন তথা বিড়ি-সিগারেটের দুর্গন্ধ দূর করে নেওয়া আবশ্যিক। যাতে সে গন্ধে ফিরিশ্তা ও পাশের নামাযী কষ্ট না পান এবং ঐ গন্ধ-ওয়ালার প্রতি নামাযীদের মনে মনে ঘৃণার উদ্রেক না হয়।

চলার পথে দুই হাতের আঙ্গুলসমূহের মাঝে খাঁজাখাঁজি করা নিষিদ্ধ। কারণ, নামাযের জন্য চলাও নামায পড়ার মতই গুরুত্ব রাখে। *(আদাঃ ৫৬২নং)*

চলার সময় নামাযী যেন এদিক-ওদিক না তাকায়, হৈ-হাল্লা না করে, নামাযের কিছু অংশ ছুটে গেলেও যেন না দৌড়ে। বরং ভদ্রতা ও গম্ভীরতার সাথে তাড়াহুড়ো না করে ধীরে-সুস্থে শান্তভাবে জামাআতে শামিল হয়।

চলার পথে আল্লাহর যিক্র মনে রাখা কর্তব্য। *(মসজিদে যাওয়ার আদব দ্রষ্টব্য)*

উল্লেখ্য যে, মসজিদে প্রবেশ করার সময় (জুমআর খুতবার আযান ছাড়া অন্য) আযান হলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আযানের উত্তর দিয়ে দরূদ-দুআ পড়ে তারপর তাহিয়্যাতুল মাসজিদ অথবা অন্য সুন্নত পড়বে নামাযী।

কি কি ওযরে জামাআত ছাড়া যায়?

পুরুষের জন্য জামাআত ওয়াজেব হলেও অসুবিধার ক্ষেত্রে তা ওয়াজেব থাকে না। মহান আল্লাহর বান্দার প্রতি দ্বীনের ব্যাপারে সাধারণ অনুগ্রহ এই যে, তিনি সাধ্যের অতীত কাউকে ভার অর্পণ করেন না। তিনি বলেন,

(مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ) (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ)

অর্থাৎ, আল্লাহ দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি। *(কুঃ ৫/৬, ২২/৭৮)*

বলা বাহুল্য, কোন অসুবিধা বা ওযর থাকার ফলে জামাআতে উপস্থিত না হতে পারলে নামাযীর কোন গোনাহ নেই। বরং সে যেখানেই নামায আদায় করে নেবে, সেখানেই তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। যে যে ওজরে জামাআত ত্যাগ করলে গোনাহ হয় না তা নিম্নরূপ ঃ-

১। ঝড়-বৃষ্টি, কাদা, প্রচন্ড শীত বা গ্রীষ্ম ঃ একদা ঠান্ডা ও বাতাসের রাতে ইবনে উমার ﷺ আযান দিলেন। তাতে তিনি বললেন, 'শোন! তোমরা স্বগৃহে নামায পড়ে নাও।' অতঃপর তিনি বললেন, বৃষ্টিময় ঠান্ডা রাত্রিতে আল্লাহর রসূল ﷺ মুআযযিনকে এই বলতে আদেশ দিতেন, 'শোন! তোমরা স্বগৃহে নামায পড়ে নাও।' *(বুঃ ৬৩২, মুঃ ৬৯৭নং)*

একদা ইবনে আব্বাস ﷺ এক বৃষ্টিময় জুমআর দিনে তাঁর মুআযযিনকে বললেন, 'তুমি যখন "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলবে তখন বল, তোমরা তোমাদের ঘরে নামায পড়ে নাও।' এ কথা শুনে লোকেরা যেন আপত্তিকর মনোভাব ব্যক্ত করল। কিন্তু তিনি বললেন, 'এরূপ তিনি করেছেন যিনি আমার থেকে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ, আল্লাহর রসূল ﷺ এরূপ করেছেন। আর আমিও তোমাদেরকে এই কাদা-পানিতে বের হওয়াকে অপছন্দ করলাম।' *(বুঃ ৯০১, মুঃ ৬৯৯নং)*

প্রকাশ থাকে যে, রাস্তা পিচ-ঢালা হলেও এবং ছাতার ব্যবস্থা থাকলেও নামাযী শরীয়তের এ অনুমতি গ্রহণ করতে পারে।

২। রোগ, অসুস্থতা ঃ যে রোগ ও অসুস্থতার দরুন মসজিদ আসতে খুবই কষ্ট হয়। মহানবী ﷺ যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখন বলেছিলেন, "আবূ বাক্রকে বল, সে যেন ইমামতি করে।" *(বুঃ ৬৭৮, মুঃ)*

অবশ্য অসুস্থতা সামান্য হলে; যেমন সর্দি, মাথা ব্যথা ইত্যাদির কারণে জামাআত মাফ নয়। পক্ষান্তরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, চিররোগা ও অথর্ব বৃদ্ধের জন্য জামাআত ওয়াজেব নয়।

৩। ভয়; পথিমধ্যে শত্রু, হিংস্র জন্তু বা জালেমের ভয়, ঘর ছেড়ে গেলে ঘর চুরি হওয়ার, কিংবা পাহারা ছেড়ে গেলে কোন সম্পদ-ফল-ফসল চুরি হওয়ার ভয়, ইজ্জত হানি হওয়ার ভয় অথবা অন্য কোন প্রকার বড় ক্ষতির আশঙ্কা হলে জামাআত মাফ।

৪। খাবার প্রস্তুত ও উপস্থিত থাকলে এবং খাবারের দিকে মন পড়ে থাকলে জামাআত মাফ। আগে খেয়ে তবেই নামাযে অংশগ্রহণ করতে হবে। মহানবী ﷺ বলেন, "নামাযের ইকামত হলে এবং রাতের খানা উপস্থিত হলে, আগে খানা খেয়ে নাও।" *(আঃ, বুঃ, মুঃ, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ, সজাঃ ৩৭৪নং)* ইবনে উমার ؓ বলেন, 'যখন কেউ খেতে বসবে তখন খাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত সে যেন তাড়াহুড়া না করে; যদিও নামাযের ইকামত হয়ে যায় তবুও।' *(বাঃ)*

৫। প্রস্রাব-পায়খানার চাপ; জামাআতের সময় প্রস্রাব অথবা পায়খানার তলব থাকলে জামাআত মাফ। কারণ, বেগ রাখা অবস্থায় নামায শুদ্ধ নয়। অতএব জামাআতেরও লাভ নেই। মহানবী ﷺ বলেন, খাবার সামনে রেখে নামায নেই এবং প্রস্রাব-পায়খানার বেগ থাকতেও নামায নেই।" *(মুঃ ৫৬০নং)*

৬। মুখে, দেহে বা লেবাসে দুর্গন্ধ থাকলে জামাআত মাফ। জামাআতের আগে কাঁচা পিঁয়াজ, রসুন, মুলা অথবা অনুরূপ বা তদপেক্ষা অধিক দুর্গন্ধময় বস্তু; যেমন বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি খেতে বাধ্য হলে মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি (কাঁচা) রসুন বা পিঁয়াজ খেয়েছে সে যেন আমাদের কাছ থেকে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে চলে যাক; বরং সে তার ঘরে গিয়ে বসুক।" *(মুঃ ৫৬৪নং)*

তদনুরূপ কসাই, মাছ-ওয়ালা, মুরগী-ওয়ালা, ভেঁড়া-ওয়ালা ইত্যাদি লোক; যাদের নিকট থেকে বিকট দুর্গন্ধে উপস্থিত নামাযী ও আল্লাহর ফিরিশ্তা কষ্ট পেয়ে থাকেন, তাদের জন্য জামাআতে উপস্থিত না হওয়াই উত্তম। অবশ্য যাদের কাছেই দুর্গন্ধ থাকে তারা যদি জামাআতে আসার পূর্বে তা দূর করে; যেমন মুখের গন্ধ সুগন্ধময় দাঁতের মাজন ব্যবহার করে ধুয়ে, দেহে দুর্গন্ধ থাকলে তা সাবান দিয়ে ধুয়ে, লেবাসের দুর্গন্ধ থাকলে লেবাস পাল্টে সুগন্ধ ব্যবহার করে মসজিদে আসতে পারে। *(হাশিয়াতুর রওযিল মুরবে', মারাঃ ১৮-৫পৃঃ)*

৭। ইমামের নামায বা ক্বিরাআত লম্বা হলে দুর্বল বা কর্মব্যস্ত মানুষের জন্য সেই ইমামের পশ্চাতে জামাআত মাফ। এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-কে বলল, আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! আমি অমুক (ইমামের) লম্বা নামাযের জন্য ফজরের জামাআতে হাযির হতে পারি না। ইবনে মাসউদ ؓ বলেন, আমি সেদিনকার মত আল্লাহর রসূল ﷺ-কে অন্য দিন উপদেশে অত বেশী রাগান্বিত হতে দেখিনি। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমাদের মধ্যে এমনও লোক আছে, যে (নামাযীদের মনে) বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে লোকেদের ইমামতি করবে সে যেন নামায হাল্কা করে পড়ে।---" *(মুঃ, মিঃ ১১৩২নং)*

৮। জামাআতের সময় ঘুমের চাপ সামালতে না পারলে। ঘুমিয়ে থাকলে জামাআত মাফ। কারণ মহানবী ﷺ বলেন, "নিদ্রা অবস্থায় কোন শৈথিল্য নেই। শৈথিল্য তো জাগ্রত অবস্থায়

হয়। সুতরাং যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন নামায পড়তে ভুলে যায় অথবা ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তার উচিত, স্মরণ হওয়া মাত্র তা পড়ে নেওয়া। কেন না, আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর আমাকে স্মরণ করার উদ্দেশ্যে তুমি নামায কায়েম কর।" *(কুঃ ২০/১৪, মুঃ, মিঃ ৬০৪নং)*

৯। ইজ্জত ঢাকার মত কারো লেবাস না থাকলে জামাআত মাফ। *(রওযাতুত ত্বালেবীন ১/৩৪৫-৩৪৬)*

১০। সফরে বের হয়ে সঙ্গী ছুটে যাওয়ার ভয় থাকলে জামাআত ত্যাগ করা চলে। *(মুগনী ২/৪৫৩)*

১১। মৃতব্যক্তির গোসল-কাফন নিয়ে ব্যস্ত থাকলে জামাআত ছাড়া চলে। কারণ সত্বর কাফন-দাফন করাও একটি জরুরী কাজ। *(সাজাঃ ১৮৬পৃঃ)*

১২। তায়াম্মুমকারী পানি পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলে ওযু করতে গিয়ে জামাআত ছুটলে দোষ নেই। এ ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করে নামায হবে না। যেমন জামাআত (অনুরূপ ঈদ, জানাযা, ইস্তিস্কা প্রভৃতি নামায) শেষ হতে চলল দেখেও পানি থাকতে তায়াম্মুম করে জামাআতে শামিল হয়ে নামায পড়লেও নামায হবে না। এ ক্ষেত্রে ওযূ করাই জরুরী; যদিও জামাআত ছুটে যায়। *(মবঃ ২৬/১০৮)*

১৩। অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে অথবা সমাজ তার শরয়ী বয়কট করলে জামাআত ত্যাগ করা বৈধ। যেমন হিলাল বিন উমাইয়া এবং মুরারাহ বিন রাবীর সাথে মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ বয়কট করলে তাঁরা স্বগৃহেই অবস্থান করেছিলেন। *(বুঃ ৪৪১৮নং)*

১৪। হযরত আবূ দারদা ﵁ বলেন, 'মানুষের দ্বীনী জ্ঞানের (ফিক্হের) একটি চিহ্ন এই যে, নামাযের সময় যদি কোন কিছু করা আশু ও জরুরী প্রয়োজন পড়ে তাহলে সে প্রথমে নিজের সেই প্রয়োজন সেরে নেয়, যাতে সে (চিন্তা ও ব্যস্ততা) থেকে নিজের হৃদয়কে মুক্ত ও খালি করে নামাযে অভিনিবেশ করতে পারে।' *(বুঃ)*

প্রকাশ যে, যে ব্যক্তি সত্যপক্ষে কোন ওজর থাকার ফলে জামাআতে উপস্থিত হতে অক্ষম হয়, কিন্তু সেই সাথে তার মন পড়ে থাকে জামাআতের প্রতি, জামাআতে হাজির না হতে পারার জন্য তার আন্তরিক পরিতাপ ও আফসোস থাকে, সে ব্যক্তি ঘরে নামায পড়লেও জামাআতের সওয়াব লাভ করবে। যেমন যে ব্যক্তি জামাআত ধরার আশায় নানা কর্মব্যস্ততার মাঝে শত চেষ্টার পর মসজিদে এসে দেখে যে জামাআত শেষ হয়ে গেছে, সে ব্যক্তিও গোনাহ থেকে বেঁচে যাবে এবং জামাআতের সওয়াব পাবে। যেহেতু নেক কাজ করার জন্য কেবল দৃঢ় সংকল্প হলেই এবং সে কাজ করতে সক্ষম না হলেও মহান আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে বান্দাকে তার সংকল্প ও চেষ্টার বিনিময় দান করে থাকেন।

মহানবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি স্বগৃহে সুন্দরভাবে ওযূ করে মসজিদে যায় এবং দেখে যে, (ইমাম সহ জামাআতের) লোকেরা নামায পড়ে নিয়েছে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাদের মতই সওয়াব দান করেন, যারা জামাআতে হাযির থেকে নামায পড়েছে। আর এতে তাদের কিঞ্চিৎ পরিমাণও সওয়াব কম হয় না।" *(আদাঃ ৫৬৪, নাঃ, হাঃ, সতাঃ ৪০৫নং)*

পক্ষান্তরে কোন সঠিক ওজরের কারণে মসজিদ আসতে না পারলেও ঘরে বসেই

জামাআতের সওয়াব লাভ হবে। মহানবী ﷺ বলেন, "বান্দা যখন অসুস্থ হয় অথবা সফর করে তখন আল্লাহ তার (আমল-নামায়) সেই আমলের সওয়াবই লিখে থাকেন, যে আমল সে সুস্থ ও ঘরে থাকা অবস্থায় করত।" *(আঃ, বুঃ, সজাঃ ৭৯৯নং)*

তবুক অভিযানের সফরে তিনি বলেন, "মদীনাতে এমন একটি গোষ্ঠী রয়েছে, যারা তোমাদের প্রত্যেক চলার পথে এবং প্রত্যেক অতিক্রম্য উপত্যকাতেই তোমাদের সাথে থাকে। তাদেরকে কোন ওজর আটকে রেখেছে।" অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তারা তোমাদের সওয়াবে শরীক আছে।" *(আঃ, বুঃ, মুঃ, আদাঃ, ইমাঃ, সজাঃ ২০৩৬নং)*

বলা বাহুল্য, ওজর মিথ্যা বা অজুহাত খোঁড়া হলে, মনের মধ্যে কোন প্রকার আলস্য বা ঢিলেমি থাকলে এবং সওয়াব লাভের কোন লোভ বা ইচ্ছা না থাকলে সওয়াব তো হবেই না, উল্টা গোনাহ হবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বাড়িতে ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে জামাআত করে ফরয নামায পড়লে মসজিদের জামাআত মাফ হয় না। *(মবঃ ১৭/৬৭)* যেমন পাশে মসজিদ থাকতে কর্মস্থলে সহকর্মীদের সাথে কর্মস্থলের ভিতরেই কোন রুমে জামাআত করে নামায পড়লে তা যথেষ্ট নয়। বরং মসজিদে উপস্থিত হওয়া জরুরী। *(ঐ ১৭/৫১-৫২)*

কতগুলো নামাযী হলে জামাআত হবে?

ইমাম ছাড়া কম পক্ষে একটি নামাযী হলে জামাআত গঠিত হবে; চাহে সে নামাযী জ্ঞানসম্পন্ন শিশু হোক অথবা মহিলা।

মহানবী ﷺ ইবনে আব্বাসকে নিয়ে জামাআত করে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়েছেন। *(বুঃ, মুঃ, আঃ, আসুঃ)* তিনি সফরে উদ্যত দুইজন লোককে বলেছিলেন, "নামাযের সময় উপস্থিত হলে তোমাদের একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।" *(বুঃ ৬৩০নং, মুঃ, নাঃ, দাঃ)*

নামাযের কতটুকু অংশ পেলে জামাআতের ফযীলত পাওয়া যায়?

নামাযের এক রাকআত ইমামের সাথে পেলে জামাআতের পূর্ণ ফযীলত পাওয়া যায়। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকআত নামায পেয়ে গেল, সে নামায পেয়ে গেল।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১৪১২নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি জুমআহ অথবা অন্য নামাযের এক রাকআত পেয়ে গেল, সে নামায পেয়ে গেল।" *(ইমাঃ ১১২৩নং)*

অবশ্য ইমামের সালাম ফিরার আগে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে নামাযের যেটুকু অংশ পাওয়া যায় সেটুকুকে ভিত্তি করে জামাআতে শামিল হওয়া যায়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "নামাযের ইকামত হয়ে গেলে তোমরা দৌড়ে এস না। বরং তোমরা স্বাভাবিকভাবে চলে

এস। আর তোমাদের মাঝে যেন স্থিরতা থাকে। অতঃপর যেটুকু নামায পাও তা পড়ে নাও এবং যা ছুটে যায় তা পুরা করে নাও।” *(মুঃ ৬০২)*

উল্লেখ্য যে, জামাআত করার মত লোক থাকলেও শেষ রাকআতে রুকূর পর বা শেষ তাশাহহুদে জামাআতে শামিল না হয়ে ইমামের সালাম ফিরার পর দ্বিতীয় জামাআত করা উত্তম নয়। উত্তম হল, ইমামের সালাম ফিরার আগে পর্যন্ত জামাআতে শামিল হওয়া। *(ফামুসাঃ ৭৬পৃঃ)*

কেউ কেউ বলেন, সঙ্গে জামাআত করার মত লোক থাকলে এবং ইমাম শেষ তাশাহহুদে থাকলে জামাআতে শামিল না হয়ে তাদের সালাম ফিরার পর নতুনভাবে জামাআত করে নামায পড়া উত্তম। কেননা, মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকআত নামায পেয়ে গেল, সে নামায পেয়ে গেল।” আর তার মানেই হল যে এক রাকআত পেল না বরং সিজদাহ বা তাশাহহুদ পেল, সে নামায পেল না। অতএব নতুন করে জামাআত করলে প্রথম থেকে জামাআত পাওয়া যাবে এবং পূর্ণ নামাযও পাওয়া যাবে। আর এটাই হবে উত্তম। *(ফাতাজামাঃ ৫০পৃঃ)* অতএব আল্লাহই ভালো জানেন।

মসজিদের জামাআত ছুটে গেলে

মসজিদের জামাআত ছুটে গেলে বা জামাআত শেষ হওয়ার পর মসজিদে এলে যদি অন্য লোক থাকে তাহলে তাদের সাথে মিলে একজন ইমাম হয়ে জামাআত করে নামায পড়বে।

যদি আর কোন লোকের উপস্থিতির আশা না থাকে, তাহলে অন্য মসজিদে জামাআত না হওয়ার ধারণা পাকা হলে সেখানে গিয়ে জামাআতে নামায পড়বে।

তা না হলে মসজিদে একাকী নামায পড়ার চাইতে বাড়িতে ফিরে গিয়ে নিজের পরিবার-পরিজনকে নিয়ে জামাআত করে নামায পড়া উত্তম। মহানবী ﷺ এরূপ করেছেন বলে প্রমাণ আছে। *(তামিঃ ১৫৫পৃঃ, সাজাঃ ৫৬পৃঃ)* অবশ্য বাড়িতে জামাআত করার মত লোক না থাকলে ফরয নামায বাড়ির চেয়ে মসজিদে পড়াই উত্তম। কারণ, নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়ার পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে এবং ফরয নামায মসজিদে পড়ার আদেশ আছে।

মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত

একই মসজিদে একই সময়ে দুটি জামাআত করা বৈধ নয়। কেননা তাতে জামাআত না হয়ে বিচ্ছিন্নতাই প্রকাশ পায়।

অবশ্য কোন মসজিদে নির্দিষ্ট ইমাম না থাকলে সেখানে প্রথম জামাআতের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় জামাআত দূষণীয় নয়।

যেমন পথের ধারে বা বাজারের মসজিদে বারবার জামাআত হওয়াও দোষাবহ নয়। বরং যারা যখন আসবে তারা তখনই জামাআত সহকারে নামায আদায় করে নিজ নিজ কাজে

বের হয়ে যাবে।

যেমন মসজিদ ছোট হওয়ার কারণে প্রথম জামাআতে বিরাট সংখ্যক মানুষের এক সাথে নামায পড়া সম্ভব না হলে, জামাআত শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় জামাআত করাও বৈধ।

মসজিদের নির্ধারিত ইমামের ইমামতিতে জামাআত শেষ হয়ে যাওয়ার পর জামাআত হওয়ার মত লোক মসজিদে এলে জামাআতের ফযীলত নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের দ্বিতীয় জামাআত করা বৈধ।

একদা জামাআত হয়ে গেলে এক ব্যক্তি মসজিদে এল। মহানবী ﷺ বললেন, "কে আছে যে এর জন্য সাদকাহ করবে? (এর সওয়াব বর্ধন করবে?)" এ কথা শুনে এক ব্যক্তি উঠে তার সাথে নামায পড়ল। *(আদাঃ, তিঃ, মিঃ ১১৪৬নং)*

হযরত আনাস ؓ এক মসজিদে এলেন। দেখলেন, সেখানে জামাআত হয়ে গেছে। তিনি সেখানে আযান-ইকামত দিয়ে জামাআত সহকারে নামায আদায় করলেন। *(বুঃ, ফবাঃ ২/১৫৪)*

অবশ্য এই সুবাদে কেউ যেন প্রথম জামাআতে উপস্থিত হওয়াতে ঢিলেমি না করে। কারণ, (কোন ওযর না থাকলে) আযান শোনামাত্র মসজিদে হাযির হওয়ার জন্য তৎপর হওয়া ওয়াজেব। *(ফামুসাঃ ৭৪পৃঃ)*

জামাআতের নামায দেরীতে হলে

আওয়াল-অক্তে একাকী নামায পড়ার চাইতে একটু দেরীতে জামাআত সহ নামায পড়া উত্তম। বিশেষ করে রাতের এশার নামায দেরীতে হলে একাকী আওয়াল অক্তে নামায পড়ে শুয়ে পড়া উত্তম নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "নামাযে সবচেয়ে সওয়াব বেশী তার, যাকে (মসজিদের পথে) হাঁটতে হয় বেশী। আর যে ব্যক্তি অপেক্ষা করে ইমাম ও জামাআতের সাথে পড়ে সে ব্যক্তির সওয়াব তার থেকে বেশী, যে (একাকী) নামায পড়ে নিয়ে ঘুমিয়ে যায়।" *(বুঃ ৬৫১নং)*

অবশ্য ইমাম যদি খুব ঢিলে হন এবং খুব দেরী করে নামায পড়েন, তাহলে তার নির্দেশ ভিন্ন। মহানবী ﷺ একদা আবূ যার্র ؓ-কে বললেন, "কি করবে তুমি, যখন এমন কিছু আমীর হবে, যারা যথা সময় থেকে নামায দেরী করে পড়বে?" আবূ যার্র বললেন, 'আমাকে আপনি কি আদেশ করেন? বললেন, "তুমি তোমার নামায যথাসময়ে পড়ে নাও। অতঃপর যদি সেই নামায তাদের সাথে পাও, তাহলে পুনরায় তাদের সাথে (জামাআতে) পড়ে নাও। এটা তোমার জন্য নফল হয়ে যাবে।" *(মুঃ, সুআঃ)*

ইমামতির বিবরণ

সর্বাঙ্গসুন্দর ইসলামের সুষ্ঠু এক বিধান হল জামাআত তথা তার পরিচালক একক ইমাম বা নেতার বিধান। ইমাম হলেন সমাজের নেতা। সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু জীবন-যাপন করার জন্য নেতার দরকার একান্ত। যিনি হবেন মুসলিমের সমাজ-কেন্দ্র মসজিদের ইমাম এবং তিনিই

হবেন ইসলামী-শরীয়ত ব্যাখ্যাতা তথা নির্দেশ প্রদানকারী। তিনি হবেন সকলের সকল কাজের আগে। তাঁর মুগ্ধকারী আখলাক-চরিত্র, আচার-ব্যবহার এবং সর্বপ্রকার আচরণে সমাজের জন্য দিক-নির্ণয়ক তারা। তিনি প্রচলিত 'মোল্লা' নন, তাঁর দৌড় মসজিদ পর্যন্তই নয়। বরং তাঁর দৌড় গোরের পরেও পরপারের সুখময় জীবন পর্যন্ত।

তিনি সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। তিনি মাননীয় ও অনুসরণীয়। তিনি সমাজ-সংস্কারক, সুপরামর্শদাতা, কল্যাণকামী ও শুভানুধ্যায়ী। তিনি ইসলামের বিশাল ইবাদত নামাযের নেতা, তিনিই জিহাদের ময়দানে প্রধান সেনাপতি।

ইমাম হওয়ার সর্বাধিক বেশী যোগ্য কে?

ইমামতির সবচেয়ে বেশী যোগ্য তিনি, যিনি কুরআনের হাফেয; যিনি (তাজবীদ সহ) ভালো কুরআন পড়তে পারেন। তাজবীদ ছাড়া হাফেয ইমামতির যোগ্য নয়। পূর্ণ হাফেয না হলেও যাঁর পড়া ভালো এবং বেশী কুরআন মুখস্থ আছে তিনিই ইমাম হওয়ার অধিক যোগ্য।

মহানবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তি হলে ওদের মধ্যে একজন ইমামতি করবে। আর ইমামতির বেশী হকদার সেই ব্যক্তি, যে তাদের মধ্যে বেশী ভালো কুরআন পড়তে পারে।" *(মুঃ, মিঃ ১১১৮নং)*

তিনি আরো বলেন, "লোকেদের ইমাম সেই ব্যক্তি হবে যে বেশী ভালো কুরআন পড়তে পারে। পড়াতে সকলে সমান হলে ওদের মধ্যে যে বেশী সুন্নাহ জানে, সুন্নাহর জ্ঞান সকলের সমান থাকলে ওদের মধ্যে যে সবার আগে হিজরত করেছে, হিজরতেও সকলে সমান হলে ওদের মধ্যে যার বয়স বেশী সে ইমাম হবে। আর কোন ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির জায়গায় তার বিনা অনুমতিতে ইমামতি না করে এবং না কেউ কারো ঘরে তার বসার জায়গায় তার বিনা অনুমতিতে বসে।" *(আঃ, মুঃ, মিঃ ১১১৭নং)*

উল্লেখ্য যে, সাধারণ নামাযীর মত ইমামতির জন্যও সুন্নতী লেবাস উত্তম। তবে মাথায় পাগড়ী, রুমাল বা টুপী হওয়া কিংবা মাথা ঢাকা ইমামতির জন্য শর্ত, ফরয বা জরুরী নয়। *(ফউঃ ১/৩৮৬, ৩৮৯)* সুতরাং যার মাথা ঢাকা আছে তার থেকে যার মাথা ঢাকা নেই, সে ভালো কুরআন পড়তে পারলে সেই ইমামতির হকদার।

যাদের ইমামতি বৈধ ও শুদ্ধ

এমন কতক লোক আছে যাদেরকে আপাতঃদৃষ্টিতে ইমামতির অযোগ্য মনে হলেও প্রকৃতদৃষ্টিতে তাদের ইমামতি বৈধ ও শুদ্ধ। অবশ্য শুরুতে একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি মনে রাখলে এ প্রসঙ্গে অনেক ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে যাবে। যে ব্যক্তির নামায শুদ্ধ, তার ইমামতিও শুদ্ধ এবং তার পিছনে মুক্তাদীর নামাযও শুদ্ধ। আর যার নামায শুদ্ধ নয়, তার ইমামতিও শুদ্ধ নয় এবং তার পিছনে মুক্তাদীর নামাযও শুদ্ধ নয়। *(মুমঃ ২/৩১৬-৩১৭)*

যারা ইমাম হওয়ার যোগ্য নয় বলে ধারণা হতে পারে অথচ (ইমামতির গুণাবলী বর্তমান

থাকলে) তারা আসলে তার যোগ্য এমন কিছু লোক নিম্নরূপ ঃ-

১। অন্ধ ঃ

অন্ধ মানুষের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও সব অন্ধ সমান নয়। সুতরাং যোগ্যতা থাকলে সে ইমাম হতে পারে। আল্লাহর রসূল ﷺ অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূমকে দু-দু বার মদীনার ইমাম বানিয়েছিলেন এবং তিনি লোকেদের নামাযের ইমামতি করেছেন। *(আঃ, আদাঃ, মিঃ ১১২ ১নং)*

২। ক্রীতদাস ঃ

ক্রীতদাস, যুদ্ধবন্দী দাস, মুক্তদাস, সাধারণ দাস, ভৃত্য, চাকর, বা রাখাল যোগ্য হলে তার ইমামতি শুদ্ধ এবং এমন আতরাফদের পশ্চাতে আশরাফদেরও নামায শুদ্ধ। মহানবী ﷺ যখন মদীনায় প্রথম প্রথম হিজরত করে এলেন, তখন মুহাজেরীনরা কুবার নিকটবর্তী উসবাহ নামক এক জায়গায় অবস্থান শুরু করলেন। সেখানে আবূ হুযাইফা ؓ-এর মুক্ত করা দাস সালেম ؓ লোকেদের ইমামতি করতেন। তাঁর সবার চাইতে বেশী কুরআন মুখস্থ ছিল। অথচ তাঁর পশ্চাতে মুক্তাদীদের মধ্যে হযরত উমার এবং আবূ সালামাও ছিলেন। *(বুঃ, ৬৯২, আদাঃ ৫৮৮নং, মিঃ ১১২৭নং)*

তদনুরূপ হযরত আয়েশা (রাঃ) এর মুক্ত করা দাস আবূ আম্‌র নামাযের ইমামতি করতেন। *(মুসনাদ ইমাম শাফেয়ী)* তাঁর যাকওয়ান নামক আর এক মুক্ত করা দাসও ইমামতি করতেন। *(মাঃ, ইআশাঃ ৭২১৫, ৭২১৬, ৭২১৭ নং)*

৩। মুসাফির ঃ

মুসাফিরের জন্য সফরে নামায জমা ও কসর করা সুন্নত হলেও এবং সে ইমামতি করার সময় নামায কসর করে পড়লেও তার পিছনে গৃহবাসীদের নামায শুদ্ধ। অবশ্য এ ক্ষেত্রে গৃহবাসীরা ঐ মুসাফির ইমামের সালাম ফিরার পর উঠে বাকী নামায পূরণ করে নেবে। অর্থাৎ, ইমাম ও মুক্তাদী মিলে ২ রাকআত হয়ে গেলে মুক্তাদীরা ইমামের সালাম ফিরার পর উঠে একা একা আরো বাকী ২ রাকআত পড়ে নেবে। আর সে নামায জমা করে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দারা তা করবে না।

৪। দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তি ঃ

দাঁড়াতে অক্ষম ব্যক্তির ইমামতি শুদ্ধ। তবে মুক্তাদীরাও (দাঁড়ানোর সময়) বসে নামায পড়বে। মহানবী ﷺ বলেন, “ইমাম এ জন্যই বানানো হয়েছে যে, তার অনুসরণ করা হবে। সুতরাং --- সে যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড় এবং যখন বসে নামায পড়বে তখন তোমরাও বসে নামায পড়। আর সে বসে থাকলে তোমরা দাঁড়াও না; যেমন পারস্যের লোকেরা তাদের সম্মানার্হ ব্যক্তিদের জন্য করে থাকে।” *(আঃ, মুঃ, আদাঃ, নাঃ, সজাঃ ২৩৫৬নং)*

কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বসে নামায পড়লে তাঁর পশ্চাতে সাহাবীগণ দাঁড়িয়েই নামায

পড়েছেন। এর ফলে উলামাগণ বলেন যে, ইমাম সাময়িক অসুবিধার কারণে বসে নামায পড়লে মুক্তাদীরাও বসে নামায পড়বে। নচেৎ, শেষ জীবনে বার্ধক্যজনিত কারণে বসে নামায পড়লে মুক্তাদীরা (দাঁড়ানোর সময়) দাঁড়িয়েই নামায পড়বে।

বলা বাহুল্য, তাঁর পূর্বেকার আমল মনসূখ নয়। কারণ, তাঁর আমল দ্বারা তাঁর আদেশ মনসূখ হয় না। তাছাড়া তাঁর পরবর্তীতে সাহাবাগণও ইমাম বসে নামায পড়লে বসেই নামায পড়েছেন। অবশ্য ঐ ক্ষেত্রে বসে নামায পড়া ওয়াজেব না বলে মুস্তাহাব বলা যেতে পারে। *(মিঃ ১১৩৯নং, ১/৩৫৭ আলবানীর টীকা সহ দ্রঃ)*

৫। তায়াম্মুমকারীঃ

যে ব্যক্তি ওযূ করতে না পেরে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে তার ইমামতি এবং তার পশ্চাতে যারা ওযূ করে নামায পড়ে তাদের নামায শুদ্ধ।

হযরত আম্র বিন আস ﵁ বলেন, যাতুস সালাসিল যুদ্ধ -সফরে এক শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হল। আমার ভয় হল যে, যদি গোসল করি তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। তাই আমি তায়াম্মুম করে সঙ্গীদেরকে নিয়ে (ইমাম হয়ে) ফজরের নামায পড়লাম। আমার সঙ্গীরা একথা নবী ﷺ -এর নিকটে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "হে আম্র! তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সঙ্গীদের ইমামতি করেছ?" আমি গোসল না করার কারণ তাঁকে বললাম। আরো বললাম যে, আল্লাহ তাআলার এ বাণীও আমি শুনেছি, তিনি বলেন, "তোমরা আত্মহত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড় দয়াশীল।" *(কুঃ ৪/২৯)*

একথা শুনে তিনি হাসলেন এবং আর কিছুই বললেন না। *(বুঃ, সঃআদাঃ ৩২৩নং, আঃ, হাঃ, দারাঃ, ইহিঃ)*

৬। কেবল মহিলাদের জন্য মহিলাঃ

মহিলা মহিলা নামাযীদের ইমামতি করতে পারে। উম্মে অরাকাহ বিন নাওফাল (রাঃ) মহানবী ﷺ-এর নির্দেশমতে তাঁর পরিবারের মহিলাদের ইমামতি করতেন। *(আদাঃ ৫৯১-৫৯২নং)*

অবশ্য এ ক্ষেত্রে মহিলা ইমাম মহিলাদের কাতার ছেড়ে পুরুষের মত সামনে একাকিনী দাঁড়াবে না। বরং কাতারের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে ইমামতি করবে। *(আরাঃ, মুহাল্লা ৩/১৭১-১৭৩)* আশেপাশে বেগানা পুরুষ না থাকলে সশব্দে তকবীর ও কিরাআত পড়বে। *(মবঃ ৩০/১১৩)*

৭। কেবল মহিলাদের জন্য পুরুষঃ

কোন পুরুষ কেবল মহিলা জামাআতের ইমামতি করতে পারে। তবে শর্ত হল, মহিলা যেন এগানা হয়, নচেৎ বেগানা হলে যেন একা না হয়, পরিপূর্ণ পর্দার সাথে একাধিক থাকে এবং কোন প্রকার ফিতনার ভয় না থাকে অথবা তার সঙ্গে যেন কোন এগানা মহিলা বা অন্য পুরুষ থাকে। *(মুমঃ ৪/৩৫২)*

একদা ক্বারী সাহাবী হযরত উবাই বিন কা'ব ﵁ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে আরজ করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! গতরাত্রে আমি একটি (অস্বাভাবিক) কাজ করেছি।' তিনি বললেন, "সেটা কি?" উবাই বললেন, 'কিছু মহিলা আমার ঘরে জমা হয়ে বলল, আপনি (ভালো ও বেশী) কুরআন পড়তে পারেন, আমরা পারি না। অতএব আপনি আজ আমাদের

ইমামতি করেন। তাদের এই অনুরোধে আমি তাদেরকে নিয়ে ৮ রাকআত এবং বিতর পড়েছি।' এ কথা শুনে মহানবী ﷺ চুপ থাকলেন। অর্থাৎ তাঁর এই নীরব থাকা এ ব্যাপারে তাঁর মৌনসম্মতি হয়ে গেল। *(ত্বাবঃ, আয়াঃ)*

৮। নাবালক কিশোর ঃ

জ্ঞানসম্পন্ন নাবালক কিশোরের জন্য যদিও নামায ফরয নয়, তবুও বড়দের জন্য ফরয-নফল সব নামাযেই তার ইমামতি শুদ্ধ।

আম্র বিন সালামাহ ৬-৭ বছর বয়সে লোকেদের ইমামতি করেছেন। আর তিনি ছিলেন সকলের মধ্যে বেশী কুরআনের হাফেয। *(বুঃ ৪৩০২, মুঃ, আদাঃ ৫৮৫নং)*

৯। জারজ ঃ

ব্যভিচারজাত সন্তানের কোন দোষ নেই। তার মা-বাপের দোষ তার ঘাড়ে আসতে পারে না। সুতরাং অন্যান্য দিকে যোগ্যতা থাকলে তার ইমামতি এবং তার পশ্চাতে নামায শুদ্ধ। *(মবঃ ১৯/১৪৭-১৪৮)*

১০। যে নফল বা ভিন্ন ফরয নামায পড়ছে ঃ

যে নফল নামায পড়ছে তার পিছনে ফরয নামায শুদ্ধ; যেমন তারাবীহর জামাআতে এশার নামায, অথবা আসরের জামাআতে যোহরের কাযা নামায অথবা কাযা নামায আদায়কারীর পিছনে ফরয নামায আদায় করা শুদ্ধ। এ ক্ষেত্রে ইমাম ও মুক্তাদীর নিয়ত ভিন্ন হলেও তা কোন দোষের নয়। যেহেতু জরুরী হল বাহ্যিক কর্মাবলীতে ইমামের অনুসরণ করা।

হযরত মুআয বিন জাবাল মহানবী ﷺ-এর সাথে এশার নামায পড়তেন। অতঃপর ফিরে গিয়ে নিজের গোত্রের লোকেদের ঐ নামাযই পড়াতেন। এক বর্ণনায় আছে যে, এ নামায তাঁর নফল হত এবং লোকেদের হত ফরয। *(বুঃ, মুঃ, শাফেয়ী, দারাঃ, বাঃ ৩/৮৬, মিঃ ১১৫০-১১৫১নং)*

১১। সম্মানিত থাকতে অপেক্ষাকৃত কম সম্মানিত লোকের ইমামতিঃ

সম্মানিত থাকতে অপেক্ষাকৃত কম সম্মানিত ব্যক্তির ইমামতি বৈধ। একদা আব্দুর রহমান বিন আওফের পশ্চাতে মহানবী ﷺ নামায পড়েছেন। *(মুঃ ২৭৪নং)*

যাদের ইমামতি শুদ্ধ নয়

১। পুরুষের জন্য মহিলা ঃ

পুরুষের জন্য মহিলার ইমামতি বৈধ ও শুদ্ধ নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "সে জাতি কোন দিন সফল হবে না, যে জাতি তাদের কর্মভার একজন মহিলাকে সমর্পণ করবে।" *(বুঃ, তিঃ, বাঃ)*

বলা বাহুল্য, মহিলা যত বড়ই যোগ্য হোক, মুক্তাদী নিজের ছেলে হোক অথবা অন্য কেউ হোক, স্বামী জাহেল এবং স্ত্রী কুরআনের হাফেয হোক তবুও কোন ক্ষেত্রেই মহিলা পুরুষের ইমামতি করতে পারে না। এটি পুরুষের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। *(ফউঃ ১/৩৮২)*

২। মুশরিক ও বিদআতীঃ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন ইবাদতে অন্য কোন সৃষ্টিকে শরীক করে, যেমন মাযার পূজা করে, মাযারে গিয়ে সিজদা, নযর-নিয়ায, মানত, কুরবানী, তওয়াফ প্রভৃতি নিবেদন করে, সেখানে সুখ-সমৃদ্ধি বা সন্তান চায়, সাহায্য প্রার্থনা করে, যে ব্যক্তি গায়বী (অদৃশ্যের খবর জানার) দাবী করে ও লোকের হাত বা ভাগ্য-ভবিষ্যত বলে দেয়, যে (কোন পশু বা পাখীর চামড়া, হাড়, লোম বা পালক দিয়ে, কোন গাছপালার শিকড় বা ফুল-পাতা দিয়ে, কারো কাপড়ের কোন অংশ দিয়ে, ফিরিশ্তা, জিন, নবী, সাহাবী, ওলী বা শয়তানের নাম লিখে অথবা বিভিন্ন সংখ্যার নকশা বানিয়ে, অথবা তেলেস্মাতি বিভিন্ন কারসাজি করে, নোংরা ও নাপাক কোন জিনিস দিয়ে) শির্কী তাবীয লিখে, যে ব্যক্তি দুই জনের মাঝে (বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে) প্রেম বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করার জন্য তাবীয করে, যোগ বা যাদু করে, এ শ্রেণীর ইমামের নামায শুদ্ধ নয়, ইমামতি শুদ্ধ নয় এবং তার পশ্চাতে নামাযও শুদ্ধ নয়। *(মবঃ ১৯/১৫৯, ২২/৮২, ২৪/৭৮, ৮৯, ২৬/৯৭, ২৮/৫৫)*

তদনুরূপ বিদআতী যদি বিদআতে মুকাফ্‌ফিরাহ বা এমন বিদআত করে যাতে মানুষ কাফের হয়ে যায়, তাহলে সে বিদআতীর পিছনে নামায শুদ্ধ নয়।

৩। ফাসেকঃ

ফাসেক হল সেই ব্যক্তি, যে অবৈধ, হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ করে এবং ফরয বা ওয়াজেব কাজ ত্যাগ করে; অর্থাৎ কাবীরা গোনাহ করে। যেমন, ধূমপান করে, বিড়ি-সিগারেট, জর্দা-তামাক প্রভৃতি মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে, অথবা সূদ বা ঘুস খায়, অথবা মিথ্যা বলে, অথবা (অবৈধ প্রেম) ব্যভিচার করে, অথবা দাড়ি চাঁছে বা (এক মুঠির কম) ছেঁটে ফেলে, অথবা মুশরিকদের যবেহ (হালাল মনে না করে) খায়, (হালাল মনে করে খেলে তার পিছনে নামায হবে না।) অথবা স্ত্রী-কন্যাকে বেপর্দা রেখে তাদের ব্যাপারে ঈর্ষাহীন হয়, অথবা মা-বাপকে দেখে না বা তাদেরকে ভাত দেয় না ইত্যাদি।

উক্ত সকল ব্যক্তি এবং তাদের অনুরূপ অন্যান্য ব্যক্তির পিছনে নামায মকরূহ (অপছন্দনীয়)। বিধায় তাকে ইমামরূপে নির্বাচন ও নিয়োগ করা বৈধ ও উচিত নয়।

কিন্তু যদি কোন কারণে বা চাপে পড়ে বাধ্য হয়েই তার পিছনে নামায পড়তেই হয়, তাহলে নামায হয়ে যাবে। *(মবঃ ৫/২৯০, ৩০০, ৬/২৫১, ১৫/৮০, ১৮/৯০, ১১১, ১৯/১৫২, ২২/৭৫, ৭৭, ৯২, ২৪/৭৮)*

সাহাবাগণের যামানায় সাহাবাগণ ফাসেকের পিছনে নামায পড়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ হাজ্জাজের পিছনে নামায পড়েছেন। *(বুঃ)* আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ মারওয়ানের পিছনে নামায পড়েছেন। *(মুঃ, আদাঃ, তিঃ)*

হযরত ওসমান ﷺ ফিতনার সময় যখন স্বগৃহ অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন উবাইদুল্লাহ বিন আদী বিন খিয়ার তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'আপনি জনসাধারণের ইমাম। আর আপনার উপর যে বিপদ এসেছে তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। ফিতনার ইমাম আমাদের নামাযের ইমামতি করছে; অথচ তার পশ্চাতে নামায পড়তে আমরা দ্বিধাবোধ করি।' তিনি বললেন, 'নামায হল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। সুতরাং লোকে ভালো ব্যবহার করলে তাদের

সাথেও ভালো ব্যবহার কর। আর মন্দ ব্যবহার করলে তাদের সাথে মন্দ ব্যবহার করা থেকে দূরে থাক।' *(বুঃ ৬৯৫, মিঃ ৬২৩নং)*

৪। ইমামতির বিনিময়ে অর্থগ্রহণকারী ব্যক্তি ঃ

ইমামতিকে যে অর্থকরী পেশা মনে করে ইমামতি করে; অর্থাৎ, কেবল পয়সার ধান্দায় ইমামতি করে, এমন ইমামের পশ্চাতে নামায মকরূহ।

আবূ দাঊদ বলেন, (ইমাম) আহমাদ এমন ইমামের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হলেন, যে বলে, 'আমি এত এত (টাকার) বিনিময়ে রমযানে তোমাদের ইমামতি করব।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাই। কে এর পেছনে নামায পড়বে?' *(মারাঃ ৯৯পৃঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, ইমামতির জন্য সৌজন্য সহকারে ইমামকে বেতন, ভাতা বা বিনিময় দেওয়া মুক্তাদীদের কর্তব্য। ইমামের উচিত, কোন চুক্তি না করা; বরং মুক্তাদীদের বিবেকের উপর যা পায় তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে ইমামতির দায়িত্ব পালন করা। পক্ষান্তরে জামাআতের উচিত, ইমামের এই দ্বীনদারীকে সস্তার সুযোগরূপে ব্যবহার না করা। বরং বিবেক, ন্যায্য ও উচিত মত তাঁর কালাতিপাতের ব্যবস্থা করে দেওয়া। যেমন উচিত নয় এবং আদৌ উচিত নয়, ইমাম সাহেবকে জামাআতের 'কেনা গোলাম' মনে করা।

৫। ক্বিরাআত ভুল যার ঃ

যে কুরআন পড়তে এমন ভুল পড়ে, যাতে মানে বদলে যায়, তার ইমামতি ও তার পিছনে যে ভালো কুরআন পড়তে পারে তার নামায শুদ্ধ নয়। *(ফউঃ ১/৩৬৯, মবঃ ২০/১৪৮)*

বলা বাহুল্য, ভুল ক্বিরাআতকারীর পিছনে ক্বারীর নামায শুদ্ধ নয়। তবে অক্বারীর নামায হয়ে যাবে। অবশ্য যদি কোন ক্বারী ভুল ক্বিরাআতকারীর পিছনে অজান্তে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে নেয়, তাহলে তার নামায হয়ে যাবে। *(সাজাঃ ১২১পৃঃ)*

সুতরাং যে সকল মসজিদে সস্তা দরে অক্বারী ইমাম রাখা হয়, সে সকল গ্রাম শহরের ক্বারীদের (যারা ইমাম অপেক্ষা ভালো কুরআন পড়তে পারে তাদের) নামাযের অবস্থা কি হবে তা মসজিদের মতওয়াল্লীদেরকে ভেবে দেখা দরকার।

৬। যাকে মুক্তাদীরা অপছন্দ করে ঃ

চরিত্রগত বা শিক্ষাগত কোন কারণে মুক্তাদীরা ইমামকে অপছন্দ করলে ইমামের নামায আল্লাহর দরবারে কবুল নয়। সুতরাং জেনেশুনে তার ইমামতি করা বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির নামায তাদের কান অতিক্রম করে না; পলাতক ক্রীতদাস, যতক্ষণ না সে ফিরে এসেছে, এমন স্ত্রী যার স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করেছে, (যতক্ষণ না সে রাজী হয়েছে), (অথবা যে স্ত্রী তার স্বামীর অবাধ্যাচরণ করেছে, সে তার বাধ্যা না হওয়া পর্যন্ত) এবং সেই সম্প্রদায়ের ইমাম, যাকে লোকে অপছন্দ করে।" *(তিঃ, ত্বাবা, হাঃ, সিসঃ ২৮৮, ৬৫০নং)*

অবশ্য ব্যক্তিগত কোন কারণে কেউ কেউ ইমামকে অপছন্দ করলে, দোষ নেই অথচ তাকে খামাখা কেউ অপছন্দ করলে অথবা বেশী সংখ্যক লোক পছন্দ এবং অল্প সংখ্যক

লোক অপছন্দ করলে কারো কোন ক্ষতি হয় না। অবশ্য ক্ষতি তার হয়, যে একজন নির্দোষ মানুষকে খামাখা অপছন্দ করে। তবুও জ্ঞানী ইমামের উচিত, যে জামাআতের অধিকাংশ লোক তাকে অপছন্দ করে, সে জামাআতের ইমামতি ত্যাগ করা এবং তার ইমামতিকে কেন্দ্র করে জামাআতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি না করা।

৭। সুন্নাহত্যাগী ঃ

যে মানুষ সুন্নাহর পাবন্দ নয়; সুন্নত নামায-রোযা ইত্যাদি ত্যাগ করে, নিশ্চয় সে মানুষ পরহেযগার ও ভালো লোক নয়। তবে সে যে পাপী তা কেউ বলতে পারে না। অতএব তার পিছনে নামায পড়তে কোন দোষ নেই। তদনুরূপ কোন বিতর্ক থাকার ফলে বা কোন সন্দেহের কারণে কেউ কোন সুন্নাহ ত্যাগ করলে; যেমন বুকের উপর হাত না বাঁধলে, রুকূর আগে-পরে রফয়ে য়্যাদাইন না করলে বা জোরে আমীন না বললেও তার পিছনে নামায পড়তে কোন দোষ নেই। *(মবঃ ২৫/৪৬)*

৮। পেশাব-ঝরা রোগী ঃ

যে ব্যক্তির সর্বদা পেশাব ঝরার রোগ আছে সে ব্যক্তির ইমামতি শুদ্ধ নয়। *(ফইঃ ১/৩৯৭)*

৯। বোবা ঃ

বোবার পিছনে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ। কিন্তু তাকে ইমাম করা যাবে না। যেহেতু সে তকবীর শুনাতে ও জেহরী নামাযে ক্বিরাআত করতে অক্ষম। *(মুমঃ ৪/৩২০)*

১০। জলদিবাজ ঃ

যে ব্যক্তি ঠকাঠক কাকের দানা খাওয়ার মত নামায পড়ে এবং পশ্চাতে মুক্তাদীরা তার অনুসরণ করতে সক্ষম হয় না, রুকূ ও সিজদা থেকে উঠে পিঠ সোজা করে না, তার নামায এবং তার পশ্চাতে মুক্তাদীদেরও নামায হয় না। *(মবঃ ১৫/৬৭)*

১১। বেওযূ ব্যক্তি ঃ

কোন ইমাম নাপাক বা বেওযূ অবস্থায় নামায পড়লে এবং সালাম ফিরার পর তা জানতে পারলে কেবল তার নামায বাতিল হবে এবং মুক্তাদীদের নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেবল ইমামই ঐ নামায পুনরায় পড়বে, মুক্তাদীরা নয়। *(আইঃ ১৪৭পৃঃ)* জেনেশুনে কোন বেওযূর পিছনে নামায হবে না।

১২। রেডিও-টিভির ইমাম ঃ

কোন পুরুষ অথবা মহিলা, সুস্থ অথবা অসুস্থ, ওজরে অথবা বিনা ওজরে রেডিও বা টিভির পিছনে দাঁড়িয়ে সম্প্রচারিত কোন মসজিদের ফরয অথবা নফল, জুমআহ অথবা অন্য যে কোন নামাযে তার ইমামের অনুসরণ করা বৈধ নয়। যদিও তাদের বাসা উক্ত মসজিদের পাশে হোক অথবা সামনে, উপরে হোক অথবা পিছনে। কোন অবস্থাতেই মসজিদে হাজির না হয়ে দূর থেকে কেবল শব্দ অথবা শব্দ ও ছবির অনুকরণ করে জামাআত পাওয়া যায় না।

(সাজাঃ ১৭৩পৃঃ)

ইমাম ও মুক্তাদীর দাঁড়াবার স্থান ও নিয়ম

মুক্তাদীর সংখ্যা হিসাবে ইমাম ও মুক্তাদীর দাঁড়ানোর নিয়ম-পদ্ধতি বিভিন্ন রকম।

১। ইমামের সাথে মাত্র একজন মুক্তাদী (পুরুষ বা শিশু) হলে উভয়ে একই সাথে সমানভাবে দাঁড়াবে; ইমাম বাঁয়ে এবং মুক্তাদী হবে ডানে। এ ক্ষেত্রে ইমাম একটু আগে এবং মুক্তাদী একটু পিছনে আগাপিছা হয়ে দাঁড়াবে না। ইবনে আব্বাস ﷺ-কে মহানবী ﷺ নিজের বরাবর দাঁড় করিয়েছিলেন। *(বুঃ ৬৯৭নং)* মৃত্যুরোগের সময় তিনি আবূ বাক্র ﷺ-এর বাম পাশে তাঁর বরাবর এসে বসেছিলেন। *(ঐ ১৯৮-নং)*

নাফে' বলেন, 'একদা আমি কোন নামাযে আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ-এর পিছনে দাঁড়ালাম, আর আমি ছাড়া তাঁর সাথে অন্য কেউ ছিল না। তিনি আমাকে তাঁর হাত দ্বারা তাঁর পাশাপাশি বরাবর করে দাঁড় করালেন।' *(মাঃ ১/১৫৪)* অনুরূপ বর্ণিত আছে হযরত উমার ﷺ কর্তৃকও।

এ জন্যই ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ গ্রন্থে উক্ত বিষয়ক পরিচ্ছেদ বাঁধার সময় বলেন, 'দুজন হলে (মুক্তাদী) ইমামের পাশাপাশি তার বরাবর ডান দিকে দাঁড়াবে।' *(বুঃ ৬৯৭, সিসঃ ২৫৯০ নং, ৬/১৭৫-১৭৬)*

জ্ঞাতব্য যে, একক মুক্তাদীর ইমামের ডানে দাঁড়ানো সুন্নত বা মুস্তাহাব। অর্থাৎ, যদি কেউ ইমামের বামে দাঁড়িয়ে নামায শেষ করে, তাহলে ইমাম-মুক্তাদী কারো নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। *(মুমঃ ৪/৩৭৫, সাজাঃ ১১১পৃঃ)*

২। মুক্তাদী ২ জন বা তার বেশী (পুরুষ) হলে ইমামের পশ্চাতে কাতার বাঁধবে।

জাবের ﷺ বলেন, একদা মহানবী ﷺ মাগরেবের নামায পড়ার জন্য দাঁড়ালেন। এই সময় আমি এসে তাঁর বাম দিকে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে ঘুরিয়ে তাঁর ডান দিকে দাঁড় করালেন। ইতিমধ্যে জাব্বার বিন সাখ্র ﷺ এলেন। তিনি তাঁর বাম দিকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি আমাদের উভয়ের হাত ধরে ধাক্কা দিয়ে তাঁর পশ্চাতে দাঁড় করিয়ে দিলেন। *(মুঃ, আদাঃ, মিঃ ১১০৭নং)*

উল্লেখ্য যে, দুই জন মুক্তাদী যদি ইমামের ডানে-বামে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তাহলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। *(মুমঃ ৪/৩৭০)* নামায হয়ে যাবে, কারণ ইবনে মাসঊদ আলক্বামাহ ও আসওয়াদের মাঝে দাঁড়িয়ে ইমামতি করেছেন এবং তিনি নবী ﷺ-কে ঐরূপ দাঁড়াতে দেখেছেন। *(আদাঃ, ইগঃ ৫৩৮-নং)* অবশ্য মহানবী ﷺ-এর সাধারণ সুন্নাহ হল, তিন জন হলে একজন সামনে ইমাম এবং দুই জনের পিছনে কাতার বাঁধা। পক্ষান্তরে আগে-পিছে জায়গা না থাকলে তো এক সারিতে দাঁড়াতে বাধ্যই হবে।

৩। মুক্তাদী একজন মহিলা হলে (সে নিজের স্ত্রী হলেও) ইমাম (স্বামীর) পাশাপাশি বরাবর না দাঁড়িয়ে তার পিছনে দাঁড়াবে। *(আদাবুয যিফাফ, আলবানী ৯৬পৃঃ দ্রঃ)*

৪। মুক্তাদী দুই বা ততোধিক পুরুষ হলে এবং একজন মহিলা হলে, ইমামের পিছনে

পুরুষরা কাতার বাঁধবে এবং মহিলা সবশেষে একা দাঁড়াবে।

একদা হযরত আনাস ﷺ-এর ঘরে আল্লাহর রসূল ﷺ ইমামতি করেন। আনাস ﷺ ও তাঁর ঘরের এক এতীম দাঁড়ান নবী ﷺ-এর পিছে এবং তাঁর আম্মা দাঁড়ান তাঁদের পিছে (একা)। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১১০৮-১১০৯নং)*

৫। মুক্তাদী একজন শিশু ও একজন বা একাধিক পুরুষ হলে শিশুও পুরুষদের কাতারে শামিল হয়ে দাঁড়াবে।

৬। মুক্তাদী দুই বা দুয়ের অধিক পুরুষ, শিশু ও মহিলা হলে, ইমামের পিছনে পুরুষরা, অতঃপর শিশুরা এবং সবশেষে মহিলারা কাতার বাঁধবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "পুরুষদের শ্রেষ্ঠ কাতার হল প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হল সর্বশেষ কাতার। আর মহিলাদের শ্রেষ্ঠ কাতার হল সর্বশেষ কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হল প্রথম কাতার।" *(মুঃ, আঃ, সুআঃ, মিঃ ১০৯২নং)*

প্রকাশ থাকে যে, শিশু ছেলেদের পৃথক কাতার করার কোন সহীহ দলীল নেই। তাই শিশু ছেলেরাও পুরুষদের সঙ্গে কাতার করতে পারে। *(তামিঃ ২৮৪পৃঃ)*

৭। ইমামের সামনে কাতার বেঁধে নামায হয় না। অবশ্য ভিঁড়ের সময় ইমামের সামনে ছাড়া কোন দিকে জায়গা না থাকলে নিরুপায় অবস্থায় নামায হয়ে যাবে। *(মুমঃ ৪/৩৭২-৩৭৩)*

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, জুমআহ ও ঈদের নামাযের জামাআতে যদি এত ভিঁড় হয় যে সিজদার জন্য জায়গা না পাওয়া যায়, তাহলে সামনের মুসল্লীর পিঠে সিজদা করে নামায সম্পন্ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জায়গা নেই বলে অপেক্ষা করে দ্বিতীয় জামাআত কায়েম করা যাবে না। একদা হযরত উমার বিন খাত্তাব ﷺ খুতবায় বলেন, 'ভিঁড় বেশী হলে তোমাদের একজন যেন অপরজনের পিঠে সিজদা করে।' *(আঃ ১/৩২, বাঃ ৩/১৮২-১৮৩, আরাঃ ৫৪৬৫, ৫৪৬৯নং, তামিঃ ৩৪১পৃঃ)*

৮। ইমামের নিকটবর্তী দাঁড়াবে জ্ঞানী লোকেরা। যাতে তাঁরা ইমামের কোন ভুল চট্ করে ধরে দিতে পারেন এবং ইমাম নামায পড়াতে পড়াতে কোন কারণে নামায ছাড়তে বাধ্য হলে তাঁদের কেউ জামাআতের বাকী কাজ সম্পন্ন করতে পারেন। বলা বাহুল্য, সাধারণ মূর্খ মানুষদের ইমামের সরাসরি পশ্চাতে দাঁড়ানো উচিত নয়। জ্ঞানী (আলেম-হাফেয-ক্বারী) মানুষদের জন্য ইমামের পার্শ্ববর্তী জায়গা ছেড়ে রাখা উচিত।

মহানবী ﷺ বলেন, "সেই লোকদেরকে আমার নিকটবর্তী দাঁড়ানো উচিত, যারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোক। অতঃপর তারা যারা তাদের চেয়ে কম জ্ঞানের। অতঃপর তারা যারা তাদের থেকে কম জ্ঞানের। আর তোমরা বাজারের ফালতু কথা (হৈচৈ) থেকে দূরে থাক।" *(মুঃ, আঃ, আদাঃ, তিঃ, মিঃ ১০৮৯নং)*

৯। সামনের কাতারে জায়গা থাকতে পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়লে নামায হয় না।

এক ব্যক্তি কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে নামায পড়লে মহানবী ﷺ তাকে নামায ফিরিয়ে পড়তে বললেন। *(আদাঃ ৬৮২নং, তিঃ, ইমাঃ)*

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি কাতারের পিছে একা নামায পড়ে, সে যেন নামায ফিরিয়ে পড়ে।"

(ইহিঃ)

অতএব যদি কোন ব্যক্তি জামাআতে এসে দেখে যে, কাতার পরিপূর্ণ, তাহলে সে কাতারে কোথাও ফাঁক থাকলে সেখানে প্রবেশ করবে। নচেৎ সামান্যক্ষণ কারো অপেক্ষা করে কেউ এলে তার সঙ্গে কাতার বাঁধা উচিত। সে আশা না থাকলে বা জামাআত ছুটার ভয় থাকলে (মিহরাব ছাড়া বাইরে নামায পড়ার সময়) যদি ইমামের পাশে জায়গা থাকে এবং সেখানে যাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে এবং এ সব উপায় থাকতে পিছনে একা দাঁড়াবে না।

পরন্তু কাতার বাঁধার জন্য সামনের কাতার থেকে কাউকে টেনে নেওয়া ঠিক নয়। এ ব্যাপারে যে হাদীস এসেছে তা সহীহ ও শুদ্ধ নয়। *(যজাঃ ২২৬১নং)* তাছাড়া এ কাজে একাধিক ক্ষতিও রয়েছে। যেমন; যে মুসল্লীকে টানা হবে তার নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হবে, প্রথম কাতারের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে, কাতারের মাঝে ফাঁক হয়ে যাবে, সেই ফাঁক বন্ধ করার জন্য পাশের মুসল্লী সরে আসতে বাধ্য হবে, ফলে তার জায়গা ফাঁক হবে এবং শেষ পর্যন্ত প্রথম বা সামনের কাতারের ডান অথবা বাম দিককার সকল মুসল্লীকে নড়তে-সরতে হবে। আর এতে তাদের সকলের একাগ্রতা নষ্ট হবে। অবশ্য হাদীস সহীহ হলে এত ক্ষতি স্বীকার করতে বাধা ছিল না।

তদনুরূপ ইমামের পাশে যেতেও যদি অনুরূপ ক্ষতির শিকার হতে হয়, তাহলে তাও করা যাবে না।

ঠিক তদ্রূপই জায়গা না থাকলেও কাতারের মুসল্লীদেরকে এক এক করে ঠেলে অথবা সরে যেতে ইঙ্গিত করে জায়গা করে নেওয়াতেও ঐ মুসল্লীদের নামাযের একাগ্রতায় বড় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সুতরাং এ কাজও বৈধ নয়।

বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে সঠিক ফায়সালা এই যে, সামনে কাতারে জায়গা না পেলে পিছনে একা দাঁড়িয়েই নামায হয়ে যাবে। কারণ, সে নিরুপায়। আর মহান আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে ভার দেন না। *(লিবামাঃ ২২৭পৃঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, মহিলা জামাআতের মহিলা কাতারে জায়গা থাকতে যে মহিলা পিছনে একা দাঁড়িয়ে নামায পড়বে তারও নামায পুরুষের মতই হবে না। *(মুমঃ ৪/৩৮৭)* পক্ষান্তরে পুরুষদের পিছনে একা দাঁড়িয়ে মহিলার নামায হয়ে যাবে।

১০। ইমাম মুক্তাদী থেকে উঁচু জায়গায় দাঁড়াতে পারে না। কারণ, মহানবী ﷺ কর্তৃক এরূপ দাঁড়ানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। *(সআদাঃ ৬১০-৬১১, হাঃ, মিঃ ১৬৯২, সজাঃ ৬৮৪২নং)*

একদা হুযাইফা ﷺ মাদায়েনে একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে লোকেদের ইমামতি করতে লাগলেন। তা দেখে আবূ মাসউদ ﷺ তাঁর জামা ধরে টেনে তাঁকে নিচে নামিয়ে দিলেন। নামাযের সালাম ফেরার পর তিনি হুযাইফাকে বললেন, 'আপনি কি জানেন না যে, এরূপ দাঁড়ানো নিষিদ্ধ?' তিনি বললেন, 'জী হ্যাঁ, যখনই আপনি আমাকে টান দিলেন, তখনই আমার মনে পড়ে গেল।' *(আদাঃ ৫৯৭নং, ইহিঃ)*

অবশ্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ানো যায়। যেমন নবী

মুবাশ্‌শির ﷺ মিম্বরের উপর খাড়া হয়ে নামায পড়ে সাহাবাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। *(বুঃ ৩৭৭নং, মুঃ)* আর এই হাদীসকে ভিত্তি করেই উলামাগণ বলেন, মিম্বরের এক সিড়ি পরিমাণ (প্রায় এক হাত) মত উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ইমামতি করলে দোষাবহ নয়। *(মারাসাঃ ১০০পৃঃ, মুমঃ ৪/৪২৪-৪২৬)*

পক্ষান্তরে মুক্তাদী ইমাম থেকে উঁচু জায়গায় দাঁড়াতে পারে। হযরত আবূ হুরাইরা নিচের ইমামের ইক্তেদা করে মসজিদের ছাদের উপর জামাআতে নামায পড়েছেন। *(শাফেয়ী, বাঃ, বুঃ তা'লীক)*

১১। প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার পৃথক মাহাত্ম্য আছে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "লোকেরা যদি আযান ও প্রথম কাতারে নিহিত মাহাত্ম্য জানত, তাহলে তা অর্জন করার জন্য লটারি করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় না পেলে তারা লটারিই করত।" *(বুঃ৬১৫নং, মুঃ৪৩৭নং)*

তিনি বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ্‌ প্রথম কাতার ও সামনের কাতারসমূহের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তাগণ তাদের জন্য দুআ করে থাকেন।" *(আঃ, সতাঃ৪৮-৯নং)*

একদা তিনি সাহাবাদেরকে পশ্চাদ্‌পদ হতে দেখে বললেন, "তোমরা অগ্রসর হও এবং আমার অনুসরণ কর। আর তোমাদের পিছনের লোক তোমাদের অনুসরণ করুক। এক শ্রেণীর লোক পিছনে থাকতে চাইবে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে (নিজ রহমত থেকে) পিছনে ফেলে দেবেন।" *(মুঃ, মিঃ ১০৯০নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন সম্প্রদায় প্রথম কাতার থেকে পিছনে সরে আসতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে পশ্চাদ্বর্তী করে দেবেন।" (অর্থাৎ, জাহান্নামে আটকে রেখে সবার শেষে জান্নাত যেতে দেবেন, আর সে প্রথম দিকে জান্নাত যেতে পারবে না।) *(আউনুল মা'বূদ ২/২৬৪নং, আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫০৭নং)*

১২। প্রথম কাতারে ডান দিকের জায়গা অপেক্ষাকৃত উত্তম। সাহাবী বারা' বিন আযেব বলেন, 'আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ডান দিকে দাঁড়াবার চেষ্টা করতাম। যাতে তিনি আমাদের দিকে মুখ করে ফিরে বসেন।' *(মুঃ ৭০৯, আদাঃ ৬১৫নং)*

১৩। ইমামের ডানে-বামে লোক যেন সমান-সমান হয়। অতএব কাতার বাঁধার সময় তা খেয়াল রাখা সুন্নত। যেহেতু ২ জন মুক্তাদী হলে এবং আগে-পিছে জায়গা না থাকলে একজন ইমামের ডানে ও অপরজন বামে দাঁড়াতে হয়। তাছাড়া ইমামের কাছাকাছি দাঁড়ানোরও ফযীলত আছে। সুতরাং সাধারণভাবে ইমামের ডান দিকে দাঁড়ানো উত্তম নয়। যেমন ইমামের বাম দিকে লোক কম থাকলে ডান দিকে দাঁড়ানো থেকে বাম দিকে দাঁড়ানো উত্তম। কারণ তখন বাম দিকটা ইমামের অধিক কাছাকাছি। পক্ষান্তরে ডানে-বামে যদি লোক সমান সমান থাকে, তাহলে বামের থেকে ডান দিক অবশ্যই উত্তম। *(মুমঃ ৩/১৯)*

১৪। (বিরল মাসআলায়) যদি কোন স্থান-কালে কোন জামাআতের দেহে সতর ঢাকার মত লেবাস না থাকে তাহলে ইমাম সামনে না দাঁড়িয়ে কাতারের মাঝে দাঁড়াবে। অবশ্য ঘন অন্ধকার অথবা মুক্তাদীরা অন্ধ হলে বিবস্ত্র ইমাম সামনে দাঁড়াবে। (মুমঃ ৪/৩৮৯)

ইমামের কর্তব্য

১। ইমামতির নিয়ত ঃ

সাধারণভাবে ইমামতির নিয়ত (সংকল্প) জরুরী। *(মবঃ ১৫/৭০)* অবশ্য একাকী নামায পড়া অবস্থায় কেউ জামাআতের নিয়তে তার সাথে শামিল হলে জামাআত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে নামায পড়তে পড়তে ইমামতির সংকল্প করে নেওয়া যথেষ্ট হবে। নামায শুরু করার আগে থেকে ইমামতির নিয়ত জরুরী নয়। *(ঐ ১৭/৫৯)* হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন, এক রাত্রে আমি আমার খালা মায়মূনার ঘরে শুয়ে ছিলাম। নবী ﷺ রাত্রে উঠে যখন নামায পড়তে লাগলেন, তখন আমিও তাঁর সাথে শামিল হয়ে গেলাম। *(বুঃ, মুঃ, আঃ, সুআ)*

একদা মহানবী ﷺ এক ব্যক্তিকে একাকী নামায পড়া দেখে বললেন, "কে আছে যে এর জন্য সাদকাহ করবে? (এর সওয়াব বর্ধন করবে?)" এ কথা শুনে এক ব্যক্তি উঠে তার সাথে নামায পড়ল। *(আদাঃ, তিঃ)*

২। কাতার সোজা করতে বলা ঃ

নবী মুবাশ্‌শির ﷺ নামাযে ইমামতির জায়গায় দাঁড়িয়ে মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে তাদেরকে বিভিন্ন নির্দেশ দিতেন। *(বুঃ ৭১৯নং)* যেমন, "তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও।" "কাতার সোজা কর।" "কাতার পূর্ণ কর।" "ঘন হয়ে দাঁড়াও।" "সামনে এস।" "ঘাড় ও কাঁধসমূহকে সমপর্যায়ে সোজা কর।" "প্রথম কাতারকে আগে পূর্ণ কর, তারপর তার পরের কাতারকে। অপূর্ণ থাকলে যেন শেষের কাতার থাকে।" "কাতারের ফাঁক বন্ধ কর।" "বাজারের মত হৈ-চৈ করা থেকে দূরে থাক।" ইত্যাদি।

কাতারে কেউ আগে-পিছে সরে থাকলে তাকে বরাবর হতে বলা এমন কি নিজে কাছে গিয়ে কাতার সোজা করা ইমামের কর্তব্য। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না কাতার পূর্ণরূপে সোজা হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত নামায শুরু করা উচিত নয়। *(মুমঃ ৩/১৬)* বরং কাতার সোজা ও ঠিক হওয়ার আগে ইমামের নামায শুরু করা বিদআত। *(আনাঃ ৭৪পৃঃ)*

নু'মান বিন বাশীর رضي الله عنه বলেন, 'আমরা নামাযে দাঁড়ালে আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের কাতার সোজা করতেন। অতঃপর আমরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলে তবেই তকবীর দিতেন।' *(বুঃ ৭১৭, মুঃ ৪৩৬, আদাঃ ৬৬৫নং)*

৩। মুক্তাদীদের খেয়াল করে নামায হাল্কা করে পড়া ঃ

জামাআতে বিভিন্ন ধরনের লোক নামায পড়ে থাকে। ইমামের উচিত, নিজের ইচ্ছামত নামায না পড়া; বরং তাদের খেয়াল রেখে ক্বিরাআত ইত্যাদি লম্বা করা। অবশ্য কারো ইচ্ছা অনুসারে নামায এমন হাল্কা করা উচিত নয়, যাতে নামাযের বিনয়, ধীরতা-স্থিরতা, পরিপূর্ণরূপে রুকন-ওয়াজেব-সুন্নত আদি আদায় ব্যাহত হয়। বলা বাহুল্য, যাতে উভয় দিক

বজায় থাকে তার খেয়াল অবশ্যই রাখতে হবে।

আনাস ﵁ বলেন, 'আমি নবী ﷺ অপেক্ষা কোন ইমামের পিছনে অধিক সংক্ষেপ অথচ অধিক পরিপূর্ণ নামায পড়ি নি। এমন কি তিনি যখন কোন শিশুর কান্না শুনতেন তখন তার মায়ের উদ্বিগ্ন হওয়ার আশংকায় নামায সংক্ষেপ করতেন।' *(বুঃ ৭০৮-নং, মুঃ)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি অনেক সময় নামায শুরু করে তা লম্বা করতে ইচ্ছা করি। কিন্তু যখন আমি কোন শিশুর কান্না শুনি, তখন আমার নামাযকে সংক্ষেপ করি। কারণ, তার কান্নায় তার মায়ের মনের উদ্বেগ যে বেড়ে যাবে তা আমি জানি।" *(বুঃ ৭০৯নং)*

তিনি বলেন, "যখন তোমাদের কেউ লোকেদের নামায পড়ায়, তখন সে যেন হাল্কা করে পড়ে। কেননা, তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও বৃদ্ধ লোক থাকে। অবশ্য যখন তোমাদের কেউ একা নামায পড়ে, তখন সে যত ইচ্ছা লম্বা করতে পারে।" *(বুঃ ৭০৩নং, মুঃ)*

এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম! আমি ফজরের নামাযে অমুকের কারণে হাজির হই না; সে আমাদের নামায খুব লম্বা করে পড়ায়।' আবূ মাসঊদ ﵁ বলেন, 'এর পর সেদিন আল্লাহর রসূল ﷺ-কে ওয়াযে যেরূপ রাগান্বিত হতে দেখেছি সেরূপ আর অন্য কোন দিন দেখি নি। তিনি বললেন, "তোমাদের কেউ কেউ লোকদেরকে (জামাআতের প্রতি) বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। তোমাদের যে কেউ কোন নামাযের ইমামতি করে সে যেন নামায সংক্ষেপ করে পড়ে। কেননা, তাদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও (বিভিন্ন) প্রয়োজন-ওয়ালা লোক আছে।" *(বুঃ ৭০২নং, মুঃ)*

মহানবী ﷺ বলেন, "জামাআতের সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তির খেয়াল করে নামায পড়াও। আর এমন মুআয্যিন রেখো না, যে আযানের পারিশ্রমিক চায়।" *(ত্বাবঃ, সজাঃ ৩৭৭৩নং)*

তিনি মুআয ﵁ কে এশার ইমামতিতে লম্বা ক্বিরাআত পড়তে নিষেধ করে বলেছিলেন, "তুমি কি লোকদেরকে ফিতনায় ফেলতে চাও হে মুআয? তুমি যখন ইমামতি করবে তখন 'অশ্শামসি অযুহা-হা, সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লা, ইক্বরা বিসমি রাব্বিকা, অল্লাইলি ইযা য়্যাগশা' পাঠ কর। কারণ তোমার পশ্চাতে বৃদ্ধ, দুর্বল ও প্রয়োজনে উদগ্রীব মানুষ নামায পড়ে থাকে। *(বুঃ ৭০৫, মুঃ, না, মিঃ ৮৩৩ নং)*

আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ত্বারখান বলেন, একদা আমরা শায়খ ইমাদের পশ্চাতে নামায পড়ছিলাম। আমার পাশে এক ব্যক্তি নামায পড়ছিল, -আমার মনে হয়- তার কোন ব্যস্ততা ছিল। যখন নামায থেকে ফারেগ হলাম, তখন সে কসম করে বলল, আর কখনো তাঁর পিছনে নামায পড়বে না। আর সেই সঙ্গে মুআযের ঐ হাদীস উল্লেখ করল। আমি তাকে বললাম, তুমি কেবল এই হাদীসটিই জান? অতঃপর আমি তার কাছে নবী ﷺ-এর নামায লম্বা করার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলি উল্লেখ করলাম। এরপর আমি শায়খ ইমাদের পাশে বসলাম এবং ঘটনা খুলে বললাম। আমি তাঁকে বললাম, 'আমি আপনাকে ভালোবাসি এবং এই কামনা করি যে, আপনার বিরুদ্ধে যেন কোন প্রকার সমালোচনা না হয়। সুতরাং যদি আপনি নামাযকে একটু হাল্কা করে পড়তেন। তিনি আমার এ কথা শুনে বললেন, 'সম্ভবতঃ অতি নিকটে ওরা আমার ও আমার নামায থেকে নিষ্কৃতি পাবে। ইয়া

সুবহানাল্লাহ! ওদের কেউ কেউ (দুনিয়ার) রাজা-বাদশার সামনে সারা দিন দাঁড়িয়ে থাকলে কোন প্রকারের বিরক্তি প্রকাশ করে না; অথচ ওরা ওদের (দ্বীন-দুনিয়ার বাদশা) প্রভুর সামনে সামান্য সময় দাঁড়াতে বিরক্তিবোধ করে?! *(মুত্বাসাঃ ১৮৮পৃঃ)*

৪। দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় প্রথম রাকআত দীর্ঘ করাঃ

প্রথম রাকআতকে একটু লম্বা করে পড়া উত্তম। যাতে পিছে থেকে যাওয়া মুসল্লীরা প্রথম রাকআতেই এসে শামিল হতে পারে।

আবূ কাতাদাহ কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী ﷺ যোহরের নামাযে দ্বিতীয় রাকআতের তুলনায় প্রথম রাকআত লম্বা করে পড়তেন। অনুরূপ আসর ও ফজরের নামাযেও। *(বুঃ, মুঃ, আদাঃ ৮০০ নং)* আবূ দাউদের বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে যে, আমরা মনে করতাম, তিনি তা এই জন্য করছেন; যাতে লোকেরা প্রথম রাকআতে শামিল হতে পারে।

আবূ সাঈদ খুদরী ؓ বলেন, নামাযের ইকামত হয়ে যেত, আর আমাদের কেউ কেউ বাকী গিয়ে নিজের প্রয়োজন (প্রস্রাব-পায়খানা) সেরে ওযূ করে প্রথম রাকআতে শামিল হতে পারত। কারণ, নবী ﷺ ঐ রাকআতকে লম্বা করে পড়তেন। *(আঃ, মুঃ, নাঃ, ইমাঃ)*

তদনুরূপ ইমাম রুকূতে থাকা কালে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে তাকে রুকূ পাইয়ে দেওয়ার জন্য রুকূ একটু লম্বা করা বৈধ। *(ফইঃ ১/৩৫২)* পক্ষান্তরে বেশী লম্বা করে জামাআতের মুসল্লীদেরকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। অভিজ্ঞ ইমাম তাঁর মুক্তাদীদের অভ্যাস ও আচরণের মাধ্যমে তাদের বিরক্তি ও সন্তুষ্টির কথা অবশ্যই বুঝতে পারবেন।

৫। দুআয় নিজেকে খাস না করাঃ

দুআর সময় এক বচন শব্দ ব্যবহার করে নিজের জন্য দুআকে খাস করা ইমামের জন্য বৈধ নয় বলে যে হাদীস মহানবী ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়, তা সহীহ নয়। *(দ্রঃ তামামুল মিন্নাহ ২৭৮-২৮০পৃঃ)* আর এ কথা বিদিত যে, মহানবী ﷺ নিজে ইমাম হয়েও অনেক সময় একবচন শব্দ ব্যবহার করে নামায পড়েছেন। উদাহরণস্বরূপ 'বা-ইদ বাইনী'র হাদীস।

তবুও সাধারণ দুআর সময় এক বচনের স্থলে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা দোষাবহ নয়। ইমাম বগবী (রঃ) বলেন, ইমাম হলে (দুআয়) এক বচনের স্থলে বহু বচন শব্দ ব্যবহার করবে। 'আল্লাহুম্মাহদিনা---- অআ-ফিনা --- বলবে এবং দুআকে নিজের জন্য খাস করবে না। *(শারহুস সুন্নাহ ৩/১২৯)* অনুরূপ বলেন ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ। *(স্বালাতুত তারাবীহ ৪১পৃঃ, মুমুত্বাসাঃ ১৭০-১৭১পৃঃ)*

৬। সালাম ফিরে মুক্তাদীদের দিকে ফিরে বসাঃ

নামাযে সালাম ফিরার পর ডান অথবা বাম দিকে ঘুরে মুক্তাদীদের প্রতি মুখ করে বসা ইমামের জন্য মুস্তাহাব। *(বুঃ, আদাঃ ১০৪১, তিঃ, মিঃ ৯৪৪নং)*

ইবনে মাসউদ ؓ বলেন, "আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বহুবার বাম দিক হতে ঘুরতে দেখেছি। *(বুখারী ৮৫২নং ও মুসলিম ৭০৭নং, মিঃ ৯৪৬নং)*

আনাস ؓ বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে অধিকাংশ ডান দিক হতে ঘুরে বসতে

দেখেছি। *(মুসলিম৭০৮নং)*

৭। যিক্‌র-আযকারের পর জায়গা বদলে সুন্নত আদি পড়া ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "ইমাম যে জায়গায় (ফরয) নামায পড়ে সে জায়গাতেই সে যেন (সুন্নত) নামায না পড়ে। বরং সে যেন অন্য জায়গায় সরে যায়।" *(আদাঃ ৬১৬নং, ইমাঃ)*

শুধু ইমামই নয়; বরং মুক্তাদীর জন্যও জায়গা বদলে সুন্নত পড়া মুস্তাহাব। নবী মুবাশ্‌শির ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ কি (সুন্নত পড়ার জন্য) তার সামনে, পিছনে, ডাইনে বা বামে সরে যেতে অক্ষম হবে?" *(আদাঃ ১০০৬, ইমাঃ, সজাঃ ২৬৬২নং)*

সায়েব বিন য়্যাযীদ বলেন, একদা আমি মুআবিয়া ﷺ-এর সাথে (মসজিদের) আমীর-কক্ষে জুমআর নামায পড়লাম। তিনি সালাম ফিরলে আমি উঠে সেই জায়গাতেই সুন্নত পড়ে নিলাম। অতঃপর তিনি (বাসায়) প্রবেশ করলে একজনের মারফৎ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'তুমি যা করলে তা আর দ্বিতীয়বার করো না। জুমআর নামায সমাপ্ত করলে কথা বলা অথবা বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তার সাথে আর অন্য কোন নামায মিলিয়ে পড়ো না। কারণ, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, (মাঝে) কথা না বলে বা বের হয়ে না গিয়ে কোন নামাযকে যেন অন্য নামাযের সাথে মিলিয়ে না পড়ি।' *(মুঃ ৮৮৩, আদাঃ ১১২৯নং, আঃ৪/৯৫, ৯৯)*

উদ্দেশ্য হল, নামাযের জায়গা বেশী করলে, কিয়ামতে ঐ সকল জায়গা আল্লাহর আনুগত্যের সাক্ষ্য দেবে। *(মিঃ ৯৫৩ হাদীসের টীকা দ্রঃ)*

অবশ্য এ সময় খেয়াল রাখা উচিত, যাতে উক্ত মুস্তাহাব পালন করতে গিয়ে কোন নামাযীর সিজদার জায়গার ভিতর বেয়ে পার হয়ে গোনাহ না হয়ে বসে।

মুক্তাদীর কর্তব্য

১। ইমামের অপেক্ষা করা ঃ

ইমাম থাকতে তাঁর জায়গায় তাঁর বিনা অনুমতিতে অন্যের ইমামতি করা অবৈধ, আর তা বড় বেপরোয়া লোকের কাজ। এ সব লোকেদের ইমামের একটু দেরী সয় না। সামান্য দেরী হলেই আর তাঁর অপেক্ষা না করে জামাআত খাড়া করে দেয়। এ ধরনের ধৈর্যহারা মানুষরা কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমান।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত (নামাযের জন্য উঠে) দাঁড়াও না।" *(বুঃ ৬৩৭, মুঃ ৬০৪নং)*

তিনি বলেন, "কোন ব্যক্তি যেন অপর ব্যক্তির জায়গায় তার বিনা অনুমতিতে ইমামতি না করে এবং না কেউ কারো ঘরে তার বসার জায়গায় তার বিনা অনুমতিতে বসে।" *(আঃ, মুঃ ৬৭৩নং)*

অবশ্য অস্বাভাবিক বেশী দেরী হলে মুক্তাদীদের অধিকার আছে জামাআত করার। কিন্তু ইমাম উপস্থিত হওয়ার যথাসময় পার হওয়ার পর মুক্তাদীদের কোন এক উপযুক্ত ব্যক্তি ইমামতি শুরু করলে ইতিমধ্যে যদি নিযুক্ত ইমাম এসে পড়েন, তাহলে ইমাম অগ্রসর হয়ে নিজ ইমামতি করতে পারেন। আর সে ক্ষেত্রে ঐ মুক্তাদী ইমাম পিছে হটে যাবেন। *(মবঃ ১৫/৮৩)* যেমন দু-দুবার হযরত আবূ বাক্‌র ﷺ নামায পড়াতে শুরু করলে ইতিমধ্যে মহানবী ﷺ এসে উপস্থিত হন এবং আবূ বাক্‌র পিছে হটে যান ও তিনি ইমামতি করেন। *(বুঃ ৬৮৪, ৭১২, মুঃ)*

অবশ্য ইমাম চাইলে মুক্তাদী হয়েও নামায সম্পন্ন করতে পারেন। যেমন একদা এক সফরে মহানবী ﷺ নিজ প্রয়োজনে দূরে গেলে আসতে দেরী হল। হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ ইমামতি করতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে তিনি এসে উপস্থিত হলে আব্দুর রহমান পিছে হটতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে ইঙ্গিতে বললেন যে, তুমি ইমামতি করতে থাক। অতঃপর তিনি সেদিন মুক্তাদী হয়ে নামায পড়লেন। *(মুঃ ২৭৪, ইমাঃ ১২৩৬নং)*

২। ইক্তিদার নিয়ত ঃ

ইমামের পিছনে নামায পড়ার সময় মনে মনে ইক্তিদার নিয়ত (সংকল্প) করা জরুরী। যেহেতু মুক্তাদী অবস্থায় ইমামের অনুসরণ ওয়াজেব, ইমামের পিছনে মুক্তাদী ভুল করলে সহু সিজদা করতে হয় না এবং অনেক সময় ইমামের নামায বাতিল হলে মুক্তাদীরও বাতিল; তাই এই নিয়ত জরুরী। সুতরাং নিয়ত না হলে মুক্তাদীর নামায জামাআতী নামায হবে না। *(আইঃ ২০৬পৃঃ)*

জ্ঞাতব্য যে, 'ইক্তাদাইতু বিহাযাল ইমাম' বলে মুখে উচ্চারিতব্য নিয়ত বিদআত।

৩। যথাসময়ে জামাআতে দাঁড়ানো ঃ

ইকামত হয়ে গেলে এবং ইমাম দাঁড়িয়ে গেলে মুক্তাদীর বসে থাকা অথবা তেলাঅত বা মুনাজাতে মশগুল থাকা অথবা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকা উচিত নয়। বরং সত্বর উঠে ইমামের সাথে তাকবীরে-তাহরীমা দিয়ে নামায শুরু করার প্রস্তুতি নেওয়া উচিত।

যেমন তাকবীরে-তাহরীমা ইমামের সাথে না পাওয়া এক বড় বঞ্চনার কারণ। অতএব ইমাম তকবীর দিয়ে ফেললে কোন কথাবার্তায় অথবা মনগড়া নিয়ত আওড়ানোতে অথবা মিসওয়াকের সুন্নত পালনে ব্যস্ত হয়ে তকবীর দিতে দেরী করা মোটেই উচিত নয়। ইমামের সাথে তাকবীরে-তাহরীমার একটি পৃথক মর্যাদা রয়েছে শরীয়তে। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে ৪০ দিন জামাআতে নামায আদায় করবে এবং তাতে তাহরীমার তকবীরও পাবে, সেই ব্যক্তির জন্য দুটি মুক্তি লিখা হয়; দোযখ থেকে মুক্তি এবং মুনাফেকী থেকে মুক্তি।" *(তিঃ, সতাঃ ৪০৪নং)*

মুজাহিদ বলেন, এক বদরী সাহাবী একদা তাঁর ছেলেকে বললেন, 'তুমি আমাদের সাথে জামাআত পেয়েছ?' ছেলে বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'প্রথম তাকবীর পেয়েছ?' ছেলে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'যা তোমার ছুটে গেছে তা এক শত কালো চক্ষুবিশিষ্ট (উৎকৃষ্ট)

উটনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর!’ *(আরাঃ ২০২১নং)*

অনুরূপভাবে জামাআত শুরু হয়ে গেলে সুন্নত নামাযে মশগুল থাকাও বৈধ নয়। বৈধ নয় কোন সুন্নত শুরু করা। ফজরের সুন্নত হলেও জামাআতের ইকামত শোনার পর তা আর পড়া চলে না। মহানবী ﷺ বলেন, “যখন নামায খাড়া হয়, তখন ফরয (বা সেই) নামায ছাড়া অন্য কোন নামায নেই।” *(বুঃ বিনা সনদে, ফবাঃ ২/১৭৪, মুঃ ৭১০ নং, আঃ ২/৩৫২, প্রমুখ)* অর্থাৎ, জামাআত খাড়া হলে ফরয বা (ঐ নামায তাকে পড়তে হলে) ঐ নামাযে শামিল হওয়া ছাড়া পৃথক করে কোন নফল বা সুন্নত নামায পড়া বৈধ নয়। অর্থাৎ ইকামতের পর আর কোন সুন্নত বা নফল নামায শুদ্ধ হবে না।। *(শরহুন নওবী ৫/২২১, ফবাঃ ২/১৭৫, আমাঃ ৪/১০১)*

এক ব্যক্তি মসজিদে এল। তখন আল্লাহর রসূল ﷺ ফজরের নামাযে ছিলেন। সে ২ রাকআত নামায পড়ে জামাআতে শামিল হল। নামায শেষে আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে বললেন, “হে অমুক! তোমার নামায কোন্‌টা? যেটা আমাদের সাথে পড়লে সেটা, নাকি যেটা তুমি একা পড়লে সেটা? *(নাঃ ৮৬৮-নং)*

একদা এক ব্যক্তি মুআযযিনের ইকামত বলার সময় নামায পড়ছিল। তা দেখে তিনি বললেন, “একই সাথে কি দুটি নামায!” *(সিসঃ ৬/১৭১, ২৫৮৮-নং)*

একদা ফজরের নামাযের ইকামত হওয়ার সময় মহানবী ﷺ দেখলেন, এক ব্যক্তি নামায পড়ছে। তিনি তাকে বললেন, “তুমি কি ফজরের নামায ৪ রাকআত পড়বে?” *(মুঃ ৭১১, সিসঃ ৬/১৭২)*

একদা তিনি ফজরের নামায পড়ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে এক প্রান্তে ২ রাকআত নামায পড়ে তাঁর সাথে জামাআতে শামিল হল। সালাম ফিরার পর তিনি তাকে বললেন, “ওহে অমুক! তুমি কোন্‌ নামাযকে (ফরয বলে) গণ্য করলে? তোমার একাকী পড়া নামাযকে, নাকি আমাদের সাথে পড়া নামাযকে?” *(মুঃ ৭১২নং)*

অবশ্য কারো সুন্নত পড়া কালে যদি ইকামত হয়ে যায়, তাহলে সে দ্বিতীয় রাকআতে থাকলে বাকীটা হাল্কা করে পড়ে পূর্ণ করে নেবে। পক্ষান্তরে প্রথম রাকআতে থাকলে নামায ছেড়ে জামাআতে শামিল হয়ে যাবে। *(লিবামাঃ ২৪/১৪, ফউঃ ১/৩৪৫)*

প্রকাশ যে, নামায ছাড়ার সময় সালাম ফিরা বিধেয় নয়। বরং নিয়ত বাতিল করলেই নামায থেকে বের হওয়া যায়। *(মাতাহাআঃ ২২পৃঃ)*

৪। যথা নিয়মে কাতার বাঁধা ঃ

মহান আল্লাহর তা’যীম প্রকাশের উদ্দেশ্যে কাতার বাঁধার যে নিয়ম আছে সেই অনুযায়ী কাতার বাঁধা মুক্তাদীর কর্তব্য। আর তা যথাক্রমে নিম্নরূপ ঃ-

۞ কাতার সোজা করা ঃ

কাতার সোজা করা ওয়াজেব। কাতার সোজা হবে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় এক অপরের কাঁধ ও পায়ের গাঁট বরাবর সোজা রেখে; যাতে একজনের কাঁধ আগে এবং অপর জনের পিছে না হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে পায়ের কনিষ্ঠা আঙ্গুলে আঙ্গুল মিলিয়ে কাতার সোজা হবে না। কারণ, পা

ছোট-বড় থাকার ফলে কাতার বাঁকা থেকে যাবে। আর বসা অবস্থায় বাহুমূল বা কাঁধের সাথে বাহুমূল বা কাঁধ বরাবর থাকলে কাতার সোজা বলে ধরা যাবে।

যেমন মসজিদে কাতারের দাগ থাকলে দাগের মাথায় বুড়ো আঙ্গুল রেখে কাতার সোজা হয় না। কারণ, এতে যার পা লম্বা সে কাতার থেকে পিছনের দিকে এবং যার পা ছোট সে কাতারের সামনের দিকে বের হয়ে থাকবে। সুতরাং পায়ের গোড়ালিকে দাগের মাথায় রাখলে তবেই কাতার বাঞ্ছনীয় সোজা হবে।

কাতার সোজা করার ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা কাতার সোজা কর। কারণ, কাতার সোজা করা নামায প্রতিষ্ঠা বা পরিপূর্ণ করার অন্তর্গত কর্ম।" *(বুঃ ৭২৩, মুঃ ৪৩৩, আদাঃ ৬৬৮নং)*

আবূ মাসউদ ؓ বলেন, নামাযের (কাতার বাঁধার) সময় নবী ﷺ আমাদের বাহুমূল স্পর্শ করতেন ও বলতেন, "সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং বিভিন্নরূপে দাঁড়াও না; তাতে তোমাদের অন্তরসমূহ বিভিন্নমুখী হয়ে যাবে।" *(মুঃ, মিঃ ১০৮৮নং)*

❁ কাতার মিলিয়ে ঘন হয়ে জমে দাঁড়ানো এবং মাঝের ফাঁক বন্ধ করা ঃ

কাতারে দাঁড়ানোর সময় ঘন হয়ে দাঁড়ানো জরুরী; যাতে মাঝে কোন ফাঁক না থাকে। পার্শ্ববর্তী নামাযীর পায়ের পাতার সাথে পায়ের পাতা (পায়ের বাইরের দিকটা সোজা কেবলামুখী করে কনিষ্ঠা আঙ্গুল থেকে গোড়ালি পর্যন্ত অংশ) ও বাহুর সাথে বাহু লাগিয়ে জমে দাঁড়াতে হবে নামাযীকে। আল্লাহর এ দরবারে আমীর-গরীব, ছোট-বড় ও প্রভু-দাসের কোন ভেদাভেদ নেই, কোন বেআদবী নেই। সাহাবাগণ কাতারে পরস্পর এইভাবেই দাঁড়াতেন। তাহলে কি তাঁরা বেআদব ছিলেন? আল্লাহর কসম! না। ঐ দেখেন না, একজন ছাত্র যদি তার শিক্ষকের গায়ে গা লাগিয়ে বসে, তাহলে শিক্ষক ও সমস্ত লোক তাকে বেআদব বলবেই। কিন্তু সেই ছাত্রই যদি বাস বা ট্রেনের সীটে ঐরূপ বসে, তাহলে তখন আর কেউ তাকে বেআদব বলে না। বলা বাহুল্য নামাযের সারিতে পাশাপাশি এই প্রেমের সূত্রে বড়-ছোটর কোন প্রভেদ নেই।

আসলে মনের সাথে মনের মিল থাকলে পায়ের সাথে পা মিলে যাওয়া দূরের কথা নয়। আর মনের মাঝে দূরত্ব থাকলে, মনের মাঝে ঔদ্ধত্য, অহংকার ও ঘৃণা-বিদ্বেষ থাকলে অথবা ভুল বুঝাবুঝির ফলে অভিমান ও ক্ষোভ থাকলে অবশ্যই দেহের দূরত্ব বেড়ে যাবে। বেড়ে যাবে আরো মনের দূরত্ব। দূর হবে সম্প্রীতির বাঁধন। শয়তান সেই ভুল বুঝাবুঝির সুযোগে জামাআতের মাঝে বিচ্ছিন্নতা আনতে বড় কৃতকার্য হবে।

পরন্তু যদি আপনি মনে করেন যে, পাশের মুসল্লী থেকে আপনি বড় এবং সে আপনার পায়ে পা লাগালে আপনার সম্মানে বাধবে, তাহলে আপনি আপনার পা তার পায়ে লাগিয়ে দিন। আর এ ক্ষেত্রে আশা করি আপনার মনের ঐ আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন হবে না।

পায়ে পা লাগিয়ে দাঁড়ানোর আমল মহানবী ﷺ-এর যামানায় প্রচলিত ছিল। তিনি সাহাবাদের সে আমল দেখেও বেআদবী মনে করে বাধা দেননি। তিনি নামাযের মধ্যে যেমন সামনে দেখতেন তেমনি পিছনে। ঘন হয়ে দাঁড়ানোর ব্যাখ্যাতে সাহাবাগণের এই আমল অবশ্যই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাতে মৌন-সম্মতি প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, এ

কাজ যে সুন্নত তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, তাবেঈনদের যামানা থেকেই এ আমল অনেকের কাছে বর্জনীয় হয়ে চলে আসছে। হযরত আনাস ﷺ বলেন, 'আজকে যদি কারোর সাথে ঐ কাজ করি, তাহলে সে সেরকশ (দুরন্ত) খচ্চরের মত চকে যাবে।' *(ফবাঃ ২/২৪৭)* সুতরাং আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন যে এই মৃত সুন্নতকে জীবিত করে। *(মারাঃ ২২৫পৃঃ)*

মহানবী ﷺ নামাযের কাতার তীরের মত সোজা করতেন। অতঃপর সাহাবাগণ যখন সে কাজ সম্যক্‌ বুঝে উঠতে পেরেছেন এ কথা বুঝতে পারতেন, তখন তিনি তাকবীরে তাহরীমা দিতেন। একদিন তাকবীরে দিতে উদ্যত হতে গিয়ে তিনি দেখলেন, একটা লোকের বুক কাতারের সামনের দিকে বের হয়ে আছে। তা দেখে তিনি বললেন, "আল্লাহর বান্দাগণ! হয় তোমরা ঠিকমত কাতার সোজা কর, নচেৎ আল্লাহ তোমাদের চেহারাসমূহের মাঝে বিভিন্নতা সৃষ্টি করে দেবেন।" *(বুঃ ৭১৭, মুঃ ৪৩৬, আদাঃ ৬৬৩, মিঃ ১০৮৫নং)*

হযরত আনাস ﷺ বলেন, একদা নামাযের ইকামত হল। নবী ﷺ আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর এবং ঘন হয়ে দাঁড়াও। নিশ্চয় আমি আমার পিছন দিক হতেও দেখে থাকি।" আনাস ﷺ বলেন, এরপর আমাদের প্রত্যেকে নিজ বাহুমূল তার পার্শ্ববর্তী সঙ্গীর বাহুমূলের সাথে এবং নিজ পা তার পায়ের সাথে (হাঁটু তার হাঁটুর সাথে, পায়ের গাঁট তার পায়ের গাঁটের সাথে) লাগিয়ে দিত। *(বুঃ ৭১৮, মুঃ ৪৩৬, আদাঃ ৬৬২নং)*

হযরত জাবের বিন সামুরাহ ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের কাছে এলেন। সে সময় আমরা গোলাকার দলে দলে বিভক্ত ছিলাম। তিনি বললেন, "তোমাদেরকে আমি বিক্ষিপ্তরূপে দেখছি কেন?" অতঃপর একদিন তিনি আমাদের কাছে এসে (আমাদেরকে অনুরূপ বিক্ষিপ্ত দেখে) বললেন, "তোমরা প্রতিপালকের সামনে ফিরিশ্তাবর্গের কাতার বাঁধার মত কাতার বেঁধে দাঁড়াবে না কি?" আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! ফিরিশ্তাবর্গ তাঁদের প্রতিপালকের সামনে কিরূপে কাতার বেঁধে দাঁড়ান।' তিনি বললেন, "প্রথমকার কাতারসমূহ পূর্ণ করেন এবং ঘন হয়ে জমে কাতার বেঁধে দাঁড়ান।" *(মুঃ ৪৩০, আদাঃ ৬৬১, মিঃ ১০৯১নং)*

প্রকাশ থাকে যে, ঘন করে দাঁড়ানোর অর্থ এই নয় যে, পরস্পর ঠেলাঠেলি ও চাপাচাপি করে দাঁড়াতে হবে। বরং এইরূপ দাঁড়ানোতে নামাযের একাগ্রতা ও বিনয় নষ্ট হতে পারে। অতএব যাতে পায়ে পা এবং বাহুতে বাহু স্বাভাবিকভাবে লেগে থাকে তারই চেষ্টা করতে হবে। আর তার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই পা ফাঁক করে দাঁড়াতে হবে।

সামনের কাতার খালি থাকলে (রাকআত বা রুকূ ছুটে যাওয়ার ভয়ে) পিছনে দাঁড়ানো বৈধ নয়। যেমন সামনের কাতারে ফাঁক দেখা দিলে তা বন্ধ করা জরুরী। সামনে কাতারে যেতে দূর হলে এবং নামাযের মধ্যে হলেও অগ্রসর হয়ে যেতে হবে কাতার মিলানোর উদ্দেশ্যে। এর জন্য রয়েছে আদেশ, পুরস্কার এবং তিরস্কারও।

নবী মুবাশ্‌শির ﷺ বলেন, "প্রথম কাতারকে আগে পূর্ণ কর, তারপর তার পরের কাতারকে। অপূর্ণ থাকলে যেন শেষের কাতার থাকে।" *(আদাঃ ৬৭১নং)*

তিনি বলেন, "তোমরা কাতার সোজা কর, বাহুমূলসমূহকে পাশাপাশি সমপর্যায় করে দাঁড়াও, কাতারের ফাঁক বন্ধ কর, পার্শ্ববর্তী নামাযী ভাইদের জন্য নিজ নিজ হাতসমূহকে নরম কর এবং শয়তানের জন্য (কাতারে) ফাঁক রেখো না। আর যে ব্যক্তি কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায় সে ব্যক্তির সাথে আল্লাহ মিলন (সম্পর্ক) রাখেন এবং যে ব্যক্তি কাতার ছিন্ন করে সে ব্যক্তির সাথে আল্লাহ (সম্পর্ক অথবা কল্যাণ) ছিন্ন করেন।" *(আদাঃ ৬৬৬নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করেন এবং ফিরিশ্তাবর্গ তাদের জন্য দুআ করে থাকেন, যারা কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায়। আর যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন।" *(ইমাঃ, আঃ, ইখুঃ, ইহিঃ, হাঃ, সজাঃ ১৮৪৩নং)*

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি (কাতারের মাঝে) কোন ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং তার জন্য জান্নাতে এক গৃহ নির্মাণ করেন।" *(ত্বাবঃ আওসাত্ব, সতাঃ ৫০২নং)*

তিনি বলেন, "অবশ্যই আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তাবর্গ দুআ করতে থাকেন তাদের জন্য যারা প্রথম কাতার মিলিয়ে (ব্যবধান না রেখে) দাঁড়ায়। আর যে পদক্ষেপ দ্বারা বান্দা কোন কাতারের ফাঁক বন্ধ করতে যায় তা অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অন্য কোন পদক্ষেপ অধিক পছন্দনীয় নয়।" *(আদাঃ, ইখুঃ, অবশ্য এতে পদক্ষেপের উল্লেখ নেই, সতাঃ ৫০৪নং)*

۞ পাশের নামাযীর জন্য নিজের বাহুকে নরম করে দাঁড়ানো ঃ

পাশের নামাযী যাতে মনে কষ্ট না পায় তার জন্য প্রত্যেক নামাযীর কর্তব্য নিজ নিজ বাহুকে নরম করে রাখা। এতে উভয়ের মনে বিদ্বেষ দূর হয়ে প্রীতির সঞ্চার হবে। দূর হবে ঘৃণা ও কাতারের ফাঁক।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারাই, যারা নামাযের মধ্যে নিজেদের বাহুসমূহকে (পাশের নামাযীর জন্য) নরম রাখে।" *(আদাঃ ৬৭২নং)*

বলা বাহুল্য, পায়ে পা লাগাবার সময়, বাম পা-কে ডান পায়ের নিচে বের করে বসার সময়ও পাশের নামাযীর সাথে কঠোরতার পরিচয় দেওয়া উচিত নয়। বরং কাতারে চাপাচাপি বা ঠাসাঠাসি থাকলে পা বের করে অপরকে কষ্ট দেওয়ার চাইতে পা না বের করে উক্ত সুন্নত পালন না করাই উত্তম। *(লিবামাঃ ২২/৩০)*

۞ কাতারসমূহের মাঝে বেশী দূরত্ব না রাখা ঃ

ইমাম ও প্রথম কাতার এবং অনুরূপ দ্বিতীয় ও তার পরের কাতারসমূহের মাঝে প্রয়োজনের অধিক দূরত্ব রাখা উচিত নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের কাতারসমূহকে ঘন কর, কাতারগুলোর মাঝে ব্যবধান কাছাকাছি কর এবং তোমাদের ঘাড়সমূহকে সমপর্যায়ে সোজা রাখ। সেই আল্লাহর কসম! যাঁর হাতে আমার জান আছে, নিশ্চয় আমি শয়তানকে কাল ভেঁড়ার বাচ্চার মত তোমাদের কাতারের ফাঁকে ফাঁকে প্রবেশ করতে দেখছি।" *(বুঃ ৭১৮, মুঃ ৪২৩, ৪৩৩, ৪৩৪, আদাঃ ৬৬৭নং)*

সামনে কাতার করার মত জায়গা ফাঁক থাকলে পিছনে কাতার বেঁধে নামায হবে না। যেমন

পিছনে কাতার বাঁধলে এবং সামনে ফাঁকা জায়গায় রাস্তায় লোক চলাচল করলেও নামায হবে না। মসজিদ পূর্ণ হয়ে গেলে তারপর রাস্তা পূর্ণ হবে এবং তার পরে দোকান ইত্যাদিতে কাতার বাঁধা চলবে। রাস্তা খালি থাকতে দোকানে কাতার বাঁধা বৈধ হবে না। *(মাজমূউ ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ ২৩/৪১০, দ্রঃ তামিঃ ২৮২পৃঃ)*

۞ থামসমূহের ফাঁকে কাতার না বাঁধা ঃ

হযরত আনাস ﷺ বলেন, 'আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যামানায় এই (থামের ফাঁকে কাতার বাঁধা) থেকে দূরে থাকতাম।' *(আদাঃ ৬৭৩নং, তিঃ)*

হযরত কুর্রাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর যুগে আমাদেরকে থামের ফাঁকে কাতার বাঁধতে নিষেধ করা হত এবং কেউ বাঁধলে তাকে সেখান থেকে দস্তুর মত তাড়িয়ে দেওয়া হত।' *(ইমাঃ ১০০২, ইখুঃ, ইহিঃ, হাঃ, বাঃ)*

এর কারণ হল এই যে, মাঝে থাম হওয়ার ফলে কাতার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর এই জন্য ইমাম বা একাকী নামাযীর জন্য দুই থামের মাঝে দাঁড়িয়ে নামায পড়া নিষেধের আওতাভুক্ত নয়। যেমন অধিক ভিঁড়ে মসজিদে জায়গা না থাকলে ঐ জায়গাতেও কাতার বাঁধা প্রয়োজনে বৈধ। *(মুত্বাসাঃ ২০৮-২০৯পৃঃ)*

পরিশেষে ইবনুল কাইয়েম (রঃ)-এর একটি মূল্যবান উক্তির উল্লেখ করে এ বিষয়ের ইতি টানি; তিনি বলেন, 'আল্লাহর সামনে বান্দার দুই সময় দাঁড়াতে হবে। নামাযে তাঁর সামনে দাঁড়াতে হয় এবং তাঁর সাক্ষাতের সময় (কিয়ামতে) তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রথম সময়ে (নামাযে) সঠিকভাবে দাঁড়াবে, তার জন্য দ্বিতীয় সময়ে (কিয়ামতে) দাঁড়ানো সহজ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি প্রথম সময়ে দাঁড়ানোতে অবহেলা প্রদর্শন করবে এবং তার যথার্থ হক আদায় করবে না, তার জন্য দ্বিতীয় সময়ে (কিয়ামতে) দাঁড়ানো কঠিন হয়ে যাবে।'

৫। ইমামের অনুসরণ করা ঃ

যথা নিয়মে ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজেব এবং তাঁর অন্যথা আচরণ গোনাহর কাজ।

ইমামের পশ্চাতে সাধারণতঃ মুক্তাদীর ৪ প্রকার আচরণ হতে পারে ঃ

(ক) অগ্রগমন ঃ অর্থাৎ ইমামের আগে-আগে রুকূ-সিজদা করা অথবা মাথা তোলা। এমন আচরণ গোনাহর কাজ। বরং জেনেশুনে স্বেচ্ছায় করলে নামাযই বাতিল হয়ে যাবে। *(মিন আহকামিস স্বালাহ, ইবনে উসাইমীন ৪৬পৃঃ)* যেমন ইমামের আগে তাকবীরে তাহরীমা দিলে নামাযের বন্ধনই শুদ্ধ হবে না। ভুলে দিয়ে ফেললে পুনরায় ইমামের তকবীর দেওয়ার পর তকবীর দিতে হবে। *(সাজাঃ ১৬৩পৃঃ)*

মহানবী ﷺ বলেন, "ইমাম এই জন্য বানানো হয়েছে যে, তার অনুসরণ করা হবে। সুতরাং তার বিরুদ্ধাচরণ করো না।" *(মুঃ ৪১৪নং)* "তোমরা ইমামের পূর্বে (কিছু করতে) তাড়াতাড়ি করো না। যখন সে 'আল্লাহু আকবার' বলে তখন তোমরাও 'আল্লাহু আকবার' বল। --- যখন সে রুকূ করে তখন তোমরা রুকূ কর। যখন সে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলে, তখন তোমরা 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্দ' বল।" *(ঐ ৪১৫নং)* "যখন সে রুকূ

করে তখন তোমরা রুকূ কর। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত রুকূ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে রুকূ না করে। যখন সে সিজদা করে, তখন তোমরা সিজদা কর এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদা করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সিজদা না করে।” *(আদাঃ ৬০৩নং)*

তিনি বলেন, “তোমাদের মধ্যে কি এ কথার কেউ ভয় করে না যে, ইমামের আগে মাথা তুললে তার চেহারা অথবা আকৃতি গাধার মত হয়ে যাবে।” *(বুঃ ৬৯১, মুঃ ৪২৭, আঃ, সুআঃ)*

একদা তিনি মুক্তাদীদের উদ্দেশ্যে বললেন, “হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম। অতএব আমার আগে তোমরা রুকূ করো না, সিজদা করো না, বসো না এবং সালাম ফিরো না।” *(আঃ, মুঃ, মিঃ ১১৩৭নং)*

(খ) পশ্চাদ্গমন ঃ অর্থাৎ ইমামের অনেক পিছনে দেরী করে রুকূ-সিজদা করা। ইমাম রুকূ বা সিজদা থেকে উঠে গেলেও মুক্তাদীর দেরী করে রুকূ বা সিজদাতে পড়ে থাকা। এমন করাও বৈধ নয়। কারণ, রসূল ﷺ বলেন, “যখন সে রুকূ করে তখন তোমরা রুকূ কর। যখন সে সিজদা করে, তখন তোমরা সিজদা কর।”

(গ) সহগমন ঃ অর্থাৎ চট্পট্ ইমামের সাথে সাথেই রুকূ-সিজদা ইত্যাদি করা। এরূপ করাটাও অবৈধ।

(ঘ) অনুগমন ঃ অর্থাৎ, ইমাম রুকূ-সিজদা করলে তবেই রুকূ-সিজদা ইত্যাদি করা। আর এরূপ করাটাই ওয়াজেব।

নবী মুবাশ্শির ﷺ বলেন, “তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত রুকূ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে রুকূ না করে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদা করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সিজদা না করে।”

সাহাবী বারা’ বিন আযেব (উক্ত আমলের ব্যাখ্যায়) বলেন, ‘আমরা নবী ﷺ-এর পিছনে নামায পড়তাম। যখন তিনি ‘সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ’ বলতেন, তখন আমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত সিজদা করার জন্য নিজের পিঠ ঝুকাত না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি মাটিতে নিজের কপাল রেখে নিতেন।’ *(বুঃ ৬৯০নং, মুঃ, আঃ, সুআঃ)*

ইমামের তকবীর বলার পর তকবীর বলতে হবে। ইমামের ‘আমীন’-এর ‘আ-’ বলতে শুরু করার পরেই ‘আমীন’ বলতে হবে।

কোন ওজরের ফলে ইমামের আগে হয়ে গেলে নামায বাতিল নয়। যেমন কোন ব্যথার কারণে অসহ্য যন্ত্রণায় তাড়াতাড়ি ইমামের আগে সিজদা থেকে উঠে পড়লে তা ধর্তব্য নয়।

তদনুরূপ কোন ওজরের ফলে কেউ ইমামের পিছনে থেকে গেলে তাও ধর্তব্য নয়। যেমন যদি কেউ সিজদায় গিয়ে ঘুমিয়ে গেল, অতঃপর পরের রাকআতে রুকূর সময় জেগে উঠল অথবা কোন বড় জামাআতে বা মসজিদের অন্য তলায় নামায পড়তে পড়তে সূরা ফাতিহা শোনার পর মাইকের শব্দ বন্ধ হওয়ার ফলে ইমামের রুকূ করার কথা ঠিকমত বুঝা না গেলে হঠাৎ করে জানতে পারা গেল যে, ইমাম ‘সামিআল্লাহু---’ বলে রুকূ থেকে উঠছেন -এ ক্ষেত্রে ছুটে যাওয়া রুক্ন নিজে নিজে আদায় করে বাকী নামাযে ইমামের অনুসরণ করবে। আর তার এ নামায হয়ে যাবে।

তবে যে জায়গা থেকে নামায ছুটে গেছে পরের রাকআতে সেই জায়গায় যদি ইমাম চলে

গিয়ে থাকেন, তাহলে তার এক রাকআত বাতিল হবে। সেখান থেকেই ইমামের অনুসরণ করে বাকী নামায পড়ে ইমামের (দুই) সালাম ফিরার পর উঠে ছুটে যাওয়া ঐ রাকআত নিজে পড়ে নেবে। *(মুমঃ ৪/২৬৪-২৬৫)*

ইমামের দুই সালাম ফিরার আগে মুক্তাদীর সালাম ফিরা বৈধ নয়। *(মবঃ ১২/৯১)*

মহানবী ﷺ বলেন, "হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম। সুতরাং তোমরা রুকূ, সিজদা, কিয়াম ও বৈঠকে, আর না সালামে আমার অগ্রবর্তী হয়ো না।" *(মুঃ, আঃ, মিঃ ১১৩৭নং)*

আফযল হল ইমামের দুই দিকে সালাম ফিরার পরই সালাম ফিরা। অবশ্য যদি কেউ ইমামের ডান দিকে সালাম ফিরার পর ডান দিকে এবং তাঁর বাম দিকে সালাম ফিরার পর বাম দিকে সালাম ফিরে, তাহলে তা দোষের নয়। *(মুমঃ ৪/২৬৭)*

অনেকের মতে ইমামের দুই সালাম ফিরার আগে যদি মুক্তাদী সালাম ফিরে দেয় অথবা বাকী নামায পড়ার জন্য উঠে যায়, তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে নফলে পরিণত হয়ে যায়। *(ফাতওয়া শায়খ সা'দী ১৭৪পৃঃ, মুত্বাসা ৯৭পৃঃ)*

জ্ঞাতব্য যে, গুপ্ত বিষয়সমূহ ইমামের আগে-পিছে বা সাথে-সাথে হলে কোন দোষের নয়। যেমন সির্রী নামাযে সূরা ফাতিহা, কোনও নামাযে তাশাহহুদ ইমামের আগে বা সাথে সাথে পড়া হলে তাতে কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, সাধারণতঃ এর শুরু ও শেষ বুঝা যায় না এবং এ ব্যাপারে ইমামের অনুসরণ করতে মুক্তাদী আদিষ্ট নয়। *(মুমঃ ৪/২৬৭-২৬৮)*

বুকে হাত বাঁধেন না এমন ইমামের পশ্চাতে বুকে হাত বেঁধে এবং রফয়ে য়্যাদাইন করেন না এমন ইমামের পশ্চাতে রফয়ে য়্যাদাইন করে মুক্তাদীর নামায পড়া ইমামের বিরুদ্ধাচরণ নয়। যেমন যে ইমাম তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতবিশিষ্ট নামাযের শেষ বৈঠকে বাম পা-কে ডান পায়ের রলার নিচে বের করে বসেন না, তাঁর পিছনে মুক্তাদী ঐরূপ বসলে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ হয় না।

জালসায়ে ইস্তিরাহাহ করেন না এমন ইমামের পিছনে নামায পড়লে প্রথম বা তৃতীয় রাকআতের সিজদা থেকে সরাসরি উঠে গেলে মুক্তাদীর জন্য বসা বৈধ নয়। কারণ, এটি ইমামের বাহ্যিক কর্ম। অতএব তিনি দাঁড়িয়ে গেলে মুক্তাদীর বসে যাওয়া চলবে না। *(মুমঃ ২/৩১২)*

অবশ্য অনেকে বলেন, এটি হাল্কা বৈঠক। এতে ইমামের বিরুদ্ধাচরণ হয় না। অতএব ইমাম জালসায়ে ইস্তিরাহাহর সুন্নত পালন না করলেও মুক্তাদীর হাল্কা বসে সাথে সাথে উঠে গিয়ে তা পালন করায় দোষ নেই।

ইমাম ফজরের নামাযে হাত তুলে কুনুত পড়লে মুক্তাদীর জন্য হাত তুলে আমীন বলে তাঁর অনুসরণ করা জরুরী। তবে সেই ইমামের পিছনে নামায পড়া উত্তম, যে ফজরে কুনুত পড়ে না। যেহেতু তা বিদআত। *(ফউঃ ১/৩৯৩)*

ইমাম সালাম ফিরার পর মুক্তাদীদের প্রতি ফিরে না বসা পর্যন্ত মুক্তাদীর উঠে মসজিদ ত্যাগ করা উচিত নয়। *(মুমঃ ৪/৪৩২, ফইঃ ১/৩৯১)*

ইমাম তাশাহহুদে দেরী করলে মুক্তাদীর চুপচাপ বসে থাকা উচিত নয়। বরং এ সময়ে

সহীহ নববী দুআ দ্বারা মুনাজাত করে আল্লাহর কাছে বহু কিছু চেয়ে নেওয়া উচিত। কারণ, এটা হল দুআ কবুল হওয়ার সময়। অনুরূপ প্রথম তাশাহহুদে দেরী করলে আধা তাশাহহুদ পড়ে নীরব বসে থাকা উচিত নয়। বরং তাশাহহুদের পর দরূদ এবং তার পরেও সময় থাকলে মুনাজাত করা উচিত। আর এ ব্যাপারে তাশাহহুদের বর্ণনায় (১ম খন্ডে) আলোচনা করা হয়েছে।

সতর্কতার বিষয় যে, তাশাহহুদের বৈঠকে ইমামকে দেরী করতে দেখে অনেকে গলা ঝাড়তে শুরু করে। এমন করা তাদের ধৈর্যহীনতা ও অজ্ঞতার পরিচয়।

ইমামের পশ্চাতে ক্বিরাআত

ইমাম সশব্দে ক্বিরাআত করলে মুক্তাদীকে ক্বিরাআত করতে হয় না। বিশেষ করে সশব্দে কোন সূরা পাঠ করা মুক্তাদীর জন্য বৈধ নয়। বরং ইমামের ক্বিরাআত চুপ করে শুনতে হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

(وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا)

অর্থাৎ, যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শোন এবং চুপ থাক। *(কুঃ ৭/২০৪)*

সাহাবাগণ নামাযে সশব্দে ক্বিরাআত পড়তেন। একদা কোন জেহরী নামায থেকে সালাম ফিরে আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ কি আমার সাথে (সশব্দে) কুরআন পড়েছে?” এক ব্যক্তি বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, “তাতেই আমি ভাবছি যে, আমার ক্বিরাআতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে কেন।” আবূ হুরাইরা বলেন, এই কথা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শোনার পর লোকেরা তাঁর সাথে জেহরী নামাযে ক্বিরাআত করা থেকে বিরত হয়ে গেল। *(মাঃ, আঃ, সুআঃ, মিঃ ৮৫৫নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, “যার ইমাম আছে, তার ইমামের ক্বিরাআত তার ক্বিরাআত।” *(আঃ, ইমাঃ, সজাঃ ৬৪৮৭নং)*

তিনি বলেন, “ইমাম তো এই জন্য বানানো হয় যে, তার অনুসরণ করা হবে। অতএব সে যখন ‘আল্লাহু আকবার’ বলে, তখন তোমরা ‘আল্লাহু আকবার’ বল এবং যখন ক্বিরাআত করে তখন চুপ থাক।” *(আদাঃ, নাঃ, ইআশাঃ, ইমাঃ, বাঃ, সজাঃ ২৩৫৮-২৩৫৯নং)*

এ হল সাধারণ হুকুম। জেহরী নামাযে সশব্দে মুক্তাদী কোন ক্বিরাআত করতে পারবে না। কিন্তু নিঃশব্দে কেবল সূরা ফাতিহা পড়ার ব্যাপারটা ব্যতিক্রম। কারণ, সূরা ফাতিহার রয়েছে পৃথক বৈশিষ্ট্য।

মহানবী ﷺ বলেন,

“সেই ব্যক্তির নামায হয় না, যে ব্যক্তি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।” *(বুঃ, মুঃ, আআঃ, বাঃ, ইগঃ ৩০২নং)*

“সেই ব্যক্তির নামায যথেষ্ট নয়, যে তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।” *(দারাঃ, ইহিঃ, ইগঃ*

৩০২নং)

"যে ব্যক্তি এমন কোনও নামায পড়ে, যাতে সে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না, তার ঐ নামায (গর্ভচ্যুত ভ্রূণের ন্যায়) অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ।" *(মুঃ, আআঃ, মিঃ ৮২৩নং)*

"আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি নামায (সূরা ফাতিহা)কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' *(মুঃ ৩৯৫, আদাঃ, তিঃ, আআঃ, প্রমুখ, মিঃ ৮২৩নং)*

"উম্মুল কুরআন (কুরআনের জননী সূরা ফাতিহা) এর মত আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল্‌ তাওরাতে এবং ইঞ্জিলে কোন কিছুই অবতীর্ণ করেন নি। এই (সূরাই) হল (নামাযে প্রত্যেক রাকআতে) পঠিত ৭টি আয়াত এবং মহা কুরআন, যা আমাকে দান করা হয়েছে।" *(নাঃ, হাঃ, তিঃ, মিঃ ২ ১৪২ নং)*

সাহাবী উবাদাহ বিন সামেত বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর পশ্চাতে ফজরের নামায পড়ছিলাম। তিনি ক্বিরাআত পড়তে লাগলে তাঁকে ক্বিরাআত ভারী লাগল। সালাম ফিরার পর তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ তোমরা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত কর।" আমরা বললাম, 'হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল! (আমরা তো তা করি।) তিনি বললেন, "না, ক্বিরাআত করো না। অবশ্য সূরা ফাতিহা পড়ো। কারণ, যে তা পড়ে না তার নামায হয় না।" *(আদাঃ, তিঃ, নাঃ, দারাঃ, হাঃ, মিঃ ৮২৩নং)*

পক্ষান্তরে ইমাম জেহরী নামাযের শেষ এক বা দুই রাকআতে অথবা সিরী নামাযে নিঃশব্দে ক্বিরাআত করলে অথবা তাঁর ক্বিরাআত শুনতে না পাওয়া গেলেও মুক্তাদী সূরা ফাতিহা অবশ্যই পড়বে এবং সেই সাথে অন্য সূরাও পড়তে পারে।

যে আবূ হুরাইরা বলেন, 'এই কথা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শোনার পর লোকেরা তাঁর সাথে জেহরী নামাযে ক্বিরাআত করা থেকে বিরত হয়ে গেল।' সেই (সূরা ফাতিহার গুরুত্ব নিয়ে হাদীস বর্ণনাকারী) আবূ হুরাইরাকে প্রশ্ন করা হল যে, (সূরা ফাতিহার এত গুরুত্ব হলে) ইমামের পশ্চাতে কিভাবে পড়া যাবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি তোমার মনে মনে পড়ে নাও। কারণ, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি নামায (সূরা ফাতিহা)কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' *(মুঃ ৩৯৫, আদাঃ, তিঃ, আআঃ, প্রমুখ, মিঃ ৮২৩নং)*

যদি বলেন, আদবের নিয়ম এই যে, জামাআতের মধ্যে একজন কথা বলবে এবং বাকী সবাই চুপ থাকবে। সবাই কথা বললে শ্রোতা বুঝতে পারে না এবং সম্মানিত শ্রোতার শানে বেআদবী হয়।

তাহলে আমরা বলব যে, তাই যদি হয়, তাহলে ইস্তিফতাহ, তাসবীহ, তাশাহহুদ ইত্যাদি কেন সবাই বলে থাকে? তাতে কি বেআদবী হয় না? তা কি বুঝতে আল্লাহর অসুবিধা হয় না? তাছাড়া একই সাথে বিশ্বের কত শত মুসলমান একই সময়ে এক সাথে কত ইমাম, কত নফল নামাযী নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ে, তখন কি এই অসুবিধা হয় না? মানুষের সাথে

আল্লাহর তুলনা? নাকি আল্লাহর কুদরতে সন্দেহ? আসলে যেখানে দলীল আছে সেখানে আকেল দ্বারা কাজ নেওয়া আক্কেলের কাজ নয়।

প্রকাশ থাকে যে, যদি কোন কারণবশতঃ মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে যায়, তাহলে তাতে তার নামায হয়ে যাবে। ঐ রাকআত তাকে কাযা করতে হবে না। কারণ, ভুলের আমল ধর্তব্য নয়। *(ফইঃ ১/২৬৪)*

সির্রী নামাযে ইমামের পিছনে মুক্তাদী সিজদার আয়াত পাঠ করলে তেলাঅতের সিজদা করতে পারে না। তেলাঅতের সিজদা সুন্নত। আর ইমামের অনুসরণ ওয়াজেব। অতএব সুন্নত পালন করতে গিয়ে গোনাহ করতে কেউ পারে না। আবার এ কথা জেনেশুনে কেউ সিজদা করলে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে। *(ঐ ১/২৯০)*

মুক্তাদীর জামাআতে শামিল হওয়ার বিভিন্ন অবস্থা

জামাআত শুরু হয়ে যাওয়ার পর কোন নামাযী নামাযে শামিল হতে চাইলে নিয়মিত দুই হাত তুলে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে তাকে তাই করতে হবে, যা ইমাম করছেন। তাড়াহুড়ো না করে ইমাম যে অবস্থায় থাকবেন সেই অবস্থায় ধীরে-সুস্থে শামিল হতে হবে।

মহানবী ﷺ বলেন, “নামাযে আসার সময় ধীর-স্থিরতার সাথে এস এবং তাড়াহুড়ো করে এসো না। এরপর যা পাবে তা পড়ে নাও এবং যা ছুটে যাবে তা পুরা করে নাও।” *(আঃ, বুঃ, মুঃ, সজাঃ ২৭৫নং)*

তিনি বলেন, “তোমাদের কেউ নামাযে এলে এবং ইমাম কোন অবস্থায় থাকলে, সে যেন তাই করে যা ইমাম করছে।” *(তিঃ, সিসঃ ১১৮৮, সজাঃ ২৬১নং)*

ইমাম সির্রী নামাযে প্রথম রাকআতে কিয়াম অবস্থায় থাকলে মুক্তাদী যথানিয়মে দুই হাত তুলে তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে ইস্তিফতাহর দুআ পড়ে ‘আঊযু বিল্লাহ-বিসমিল্লাহ’ পড়ে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করবে। কিন্তু ইমামের রুকূ চলে যাওয়ার আশঙ্কা হলে কেবল ‘আঊযু বিল্লাহ-বিসমিল্লাহ’ পড়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। ফাতিহা পাঠ করতে করতে ইমাম রুকূ চলে গেলে পুরো না পড়েই রুকূতে যেতে হবে। *(ফইঃ ১/২৫৯)* এ ক্ষেত্রে ফাতিহা পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা বৈধ নয়।

জেহরী নামাযে ইমামের সূরা ফাতিহা বা অন্য সূরা পাঠ করা অবস্থায় শামিল হলে মুক্তাদী ইস্তিফতাহ বা সানা পড়বে না। বরং চুপে চুপে কেবল ‘আঊযু বিল্লাহ-বিসমিল্লাহ’ পড়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। *(মুমঃ ৩/৩৯৪)*

ইমাম রুকূতে চলে গেলে মুক্তাদী তাড়াহুড়ো না করে ধীরে-সুস্থে যথানিয়মে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে তাকবীরে তাহরীমা দেওয়ার পর রুকুতে যাওয়ার তকবীর পড়ে রুকূতে যাবে এবং রুকূর তসবীহ পাঠ করবে। অবশ্য সময় সংকীর্ণ বুঝলে কেবল তাহরীমার তকবীরই যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তকবীরের পর বুকে হাতও রাখবে না এবং সানা বা ফাতিহাও পড়বে না। কারণ, ইমামের অনুসরণ জরুরী। *(ফইঃ ১/২৫৫, মুমঃ ৪/২৪২-২৪৩)*

রুকূ পেলে রাকআত গণ্য ঃ

ইমামের সাথে রুকূ পেলে রাকআত গণ্য হবে কি না সে বিষয়টি বিতর্কিত। বর্তমান বিশ্বের সত্যানুসন্ধানী উলামাগণের সুচিন্তিত মতানুসারে রুকু পেলে রাকআত গণ্য হবে।

এ ব্যাপারে যে সকল স্পষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে কিছু কিছু দুর্বলতা থাকলেও এক জামাআত সাহাবার আমল এ কথার সমর্থন করে।

এ ব্যাপারে ইবনে মাসউদ, ইবনে উমার, যায়দ বিন সাবেত, আব্দুল্লাহ বিন আম্র প্রভৃতি কর্তৃক রুকূ পেলে রাকআত গণ্য হওয়ার কথা সহীহ সনদে বর্ণিত আছে। পক্ষান্তরে আবূ বাকরার সহীহ হাদীসের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ থাকলেও অনেকে হাদীসটিকে রুকূ পেলে রাকআত গণ্য হওয়ার দলীল হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আবূ বাকরাহ একদা মসজিদ প্রবেশ করতেই দেখলেন নবী ﷺ রুকূতে চলে গেছেন। তিনি তাড়াহুড়ো করে কাতারে শামিল হওয়ার আগেই রুকূ করলেন। অতঃপর রুকূর অবস্থায় চলতে চলতে কাতারে গিয়ে শামিল হলেন। একথা নবী ﷺ-কে বলা হলে তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন, “আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করুন। আর তুমি দ্বিতীয় বার এমনটি করো না। (অথবা আর তুমি ছুটে এসো না। অথবা তুমি নামায ফিরিয়ে পড়ো না।)” *(বুঃ, আদাঃ, মিঃ ১১১০নং)*

উক্ত হাদীসে রুকূ পেলে রাকআত পেয়ে নেওয়ার কথা ইঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আর একটি সুন্নতের কথা বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করে ইমামকে রুকূর অবস্থায় দেখে তাহলে কাতারে শামিল হওয়ার আগেই তার জন্য রুকূ করা সুন্নত। তাতে যদি সে ইমামের মাথা তোলার পর কাতারে শামিল হয় তাহলেও তার ঐ রাকআত গণ্য হয়ে যাবে। *(তামিঃ ২৮৬পৃঃ)*

ইবনুয যুবাইর ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে যখন কেউ মসজিদে প্রবেশ করে দেখে যে (জামাআতের) লোকেরা রুকূর অবস্থায় আছে, তাহলে সে যেন প্রবেশ করেই রুকূ করে। অতঃপর রুকূর অবস্থায় চলতে চলতে কাতারে শামিল হয়। কারণ, এটাই হল সুন্নাহ।” *(ত্বাব, আওসাত্ব, আরাঃ, ইখুঃ ১৫৭১, হাঃ ১/২১৪, বাঃ ৩/১০৬, সিসঃ ২২৯নং, ইগঃ ২/২৬০-২৬৫)*

মোট কথা, কেউ যদি ইমামকে রুকূর অবস্থায় পেয়ে তাঁর সাথে রুকূর (কমপক্ষে একবার) তসবীহ পড়তে সক্ষম হয়, তাহলে তার সে রাকআত গণ্য হয়ে যাবে। কিয়াম ও সূরা ফাতিহা না পেলেও রাকআত হয়ে যাবে। সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না। কিন্তু কিয়াম অবস্থায় পড়ার সুযোগ না পেয়ে ইমামের সাথে রুকূতে চলে গেলে মুক্তাদীর হক্কে তা মার্জনীয়। কারণ, সাধারণ দলীল থেকে এ ব্যাপারটাও ব্যতিক্রম। *(মুমঃ ৪/২৪৪)* পরন্তু ইচ্ছা করে যদি কেউ কিয়ামে শামিল না হয়ে (লম্বা তারাবীহর) রুকূতে শামিল হয়, তাহলে তার ঐ রাকআত হবে না। কারণ সে ইচ্ছাকৃত নামাযের একটি রুক্ন কিয়াম ও সূরা ফাতিহা ত্যাগ করে।

সতর্কতার বিষয় যে, ইমাম রুকূ অবস্থায় থাকলে মসজিদে প্রবেশ করে অনেক মুক্তাদী তাকে রুকূ পাইয়ে দেওয়ার আশায় গলা ঝাড়া দিয়ে ইমামকে সতর্ক করে। এমন করা বৈধ নয়।

❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

ইমাম কওমার অবস্থায় থাকলে যথানিয়মে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে তাকবীরে তাহরীমা দেওয়ার পর কওমার দুআ পাঠ করবে। এ ক্ষেত্রে আর রাকআত গণ্য হবে না।

ইমাম সিজদায় চলে গেলে যথানিয়মে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে তাকবীরে তাহরীমা দেওয়ার পর (বুকে হাত না বেঁধে) আবার তকবীর বলে সিজদায় গিয়ে সিজদার তসবীহ পাঠ করবে।

আর এ ক্ষেত্রেও রাকআত গণ্য হবে না এবং ইমামের দ্বিতীয় রাকআতে কিয়ামে দাঁড়ানোর সময় ইস্তিফতাহও পড়বে না। বরং 'আঊযু বিল্লাহ-বিসমিল্লাহ' পড়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "আমরা সিজদারত থাকা অবস্থায় তোমরা নামাযে এলে তোমরাও সিজদা কর এবং সেটাকে কিছুও গণ্য করো না।" *(বুঃ ৫৫৬, মুঃ ৬০৭-৬০৮, আদাঃ ৮৯৩নং)*

ইমাম দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে থাকলে মুক্তাদী যথানিয়মে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে তাকবীরে তাহরীমা দেওয়ার পর পুনরায় তকবীর দিয়ে (বুকে হাত না বেঁধে) সরাসরি ইমামের মত বসে যাবে এবং ঐ বৈঠকের দুআ পাঠ করবে।

ইমাম শেষ সিজদায় থাকলেও তাঁর জন্য উঠে দাঁড়ানোর অপেক্ষা বৈধ নয়। বরং যথানিয়মে সিজদায় যেতে হবে এবং যথানিয়মে ইমামের সাথে উঠে দাঁড়িয়ে 'আঊযু বিল্লাহ-বিসমিল্লাহ' পড়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।

এখানে দাঁড়িয়ে থেকে একটা সিজদা খামাখা নষ্ট করা উচিত নয়। কারণ, মহানবী ﷺ বলেন, "তুমি আল্লাহর জন্য অধিকাধিক সিজদা করাকে অভ্যাস বানিয়ে নাও; কারণ যখনই তুমি আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করবে তখনই আল্লাহ তার বিনিময়ে তোমাকে এক মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং তার দরুন একটি গোনাহ মোচন করবেন।" *(মুঃ ৪৮৮নং তিঃ, নাঃ, ইমাঃ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক বান্দাই, যখন সে আল্লাহর জন্য একটি সিজদা করে তখনই তার বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য একটি সওয়াব লিপিবদ্ধ করেন, তার একটি গোনাহ ক্ষালন করে দেন এবং তাকে একটি মর্যাদায় উন্নীত করেন। অতএব তোমরা বেশী বেশী করে সিজদা কর।" *(ইমাঃ, সতাঃ ৩৭৯নং)*

বলাই বাহুল্য যে, ইমামের রুকূ থেকে মাথা তোলার পর রাকআতের কোন অংশে শামিল হলে ঐ রাকআত গণ্য হবে না। ইমাম সালাম ফিরে দিলে ঐ নামাযী সালাম না ফিরে তকবীর দিয়ে উঠে ছুটে যাওয়া ঐ রাকআত একাকী যথানিয়মে পূরণ করে সালাম ফিরবে।

অনুরূপ দ্বিতীয় রাকআতে শামিল হলে অনুরূপভাবে রাকআত গণ্য ও অগণ্য হবে।

ইমাম তাশাহহুদে থাকলে মুক্তাদী যথানিয়মে দাঁড়িয়ে দুই হাত তুলে তাকবীরে তাহরীমা দেওয়ার পর পুনরায় তকবীর দিয়ে (বুকে হাত না বেঁধে) সরাসরি ইমামের মত বসে যাবে এবং ঐ তাশাহহুদের দুআ পাঠ করবে। এর ফলে কোন কোন ৪ রাকআতবিশিষ্ট নামাযে ৩ বার, ৩ রাকআতবিশিষ্ট নামাযে ৩ থেকে ৪ বার এবং ২ রাকআতবিশিষ্ট নামাযে ২ বার তাশাহহুদ হয়ে যেতে পারে।

যেমন যোহর, আসর বা এশার নামাযের প্রথম তাশাহহুদে জামাআতে শামিল হলে মুক্তাদী ইমামের সাথে ২ রাকআত নামায পড়ে শেষ তাশাহহুদ পড়বে। আর তার হবে প্রথম তাশাহহুদ। তারপর ইমামের সালাম ফিরার পর তকবীর দিয়ে উঠে বাকী ২ রাকআত নামায পড়ে শেষ তাশাহহুদ পাঠ করবে। এইভাবে মুক্তাদীর হয়ে যাবে ৩ তাশাহহুদ।

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় রাকআতে বা শেষ তাশাহহুদে শামিল হলে ইমামের সালাম ফিরার

পর উঠে বাকী নামায আদায় করলেও যথানিয়মে তার ৩টি তাশাহহুদ হবে।

মাগরেবের নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে রুকূর পর বা প্রথম তাশাহহুদে জামাআতে শামিল হলে ইমামের সাথে শেষের রাকআত পড়ে শেষ তাশাহহুদ পড়বে। তারপর ইমামের সালাম ফিরার পর তকবীর দিয়ে উঠে বাকী ২ রাকআত নামায পড়তে প্রথম যে রাকআত সে একাকী পড়বে সেটি তার দ্বিতীয় রাকআত। ফলে সে তার হিসাবে সে প্রথম তাশাহহুদ পড়বে। তারপর উঠে তৃতীয় রাকআত পড়ে শেষ তাশাহহুদ পাঠ করবে। এইভাবে ঐ মুক্তাদীর হয়ে যাবে ৩ রাকআতে ৪টি তাশাহহুদ।

কিন্তু এই নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে রুকূর আগে বা রুকূতে শামিল হলে প্রত্যেক রাকআতে ১টি করে মোট ৩টি তাশাহহুদ হয়ে যাবে। যেমন শেষ তাশাহহুদে শামিল হলেও যথানিয়মে ৩টি তাশাহহুদ হবে।

ফজরের নামাযে দ্বিতীয় রাকআতে অথবা তাশাহহুদে শামিল হলে ২ রাকআত নামাযে ২টি তাশাহহুদ হয়ে যাবে।

অবশ্য তাশাহহুদ বেশী হওয়ার জন্য কোন সহু সিজদা লাগবে না।

প্রকাশ থাকে যে, মুক্তাদী ইমামের সালাম ফিরার পর উঠে একাকী যে নামায পড়বে সেগুলো তার শেষ রাকআত। অতএব শেষ রাকআতগুলো সে একাকী যে নিয়মে পড়ে ঠিক সেই নিয়মে আদায় করবে। *(মবঃ ১৭/৬৬, ১৮/১০৭, ফইঃ ১/৩০৮)* জেহরী নামায হলে জেহরী ক্বিরাআতে যদি পাশের নামাযীর ডিষ্টার্ব না হয়, তাহলে জেহরী, নচেৎ সির্রী ক্বিরাআত করে নামায শেষ করবে। যেহেতু একাকী নামাযে জোরে জোরে ক্বিরাআত বাধ্যতামূলক নয়। *(ফইঃ ১/৩৪০)*

ইমাম সালাম ফিরে দিলে আর জামাআতে শামিল না হয়ে অন্য নামাযী থাকলে তাকে নিয়ে দ্বিতীয় জামাআত করে নামায পড়বে।

ইমাম প্রথম সালাম ফিরে শেষ করলেই মসবূক নিজের বাকী নামায পড়ার জন্য উঠতে পারে। কারণ, এক সালামেও নামায হয়ে যায়। তবে সতর্কতার বিষয় যে, তাঁর সালাম শুরু করার সাথে সাথে উঠবে না। পক্ষান্তরে অনেকে বলেছেন, ইমাম যতক্ষণ দ্বিতীয় সালাম থেকে ফারেগ না হয়েছেন, ততক্ষণ উঠা বৈধ নয়। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, কোন মসবূক যেন ইমামের উভয় সালাম ফিরে শেষ না করা পর্যন্ত তার বাকী নামায আদায় করতে না উঠে। *(মুমুত্বাসাঃ ৪১পৃঃ)* মহানবী ﷺ বলেন, "হে লোক সকল! আমি তোমাদের ইমাম। অতএব আমার আগে তোমরা রুকূ করো না, সিজদা করো না, বসো না এবং সালাম ফিরো না।" *(আঃ, মুঃ)*

অনেকে বলেছেন, ইমামের দুই সালাম ফিরার আগে উঠে গেলে মসবূকের নামায বাতিল হয়ে যাবে। *(ফাতাওয়াশ্‌ শায়খ ইবনি সা'দী ১৭৪পৃঃ, মুত্বাসাঃ ৯৬-৯৭পৃঃ)* অতএব নামাযী সাবধান!

মসবূকের ইক্তিদা

যদি কোন নামাযী মসজিদে এসে দেখে যে জামআত শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু কিছু মসবূক (যাদের কিছু নামায ছুটে গেছে তারা) উঠে একাকী নামায পূর্ণ করছে, তাহলে জামাআতের সওয়াব লাভের আশায় ঐ নামাযীর কোন এক মসবূকের ডাইনে দাঁড়িয়ে তার ইক্তিদা করে নামায পড়া বৈধ। *(ফইঃ ১/২৬৬)*

কিন্তু শায়খ ইবনে উষাইমীন (রঃ) বলেন, এর যেহেতু সঠিক প্রমাণ নেই এবং অনেকে এরূপ শুদ্ধ নয় বলেছেন, সেহেতু তা না করাই উত্তম। আর মহানবী ﷺ বলেন, "যে বিষয়ে সন্দেহ আছে সে বিষয় বর্জন করে তাই কর যাতে সন্দেহ নেই।" *(তিঃ ২৫১৮, সজাঃ ৩৩৭৮নং)* "সুতরাং যে সন্দিহান বিষয়াবলী থেকে দূরে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জতকে বাঁচিয়ে নেবে।" *(বুঃ ৫২, মুঃ ১৫৯৯নং)* বলা বাহুল্য, অনেকে তা জায়েয বললেও না করাটাই উত্তম। *(ফউঃ ১/৩৭১, লিবামাঃ ৫৩-৫৪পৃঃ)*

আয়াতের জবাবে মুক্তাদীর দুআ বলা

(নিঃশব্দে) কতিপয় আয়াতের জবাব দেওয়া এবং (যে কোনও নামাযে) রহমতের আয়াত পঠিত হলে সেই সময় আল্লাহর রহমত ভিক্ষা করা এবং আযাবের আয়াত পঠিত হলে সেই সময়ে আল্লাহর আযাব থেকে পানাহ চাওয়া মুক্তাদীর জন্যও মুস্তাহাব। অবশ্য শর্ত হল, তাতে যেন ইমামের ক্বিরাআত শোনাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

অতএব ইমাম দুআ পড়লে মুক্তাদীও পড়বে। নচেৎ ইমাম একটানা ক্বিরাআত করে গেলে আয়াতের জবাবে বা অন্য কোন দুআ পড়া বৈধ হবে না। কারণ তাতে মুস্তাহাব পালন করতে গিয়ে আদেশ লংঘন করা হবে। যেহেতু ইমাম ক্বিরাআত করলে মুক্তাদী চুপ থেকে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে আদিষ্ট হয়েছে। *(মুমঃ ৩/৩৯৪-৩৯৫)*

ইমাম ভুল করলে মুক্তাদীর কর্তব্য

ইমাম কোন ভুল করলে মুক্তাদীর তা ধরিয়ে দেওয়া বা সংশোধন করে দেওয়া কর্তব্য। আর বড় মারাত্মক ভুলে (যেমন নামাযের কোন শর্ত বা রুক্ন ছাড়াতে) তাঁর অনুসরণ করা মোটেই উচিত নয়।

ইমাম ভুলে বিনা ওযূতে নামায পড়ালে এবং মুক্তাদীরাও তা জানতে না পারলে, অতঃপর নামায শেষ করার পর জানা গেলে মুক্তাদীদের নামায শুদ্ধ। অবশ্য ইমামকে সে নামায

পুনরায় পড়তেই হবে। *(মুমঃ ৪/৩৩৯, লিবামাঃ ৯৯পৃঃ)*

মহানবী ﷺ বলেন, “লোকেরা তোমাদের ইমামতি করে; সুতরাং তারা যদি ঠিকভাবে পড়ায় তাহলে তা তোমাদের জন্য এবং তাদের জন্যও। (অর্থাৎ, তোমাদের নামায হয়ে যাবে এবং তাদেরও।) পক্ষান্তরে তারা যদি ভুল পড়ায় তাহলে তোমাদের (নামায শুদ্ধ) হয়ে যাবে এবং ওদের (নামায শুদ্ধ) হবে না।” *(আঃ, বুঃ, মিঃ ১১৩৩নং)*

একদা হযরত উমার ؓ অপবিত্র অবস্থায় ভুলে লোকেদের ইমামতি করলেন। অতঃপর তিনি নিজে নামায ফিরিয়ে পড়লেন আর লোকেরা পড়ল না। *(নাআঃ ৩/ ১৪৭)*

নামায পড়া অবস্থায় ইমাম যদি জানতে পারে যে, সে নাপাকে আছে অথবা তার ওযূ ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু লজ্জায় সে নামায ত্যাগ না করে পড়ে শেষ করে তাহলেও মুক্তাদীদের নামায শুদ্ধ। অবশ্য ইমামের নামায বাতিল এবং তার জন্য জেনেশুনে নাপাকে নামায পড়া হারাম।

পক্ষান্তরে মুক্তাদী যদি জানতে পারে যে, ইমাম নাপাক অবস্থায় নামায পড়াচ্ছেন, তাহলে তারও নামায বাতিল। *(মুমঃ ৪/৩৪০)*

বলা বাহুল্য, ইমাম হোক চাহে মুক্তাদী নামায পড়তে পড়তে কারো ওযূ নষ্ট হয়ে গেলে অথবা নাপাকে আছে মনে পড়লে সে নাক ধরে নামায ছেড়ে বের হয়ে আসবে।

নবী মুবাশ্‌শির ﷺ বলেন, “যখন তোমাদের কেউ নামাযে বেওযূ হয়ে যায়, তখন সে যেন নাক ধরে নামায ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে।” *(আদাঃ ১১১৪নং)*

নাক ধরে বেরিয়ে আসার পশ্চাতে হিকমত এই যে, যাতে লোকেরা মনে করে, তার নাক দিয়ে হয়তো রক্ত আসছে। আর এটা মিথ্যা নয়; বরং এটি এক প্রকার ছদ্মকর্ম, যা তার জন্য বৈধ করা হয়েছে। যাতে সে লোকেদেরকে লজ্জা করলে শয়তান তাকে নামায ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধা না দেয়।

۞ ইমামের ইমামতি করায় কোন সমস্যা দেখা দিলে

ইমামতি করতে করতে ইমামের কোন প্রতিবন্ধক বা সমস্যা সৃষ্টি হলে; যেমন ওযূ নষ্ট হয়ে গেলে, অথবা ওযূ নেই বা ফরয গোসল বাকী আছে মনে পড়লে, অথবা অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে, অথবা গলার আওয়ায বন্ধ হয়ে গেলে, অথবা নাক থেকে রক্ত পড়লে, অথবা প্রস্রাব-পায়খানার বেগ বেসামাল হয়ে উঠলে, ইমাম তৎক্ষণাৎ একজন উপযুক্ত মুক্তাদীকে ইমাম বানিয়ে নাক ধরে মসজিদ ত্যাগ করবেন।

নামায পড়ার পড় ইমাম কাপড়ে নাপাকী দেখলে সকলের নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। নামায পড়তে পড়তে দেখলে যদি তা সেই অবস্থাতেই দূর করা সম্ভব হয় তো উত্তম। নচেৎ নামায ত্যাগ করে বেরিয়ে এসে কাপড় পবিত্র করা জরুরী। *(মুমঃ ৪/৩৪৩)*

নামায পড়তে দাঁড়িয়ে হযরত উমার ؓ-কে খঞ্জরাঘাত করা হলে তিনি হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফকে আগে বাড়িয়ে ইমামতি করতে ইঙ্গিত করলে তিনি হাল্কাভাবে নামায পড়িয়ে শেষ করলেন। *(বুঃ ৩৭০০নং)*

একদা নামায পড়তে পড়তে হযরত আলী ؓ-এর নাক দিয়ে রক্ত পড়া শুরু হলে তিনি

একজনকে তার হাত ধরে আগে বাড়িয়ে দিয়ে নিজে বেরিয়ে এলেন। *(সুনান সাঈদ বিন মানসূর, ফিসুঃ উর্দু ১৫৬পৃঃ)*

কোন মসবূক (যার দু-এক রাকআত ছুটে গেছে এমন মুক্তাদী)কেও ইমামতি করতে আগে বাড়িয়ে দেওয়া ইমামের জন্য বৈধ।

সেই সময় কোন অমুক্তাদী (তখনও জামাআতে শামিল হয়নি এমন) লোককেও ইমাম করা যায়। এ ক্ষেত্রে সে ইমামের তরতীব অনুযায়ী নামায পড়বে। মুক্তাদীদের নামায শেষ হয়ে গেলে তারা বসে তার সালাম ফিরার অপেক্ষা করবে। (অর্থাৎ, তার অনুসরণে নির্ধারিত রাকআত অপেক্ষা বেশী পড়বে না।) অতঃপর সে তার বাকী নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরলে মুক্তাদীরাও তার সাথে সালাম ফিরবে। *(ফইঃ ১/২৭৩, আইঃ ২৪৫-২৫১পৃঃ)*

ইমাম যদি কাউকে নায়েব করতে সুযোগ না পান, তাহলে উপযুক্ত একজন মুক্তাদীর অগ্রসর হয়ে ইমামতি করে নামায সম্পন্ন করা কর্তব্য। অবশ্য এও বৈধ যে, ইমাম নামায ত্যাগ করলে মুক্তাদীরা নিজে নিজে একাকী নামায সম্পন্ন করবে। যেমন হযরত মুআবিয়াকে ইমামতি করা অবস্থায় আক্রমণ করা হলে লোকেরা নিজে নিজে নামায শেষ করেছিল। *(মুমঃ ৪/৩৪১, ফিসুঃ উর্দু ১৫৬পৃঃ)*

۞ ইমামের শরমগাহ খোলা দেখলে

নামায পড়তে পড়তে মুক্তাদী ইমামের শরমগাহ খোলা দেখলে চুপ থেকে তাঁর ইক্তিদা করে যাওয়া বৈধ নয়। কারণ, সে জানে যে, শরমগাহ বের হয়ে গেলে নামায বাতিল হয়ে যায়। আর যার নামায বাতিল, তার ইক্তিদা করা বৈধ নয়। অতএব জরুরী হল, নামায ছেড়ে ইমামকে সে বিষয়ে সতর্ক করা। *(ইবনে বায, মাতাহাআঃ ২৬পৃঃ)*

۞ ইমাম সূরা ভুল পড়লে

ইমাম সূরা ভুল পড়লে সংশোধন করা, কোন আয়াত ভুলে ছেড়ে দিলে তা ধরিয়ে দেওয়া মুক্তাদীর কর্তব্য।

'নামাযের মধ্যে যা করা বৈধ' শিরোনামে এ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে যে, ইমাম সূরা ফাতিহায় ভুল করলে তা ধরিয়ে বা সংশোধন করে দেওয়া মুক্তাদীর জন্য ওয়াজেব। এ ছাড়া অন্যান্য সূরা ভুল পড়লেও মনে করিয়ে দেওয়া বিধেয়।

ইমাম সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পাঠ করার সময় কোন আয়াতে গিয়ে আটকে গেলে এবং মুক্তাদীদের কারো সে সূরা মুখস্থ না থাকলে বা কেউ ধরিয়ে না দিলে তিনি দুয়ের মধ্যে এক করতে পারেন; (কয়েক আয়াত পড়া হয়ে থাকলে) তিনি ইচ্ছা করলে তকবীর দিয়ে রুকূতে চলে যেতে পারেন। নতুবা (বিশেষ করে ক্বিরাআতের শুরুতে হলে) অন্য সূরা বা সূরার কতক আয়াত পাঠ করে রুকূতে যেতে পারেন। পক্ষান্তরে সূরা ফাতিহা পড়তে পড়তে আটকে গেলে তাকে যে কোন প্রকারে সম্পূর্ণ পড়ে শেষ করতেই হবে। নচেৎ নামাযই হবে না। *(মাতাহাআঃ ২৬পৃঃ)*

মুক্তাদী কেউ হাফেয না থাকলে কোন লম্বা নামাযে হাফেয ইমামের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য কোন মুক্তাদীর মুসহাফ নিয়ে নামাযে দেখে যাওয়া প্রয়োজনে বৈধ। *(ফউঃ ১/৩৬৫)*

ইমাম ভুল করে নামাযের কোন রুক্ন বা রাকআত ত্যাগ করলে মুক্তাদী 'সুবহানাল্লাহ' বলে সতর্ক করবে। রাকআত বেশী করলে তাতে তাঁর অনুসরণ করবে না। *(মবঃ ১৫/৮৭)* বরং তসবীহ্ বলে তাঁকে বসে যেতে ইঙ্গিত করবে।

পক্ষান্তরে ইমাম প্রথম তাশাহহুদের বৈঠক ছেড়ে ভুলে উঠে পড়লে মুক্তাদীও তাঁর সাথে উঠে যাবে। এ ক্ষেত্রে বারবার তসবীহ্ পড়ে তাঁকে বসতে বাধ্য করবে না এবং ইমামও বসতে বাধ্য হবেন না। (এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা 'সহু সিজদার' বর্ণনায় আসবে।)

সতর্কতার বিষয় যে, মুক্তাদীদের মাঝে ভুল বুঝার সুযোগ সৃষ্টি হবে বলেই ক্বারী ইমামের উচিত নয়, নামাযের ভিতরে প্রচলিত ক্বিরাআত ছাড়া অন্যান্য বিরল ক্বিরাআতে সূরা পড়া। কারণ, নামাযের ভিতরে একাধিক নিয়মে ক্বিরাআত পড়া বিদআত। *(মুবিঃ ৩১৭পৃঃ)*

একই নামায দুইবার পড়া যায় কি?

একই নামায দুইবার পড়া নিষিদ্ধ। মহানবী ﷺ বলেন, "একই নামাযকে একই দিনে দুইবার পড়ো না।" *(আদাঃ ৫৭৯নং)*

একদা তিনি এক সাহাবীকে ফজরের পরে নামায পড়তে দেখে বললেন, "এটি আবার কোন্ নামায? (ফজরের নামায কি দুইবার?)" *(আঃ, আদাঃ ১২৬৭, তিঃ, ইমাঃ ১১৫৪, ইখুঃ, ইহিঃ)*

কিন্তু যদি কেউ কোন অসুবিধার কারণে বাসায় নামায পড়ে নিয়ে মসজিদে এসে দেখে যে, তখনও জামাআত চলছে, তাহলে জামাআতের ফযীলত পাওয়ার আশায়, এক জামাআতে (মসজিদে) নামায পড়ার পর দ্বিতীয় জামাআতে (মসজিদে) কোন কাজের খাতিরে গিয়ে জামাআত চলছে দেখলে অধিক সওয়াবের আশায়, ইমাম অত্যন্ত দেরী করে নামায পড়লে আওয়াল অক্তে নামায পড়ে নেওয়ার পর পুনরায় ঐ ইমামের জামাআতে এবং এ সকল ক্ষেত্রে নফলের নিয়তে ও বেনামাযী বা জামাআতত্যাগী হওয়ার অপবাদ অপনোদন করার উদ্দেশ্যে একই নামায দ্বিতীয়বার পড়া উত্তম। অনুরূপ কোন সাধারণ মসজিদের ইমাম শ্রেষ্ঠতর মসজিদে (মাহাত্ম্যপূর্ণ ৪ মসজিদের কোন একটিতে) নামায পড়ার পর নিজের মসজিদে ইমামতি করার জন্য, অথবা একাকী নামাযীকে জামাআতের সওয়াব অর্জন করাবার উদ্দেশ্যেও পড়ে নেওয়া নামায নফলের নিয়তে পুনরায় পড়া যায়।

একদা মসজিদে খাইফে তিনি ফজরের নামাযে সালাম ফিরে দেখলেন, মসজিদের এক প্রান্তে দুই ব্যক্তি জামাআতে নামায পড়ে নি। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'আমরা আমাদের বাসায় নামায পড়ে নিয়েছি।' তিনি বললেন, "এমনটি

আর করো না। বরং যখন তোমাদের কেউ নিজ বাসায় নামায পড়ে নেয়, অতঃপর (মসজিদে এসে) দেখে যে, ইমাম নামায পড়ে নি, তখন সে যেন (দ্বিতীয়বার) তাঁর সাথে নামায পড়ে। আর এ নামায তার জন্য নফল হবে।” *(আদাঃ ৫৭৫, তিঃ ২১৯, নাঃ, মিঃ ১১৫২, সজাঃ ৬৬৭নং)*

সাহাবী মিহজান ﷺ এক মজলিসে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে বসেছিলেন। ইতিমধ্যে আযান (ইকামত) হলে আল্লাহর রসূল ﷺ উঠে গেলেন। তিনি নামায পড়ে এসে দেখলেন, মিহজান তাঁর সেই মজলিসেই বসে আছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বললেন, “লোকেদের সাথে নামায পড়তে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি মুসলিম নও?” মিহজান বললেন, ‘অবশ্যই, হে আল্লাহর রসূল! তবে আমি আমার ঘরে নামায পড়ে নিয়েছি।’ এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বললেন, “তুমি নামায পড়ার পর যখন মসজিদে আস এবং নামাযের জামাআত শুরু হয়, তখন তুমিও লোকেদের সাথে নামায পড়ে নাও; যদিও তুমি পূর্বে সে নামায পড়ে নিয়ে থাক।” *(মাঃ, নাঃ, মিঃ, সিসঃ ১৩৩৭নং)*

একদা মহানবী ﷺ আবূ যার্র ﷺ-কে বললেন, “তোমার অবস্থা কি হবে, যখন এমন এমন আমীর হবে, যারা নামায মেরে ফেলবে অথবা যথাসময় থেকে দেরী করে পড়বে?” আবূ যার্র ﷺ বললেন, ‘আপনি আমাকে কি আদেশ করেন?’ তিনি বললেন, “তুমি যথাসময়ে নামায পড়ে নাও। অতঃপর যদি সেই নামায তাদের সাথে পাও, তাহলে তা আবার পড়ে নাও; এটা তোমার জন্য নফল হবে।” (মুঃ, আদাঃ, মিঃ ৬০০নং)

মুআয বিন জাবাল ﷺ মহানবী ﷺ এর সাথে তাঁর মসজিদে (নববীতে) নামায পড়তেন। অতঃপর নিজ গোত্রে ফিরে এসে ঐ নামাযেরই ইমামতি করতেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১১৫০ নং)*

মহানবী ﷺ একদা এক ব্যক্তিকে একাকী নামায পড়তে দেখলে তিনি অন্যান্য সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন, “এমন কেউ কি নেই, যে এর সাথে নামায পড়ে একে (জামাআতের সওয়াব) দান করে?” এ কথা শুনে এক ব্যক্তি উঠে তার সাথে নামায পড়ল। *(আদাঃ ৫৭৪, তিঃ, মিঃ ১১৪৬ নং)* অথচ সে মহানবী ﷺ এর সাথে ঐ নামায পূর্বে পড়েছিল।

দুটি নামাযের মধ্যে কোন্ নামাযটি নফল হবে সে বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, ‘উভয় নামাযের মধ্যে কোন্‌টি আমার (ফরয) নামায গণ্য করব?’ উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘এ এখতিয়ার কি তোমার আছে? এ এখতিয়ার আছে একমাত্র আল্লাহ আয্যা জাল্লারই। তিনি উভয়ের মধ্যে যেটিকে ইচ্ছা ফরযরূপে গণ্য করবেন।’ *(মাঃ, মিঃ ১১৫৬নং)* অবশ্য পূর্বোক্ত অনেক বর্ণনায় স্পষ্ট আছে যে, শেষের নামাযটাই নফল গণ্য হবে।

ইমামের তকবীর পৌঁছানো

ইমামের আওয়াজ ক্ষীণ হলে অথবা জামাআত বড় হলে ইমামের তকবীর সকল মুসল্লী পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মুক্তাদীর উচ্চস্বরে তকবীর বলা বৈধ।

একদা মহানবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি বসে বসে নামায পড়েন। তাঁর আওয়াজ ছিল ক্ষীণ। হযরত আবূ বাক্র ﷺ তাঁর তকবীর শুনে তকবীর বলছিলেন এবং লোকেরা আবূ

বাক্‌রের তকবীর শুনে তকবীর বলছিল। *(বুঃ ৭১২-৭১৩, মুঃ)*

মুক্তাদীদের মধ্যে যে মুবাল্লেগ নির্বাচিত হবে সে ইমামের তকবীর বলার পরই তকবীর বলবে। তাঁর আগে-আগে বা সাথে-সাথে বলবে না। ইমাম 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললে মুবাল্লেগ 'রাব্বানা অলাকাল হাম্‌দ' বলবে।

প্রকাশ থাকে যে, মুবাল্লেগ হল প্রয়োজনের ক্ষেত্রে। অপ্রয়োজনে অর্থাৎ যেখানে সকল নামাযী ইমামের তকবীর শুনতে পায় সেখানে মুবাল্লেগের তকবীর পড়া ঘৃণিত বিদআত। *(ফিসুঃ আরাবী ১/২১৬, মুমুত্বাসাঃ ৬২পৃঃ, মুবিঃ ৯৪পৃঃ)*

মাইক যন্ত্র মুসলিমদের জন্য এক বড় নেয়ামত। আওয়াজকে দূরে ও জোরে পৌঁছানোর জন্য তার অবদান বিরাট। আর এটি আযান, ইকামত, খোতবা ও নামাযের জন্য ব্যবহার করা বিদআত নয়। যেমন বিদআত নয় বিশাল জনসভা ও ইজতেমায় তার মাধ্যমে বক্তৃতা ও ওয়ায-নসীহত করা। বলা বাহুল্য, যেখানে মাইকের মাধ্যমে সকল মুক্তাদী ইমামের তকবীরের শব্দ অনায়াসে শুনতে পারে সেখানে মুবাল্লেগের প্রয়োজন নেই। আর যেখানে মাইক ব্যবহার করা বিদআত নয় সেখানে বিশাল জামাআতে ৫০টা বা তারও বেশী সংখ্যক মুবাল্লেগ রেখে নামায পড়া অযৌক্তিক ও অতিরঞ্জন। এর ফলে ইমামের আওয়াজ শেষ কাতারে পৌঁছতে পৌঁছতে এমন হয় যে, ইমাম যখন সিজদা থেকে মাথা তুলেন, শেষের কাতারের মুসল্লীরা তখন রুকূ থেকে মাথা তোলে! ফলে জামাআতের মাঝে বিরাট বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। *(মুবিঃ ২৫, ৩৩৪পৃঃ)* আশ্চর্যের বিষয় যে, উক্ত প্রকার ইজতেমায় ওয়ায-নসীহত মাইকে হয়, কিন্তু নামায হয় বিনা মাইকে। হয়তো বা ওঁদের নিকট প্রথমটা বিদআত নয় এবং দ্বিতীয়টি বিদআত! কি জানি এ কোন্ বিচার?

এক নামায পড়ার পর অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করার ফযীলত

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নামাযের অবস্থাতেই থাকে যতক্ষণ নামায তাকে (অন্যান্য কর্ম হতে) আটকে রাখে। তাকে নামায ব্যতীত অন্য কিছু তার পরিবারের নিকট ফিরে যেতে বাধা দেয় না।" *(বুখারী ৬৫৯নং, মুসলিম ৬৪৯নং)*

বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় এরূপ এসেছে, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি নামাযেই থাকে যতক্ষণ নামায তাকে আটকে রাখে। (আগামী নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করে মসজিদেই বসে থাকে।) আর সেই সময় ফিরিশ্তাবর্গ বলতে থাকেন, 'হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! ওর প্রতি সদয় হও।' (এই দুআ ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে) যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নামাযের স্থান ত্যাগ করেছে অথবা তার ওযু নষ্ট হয়েছে।" *(বুঃ ৩২২৯নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নামাযের পর আর এক নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ ব্যক্তি সেই অশ্বারোহীর সমতুল্য যে তার অশ্বসহ আল্লাহর পথে শত্রুর বিরুদ্ধে বিক্রমের সাথে সদা প্রস্তুত; যে থাকে বৃহৎ প্রতিরক্ষার কাজে।" *(আহমদ, ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সহীহ তারগীব ৪৪৭নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "নামাযের জন্য বসে প্রতীক্ষারত ব্যক্তি নামাযের দণ্ডায়মান ব্যক্তির মত। তার নাম নামাযে মশগুল ব্যক্তিদের তালিকাভুক্ত থাকে -তার স্বগৃহ থেকে বের হওয়া হতে পুনরায় গৃহে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত।" *(ইবনে হিব্বান, আহমদ, প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৪৫১নং)*

জুমআর নামায

জুমআর নামায প্রত্যেক সাবালক জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষের জন্য জামাআত সহকারে ফরয।
মহান আল্লাহ বলেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! যখন জুমআর দিন নামাযের জন্য আহবান করা হবে, তখন তোমরা সত্বর আল্লাহর স্মরণের জন্য উপস্থিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় বর্জন কর। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। *(কুঃ ৬২/৯)*

মহানবী ﷺ বলেন, "দুনিয়াতে আমাদের আসার সময় সকল জাতির পরে। কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা সকলের অগ্রবর্তী। (সকলের আগে আমাদের হিসাব-নিকাশ হবে।) অবশ্য আমাদের পূর্বে ওদেরকে (ইয়াহুদী ও নাসারাকে) কিতাব দেওয়া হয়েছে। আমরা কিতাব পেয়েছি ওদের পরে। এই (জুমআর) দিনের তা'যীম ওদের উপর ফরয করা হয়েছিল। কিন্তু ওরা তাতে মতভেদ করে বসল। পক্ষান্তরে আল্লাহ আমাদেরকে তাতে একমত হওয়ার তওফীক দান করেছেন। সুতরাং সকল মানুষ আমাদের থেকে পশ্চাতে। ইয়াহুদী আগামী দিন (শনিবার)কে তা'যীম করে (জুমআর দিন বলে মানে) এবং নাসারা করে তার পরের দিন (রবিবার)কে।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ)*

মহানবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক সাবালক পুরুষের জন্য জুমআয় উপস্থিত হওয়া ওয়াজেব।" *(নাঃ ১৩৭১নং)*

হযরত ইবনে মসউদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “আমি ইচ্ছা করেছি যে, এক ব্যক্তিকে লোকেদের ইমামতি করতে আদেশ করে ঐ শ্রেণীর লোকেদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিই, যারা জুমআতে অনুপস্থিত থাকে।” *(মুসলিম ৬৫২নং, হাকেম)*

হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ ও ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তাঁরা শুনেছেন, আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর মিম্বরের কাঠের উপর বলেছেন যে, “কতক সম্প্রদায় তাদের জুমআহ ত্যাগ করা হতে অতি অবশ্যই বিরত হোক, নতুবা আল্লাহ তাদের অন্তরে অবশ্যই মোহর মেরে দেবেন। অতঃপর তারা অবশ্যই অবহেলাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।” *(মুঃ ৮৬৫ নং, ইমাঃ)*

হযরত আবুল জা’দ যামরী ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি বিনা ওজরে তিনটি জুমআহ ত্যাগ করবে সে ব্যক্তি মুনাফিক।” *(ইখুঃ, ইহিঃ, সতাঃ ৭২৬নং)*

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ জুমআর দিন খাড়া হয়ে খুতবা দানকালে বললেন, “সম্ভবতঃ এমনও লোক আছে, যার নিকট জুমআহ উপস্থিত হয়; অথচ সে মদীনা থেকে মাত্র এক মাইল দূরে থাকে এবং জুমআয় হাযির হয় না।” দ্বিতীয় বারে তিনি বললেন, “সম্ভবতঃ এমন লোকও আছে যার নিকট জুমআহ উপস্থিত হয়; অথচ সে মদীনা থেকে মাত্র দুই মাইল দূরে থাকে এবং জুমআয় হাজির হয় না।” অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি বললেন, “সম্ভবতঃ এমন লোকও আছে যে মদীনা থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে থাকে এবং জুমআয় হাজির হয় না তার হৃদয়ে আল্লাহ মোহর মেরে দেন।” *(আবূ য়্যা’লা, সতাঃ ৭৩১নং)*

হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পরপর ৩ টি জুমআহ ত্যাগ করল, সে অবশ্যই ইসলামকে নিজের পিছনে ফেলে দিল।” *(ঐ, সতাঃ ৭৩২নং)*

জুমআহ যাদের উপর ফরয নয়

১-২-৩। মহিলা, শিশু ও অসুস্থ ব্যক্তি।

নবী মুবাশ্শির ﷺ বলেন, “প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জামাআত সহকারে জুমআহ ফরয। অবশ্য ৪ ব্যক্তির জন্য ফরয নয়; ক্রীতদাস, মহিলা, শিশু ও অসুস্থ।” *(আদাঃ ১০৬৭নং)*

৪। যে ব্যক্তি (শত্রু, সম্পদ বিনষ্ট, সফরের সঙ্গী ছুটে যাওয়ার) ভয়ে, অথবা বৃষ্টি, কাদা বা অত্যন্ত শীত বা গ্রীষ্মের কারণে মসজিদে উপস্থিত হতে অক্ষম।

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি মুআয্যিনের (আযান) শোনে এবং কোন ওজর (ভয় অথবা অসুখ) তাকে জামাআতে উপস্থিত হতে বাধা না দেয়, তাহলে যে নামায সে পড়ে, তার সে নামায কবুল হয় না।” *(আদাঃ ৫৫১নং)*

একদা ইবনে আব্বাস ﷺ এক বৃষ্টিময় জুমআর দিনে তাঁর মুআযযিনকে বললেন, ‘তুমি যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ বলবে তখন বল, ‘তোমরা তোমাদের ঘরে

নামায পড়ে নাও।' এ কথা শুনে লোকেরা যেন আপত্তিকর মনোভাব ব্যক্ত করল। কিন্তু তিনি বললেন, 'এরূপ তিনি করেছেন যিনি আমার থেকে শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ, আল্লাহর রসূল ﷺ এরূপ করেছেন। আর আমিও তোমাদেরকে এই কাদা ও পিছল জায়গার মাঝে বের হওয়াকে অপছন্দ করলাম।' *(বুঃ ৯০১, মুঃ ৬৯৯নং)*

প্রকাশ থাকে যে, যারা দূরের মাঠে অথবা জঙ্গলে অথবা সমুদ্রে কাজ করে এবং আযান শুনতে পায় না, তাছাড়া কাজ ছেড়ে শহর বা গ্রামে আসাও সম্ভব নয়, তাদের জন্য জুমআহ ফরয নয়। *(ফইঃ ১/৪১৪, ফউঃ ১/৩৯৯)*

৫। মুসাফিরঃ

মহানবী ﷺ জুমআর দিন সফরে থাকলে, জুমআর নামায না পড়ে যোহরের নামায পড়তেন। বিদায়ী হজ্জের সময় তিনি আরাফাতে অবস্থানকালে জুমআর নামায পড়েননি। বরং যোহর ও আসরের নামাযকে অগ্রিম জমা করে পড়েছিলেন। অনুরূপ আমল ছিল খুলাফায়ে রাশেদীন ؓ দেরও।

উপর্যুক্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য জুমআর নামায ফরয নয়। কিন্তু যোহরের নামায অবশ্যই ফরয। পরন্তু যদি তারাও জুমআর মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআতে জুমআহ পড়ে নেয়, তাহলে তা বৈধ। এ ক্ষেত্রে তাদের জুমআহ হয়ে যাবে এবং যোহরের নামায মাফ হয়ে যাবে।

একাধিক হাদীস এ কথা প্রমাণ করে যে, মহানবী ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদীন ؓ দের যুগে মহিলারা জুমআহ ও জামাআতে উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করত।

উল্লেখ্য যে, কোন মুসাফির জুমআহ খুতবা দিলে ও ইমামতি করলে তা শুদ্ধ হয়ে যাবে। *(মুমঃ ৫/২৩)*

জুমআর জামাআতে কোন মুসাফির যোহরের কসর আদায় করার নিয়ত করতে পারে না। কারণ, যোহর অপেক্ষা জুমআর ফযীলত অনেক বেশী। *(মুমঃ ৪/৫৭৪)*

জুমআর সময়

অধিকাংশ সাহাবা, তাবেঈন ও ইমামগণের নিকট জুমআর সময় যোহরের সময় একই। অর্থাৎ, সূর্য ঢলার পর থেকে নিয়ে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হওয়া (আসরের আগে) পর্যন্ত।

হযরত আনাস ؓ বলেন, 'নবী ﷺ জুমআহ তখন পড়তেন, যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যেত।' *(আঃ, বুঃ, আদাঃ, তিঃ, বাঃ)*

ইমাম বুখারী বলেন, 'জুমআর সময় সূর্য ঢলার পরই শুরু হয়। হযরত উমার, আলী, নু'মান বিন বাশীর এবং আম্র বিন হুয়াইরিষ কর্তৃক এ ব্যাপারে বর্ণনা পাওয়া যায়।' *(বুঃ)*

হযরত সালামাহ বিন আকওয়া' ؓ বলেন, 'আমরা যখন নবী ﷺ-এর সাথে জুমআর নামায পড়ে ঘরে ফিরতাম, তখন দেওয়ালের কোন ছায়া থাকত না।' *(বুঃ, মুঃ, আদাঃ)*

হযরত আনাস ؓ বলেন, 'ঠান্ডা খুব বেশী হলে নবী ﷺ জুমআর নামায সকাল সকাল

পড়তেন এবং গরম খুব বেশী হলে দেরী করে পড়তেন।’ *(বুঃ)*

অবশ্য সূর্য ঢলার পূর্বেও জুমআহ পড়া বৈধ। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য আনাঃ ২২-২৫পৃঃ)* তবে সূর্য ঢলার পরই জুমআহর (খুতবার) আযান হওয়া উত্তম। কারণ, প্রথমতঃ এতে অধিকাংশ উলামার সাথে সহমত প্রকাশ হয়। দ্বিতীয়তঃ যারা জুমআয় হাজির হয় না এবং সময়ের খবর না রেখে আযান শুনে নামায পড়তে অভ্যাসী (ওযরগ্রস্ত ও মহিলারা) সময় হওয়ার পূর্বেই নামায পড়ে ফেলে না। *(লিবামাঃ ৫/৩৪)*

প্রকাশ থাকে যে, সকাল সকাল মসজিদে গিয়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ সহ অন্যান্য নফল পড়া সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকার সময়ে হলেও তা নিষেধের আওতাভুক্ত নয়। *(ঐ)*

জুমআর জন্য নিম্নতম নামাযী সংখ্যা

জুমআর নামায যেহেতু জামাআত সহকারে ফরয, সেহেতু যে কয় জন লোক নিয়ে জামাআত হবে, সে কয় জন লোক নিয়ে জুমআহও প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তার জন্য নির্দিষ্ট লোক সংখ্যা হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়।

জুমআর স্থান

জুমআহ যেমন শহরবাসীর জন্য ফরয, তেমনি ফরয গ্রামবাসীর জন্যও। এর জন্য খলীফা হওয়া, শহর হওয়া, জামে মসজিদ হওয়া বা ৪০ জন নামাযী হওয়া শর্ত নয়। বরং যেখানেই স্থানীয় স্থায়ী বসবাসকারী জামাআত পাওয়া যাবে, সেখানেই জুমআহ ফরয। *(মবঃ ২২/৭৫, ফইঃ ১/৪২৪)*

হযরত ইবনে আব্বাস ﵁ বলেন, ‘নবী ﷺ-এর মসজিদে জুমআহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইসলামে সর্বপ্রথম যে জুমআহ প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হল বাহরাইনের জুয়াষা নামক এক গ্রামে।’ *(বুঃ ৮৯২, ৪৩৭১, আদাঃ ১০৬৮-নং)*

হযরত ইবনে উমার ﵁ মক্কা মুকার্রামা ও মদীনা নববিয়ার মধ্যবর্তী পথে অবস্থিত ছোট ছোট জনপদে জুমআহ প্রতিষ্ঠিত হতে লক্ষ্য করতেন। তিনি তাতে কোন আপত্তি জানাতেন না। *(আরাঃ)*

হযরত উমার ﵁ বলেন, ‘তোমরা যেখানেই থাক, সেখানেই জুমআহ পড়।’ *(আরাঃ, তামিঃ ৩৩২পৃঃ)*

পক্ষান্তরে পাড়া-গ্রামে জুমআহ হবে না বলে হযরত আলী কর্তৃক যে হাদীস বর্ণনা করা হয়, তা সহীহ নয়। *(মবঃ ১৬/৩৫২-৩৫৪, ২২/৭৫)*

কোন অমুসলিম দেশে পড়াশোনা বা চাকরী করতে গিয়ে সেখানে মসজিদ না থাকলে বা যথেষ্ট সংখ্যক মুসলিম না থাকলেও ৩ জনেই যে কোন রুমে জুমআহ কায়েম হবে। *(মবঃ ১৫/৮৫)*

একই বড় গ্রাম বা শহরে বিচ্ছন্নতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়, বরং মসজিদ সংকীর্ণ হওয়ার কারণে, অথবা দূর হওয়ার কারণে, অথবা ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় প্রয়োজনে একাধিক মসজিদে জুমআহ কায়েম করা যায়। *(মবঃ ১৮/১১১, ১৯/১৬৫-১৬৬)*

কোন মসজিদে জুমআহ পড়ার জন্য নির্মাণের সময় ঐ নিয়ত শর্ত নয়। অক্তিয়ারূপে নির্মাণের পর প্রয়োজনে সেখানে জুমআহ পড়া যায়। *(মবঃ ১৮/১১০)*

জুমআর আযান

মহানবী ﷺ, হযরত আবূ বাক্র ও হযরত উমার ﷺ-এর যামানায় জুমআর মাত্র ১টি আযানই প্রচলিত ছিল। আর এ আযান দেওয়া হত, যখন ইমাম খুতবাহ দেওয়ার জন্য মিম্বরে চড়ে বসতেন তখন মসজিদের দরজার সামনে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে। এইরূপ আযান চালু ছিল হযরত আবূ বাক্র, উমারের খেলাফত কাল পর্যন্ত। অতঃপর হযরত উসমান ﷺ মদীনার বাড়ি-ঘর দূরে দূরে এবং জনসংখ্যা বেশী দেখে উক্ত আযানের পূর্বে আরো একটি অতিরিক্ত আযান চালু করলেন। যাতে লোকেরা পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে জুমআর খুতবাহ শুনতে প্রথম থেকেই উপস্থিত হয়। আর এই আযান দেওয়া হত বাজারে যাওরা নামক একটি উঁচু ঘরের ছাদে। এ আযান শুনে লোকেরা জুমআহর সময় উপস্থিত হয়েছে বলে জানতে পারত। এইভাবে ঐ আযান প্রচলিত থাকল। এতে কেউ তাঁর প্রতিবাদ বা সমালোচনা করল না। অথচ মিনায় (২ রাকআতের জায়গায়) ৪ রাকআত নামায পড়ার কারণে লোকেরা তাঁর সমালোচনা করেছিল। *(বুঃ, সুআঃ, আনাঃ ৮-৯পৃঃ)*

বলাই বাহুল্য যে, যে কাজ একজন খলীফায়ে রাশেদ করেছেন তা বিদআত হতে পারে না। বিশেষ করে মহানবী ﷺ-এর বিরোধিতা নেই যেখানে সেখানে সাহাবীর ইজতিহাদ ও আমল আমাদের জন্যও সুন্নত। কেননা, মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে জীবিত থাকবে, সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সুন্নাহ (পথ ও আদর্শ) এবং আমার পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো। তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, দাঁতে কামড়ে ধরো। আর দ্বীনে নবরচিত কর্ম থেকে সাবধান থেকো। কারণ প্রত্যেক নবরচিত (দ্বীনী) কর্মই হল ‘বিদআত’। আর প্রত্যেক বিদআতই হল ভ্রষ্টতা।” *(আঃ, আদাঃ ৪৬০৭, তিঃ ২৮-১৫ নং, ইমাঃ, মিঃ ১৬৫নং) (মবঃ ১৫/৭৫)*

অতএব যদি অনুরূপ প্রয়োজন বোধ করে মাঠে-ঘাটে ও অফিসে-বাজারে সর্বসাধারণকে জুমআর জন্য প্রস্তুত হওয়ার কথা জানানো একান্ত জরুরী হয়েই থাকে, তাহলে তৃতীয় খলীফার সে সুন্নত ব্যবহার করতে আমাদের বাধা কোথায়?

পক্ষান্তরে বিদআত ও বাধা হল, একই উদ্দেশ্যে এর পরিবর্তে অন্য কিছু ব্যবহার করা। যেমন, মাইকে জুমআর সময় বলে দেওয়া, ওযূ-গোসল সেরে মসজিদে আসতে অনুরোধ করা, সূরা জুমআর শেষ ৩টি আয়াত পাঠ করা, গজল পড়া, বেল বা ঘন্টা বাজানো ইত্যাদি। *(ফইঃ ১/৪১১, ৪২১)*

অবশ্য এই আযান দিতে হবে খুতবার আযানের সময়ের যথেষ্ট পূর্বে। নচেৎ, আযানের

প্রধান উদ্দেশ্যই বাতিল হয়ে যাবে। যেমন ৫ বা ১০ মিনিট আগে হলে তাতে তেমন কিছু লাভ পরিলক্ষিত হবে না। অন্ততঃপক্ষে আধা থেকে এক ঘন্টা আগে হলে তবেই উদ্দেশ্য সফল হবে।

উল্লেখ্য যে, জুমআর দিন (খুতবার আগে দ্বিতীয়) আযান হওয়ার পর বেচা-কেনা (অনুরূপ সফর করা) হারাম হয়ে যায়। কারণ, মহান আল্লাহর আদেশ হল, "হে ঈমানদারগণ! যখন জুমআর দিন নামাযের জন্য আহবান করা হবে, তখন তোমরা সত্বর আল্লাহর স্মরণের জন্য উপস্থিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় বর্জন কর। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।" *(কুঃ ৬২/৯)*

দ্বিতীয় আযান (মাইকে হলেও) দেওয়া উচিত মসজিদের সামনে কোন উঁচু জায়গায়। এ আযান মসজিদের ভিতরে মিম্বরের সামনে দেওয়া বিদআত। *(আনাঃ ১৪-১৯পৃঃ)*

জুমআর খুতবার আহকাম

জুমআর খুতবার দুটি অংশ। প্রথম অংশটি প্রথম খুতবাহ এবং শেষ অংশটি দ্বিতীয় খুতবা নামে প্রসিদ্ধ। খুতবাহ মানে হল ভাষণ বা বক্তৃতা। এই ভাষণ দেওয়া ও শোনার বহু নিয়ম-নীতি আছে। যার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

খুতবার জন্য ওযূ হওয়া শর্ত নয়। তবে খুতবার পরেই যেহেতু নামায, তাই ওযু থাকা বাঞ্ছনীয়। খুতবা চলাকালে খতীবের ওযূ নষ্ট হলে খুতবার পর তিনি ওযূ করবেন এবং সে পর্যন্ত লোকেরা অপেক্ষা করবে। *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ্ দার্ব, ইবনে উষাইমীন ১/২০৮)*

খুতবা পরিবেশিত হবে দন্ডায়মান অবস্থায়। বিনা ওজরে বসে জুমআর খুতবা সহীহ নয়।

মহানবী ﷺ খুতবায় দাঁড়াবার সময় লাঠি অথবা ধনুকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। *(আদাঃ ১০৯৬নং)* অবশ্য অনেকে বলেন, এ ছিল মেম্বর বানানোর পূর্বে। অল্লাহু আ'লাম।

মহানবী ﷺ-এর অধিকাংশ সময়ে মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করতেন। সুতরাং যারা পাগড়ী ব্যবহার করে না তাদের বিশেষ করে জুমআহ বা খুতবার জন্য পাগড়ী ব্যবহার করা বিদআত। *(আনাঃ ৬৭পৃঃ)*

জুমআর খুতবা হবে কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে। যাতে সকল নামাযীকে খতীব দেখতে পান এবং তাঁকে সকলে দেখতে পায়। এ ক্ষেত্রে ২ থাকি বা ৩ থাকি অথবা তার চেয়ে বেশী থাকির কোন প্রশ্ন নেই। আসল উদ্দেশ্য হল উঁচু জায়গা। অতঃপর সেই উঁচু জায়গায় পৌঁছনোর জন্য যতটা সিড়ির দরকার ততটা করা যাবে। এতে বাধ্যতামূলক কোন নীতি

নেই। শুরুতে মহানবী ﷺ একটি খেজুর গাছের উপর খুতবা দিতেন। তারপর এক ছুতোর সাহাবী তাঁকে একটি মিম্বর বানিয়ে দিয়েছিলেন; যার সিড়ি ছিল ২টি। *(আদাঃ ১০৮১নং)* এই দুই সিড়ি চড়ে তৃতীয় (শেষ) ধাপে মহানবী ﷺ বসতেন। বলা বাহুল্য, তাঁর মিম্বর ছিল তিন ধাপবিশিষ্ট। আর এটাই হল সুন্নত। *(ফবাঃ ২/৩৩১)* (এবং করতে হয় মনে করে) তার বেশী ধাপ করা বিদআত। *(আনাঃ ৬৭পৃঃ)*

বিশেষ করে জুমআর জন্য জুমআর দিন মিম্বরের উপর কার্পেট বিছানো বিদআত। *(আনাঃ ৬৬পৃঃ)*

মিম্বরে চড়ে মহানবী ﷺ মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিতেন। *(ইমাঃ ১১০৯, সিসঃ ২০৭৬নং)* এরপর বসে যেতেন। মুআযযিন আযান শেষ করলে উঠে দাঁড়াতেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। তিনি খুতবায় কুরআনের আয়াত পাঠ করে লোকেদেরকে নসীহত করতেন। *(মুঃ, আদাঃ, নাঃ, ইমাঃ)*

খুতবাহ হবে মহান আল্লাহর প্রশংসা, মহানবীর নবুঅতের সাক্ষ্য, আল্লাহর তাওহীদের গুরুত্ব, ঈমান ও ইসলামের শাখা-প্রশাখার আলোচনা, হালাল ও হারামের বিভিন্ন আহকাম, কুরআন মাজীদের কিছু সূরা বা আয়াত পাঠ, লোকেদের জন্য উপদেশ, আদেশ-নিষেধ বা ওয়ায-নসীহত এবং মুসলিম সর্বসাধারণের জন্য দুআ সম্বলিত।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে খুতবায় তাশাহহুদ, শাহাদত বা আল্লাহর তাওহীদের ও রসূলের রিসালতের সাক্ষ্য থাকে না, তা কাটা হাতের মত (ঠুঁটো)।" *(আদাঃ ৪৮৪১, সজাঃ ৪৫২০নং)*

তাঁর খুতবার ভূমিকায় মহানবী ﷺ যা পাঠ করতেন তা বক্ষ্যমাণ পুস্তকের (প্রথম খন্ডের) ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ খুতবা পাঠ করার পর তিনি 'আম্মা বা'দ' (অতঃপর) বলতেন।

কখনো কখনো মহানবী ঐ খুতবায় উল্লেখিত আয়াত ৩টি পাঠ করতেন না। কখনো কখনো আম্মা বা'দের পর বলতেন,

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها،

وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

অর্থাৎ, অতঃপর নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী আল্লাহর গ্রন্থ। সর্বশ্রেষ্ঠ হেদায়াত মুহাম্মাদ ﷺ-এর হেদায়াত। আর সর্বনিকৃষ্ট কর্ম হল নবরচিত কর্ম। প্রত্যেক নবরচিত কর্মই বিদআত। প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতা দোযখে। *(তামিঃ ৩৩৪-৩৩৫পৃঃ)*

তিনি খুতবায় সূরা ক্বাফ এত বেশী পাঠ করতেন যে, উম্মে হিশাম (রাঃ) প্রায় জুমআতে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে মিম্বরের উপরে পাঠ করতে শুনে তা মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। *(আঃ, মুঃ ৮৭২-৮৭৩নং, আদাঃ, নাঃ)*

তারপর একটি খুতবা দিয়ে একটু বসতেন।

এ বৈঠকে পঠনীয় কোন দুআ বা যিক্‌র নেই। খতীব বা মুক্তাদী সকলের জন্যই এ সময়ে

সূরা ইখলাস পাঠ করা বিদআত। *(মুবিঃ ১২২পৃঃ)* মহানবী ﷺ বসে কোন কথা বলতেন না। অতঃপর উঠে দ্বিতীয় খুতবা দিতেন। *(বুঃ, মুঃ, আদাঃ ১০৯২, ১০৯৫নং)*

এই সময় (দুই খুতবার মাঝে) কারো দুআ করা এবং তার জন্য হাত তোলা বিধেয় নয়। *(আনাঃ ৭০পৃঃ)*

তাঁর উভয় খুতবাতেই নসীহত হত। সুতরাং একটি খুতবাতে কেবল ক্বিরাআত এবং অপর খুতবাতে কেবল নসীহত, অথবা একটি খুতবাতে নসীহত এবং অপরটিতে কেবল দুআ করা সঠিক নয়। *(আনাঃ ৭১পৃঃ)*

খুতবা হবে সংক্ষেপ অথচ ব্যাপক বিষয়ভিত্তিক। মহানবী ﷺ-এর খুতবা এবং নামায মাঝামাঝি ধরনের হত। *(মুঃ ৮৬৬, আঃ ১১০১, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ)* তিনি বলতেন, “(খতীব) মানুষের নামায লম্বা এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া তার দ্বীনী জ্ঞান থাকার পরিচয়। সুতরাং তোমরা নামাযকে লম্বা এবং খুতবাকে সংক্ষেপ কর।” *(আঃ, মুঃ ৮৬৯নং)* হযরত আম্মার বিন ইয়াসির ؓ বলেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে খুতবা ছোট করতে আদেশ দিয়েছেন।’ *(আদাঃ ১১০৬নং)*

জুমআর খুতবার জন্য বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া এবং উচ্চস্বরে প্রভাবশালী ও হৃদয়গ্রাহী ভাষা ব্যবহার করে পরিবেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি সামনে রেখে ভাষণ দান করা খতীবের কর্তব্য। মহানবী ﷺ যখন খুতবা দিতেন, তখন তাঁর চোখ লাল হয়ে যেত, তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু হত এবং তাঁর ক্রোধ বেড়ে যেত; যেন তিনি লোকেদেরকে এমন এক সেনাবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন, যা আজই সন্ধ্যা অথবা সকালে তাদেরকে এসে আক্রমণ করবে। *(মুঃ, ইমাঃ)*

গান গাওয়ার মত সুর করে খুতবা দেওয়া বিধেয় নয়, বরং তা বিদআত। *(আনাঃ ৭২পৃঃ)*

খতীবের উচিত, খুতবায় দুর্বল ও জাল হাদীস ব্যবহার না করা। প্রত্যেক খুতবা প্রস্তুত করার সময় ছাঁকা ও গবেষণালব্ধ কথা বেছে নেওয়া উচিত।

জুমআহ বাসরীয় খুতবার মধ্যে খতীব মুসলিম জনসাধারণকে সহীহ আকীদাহ শিক্ষা দেবেন, কুসংস্কার নির্মূল করবেন, বিদআত অনুপ্রবেশ করার ব্যাপারে ও তা বর্জন করতে আহবান জানাবেন। সচ্চরিত্রতা ও শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দেবেন। ইসলামের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সন্দেহের নিরসন ঘটাবেন। মার্জিত ভাষায় ও ভঙ্গিমায় বাতিল মতবাদ ও বক্তৃতা-লেখনীর খন্ডন করবেন। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের ও ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দিয়ে তার গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলবেন ভাষণের মাধ্যমে। উদ্বুদ্ধ করবেন মযহাব, ভাষা, বর্ণ ও বংশ ভিত্তিক সকল প্রকার অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ও তরফদারী বর্জন করতে।

মিম্বর মুসলিম জনসাধারণের। এ মিম্বরকে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। কোন দলেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তরফদারী করা যাবে না এতে চড়ে। খতীব সাহেব সাধারণভাবে সকলকে নসীহত করবেন। তিনি হবেন সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। অবশ্য ইসলাম-বিরোধী কোন কথা বা কাজে তিনি কারো তোষামদ করবেন না।

বলা বাহুল্য, মসজিদ আল্লাহর ঘর। এটা কোন মানবরচিত রাজনীতির আখড়া নয়। এখানে

দ্বীন উঁচু করার কথা ছাড়া অন্য দল বা ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা আলোচিত হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلاَ تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً﴾

অর্থাৎ, আর অবশ্যই মসজিদসমূহ আল্লাহর। সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকে আহবান করো না। *(কুঃ ৭২/১৮)*

খুতবাদানে বিভিন্ন উপলক্ষ্য সামনে রাখবেন খতীব। মৌসম অনুপাতে খুতবার বিষয়বস্তু পরিবর্তন করবেন। বারো চাঁদের খুতবার মত বাঁধা-ধরা খুতবা পাঠ করেই দায় সারা করে কর্তব্য পালন করবেন না।

সপ্তাহান্তে একবার এই বক্তৃতা একটি সুবর্ণ সুযোগ দ্বীনের আহবায়কের জন্য। যেহেতু এই দিনে নামাযী-বেনামাযী, আমীর-গরীব, মুমিন-মুনাফিক এবং অনেক সময় মুসলিম নামধারী নাস্তিকও কোন স্বার্থের খাতিরে উপস্থিত হয়ে থাকে। সুতরাং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সকলের কাছে আল্লাহর বিধান পৌঁছে দেওয়া খতীবের কর্তব্য।

খুতবায় হাত তুলে দুআ বিধেয় নয়। *(আনাঃ ৭২পৃঃ)* বরং এই সময় কেবল তর্জনীর ইশারায় দুআ করা বিধেয়। খতীবকে হাত তুলে দুআ করতে দেখে বহু সলফ বদ্দুআ করতেন।

বিশ্র বিন মারওয়ানকে খুতবায় হাত তুলে দুআ করতে দেখে উমারাহ বিন রুয়াইবাহ বললেন, 'ঐ হাত দুটিকে আল্লাহ বিকৃত করুন।' *(মুঃ ৮৭৪, আদাঃ ১১০৪নং)*

মাসরুক বলেন, '(জুমআর দিন ইমাম-মুক্তাদী মিলে যারা হাত তুলে দুআ করে) আল্লাহ তাদের হাত কেটে নিন।' *(ইআশাঃ ৫৪৯১ ও ৫৪৯৩ নং)*

বিধেয় নয় মুক্তাদীদের হাত তুলে দুআ। *(আনাঃ ৭৩পৃঃ)* বরং ইমাম খুতবায় (হাত না তুলে) দুআ করলে, মুক্তাদী হাত না তুলেই একাকী নিম্নস্বরে বা চুপে-চুপে 'আমীন' বলবে। *(ফইঃ ১/৪২৭, ৪২৮)*

হ্যাঁ, খুতবায় বৃষ্টি প্রার্থনা বা বৃষ্টি বন্ধ করার জন্য দুআ করার সময় ইমাম-মুক্তাদী সকলে হাত তুলে ইমাম দুআ করবেন এবং মুক্তাদীরা 'আমীন-আমীন' বলবে। *(বুঃ ৯৩২, ৯৩৩, ১০১৩, ১০২৯, মুঃ ৮৯৭নং)*

কোন জরুরী কারণে খুতবা ত্যাগ করে প্রয়োজন সেরে পুনরায় খুতবা পূর্ণ করা খতীবের জন্য বৈধ। একদা মহানবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হযরত হাসান ও হুসাইন رضي الله عنهما পড়ে-উঠে তাঁর সামনে আসতে লাগলে তিনি মিম্বর থেকে নিচে নেমে তাঁদেরকে উপরে তুলে নিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলা সত্যই বলেছেন,

(إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ)

(অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য ফিতনাই তো।) আমি এদেরকে পড়ে-উঠে চলে আসতে দেখে ধৈর্য রাখতে পারলাম না। বরং খুতবা বন্ধ করে এদেরকে তুলে নিলাম।" *(আঃ, সুআঃ)*

হযরত আবূ রিফাআহ আদাবী رضي الله عنه বলেন, একদা আমি মসজিদে এসে দেখলাম নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! একজন অপরিচিত বিদেশী মানুষ; যার

দ্বীন সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই। এক্ষণে সে জ্ঞান লাভ করতে চায়।' তিনি খুতবা ছেড়ে দিয়ে আমার প্রতি অভিমুখ করলেন। এমনকি তিনি আমার নিকট এসে একটি কাঠের চেয়ার আনতে বললেন যার পায়া ছিল লোহার। তিনি তারই উপর বসে আমাকে দ্বীনের কথা বললেন। অতঃপর মিম্বরে এসে খুতবা পূর্ণ করলেন। *(মুঃ ৮৭৬নং, নাঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, জরুরী মনে করে নিয়মিতভাবে ... **إن الله وملائكته** এবং ...**اذكروا الله يذكركم** আয়াত পাঠ করে খুতবা শেষ করা বিদআত। *(আনাঃ ৭৩পৃঃ)*

জুমআয় উপস্থিত ব্যক্তির কর্তব্য

নামাযীর জন্য যথাসম্ভব ইমামের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করা কর্তব্য। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা আল্লাহর যিকরে উপস্থিত হও এবং ইমামের নিকটবর্তী হও। আর লোকে দূর হতে থাকলে বেহেশ্ত প্রবেশেও দেরী হবে তার; যদিও সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।" *(আদাঃ ১১০৮নং)*

জুমআর দিন নামাযী মসজিদে এসে যেখানে জায়গা পাবে সেখানে বসে যাবে। দেরী করে এসে (সামনের কাতারে ফাঁক থাকলেও) কাতার চিরে সামনে যাওয়া এবং তাতে অন্যান্য নামাযীদেরকে কষ্ট দেওয়া বৈধ নয়।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুস্‌র ؓ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক জুমআর দিনে এক ব্যক্তি লোকেদের কাতার চিরে (মসজিদের ভিতর) এল। সে সময় নবী ﷺ খুতবা দিচ্ছিলেন। তাকে দেখে নবী ﷺ বললেন, "বসে যাও, তুমি বেশ কষ্ট দিয়েছ এবং দেরী করেও এসেছ।" *(আঃ, আদাঃ, ইখুঃ, ইহিঃ, সতাঃ ৭১৩ নং)*

খুতবা চলাকালে মসজিদে উপস্থিত ব্যক্তির জন্য নামায নিষিদ্ধ। কিন্তু এই সময়ে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে তার জন্য হাল্কা করে ২ রাকআত নামায পড়া বিধেয়। যেমন কাউকে নামায না পড়ে বসতে দেখলে খতীবের উচিত তাকে ঐ নামায পড়তে আদেশ করা। খুতবা শোনা ওয়াজেব হলেও এ নামাযের গুরুত্ব দিয়েছেন খোদ মহানবী ﷺ। একদা খুতবা চলাকালে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লে তিনি তাকে বললেন, "তুমি নামায পড়েছ কি?" লোকটা বলল, না। তিনি বললেন, "ওঠ এবং হাল্কা করে ২ রাকআত পড়ে নাও।" *(বুঃ ৯৩০, মুঃ, আদাঃ ১১১৫-১১১৬, তিঃ ৫১০নং)* অতঃপর তিনি সকলের জন্য চিরস্থায়ী একটি বিধান দেওয়ার উদ্দেশ্যে লোকেদেরকে সম্বোধন করে বললেন, "তোমাদের কেউ যখন ইমামের খুতবা দেওয়া কালীন সময়ে উপস্থিত হয়, সে যেন (সংক্ষেপে) ২ রাকআত নামায পড়ে নেয়।" *(বুঃ, ১১৭০, মুঃ ৮৭৫, আদাঃ ১১১৭নং)*

একদা হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ؓ মসজিদ প্রবেশ করলেন। তখন মারওয়ান খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি নামায পড়তে শুরু করলে প্রহরীরা তাঁকে বসতে আদেশ করল। কিন্তু তিনি তাদের কথা না শুনেই নামায শেষ করলেন। নামায শেষে লোকেরা তাকে বলল, আল্লাহ

আপনাকে রহম করুন। এক্ষনি ওরা যে আপনার অপমান করত। উত্তরে তিনি বললেন, আমি সে নামায ছাড়ব কেন, যে নামায পড়তে নবী ﷺ-কে আদেশ করতে দেখেছি। *(তিঃ ৫১১নং)*

বলা বাহুল্য, খুতবা শুরু হলে লাল বাতি জ্বেলে দেওয়া, অথবা কাউকে ঐ ২ রাকআত নামায পড়তে দেখে চোখ লাল করা, অথবা তার জামা ধরে টান দেওয়া, অথবা খোদ খতীব সাহেবের মানা করা সুন্নাহ-বিরোধী তথা বিদআত কাজ।

জুমআর আযানের সময় মসজিদে এলে দাঁড়িয়ে থেকে আযানের উত্তর না দিয়ে, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়ে খুতবা শোনার জন্য বসে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। *(ফইঃ ১/৩৩৫, ৩৪৯)*

প্রকাশ থাকে যে, আযানের উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব। *(তামিঃ ৩৪০পৃঃ)* আর খুতবা শোনা ওয়াজেব। সুতরাং আযানের সময় পার করে খুতবা শুরু হলে নামায পড়া বৈধ নয়। পক্ষান্তরে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ওয়াজেব না হলেও ঐ সময় মহানবী ﷺ-এর মহা আদেশ পালন করা জরুরী।

ইমামের দিকে চেহারা করে বসা মুস্তাহাব। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ যখন মিম্বরে চড়তেন, তখন আমরা আমাদের চেহারা তাঁর দিকে ফিরিয়ে বসতাম।' *(তিঃ ৫০৯নং)*

পরিধানে লুঙ্গি বা লুঙ্গিজাতীয় এক কাপড় পরে খুতবা চলাকালে বসার সময় উভয় হাঁটুকে খাড়া করে রানের সাথে লাগিয়ে উভয় পা-কে দুই হাত দ্বারা জড়িয়ে ধরে অথবা কাপড় দ্বারা বেঁধে বসা বৈধ নয়। *(আদাঃ ১১১০, তিঃ ৫১৪নং)* কারণ, এতে শরমগাহ প্রকাশ পাওয়ার, চট্ করে ঘুম চলে আসার এবং তাতে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তাই।

খুতবা শোনা ওয়াজেব। আর এ সময় সকল প্রকার কথাবার্তা, সালাম ও সালামের উত্তর, হাঁচির হাম্‌দের জবাব, এমনকি আপত্তিকর কাজে বাধা দেওয়াও নিষিদ্ধ।

হযরত আবূ হুরাইরা রাঃ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "জুমআর দিন ইমামের খুতবা দানকালে কথা বললে তুমি অনর্থ কর্ম করলে এবং (জুমআহ) বাতিল করলে।" *(ইখুঃ, সতাঃ ৭১৬ নং)*

উক্ত হযরত আবূ হুরাইরা রাঃ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "জুমআর দিন ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় যদি তুমি তোমার (কথা বলছে এমন) সঙ্গীকে 'চুপ কর' বল তাহলে তুমিও অসার কর্ম করবে।" *(বুঃ ৯৩৪, মুঃ ৮৫১নং, সুআঃ, ইখুঃ)*

'অসার বা অনর্থক কর্ম করবে' এর একাধিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে; যেমন, তুমি জুমআর সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। অথবা তোমারও কথা বলা হবে। অথবা তুমিও ভুল করবে। অথবা তোমার জুমআহ বাতিল হয়ে যাবে। অথবা তোমার জুমআহ যোহরে পরিণত হয়ে যাবে -ইত্যাদি। তবে বিশেষজ্ঞ উলামাদের নিকট শেষোক্ত ব্যাখ্যাই নির্ভরযোগ্য। কারণ, এরূপ ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র বিন আস রাঃ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করল, তার স্ত্রীর সুগন্ধি (আতর) থাকলে তা ব্যবহার করল, উত্তম লেবাস পরিধান করল, অতঃপর (মসজিদে এসে) লোকেদের কাতার চিরে (আগে অতিক্রম)

করল না এবং ইমামের উপদেশ দানকালে কোন বাজে কর্ম করল না, সে ব্যক্তির জন্য তা উভয় জুমআর মধ্যবর্তী কৃত পাপের কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি অনর্থক কর্ম করল এবং লোকেদের কাতার চিরে সামনে অতিক্রম করল সে ব্যক্তির জুমআহ যোহরে পরিণত হয়ে যাবে।” *(আদাঃ, ইখুঃ, সতাঃ ৭২০নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, “জুমআর দিন ৩ শ্রেণীর মানুষ (মসজিদে) উপস্থিত হয়। প্রথম শ্রেণীর মানুষ উপস্থিত হয়ে বাজে কথা বলে; তার সেটাই হল প্রাপ্য। দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ উপস্থিত হয়ে দুআ করে; আর সে এমন লোক, যে আল্লাহর কাছে দুআ করে, আল্লাহ তার দুআ কবুল করেন অথবা না করেন। আর তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ উপস্থিত হয়ে চুপ ও নির্বাক থাকে, কোন মুসলিমের কাঁধ ডিঙিয়ে (কাতার চিরে) আগে যায় না এবং কাউকে কোন প্রকার কষ্ট দেয় না। এই শ্রেণীর মানুষের জন্য তার ঐ কাজের ফলে তার ঐ জুমআহ থেকে আগামী জুমআহ পর্যন্ত বরং অতিরিক্ত ৩ দিনে (অর্থাৎ, ১০ দিনে) কৃত গোনাহর কাফ্‌ফারা হবে। কেননা আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল্‌ বলেন, **(من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)** (অর্থাৎ, যে ব্যক্তি একটি সওয়াবের কাজ করবে, সে তার ১০ গুণ সওয়াব লাভ করবে।)” *(আঃ, আদাঃ ১১১৩নং)*

আলকামাহ বিন আব্দুল্লাহর সাথে তাঁর এক সাথী খুতবা চলাকালে কথা বলছিল। তিনি তাকে চুপ করতে বললেন। নামাযের পর ইবনে উমার ﷺ-এর কাছে এ কথা উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, ‘তোমার তো জুমআহই হয়নি। আর তোমার সাথী হল একটা গাধা।’ *(ইআশাঃ ৫৩০৩নং)*

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম মিম্বরের উপর বসে থাকা অবস্থায়, অর্থাৎ খুতবা বন্ধ থাকা অবস্থায় কথা বলা অবৈধ নয়। *(ফিসুঃ উর্দু ১৭৩পৃঃ)* যেমন ইমামের খুতবা শুরু না করা পর্যন্ত (প্রয়োজনীয়) কথাবার্তা (এমনকি আযানের সময়ও) বলা বৈধ। ষা’লাবাহ বিন আবী মালেক কুরাযী বলেন, হযরত উমার ও উসমানের যুগে ইমাম বের হলে আমরা নামায ত্যাগ করতাম এবং ইমাম খুতবা শুরু করলে আমরা কথা বলা ত্যাগ করতাম। *(ইআশাঃ, তামিঃ ৩৪০পৃঃ)*

খুতবা চলা অবস্থায় কেউ মসজিদ এলে মসজিদে প্রবেশ করার আগে রাস্তায় খুতবা শুনতে পেলে রাস্তাতেও কারো সঙ্গে কথা বলাও বৈধ নয়।

বৈধ নয় খুতবা চলা অবস্থায় হাতে কোন কিছু নিয়ে ফালতু খেলা করা। যেমন মিসওয়াক করা, তসবীহ-মালা (?) নিয়ে খেলা করা, মসজিদের মেঝে, কাঁকর বা কুটো স্পর্শ করে খেলা করা ইত্যাদি। মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে জুমআর উদ্দেশ্যে (মসজিদে) উপস্থিত হয়। অতঃপর মনোযোগ সহকারে (খুতবাহ) শ্রবণ করে ও নীরব থাকে সেই ব্যক্তির ঐ জুমআহ থেকে দ্বিতীয় জুমআহর মধ্যবর্তীকালে সংঘটিত এবং অতিরিক্ত তিন দিনের পাপ মাফ করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি (খুতবা চলাকালে) কাঁকর স্পর্শ করে সে অসার (ভুল) কাজ করে।” *(মুঃ ৮৫৭ নং, আদাঃ ১০৫০, তিঃ, ইমাঃ)*

খুতবা চলাকালে তন্দ্রা (ঢুল) এলে জায়গা পরিবর্তন করে বসা বিধেয়। এতে তন্দ্রা দূরীভূত হয়ে যায়। মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের কেউ মসজিদে বসে ঢুললে সে যেন তার

বসার জায়গা পরিবর্তন করে অন্য জায়গায় বসে।” *(আদাঃ ১১১৯ নং, তিঃ, সজাঃ ৮০৯নং)*

কাউকে তার জায়গা থেকে উঠিয়ে সেখানে বসা, কেউ কোন কারণে জায়গা ছেড়ে উঠে গেলে এবং সে ফিরে আসবে ধারণা হওয়া সত্ত্বেও তার সেই জায়গায় বসা বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেন, “যখন তোমাদের কেউ নিজ জায়গা ছেড়ে উঠে যায় এবং পরক্ষণে সে ফিরে আসে, তাহলে সেই ঐ জায়গার অধিক হকদার।” *(আঃ, মুঃ)*

হযরত ইবনে উমার ؓ কেউ তার জায়গা ছেড়ে উঠে গেলে সে জায়গায় বসতেন না। *(আঃ, মুঃ)*

কিন্তু খুতবা শুনতে শুনতে ঘুম এলে (কথা না বলে) ইঙ্গিতে পাশের সাথীর সাথে জায়গা বদল করা উত্তম। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, “যখন তোমাদের কেউ জুমআর দিন ঢুলতে শুরু করে, তখন তার উচিত তার সঙ্গীর জায়গায় গিয়ে বসা এবং তার সঙ্গীর উচিত তার ঐ জায়গায় বসা।” *(বাঃ, সজাঃ ৮১২নং)*

জ্ঞাতব্য যে, ইমামের কলেমা অথবা দরূদ পড়ার সাথে সাথে মুসল্লীদের সমস্বরে সশব্দে তা পড়া বিদআত। *(মুত্বাসাঃ ২৬৫পৃঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, বিশেষ করে জুমআহ বা ঈদের নামাযে অত্যন্ত ভিঁড়ের ফলে যদি সিজদাহ করার জায়গা না পাওয়া যায়, তাহলেও জামাআতে নামায পড়তে হবে। আর এই অবস্থায় সামনের নামাযীর পিঠে সিজদা করতে হবে। ইবনে উমার ؓ বলেন, ‘নবী ﷺ আমাদের কাছে সিজদার সূরা পড়তেন। অতঃপর সিজদায় জায়গায় তিনি সিজদাহ করতেন এবং আমরাও সিজদাহ করতাম। এমনকি ভিঁড়ের ফলে আমাদের কেউ সিজদাহ করার মত জায়গা না পেলে অপরের (পিঠের) উপরে সিজদাহ করতাম।’ *(বুঃ ১০৭৬নং)*

হযরত উমার বলেন, পিঠের উপর উপর সিজদাহ করতে হবে। এই মত গ্রহণ করেছেন কুফাবাসীগণ, ইমাম আহমাদ এবং ইসহাক। পক্ষান্তরে আত্বা ও যুহরী বলেন, সামনের লোকের উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করে সে উঠে গেলে তারপর সিজদাহ করবে। আর এমত গ্রহণ করেছেন ইমাম মালেক ও অধিকাংশ উলামাগণ। (কিন্তু এর ফলে ইমামের বিরোধিতা হবে।) ইমাম বুখারীর লিখার ভঙ্গিতে বুঝা যায় যে, তিনি মনে করেন, এই অবস্থায় নামাযী নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সিজদাহ করবে। এমনকি নিজ ভায়ের পিঠে সিজদাহ করতে হলে তাও করবে। *(ফবাঃ ২/৬৫২)*

অবশ্য (মাসজিদুল হারামাইনে) সামনে মহিলা পড়লে সিজদাহ না করে একটু ঝুঁকে বা ইশারায় নামায আদায় করবে।

স্থানীয় ভাষায় খুতবা

জুমআর জমায়েত মুসলিমদের একটি প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র। সাপ্তাহিক এই প্রশিক্ষণে মুসলিমের বিস্মৃত কথা স্মরণ হয়, চলার পথে অন্ধকারে আলোর দিশা পায়, সুন্দর চরিত্র ও ব্যবহার গড়তে সহায়তা পায়, ঈমান নবায়ন হয়, হৃদয় নরম হয়, মৃত্যু ও পরকালের স্মরণ হয়, তওবা করতে অনুপ্রাণিত হয়, ভালো কাজ করতে এবং খারাপ কাজ বর্জন করতে উৎসাহ

পায়, ইত্যাদি।

তাই খুতবার ভূমিকা আরবীতে হওয়ার পর স্থানীয় ভাষায় বাকী খুতবা পাঠ বৈধ। যেহেতু খুতবার আসল উদ্দেশ্য হল জনসাধারণকে শরীয়তের শিক্ষা ও উপদেশ দান করা। আর তা আরবীতে হলে উদ্দেশ্য বিফল হয়। সুতরাং যে খুতবা আরবীতে হত তারই ভাবার্থ স্থানীয় ভাষায় হলে মুসলিমদেরকে সপ্তাহান্তে একবার উপদেশ ও পথনির্দেশনা দান করার মত মহান উদ্দেশ্য সাধিত হয়। পক্ষান্তরে খুতবা নামাযের মত নয়। নামাযে অন্য ভাষা বললে নামায বাতিল। কিন্তু খুতবা তা নয়। যেমন খুতবা ছেড়ে অন্য কথা বলা যায়, নামাযে তা যায় না। ইত্যাদি। *(দ্রঃ ফইঃ ১/৪২২-৪২৩, মবঃ ১৫/৮৪)*

পক্ষান্তরে খুতবার আগে স্থানীয় ভাষায় খুতবা দেওয়া বিধেয় নয়। কারণ, উপায় থাকতেও ডবল খুতবা হয়ে যায় তাতে। ডিষ্টার্ব হয় নামায, তেলাঅত ও যিক্‌ররত মুসল্লীদের। *(মবঃ ১৭/৭১-৭২)*

উল্লেখ্য যে, কোন স্থানের জামাআতে খুতবা দেওয়ার মত কোন লোক না থাকার ফলে যদি খুতবা দেওয়া না হয়, তাহলে সেই জামাআতের লোক জুমআহ না পড়ে যোহর পড়বে। *(ইআশাঃ ৫২৬৯-৫২৭৬নং দ্রঃ)*

জ্ঞাতব্য যে, যিনি খুতবা দেবেন তাঁরই নামায পড়া জরুরী নয়। যদিও সুন্নত হল খতীবেরই ইমামতি করা। *(ফইঃ ১/৪১০, ৪১৩)*

জুমআর নামায ও তার সুন্নতী ক্বিরাআত

জুমআর নামায ফরয ২ রাকআত। এতে ক্বিরাআত হবে জেহরী। এ নামাযে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা বা আয়াত যথানিয়মে পড়া যায়। তবুও সুন্নত হল, প্রথম রাকআতে সূরা জুমআহ (সম্পূর্ণ) এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মুনাফিকূন (সম্পূর্ণ) পাঠ করা। *(আঃ, মুঃ, আদাঃ, তিঃ, ইমাঃ)* অথবা প্রথম রাকআতে সূরা জুমআহ (সম্পূর্ণ) এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়াহ পাঠ করা। *(আঃ, মুঃ, আদাঃ, তিঃ, ইমাঃ)* অথবা প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়াহ পাঠ করা। *(আঃ, মুঃ, আদাঃ, তিঃ, ইমাঃ)*

জুমআর রাকআত ছুটে গেলে

কারো জুমআর এক রাকআত ছুটে গেলে বাকী আর এক রাকআত ইমামের সালাম ফিরার পর উঠে পড়ে নিলে তার জুমআহ হয়ে যাবে। অনুরূপ কেউ দ্বিতীয় রাকআতের রুকূ পেলেও ঐ রাকআত এবং তার সাথে আর এক রাকআত পড়লে তারও জুমআহ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কেউ দ্বিতীয় রাকআতের রুকূ থেকে ইমামের মাথা তোলার পর জামাআতে শামিল হয়, তাহলে সে জুমআর নামায পাবে না। এই অবস্থায় তাকে যোহরের ৪ রাকআত আদায়ের নিয়তে জামাআতে শামিল হয়ে ইমামের সালাম ফিরার পর ৪ রাকআত ফরয পড়তে হবে। *(ফইঃ ১/৪১৮, ৪২১)* যেমন জামাআত ছুটে গেলে জুমআও ছুটে যাবে। এ

ক্ষেত্রেও একাকী যোহর পড়তে হবে। কারণ জামাআত ছাড়া জুমআহ হয় না।

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি জুমআর এক রাকআত নামায পায়, সে যেন অপর এক রাকআত পড়ে নেয়।” *(ইমাঃ, হাঃ, ইগঃ ৬২২, সজাঃ ৫৯৯১নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি এক রাকআত নামায পায়, সে নামায পেয়ে যায়।” *(বুঃ ৫৭৯, মুঃ ৬০৭, তিঃ ৫২৪নং)*

এর বিপরীত অর্থ এই দাঁড়ায় যে, “যে ব্যক্তি এক রাকআত নামায পায় না, সে নামায পায় না।” এ জন্যই ইমাম তিরমিযী উক্ত হাদীসের টীকায় বলেছেন, ‘এ হাদীসটি হাসান সহীহ। নবী ﷺ-এর অধিকাংশ সাহাবা ও অন্যান্য আহলে ইলমগণ এ হাদীসের উপর আমল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, “যে ব্যক্তি জুমআর এক রাকআত পেয়ে যায়, সে ব্যক্তি যেন আর এক রাকআত পড়ে নেয়। কিন্তু যে (দ্বিতীয় রাকআতের তাশাহহুদের) বৈঠক অবস্থায় জামাআত পায়, সে যেন যোহরের ৪ রাকআত পড়ে নেয়।” এ মত গ্রহণ করেছেন সুফয়্যান সওরী, ইবনুল মুবারক, শাফেয়ী, আহমাদ এবং ইসহাক (রঃ)।’

ইবনে মাসউদ ؓ বলেন, “যে ব্যক্তি জুমআর এক রাকআত পেয়ে যায়, সে ব্যক্তি যেন আর এক রাকআত পড়ে নেয়। কিন্তু যে (দ্বিতীয় রাকআতের) রুকূ না পায়, সে যেন যোহরের ৪ রাকআত পড়ে নেয়।” *(ইআশাঃ, ত্বাবঃ, বাঃ, ইগঃ ৬২১নং)*

ইবনে উমার ؓ বলেন, “যে ব্যক্তি জুমআর এক রাকআত পেয়ে যায়, সে ব্যক্তি যেন আর এক রাকআত পড়ে নেয়। কিন্তু যে (দ্বিতীয় রাকআতের) তাশাহহুদ পায়, সে যেন যোহরের ৪ রাকআত পড়ে নেয়।” *(বাঃ, ইগঃ ৬২১)*

কোন কোন বর্ণনায় তাশাহহুদ পেলে নামায পেয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর তার মানে হল জামাআতের সওয়াব পেয়ে যাওয়া। *(ইগঃ ৩/৮২)*

প্রকাশ থাকে যে, জুমআর খুতবা না শুনলেও; বরং ১ রাকআত নামায না পেলেও জুমআহ হয়ে যাবে। যেমন, জুমআর খুতবা দিলে অথবা শুনলেও যদি নামাযের ১ রাকআতও না পায়, তাহলে তাকে যোহরই পড়তে হবে। *(ফইঃ ১/৪১০)*

উল্লেখ্য যে, জুমআর নামায পড়তে পড়তে যদি কারো ওযূ নষ্ট হয়ে যায় এবং ওযূ করে ফিরে এসে যদি দ্বিতীয় রাকআতের রুকূ পেয়ে যায়, তাহলে সে আর এক রাকআত পড়ে নেবে। নচেৎ সিজদা বা তাশাহহুদ পেলে যোহরের নিয়তে শামিল হয়ে ৪ রাকআত পড়বে। তদনুরূপ জামাআত ছুটে গেলেও যোহর পড়বে।

অনুরূপ কোন ইমাম সাহেব যদি বিনা ওযূতে জুমআহ পড়িয়ে নামাযের শেষে মনে হয়, তাহলে মুক্তাদীদের নামায সহীহ হয়ে যাবে। আর ইমাম ঐ নামায কাযা করতে ৪ রাকআত যোহর পড়বেন। *(আল-মুন্তাকা মিন ফাতাওয়াল ফাওযান ৩/৬৮)*

জুমআর আগে ও পরে সুন্নত

জুমআর খুতবার পূর্বে ‘কাবলাল জুমআহ’ বলে কোন নির্দিষ্ট রাকআত সুন্নত নেই।

অতএব নামাযী মসজিদে এলে 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' ২ রাকআত সুন্নত পড়ে বসে যেতে পারে এবং দুআ, দরূদ তসবীহ-যিক্র বা তেলাঅত করতে পারে। আবার ইচ্ছা হলে নামাযও পড়তে পারে। তবে এ নামায হবে নফল এবং অনির্দিষ্ট সংখ্যায়।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন যথা নিয়মে গোসল করে, দাঁত পরিষ্কার করে, খোশবূ থাকলে তা ব্যবহার করে, তার সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরে, অতঃপর (মসজিদে) যায়, নামাযীদের ঘাড় ডিঙিয়ে (কাতার চিরে) আগে যায় না, অতঃপর আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী নামায পড়ে। তারপর ইমাম উপস্থিত হলে নীরব ও নিশ্চুপ থাকে এবং নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন কথা বলে না, সে ব্যক্তির এ কাজ এই জুমআহ থেকে অপর জুমআর মধ্যবর্তীকালে কৃত পাপের কাফ্ফারা হয়ে যায়।" *(আঃ, ইমাঃ, হাঃ, সজাঃ ৬০৬৬নং)*

প্রকাশ থাকে যে, "প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে নামায আছে।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৬৬২নং)* এই হাদীস দ্বারা কাবলাল জুমআর সুন্নত প্রমাণ হয় না। কারণ, বিদিত যে, জুমআর আযান ও ইকামতের মাঝে থাকে খুতবা। আর মহানবী ﷺ-এর যুগে পূর্বের আর একটি আযান ছিল না। আর সুন্নত প্রমাণ হলেও মুআক্কাদাহ ও নির্দিষ্ট সংখ্যক নয়।

তদনুরূপ "এমন কোন ফরয নামায নেই, যার পূর্বে ২ রাকআত নামায নেই।" *(ইহিঃ, ত্বাবঃ, সিসঃ ২৩২, সজাঃ ৫৭৩০নং)* এ হাদীস দ্বারাও জুমআর পূর্বে ২ রাকআত সুন্নত প্রমাণ হয় না। কারণ, জুমআর ফরয নামাযের পূর্বে খুতবা হয়। আর খুতবার পূর্বে ২ রাকআত নামায এ দ্বারা প্রমাণিত হয় না। *(দ্রঃ সিসঃ ২৩২নং)*

সতর্কতার বিষয় যে, ইমামের খুতবা চলাকালে কেউ মসজিদে উপস্থিত হলে তাকে সেই অবস্থায় হাল্কা করে যে ২ রাকআত পড়তে হয়, তা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নয়; বরং তা হল তাহিয়্যাতুল মাসজিদ।

জুমআর পরে বা বা'দাল জুমআর ৪ অথবা ২ রাকআত সুন্নত ঃ

জুমআর পর মসজিদে সুন্নত পড়লে একটু সরে গিয়ে বা কারো সাথে কোন কথা বলার পরে ৪ রাকআত নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়তে হয়। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমআর পর নামায পড়ে, সে যেন ৪ রাকআত পড়ে।" *(আদাঃ, তিঃ, সজাঃ ৬৪৯৯নং)*

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমআর নামায পড়ে সে যেন তার পর ৪ রাকআত নামায পড়ে।" *(আঃ, মুঃ, নাঃ, সজাঃ ৬৪০নং)*

তিনি বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমআহ পড়ে, সে যেন তার পর কোন কথা না বলা অথবা বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কোন নামায না পড়ে।" *(ত্বাবঃ,সিসঃ ১৩২৯নং)*

হযরত ইবনে উমার رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী ﷺ জুমআর নামায পড়ে বাসায় ফিরে ২ রাকআত নামায পড়তেন। *(বুঃ ৯৩৭নং, মুঃ, সুআঃ)*

অবশ্য যদি কেউ মসজিদে ২ রাকআত পড়ে তাও বৈধ। পরন্তু যদি কেউ ২ অথবা ৪ রাকআত বাসায় পড়ে তাহলে সেটাই উত্তম। কারণ, মহানবী ﷺ বলেন, " ফরয নামায ছাড়া মানুষের শ্রেষ্ঠতম নামায হল তার স্বগৃহে পড়া নামায।" *(নাঃ, ইখুঃ, সতাঃ ৪৩৭নং, তামিঃ ৩৪১-৩৪২পৃঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, জুমআর পরে যোহরের নিয়তে ৪ রাকআত এহতিয়াতী যোহর পড়া বিদআত। *(আনাঃ ৭৪পৃঃ, মুবিঃ ১২০, ৩২৭পৃঃ)* যেমন বিদআত রমযানের শেষ জুমআকে জুমআতুল বিদা নাম দিয়ে কোন খাস মসজিদে ঐ জুমআহ পড়তে যাওয়া।

জুমআর দিনের ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য

১। জুমআহ অর্থাৎ জমায়েত বা সমাবেশ ও সম্মেলনের দিন। এটি মুসলিমদের সাপ্তাহিক ঈদ ও বিশেষ ইবাদতের দিন। মহানবী ﷺ বলেন, “এই দিন হল ঈদের দিন। আল্লাহ মুসলিমদের জন্য তা নির্বাচিত করেছেন। অতএব যে জুমআয় আসে, সে যেন গোসল করে এবং খোশবূ থাকলে তা ব্যবহার করে। আর তোমরা দাঁতন করায় অভ্যাসী হও।” *(ইমাঃ ১০৯৮-নং)*

২। জুমআর দিন সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ দিন। এমনকি ঈদুল ফিত্র ও আযহা থেকেও শ্রেষ্ঠ।

৩। এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বেহেশ্ত্ দান করা হয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেন, “যার উপর সূর্য উদিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জুমআর দিন। এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনে তাঁকে বেহেশ্তে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং এই দিনেই তাঁকে বের করে দেওয়া হয়েছে বেহেশ্ত্ থেকে। (এই দিনেই তাঁর তওবা কবুল করা হয়েছে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে এই দিনেই।আর কিয়ামত সংঘটিত হবে এই দিনেই।” *(মুঃ, মাঃ, আঃ, আদাঃ, তিঃ, নাঃ, হাঃ, ইহিঃ, সজাঃ ৩৩৩৪নং)*

তিনি বলেন, “জুমআর দিন সকল দিনের সর্দার এবং আল্লাহর নিকট সবার চেয়ে মহান দিন। এমনকি এ দিনটি আল্লাহর নিকট আযহা ও ফিতরের দিন থেকেও শ্রেষ্ঠ। এই দিনে রয়েছে ৫টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য; এই দিনে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন, এই দিনে তাঁকে পৃথিবীতে অবতারণ করেছেন, এই দিনে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে, এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যদি কোন মুসলিম বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহর নিকট কোন কিছু বৈধ জিনিস প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তা দিয়ে থাকেন। এই দিনে কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর প্রত্যেক নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তা, আকাশ, পৃথিবী, বাতাস, পর্বত, সমুদ্র এই দিনকে ভয় করে।” *(ইমাঃ ১০৮৪নং)*

৪। এই দিনে মহান আল্লাহ জান্নাতে প্রত্যেক সপ্তাহে বেহেশ্তী বান্দাগণকে দর্শন দেবেন। হযরত আনাস ﷺ **(ولدينا مزيد)** এর ব্যাখ্যায় বলেন, ‘মহান আল্লাহ বেহেশ্তীদের জন্য প্রত্যেক জুমআর দিন জ্যোতিষ্মান হবেন।’ এই দিনের আসমানী ফিরিশ্তাবর্গের নিকট নাম হল, ‘য়্যাউমুল মাযীদ।’

৫। এই দিনে গোনাহ মাফ হয়। হযরত আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে জুমআর উদ্দেশ্যে (মসজিদে) উপস্থিত হয়। অতঃপর মনোযোগ সহকারে (খুতবাহ) শ্রবণ করে ও নীরব থাকে সেই ব্যক্তির ঐ জুমআহ থেকে দ্বিতীয় জুমআহর মধ্যবর্তীকালে সংঘটিত এবং অতিরিক্ত তিন দিনের পাপ মাফ করে দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি (খুতবা চলাকালে) কাঁকর স্পর্শ করে সে অসার (ভুল) কাজ করে।” *(মুঃ ৮৫৭ নং আদাঃ, তিঃ, ইমাঃ)*

৬। এই দিনে এমন একটি সময় আছে, যাতে দুআ কবুল হয়। মহানবী ﷺ বলেন, “জুমআর দিনে এমন একটি (সামান্য) মুহূর্ত আছে, যদি কোন মুসলিম বান্দা নামায পড়া অবস্থায় তা পায় এবং আল্লাহর নিকট কোন মঙ্গল প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তা দিয়ে থাকেন।” *(বুঃ ৯৩৫নং, মুঃ, মিঃ ১৩৫৭নং)*

এই মুহূর্তের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তা হল ইমামের মিম্বরে বসা থেকে নিয়ে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়। *(মুঃ, মিঃ ১৩৫৮নং)* অথবা তা হল আসরের পর যে কোন একটি সময়। অবশ্য এ প্রসঙ্গে আরো অন্য সময়ের কথাও অনেকে বলেছেন। *(যামাঃ ১/৩৮৯-৩৯০)*

৭। এই দিনে দান-খয়রাত করার সওয়াব বেশী। হযরত কা’ব رضي الله عنه বলেন, ‘অন্যান্য সকল দিন অপেক্ষা এই দিনে সদকাহ করার সওয়াব অধিক।’ *(যামাঃ)*

৮। জুমআর ফজরের নামায জামাআত সহকারে পড়ার পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। মহানবী ﷺ বলেন, “আল্লাহর নিকটে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ নামায হল, জুমআর দিন জামাআত সহকারে ফজরের নামায।” *(সিসঃ ১৫৬৬নং)*

৯। এই দিনে বা তার রাতে কেউ মারা গেলে কবরের আযাব থেকে রেহাই পাবে। মহানবী ﷺ বলেন, “যে মুসলিম জুমআর দিন অথবা রাতে মারা যায়, আল্লাহ তাকে কবরের ফিতনা থেকে বাঁচান।” *(আঃ, তিঃ, সজাঃ ৫৭৭৩)*

জুমআর দিনে করণীয়

১। জুমআর ফজরের প্রথম রাকআতে সূরা সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা দাহর (ইনসান) পাঠ করা। উভয় সূরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করাই সুন্নত। প্রত্যেক সূরার কিছু করে অংশ পড়া সুন্নত নয়।

অবশ্য অন্য সূরা পড়া দোষাবহ নয়। বরং কখনো কখনো ঐ দুই সূরা না পড়াই উচিত। যাতে সাধারণ মানুষ তা পড়া জরুরী মনে না করে বসে। বরং তা জরুরী মনে করে পড়া এবং কখনো কখনো না ছাড়া বা কেউ তা না পড়লে আপত্তি করা বিদআত। *(মুবিঃ ২৮১পৃঃ)*

২। সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া। আগে আগে মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার বিশেষ মাহাত্ম্য আছে।

হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি জুমআর দিন নাপাকীর গোসলের মত গোসল করল। অতঃপর প্রথম সময়ে (মসজিদে গিয়ে) উপস্থিত হল, সে যেন এক উষ্ট্রী কুরবানী করল। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় সময়ে উপস্থিত হল, সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। যে ব্যক্তি তৃতীয় সময়ে পৌঁছল, সে যেন একটি শিং-বিশিষ্ট মেষ কুরবানী করল। যে ব্যক্তি চতুর্থ সময়ে পৌঁছল, সে যেন একটি মুরগী দান করল। আর যে

ব্যক্তি পঞ্চম সময়ে পৌঁছল, সে যেন একটি ডিম দান করল। অতঃপর যখন ইমাম (খুতবাদানের জন্য) বের হয়ে যান (মিম্বরে চড়েন), তখন ফিরিশ্তাগণ (হাজরী খাতা গুটিয়ে) যিক্র (খুতবা) শুনতে উপস্থিত হন।" *(মাঃ, বুঃ ৮৮১, মুঃ ৮৫০, আদাঃ, ইমাঃ, নাঃ)*

৩। জুমআর জন্য প্রস্তুতিস্বরূপ দেহের দুর্গন্ধ দূর করা, সে জন্য গোসল করা, আতর ব্যবহার করা ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জুমআহ পড়তে আসবে, সে যেন গোসল করে আসে।" *(বুঃ, মুঃ)*

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করবে, যথাসাধ্য পবিত্রতা অর্জন করবে, তেল ব্যবহার করবে, অথবা নিজ পরিবারের সুগন্ধি নিয়ে ব্যবহার করবে, অতঃপর (জুমআর জন্য) বের হয়ে (মসজিদে) দুই নামাযীর মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করবে না (কাতার চিরবে না), অতঃপর যতটা তার ভাগ্যে লিখা আছে ততটা নামায পড়বে, অতঃপর ইমাম খুতবা দিলে চুপ থাকবে, সে ব্যক্তির এই জুমআহ থেকে আগামী জুমআহ পর্যন্ত কৃত পাপ মাফ হয়ে যাবে।" *(বুঃ, মিঃ ১৩৮১নং)*

গোসল করা ওয়াজেব না হলেও ঈদ, জুমআহ ও জামাআতের জন্য পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা একটি প্রধান কর্তব্য। ([১]) কোন কোন বর্ণনায়, "ধৌত করায় ও করে" বা "গোসল করায় ও করে" শব্দ এসেছে। যাতে গোসল যে তাকীদপ্রাপ্ত আমল তা স্পষ্ট হয়। অবশ্য এর অর্থে অনেকে বলেন, ঐ দিন স্ত্রী-সহবাস করে নিজে গোসল করে এবং স্ত্রীকেও গোসল করায়। অথবা মাথা ও দেহ ধৌত করে পরিপূর্ণ পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে। যারা করে তাদের জন্য রয়েছে উক্তরূপ পুরস্কার।

৪। দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করা ঃ

দাঁতন বা ব্রাশ করে দাঁত ও মুখের দুর্গন্ধ দূরীভূত করে নেওয়া জুমআর পূর্বে একটি করণীয় কর্তব্য। মহানবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক সাবালকের জন্য জুমআর দিন গোসল করা, মিসওয়াক করা এবং যথাসাধ্য সুগন্ধি ব্যবহার করা কর্তব্য।" *(মুঃ ৮৪৬নং)*

৫। সুন্দর পোশাক পরা ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে, খোশবূ থাকলে তা ব্যবহার করে এবং তার সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরিধান করে, অতঃপর স্থিরতার সাথে মসজিদে আসে, অতঃপর ইচ্ছামত নামায পড়ে এবং কাউকে কষ্ট দেয় না, অতঃপর ইমাম বের হলে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত নিশ্চুপ থাকে, সে ব্যক্তির এ কাজ দুই জুমআর মাঝে কৃত গোনাহর কাফ্ফারা হয়ে যায়।" *(আঃ, আদাঃ, হাঃ, ইখুঃ, মিঃ ১৩৮৭নং)*

জুমআর জন্য সাধারণ আটপৌরে পোশাক বা কাজের কাপড় ছাড়া পৃথক তোলা পোশাক ও কাপড় পরা বাঞ্ছনীয়। যেহেতু জুমআর দিন মুসলিমদের সমাবেশের দিন। আর এ দিনে সাজসজ্জা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। যাতে অপরের কাছে কেউ ঘৃণার পাত্র না হয়ে

([১]) প্রকাশ থাকে যে, সত্যানুসন্ধানী কিছু উলামার নিকট জুমআর দিন গোসল করা ওয়াজেব। দেখুন ঃ (তামিঃ ১২০পৃঃ, মুমঃ ১/১৬৩, ৫/১০৮) সুতরাং গোসল ত্যাগ না করাই উচিত।

যায়। অথবা তার অপরিচ্ছন্নতায় কেউ কষ্ট না পায়।

একদা খুতবার মাঝে মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তাদের পরিশ্রমের কাপড় ছাড়া জুমআর জন্য অন্য এক জোড়া কাপড় থাকলে কি অসুবিধা আছে?” *(আদাঃ, ইমাঃ ১০৯৫-১০৯৬নং)*

৬। পায়ে হেঁটে মসজিদে যাওয়া।

এর জন্য মর্যাদাও আছে পৃথক। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি জুমআর দিন (মাথা) ধৌত করে ও যথা নিয়মে গোসল করে, সকাল-সকাল ও আগে-আগে (মসজিদে যাওয়ার জন্য) প্রস্তুত হয়, সওয়ার না হয়ে পায়ে হেঁটে (মসজিদে) যায়, ইমামের কাছাকাছি বসে মনোযোগ সহকারে (খোতবা) শ্রবণ করে, এবং কোন অসার ক্রিয়া-কলাপ করে না, সে ব্যক্তির প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে এক বৎসরের নেক আমল ও তার (সারা বছরের) রোযা ও নামাযের সওয়াব লাভ হয়!” *(আঃ, সুআঃ, ইখুঃ, ইহিঃ, হাঃ, সতাঃ ৬৮৭ নং)*

প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি গাড়ি করে জুমআহ পড়তে আসে, তার এ সওয়াব লাভ হয় না। বলা বাহুল্য, যে বাসা থেকে ১০০ কদম পায়ে হেঁটে জামে মসজিদে পৌঁছবে, তার আমল-নামায় ১০০ বছরের রোযা-নামাযের সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে; যাতে একটি গোনাহও থাকবে না। আর তা এখানেই শেষ নয়। এইভাবে সে প্রতি মাসে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ এবং প্রতি বছরে প্রায় ৫২০০ বছরের নামায-রোযার সওয়াব অর্জন করবে ইনশাআল্লাহ। আর এ হল মুসলিম বান্দাদের প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

(ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ، وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ)

৭। সূরা কাহফ পাঠ ঃ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ؓ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে তার জন্য দুই জুমআর মধ্যবর্তীকাল জ্যোতির্ময় হবে।” *(নাঃ, বাঃ, হাঃ, সতাঃ ৭৩৫ নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে, “যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে তার জন্য তার ও কা’বা শরীফের মধ্যবর্তী জ্যোতির্ময় হবে।” *(বাঃ, শুআবুল ঈমান, সজাঃ ৬৪৭১নং)*

উল্লেখ্য যে, জুমআর সময় মসজিদে এই সূরা তেলাঅত করলে এমনভাবে তেলাঅত করতে হবে, যাতে অপরের ডিষ্টার্ব না হয়।

জ্ঞাতব্য যে, এ দিনে সূরা দুখান পড়ার হাদীস সহীহ নয়। *(যজাঃ ৫৭৬৭, ৫৭৬৮-নং)* যেমন আলে ইমরান সূরা পাঠ করার হাদীসটি জাল। *(যজাঃ ৫৭৫৯নং)*

তদনুরূপ জুমআর নামায পড়ে ৭ বার সূরা ফাতিহা, ইখলাস, ফালাক, নাস পড়ে অযীফা করার হাদীসদ্বয়ের ১টি জাল এবং অপরটি দুর্বল হাদীস। *(যজাঃ ৫৭৫৮, ৫৭৬৪, সিযঃ ৪৬৩০নং)* সুতরাং এমন অযীফা পাঠ বিদআত। *(মুবিঃ ১২২, ৩২৬পৃঃ)*

৮। বেশী বেশী দরূদ পাঠ ঃ

জুমআর রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) ও (জুমআর) দিনে প্রিয়তম হাবীব মহানবী ﷺ-এর শানে অধিকাধিক দরূদ পাঠ করা কর্তব্য। মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল, জুমআর দিন। এই দিনে তোমরা আমার প্রতি দরূদ পাঠ কর। যেহেতু তোমাদের দরূদ আমার উপর পেশ করা হয়ে থাকে। *(আদাঃ ১৫৩১নং)*

তিনি আরো বলেন, “জুমআর রাতে ও দিনে তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ কর। আর যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে, সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ ১০ বার রহমত বর্ষণ করবেন।” *(বাঃ, সিসঃ ১৪০৭নং)*

জুমআর দিন যা অবৈধ

❁ খাস জুমআর রাতে নামায ও দিনে রোযা ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, “অন্যান্য দিন থাকতে জুমআর রাতে বিশেষ করে নামায পড়ো না এবং জুমআর দিনে বিশেষ করে রোযা রেখো না। অবশ্য যদি কারো অভ্যাসগত রোযা ঐ দিনে পড়ে তাহলে তা বৈধ।” *(মুঃ ১১৪৪নং)*

তিনি আরো বলেন, “তোমাদের কেউ যেন জুমআর দিন অবশ্যই রোযা না রাখে। তবে যদি তার আগের দিন অথবা তার পরের দিনও রোযা রাখে, তাহলে তা তার জন্য বৈধ।” *(বুঃ ১৯৮৫, মুঃ ১১৪৪নং)*

❁ জুমআর দিন সফর ঃ

জুমআর সময় (খুতবার আযান) হয়ে গেলে জুমআহ পড়ে না নেওয়া পর্যন্ত (জরুরী ছাড়া) কোন সফর করা বৈধ নয়। *(যামাঃ ১/৩৮২)* অবশ্য জুমআর সকালে বা বিকালে সফর অবৈধ নয়।

❁ হারাম কাজ করে জুমআর জন্য সাজ-সজ্জা ঃ

জুমআর দিন অপ্রয়োজনীয় চুল, নখ প্রভৃতি সাফ করে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু যারা ওয়াজেব দাড়ি চেঁছে বা (এক মুঠির কম করে) ছেঁটে সৌন্দর্য আনয়ন করে তারা গোনাহগার।

সতর্কতার বিষয় যে, অনেক অনুসরণীয় নেতৃস্থানীয় উলামা তিরমিযী শরীফের দাড়ি ছাঁটার হাদীসকে দলীলরূপে পেশ করে দাড়ি ছেঁটে চেহারা সুন্দর করে থাকেন। কিন্তু সে হাদীস সহীহ ও দলীলযোগ্য নয়; বরং তা জাল ও গড়া হাদীস। *(দ্রঃ সিযঃ ২৮৮নং)* সুতরাং সহীহ হাদীসভক্ত আহলে হাদীস সাবধান!

❁ মসজিদে এসে ইমামের আড়ালে বা পিছন কাতারে বা পিছনের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসা। অবশ্য এ শ্রেণীর মানুষ পাপের কারণে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত মানুষ, নতুবা মুনাফেক মানুষ। তাই সামনের কাতারে থেকে ইমাম বা পরহেযগার মানুষদেরকে তথা আল্লাহকে (!) নিজের চেহারা দেখাতে লজ্জাবোধ করে।

❁ মসজিদে এসে গোল হয়ে বসে গল্প করা ঃ

মহানবী ﷺ মসজিদে কিছু ক্রয়-বিক্রয়, হারানো বস্তু খোঁজা, (বাজে) কবিতা বা গজল পাঠ এবং জুমআর পূর্বে গোল হয়ে বসা থেকে নিষেধ করেছেন। *(আদাঃ ১০৭৯নং, তিঃ প্রমুখ সজাঃ ৬৮৮৫ নং)*

ঈদের দিন জুমআহ পড়লে

ঈদের দিন জুমআহ পড়লে ইমাম জুমআহ পড়বেন। সাধারণ মুসলিমদের জন্য এখতিয়ার থাকবে; তারা জুমআহ পড়তেও পারে, নচেৎ যোহর পড়াও বৈধ। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য 'রোযা ও রমযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল')*

আর পূর্বে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৃষ্টি-বন্যার কারণে মসজিদে উপস্থিত হতে না পারলে ঘরে যোহর পড়ে নিতে হবে।
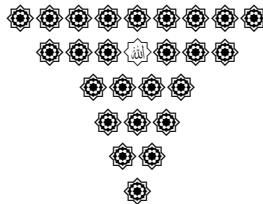
মুসাফিরের নামায

সফর একটি কঠিন জিনিস। সফর ভীতি, কষ্ট ও উদ্বেগপূর্ণ সময়, ব্যস্ততা ও শঙ্কাময় কাল। তাই এই সময়কালে দয়াময় মহান আল্লাহ দয়াপূর্বক বান্দার উপর কিছু নামায হাল্কা করেছেন এবং এ মর্মে আরো অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দান করেছেন। তন্মধ্যে কসর ও জমা করে নামায পড়া অন্যতম।

কসর নামায

সফরে ৪ রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামাযকে ২ রাকআত কসর (সংক্ষেপ) করে পড়া সুন্নত ও আফযল। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

(وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا)

অর্থাৎ, যখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর কর, তখন তোমরা নামায সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; যদি তোমরা এই আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে বিব্রত

করবে। *(কুঃ ৪/১০১)*

বাহ্যতঃ উক্ত আয়াত থেকে যদিও এই কথা বুঝা যায় যে, কেবল ভয়ের সময় নামায কসর করা বৈধ, তবুও ভয় ছাড়া নিরাপদ সময়েও কসর করা যায়। মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ﷺ-গণ ভয়-অভয় উভয় অবস্থাতেই কসর করেছেন বলে প্রমাণিত।

একদা হযরত য়্যা'লা বিন উমাইয়া ﷺ হযরত উমার ﷺ-কে বলেন, কি ব্যাপার যে, লোকেরা এখনো পর্যন্ত নামায কসর পড়েই যাচ্ছে, অথচ মহান আল্লাহ তো কেবল বলেছেন যে, "যখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে সফর কর, তখন তোমরা নামায সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই; যদি তোমরা এই আশংকা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে বিব্রত করবে।" আর বর্তমানে তো ভীতির সে অবস্থা অবশিষ্ট নেই?

হযরত উমার ﷺ উত্তরে বললেন, যে ব্যাপারে তুমি আশ্চর্যবোধ করছ, আমিও সেই ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করে নবী ﷺ-এর নিকট এ কথার উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "এটা তোমাদেরকে দেওয়া আল্লাহর একটি সদকাহ। সুতরাং তোমরা তাঁর সদকাহ গ্রহণ কর।" *(আঃ, মুঃ, সুআঃ, মিঃ ১৩৩৫নং)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'মক্কাতে প্রথমে ২ রাকআত করে নামায ফরয করা হয়। অতঃপর নবী ﷺ যখন মদীনায় হিজরত করে আসেন, তখন আরো ২ রাকআত করে নামায বৃদ্ধি করা হল। কেবল মাগরেবের নামায (৩ রাকআত) করা হল। কারণ, তা দিনের বিত্র। আর ফজরের নামাযও ২ রাকআত রাখা হল। কারণ, তার ক্বিরাআত লম্বা। কিন্তু নবী ﷺ যখন সফরে যেতেন, তখন তিনি ঐ প্রথমকার সংখ্যাই (মক্কায় ফরযকৃত ২ রাকআত নামাযই) পড়তেন।' *(আঃ, বাঃ, ইমাঃ, ইখুঃ)*

মহানবী ﷺ প্রত্যেক সফরেই কসর করে নামায পড়েছেন এবং কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত নেই যে, তিনি কোন সফরে নামায পূর্ণ করে পড়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেন, 'আমি নবী ﷺ, আবূ বাক্র, উমার ও উসমান ﷺ-এর সাথে সফরে থেকেছি। কিন্তু কখনো দেখি নি যে, তাঁরা ২ রাকআতের বেশী নামায পড়েছেন।' *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১৩৩৮নং)*

অবশ্য হযরত উসমান ﷺ তাঁর খেলাফতের শেষ দিকে মিনায় পূর্ণ (৪ রাকআত) নামায পড়েছেন। *(বুঃ ১০৮২, মুঃ, মিঃ ১৩৪৭নং)* তদনুরূপ মা আয়েশাও সফরে পূর্ণ নামায পড়তেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১৩৪৮নং)* অবশ্য তাঁদের এ কাজের ব্যাখ্যা এই ছিল যে, প্রথমতঃ তাঁরা জানতেন, কসর করা সুন্নত; ওয়াজেব নয়। আর দ্বিতীয়তঃ যাতে অজ্ঞ লোকেরা তাঁদের কসর করা দেখে মনে না করে বসে যে, যোহর, আসর ও এশার নামায মাত্র ২ রাকআত। *(ফবাঃ ২/৬৬৪-৬৫)*

পক্ষান্তরে ফজর ও মাগরেবের নামাযে কসর নেই।

কতদূর সফরে কসর বিধেয়

কুরআন মাজীদের উপর্যুক্ত আয়াতে বা কোন হাদীসে সেই সফরের কোন নির্দিষ্ট পরিমাপ

বা দূরত্ব উল্লেখ হয়নি, যতটা দূরত্ব যাওয়ার পর নামায কসর করে পড়া বিধেয়। এই জন্য সঠিক এই যে, পরিভাষায় বা প্রচলিত অর্থে যাকে সফর বলা হয়, সেই সফরে নামায কসর করা চলবে। *(মুমঃ ৪/৪৯৭-৪৯৮)*

সাহাবাদের মধ্যে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার ﷺ ৪৮ মাইল দূরে গিয়ে কসর করতেন এবং রোযা রাখতেন না। *(বুঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, এই সফর পায়ে হেঁটে হোক অথবা উটের পিঠে, সাইকেলে হোক বা বাসে-ট্রেনে, পানি-জাহাজে হোক অথবা এরোপ্লেনে, কষ্টের হোক অথবা আরামের, বৈধ কোন কাজের জন্য হলে তাতে কসর বিধেয়। *(মবঃ ২০/১৫৭)*

দূরবর্তী সফর থেকে যদি একদিনের ভিতরেই ফিরে আসে অথবা নিকটবর্তী সফরে ২/৩ দিন অবস্থান করে তবুও তাতে কসর-জমা চলবে। *(মুমঃ ৪/৪৯৯)*

কোত্থেকে কসর শুরু হবে?

মহানবী ﷺ শহর বা জনপদ ছেড়ে বের হয়ে গেলেই কসর শুরু করতেন। হযরত আনাস ﷺ বলেন, 'আমি নবী ﷺ-এর সাথে (মক্কা যাওয়ার পথে) মদীনায় যোহরের ৪ রাকআত এবং (মদীনা থেকে ৬ মাইল দূরে) যুল-হুলাইফায় গিয়ে আসরের ২ রাকআত পড়তাম।' *(বুঃ ১০৮৯নং, মুঃ, আদাঃ, তিঃ, নাঃ)*

বলা বাহুল্য, সফর করতে শহর বা গ্রাম ত্যাগ করার পূর্ব থেকেই নামায কসর বা জমা করা চলবে না।

নামাযের সময় আসার পরেও সফর করলে পথে কসর করা বৈধ। অনুরূপ সফরে নামাযের সময় হওয়ার পরেও বাসায় ফিরে এলে পূর্ণ নামায পড়তে হবে। *(লিবামাঃ ৭৯পৃঃ, মুমঃ ৪/৫২৩)*

সফরে বের হয়ে শহর ছেড়ে (শহরের বাইরে) বিমান-বন্দর, স্টেশন বা বাস-স্ট্যান্ডে কসর চলবে। সেখানে কসর করে নামায পড়ার পর যদি কোন কারণবশতঃ প্লেন বা গাড়ি না আসার ফলে বাড়ি ফিরতে হয়, তবুও ঐ কসর করা নামায আর ফিরিয়ে পড়তে হবে না। *(মুমঃ ৪/৫১৪)*

সফরে বের হয়ে প্লেন বা গাড়ি যদিও মুসাফিরের গ্রাম বা শহরের উপর বা ভিতর দিয়ে যায়, তাহলেও তার ঐ বিমান-বন্দরে বা স্টেশনে বা বাস-স্ট্যান্ডে কসর করা চলবে। *(ঐ ৪/৫৬৯)*

কসরের সময়-সীমা

সফরে গিয়ে নির্দিষ্ট দিন থাকার সংকল্প না হলে, বরং কাজ হাসিল হলেই ফিরে আসার নিয়ত হলে অথবা পথে কোন বাধা পড়লে যতদিন ঐ কাজ না হবে অথবা বাধা দূর না হবে ততদিন সফরে কসর করা চলবে। *(ফইঃ ১/৪০৬-৪০৭)*

মহানবী ﷺ এক সফরে ১৯ দিন ছিলেন এবং তাতে নামায কসর করেছেন। *(বুঃ ১০৮০নং)*

হযরত আনাস ﷺ শাম দেশে ২ বছর ছিলেন এবং ২ বছরই নামায কসর করে পড়েছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ইবনে উমার ﷺ পথে বরফ থাকার ফলে আযারবাইজানে ৬ মাস আটক ছিলেন এবং তাতে কসর করে নামায পড়েছিলেন।

কিছু সাহাবা রামাহুরমুযে ৭ মাস অবস্থান কালে কসর করে নামায পড়েছিলেন।

পক্ষান্তরে বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে; ব্যবসা, চাকুরী, অধ্যয়ন প্রভৃতির জন্য বিদেশে থাকতে হলে তখন আর কসর চলবে না।

বাকী থাকল এত দিন সফরে থাকার নিয়ত করলে কসর চলবে এবং এত দিন করলে চলবে না, তো সে কথার উপযুক্ত দলীল নেই। ৪ কিংবা তার থেকে বেশী দিনের অবস্থান নিয়তে থাকলেও যতদিন তার কাজ শেষ না হয়েছে ততদিন মুসাফির মুসাফিরই; যতক্ষণ না সে স্থায়ীভাবে বসবাসের নিয়ত করেছে। *(মুমঃ ৪/৫৩২-৫৩৯)*

প্রকাশ থাকে যে, যারা ভাড়া গাড়ি চালায়, প্রত্যহ বাস, ট্রেন বা প্লেন চালায় তারাও মুসাফির। তাদের জন্যও নামায কসর করা বিধেয়। *(মবঃ ২২/১০৩)*

সফরে সুন্নত ও নফল নামায

মহানবী ﷺ সফরে সাধারণতঃ ফরয নামাযের আগে বা পরে সুন্নত নামায পড়তেন না। তবে বিত্‌র ও ফজরের সুন্নত তিনি সফরেও নিয়মিত পড়তেন। যেমন এর পূর্বেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, সফরে (বিত্‌র ও ফজরের আগে ২ রাকআত ছাড়া) সুন্নত (মুআক্কাদাহ) না পড়াই সুন্নত। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ এক সফরে লোকেদেরকে ফরয নামাযের পর সুন্নত পড়তে দেখে বললেন, 'যদি আমাকে সুন্নতই পড়তে হত, তাহলে ফরয নামায পুরা করেই পড়তাম। আমি নবী ﷺ-এর সাথে সফরে থেকেছি। আমি তাঁকে সুন্নত পড়তে দেখিনি।' অতঃপর তিনি বললেন,

(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। *(কুঃ ৩৩/২১) (বুঃ ১১০১নং, মুঃ)*

আমি নবী ﷺ-এর সাথে সফরে থেকেছি। তিনি ২ রাকআতের বেশী নামায পড়তেন না। অনুরূপ আবূ বাক্‌র, উমার ও উসমান ﷺ-ও করতেন।' *(বুঃ ১১০২নং, মুঃ, মিঃ ১৩৩৮-নং)*

তবে সফরে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়া যাবে না এমন কথা নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ কখনো কখনো কিছু কিছু সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়তেন। *(মিঃ আলবানীর টীকা ১/৪২৩)*

অবশ্য সাধারণ নফল, তাহাজ্জুদ, চাশ্‌ত, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ প্রভৃতি নামায সফরে পড়া চলে। যেমন ফরয নামাযের আগে-পরেও নফলের নিয়তে নামায পড়া দূষণীয় নয়।

মক্কা বিজয়ের দিন উম্মে হানীর ঘরে তিনি চাশ্তের নামায পড়েছেন। *(বুঃ)* এ ছাড়া তিনি সফরে উটের পিঠে নফল ও বিত্‌র নামায পড়তেন। *(বুঃ, মুঃ, আদাঃ, নাঃ)*

মুসাফিরের ইমাম ও মুক্তাদী হয়ে নামায

মুসাফির ইমামতি করতে পারে এবং এ অবস্থাতেও সে কসর করে নামায পড়তে পারে। এ ক্ষেত্রে গৃহবাসী অমুসাফির মুক্তাদীরা মুসাফির ইমামের সালাম ফিরার পর সালাম না ফিরে উঠে বাকী নামায পূরণ করতে বাধ্য হবে। *(লিবামাঃ ৭/ ১৮)*

অনুরূপ মুসাফির অমুসাফির ইমামের পিছনে নামায পড়তে পারে। আর এ ক্ষেত্রে সে ঐ ইমামের মতই পূর্ণ নামায পড়তে বাধ্য হবে। এমন কি ইমামের শেষের ২ রাকআতে জামাআতে শামিল হলেও মুসাফির বাকী ২ রাকআত একাকী আদায় করতে বাধ্য। এখানে ঐ ২ রাকআতকে কসর ধরে নিলে হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵁-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, মুসাফির একাকী নামায পড়লে ২ রাকআত, আর অমুসাফির ইমামের পশ্চাতে পড়লে ৪ রাকআত নামায পড়ে, তার কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন, 'এটাই হল আবুল কাসেম ﷺ-এর সুন্নত।' *(আঃ ১৮৬২, ত্বাবঃ ১২৮৯৫নং)*

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'মক্কায় থেকে ইমামের সাথে জামাআতে নামায না পেলে কিভাবে নামায পড়ব?' উত্তরে তিনি বললেন, 'দুই রাকআত আবুল কাসেম ﷺ-এর সুন্নত।' *(মুঃ ৬৮৮নং, ইখুঃ)*

যদি কোন মুসাফির পথের কোন মসজিদে জামাআত চলতে দেখে এবং সে বুঝতে না পারে যে, ইমাম স্থানীয় বসবাসকারী, বিধায় পূর্ণ নামায পড়ার নিয়ত করে জামাআতে শামিল হবে, নাকি মুসাফির, বিধায় কসর করার নিয়তে শামিল হবে?

এমত অবস্থায় মুসাফির ইমামের আকার-আকৃতি ও সফরের চিহ্ন দেখে মোটামুটি আন্দাজ লাগাবে, ইমাম কি? এরপর যদি প্রবল ধারণা হয় যে, সে স্থায়ী বসবাসকারী, তাহলে পূর্ণ নামায পড়ার নিয়তে জামাআতে শামিল হবে।

পক্ষান্তরে যদি তার প্রবল ধারণা এই হয় যে, সে মুসাফির, তাহলে কসরের নিয়তে জামাআতে শামিল হবে।

কিন্তু সালাম ফিরার পর যদি বুঝতে পারে যে, ইমাম স্থানীয় বাসিন্দা এবং তার পিছনে যে ২ রাকআত নামায সে পড়েছে তা ইমামের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআত, তাহলে সে উঠে আরো ২ রাকআত পড়ে নিয়ে নামায পূর্ণ করবে। আর এর জন্য তাকে সিজদা-এ সাহ্‌ও করতে হবে। এতে যদি সে মাঝে প্রকৃত জানার জন্য কথাও বলে থাকে তাতে কোন ক্ষতি হবে না। *(মাতাহাআঃ ১৬পৃঃ)*

পরন্তু যদি প্রবল ধারণায় কোন এক দিক বুঝা না যায়, তাহলে মুসাফির সম্ভাবনাময় নিয়ত করতে পারে। যেমন মনে এই সংকল্প করতে পারে, যদি ইমাম পূর্ণ নামায পড়ে তাহলে আমিও পূর্ণ পড়ব। নচেৎ, কসর পড়লে আমিও কসর পড়ব। *(মুমঃ ৪/৫২১)*

জ্ঞাতব্য যে, মুসাফির নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা দেওয়ার পর যদি কসরের নিয়ত করে তাহলেও চলবে। পূর্ব থেকেই কসরের নিয়ত জরুরী নয়। *(ঐ ৪/৫২৫)*

প্রকাশ থাকে যে, মুসাফিরের জন্যও স্থানীয় জামাআতে শরীক হয়ে নামায পড়া উত্তম।

অবশ্য সফরের পথে কোন ক্ষতির আশঙ্কা হলে ভিন্ন কথা। *(মবঃ ১২/৮৯)*

মুসাফিরের সফরের আগে-পরে নামায

মহানবী ﷺ বলেন, “যখন তুমি তোমার ঘর থেকে বের হওয়ার সংকল্প করবে, তখন দুই রাকআত নামায পড়; তোমাকে বাহির পথের সকল মন্দ থেকে রক্ষা করবে। আবার যখন তুমি তোমার ঘরে প্রবেশ করবে তখনও দুই রাকআত নামায পড়; তোমাকে প্রবেশ পথের সকল মন্দ থেকে রক্ষা করবে।” *(বায্‌যার, বাঃ শুআবুল ঈমান, সজাঃ ৫০৫নং)*

নামায জমা করে পড়ার বিধান

মহান আল্লাহ বান্দার প্রতি বড় দয়াবান, বড় অনুগ্রহশীল। তিনি বান্দার কষ্ট চান না। তাই অনুগ্রহ করেই বিধান দিয়েছেন দুই সময়ের নামাযকে প্রয়োজনে এক সময়ে একত্রিত করে পড়ার। অনুমতি দিয়েছেন আগের নামাযকে পরের সাথে (বিলম্ব করে) অথবা পরের নামাযকে আগের সাথে (ত্বরান্বিত করে) পড়ার।

অবশ্য এ কেবল সীমাবদ্ধ নামাযের মাঝেই সম্ভব। যেমন, যোহর ও আসর এক সাথে এবং মাগরেব ও এশা এক সাথে দুটির মধ্যে একটির সময়ে জমা করে পড়া যাবে। পক্ষান্তরে ফজরের নামাযকে আগে-পরের কোন নামাযের সাথে জমা করে পড়া যাবে না। যেমন পড়া যাবে না আসর ও মাগরেবের নামাযকে এক সাথে জমা করে। অনুরূপ জুমআর নামায যোহর থেকে পৃথক। অতএব জুমআর সাথে আসরের নামাযকে জমা করে পড়া যাবে না। *(মুমঃ ৪/৫৭২-৫৭৩)*

কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় জমা করা যায়?

যথা সময়ে নামায পড়াই প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয। কিন্তু দলীলের ভিত্তিতেই নিম্নোক্ত সময় ও অবস্থায় এক সময়ের নামাযকে অন্য সময়ের নামাযের সাথে জমা করে পড়া বৈধ ঃ-

আরাফাত ও মুযদালিফায় ঃ

বিদায়ী হজ্জে মহানবী ﷺ আরাফাতে যোহর ও আসরের নামাযকে যোহরের সময় এবং মুযদালিফায় মাগরেব ও এশার নামাযকে এশার সময় জমা করে পড়েছিলেন।

সফরে মুসাফির অবস্থায় ঃ

সফরে পথে অথবা কোন অবস্থানক্ষেত্রে বা বাসায় জমা (ও কসর) করে নামায পড়া যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে নবী ﷺ-এর নামায সম্পর্কে বর্ণনা দেব না?' লোকেরা বলল, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, 'সফর করার সময় অবস্থানক্ষেত্রে থাকতে থাকতেই যদি সূর্য ঢলে যেত, তাহলে সওয়ার হওয়ার আগেই যোহর ও আসরকে জমা করে পড়ে নিতেন। আর সূর্য না ঢললে তিনি বের হয়ে যেতেন। অতঃপর আসরের সময় হলে সওয়ারী থেকে নেমে যোহর ও আসরকে এক সঙ্গে জমা করে পড়ে নিতেন। অনুরূপ যদি অবস্থানক্ষেত্রে থাকতে থাকতেই সূর্য ডুবে যেত, তাহলে মাগরেব ও এশার নামাযকে এক সঙ্গে জমা করে নিতেন। আর সূর্য না ডুবলে তিনি বের হয়ে যেতেন। অতঃপর এশার সময় হলে তিনি সওয়ারী থেকে নেমে মাগরেব ও এশার নামাযকে এক সঙ্গে জমা করে পড়ে নিতেন।' *(আঃ, শাফেয়ী, দ্রঃ বুঃ ১১১১-১১১২নং)*

হযরত মুআয ﷺ বলেন, তবুক অভিযানে গিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ একদা দেরী করে নামায পড়লেন। তিনি বাইরে এসে যোহর ও আসরকে এক সাথে জমা করে পড়লেন। তারপর তিনি ভিতরে চলে গেলেন। অতঃপর বাইরে এসে তিনি মাগরেব ও এশাকে এক সাথে জমা করে পড়লেন। *(মুঃ, মাঃ)*

দুই নামাযকে একত্রে জমা করে পড়ার সময় সুন্নত হল নামাযের পূর্বে একটি আযান হবে এবং প্রত্যেক নামায শুরু করার আগে ইকামত হবে। আর উভয় নামাযের মাঝে কোন সুন্নত পড়া যাবে না। মহানবী ﷺ আরাফাত ও মুযদালিফায় অনুরূপই করেছিলেন। *(আঃ, বুঃ, মুঃ, নাঃ)*

দুই নামায জমা করার সময় উভয়ের মাঝে সামান্য ক্ষণ দেরী হয়ে যাওয়া দোষাবহ নয়। কারণ, মুযদালিফায় পৌঁছে মহানবী ﷺ মাগরেবের নামায পড়েন। অতঃপর প্রত্যেকে নিজ নিজ উট নিজ নিজ অবতরণ স্থলে বসিয়ে দিল। তারপর এশার নামায পড়লেন এবং মাঝে কোন নামায পড়েননি। *(বুঃ ১৬৭২, মুঃ)*

বৃষ্টি-বাদলে নামায জমা

বৃষ্টি-বাদলের দিনে কাদায় পা পিছলে পড়ে যাওয়া বা পানিতে ভিজে যাওয়ার আশঙ্কায় বারবার মসজিদ আসতে মুসল্লীদের কষ্ট হবে বলেই সরল শরীয়তে সে সময়ও দুই নামাযকে এক সাথে জমা করে পড়ে নেওয়ার অনুমতি দান করেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'মহানবী ﷺ মদীনায় যোহর ও আসর এবং মাগরেব ও এশাকে জমা করে পড়েছেন।' (এক বর্ণনাকারী) আইয়ুব (আবুশ্ শা'ষা জাবেরকে) জিজ্ঞাসা করলেন, 'সম্ভবতঃ বৃষ্টির সময়?' উত্তরে (জাবের) বললেন, 'সম্ভবতঃ।' *(বুঃ ৫৪৩নং, তামিঃ ৩২১পৃঃ)*

হযরত আবূ সালামাহ ﷺ বলেন, 'বৃষ্টির দিনে মাগরেব ও এশাকে জমা করে পড়া সুন্নত।' *(আষরাম, নাআঃ ৩/২১৮)*

হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'একদা নবী ﷺ মদীনায় যোহর ও আসর এবং মাগরেব

ও এশার নামাযকে জমা করে পড়েছেন। সেদিন না কোন ভয় ছিল আর না বৃষ্টি।' লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'তিনি এমন কেন করলেন?' উত্তরে ইবনে আব্বাস ﷺ বললেন, 'তিনি তাঁর উম্মতকে অসুবিধায় না ফেলার উদ্দেশ্যে এমনটি করলেন।' *(মুঃ ৭০৫নং)*

উক্ত বর্ণনায় 'বৃষ্টি ছিল না তাও জমা করে নামায পড়েছেন' এই কথার দলীল যে, বৃষ্টি হলে জমা করে পড়া এমনিতেই বৈধ। আর এ জমা হবে হাক্বীক্বী (প্রকৃত) জমা (তাকদীম), সূরী (আপাত) জমা নয়। কারণ, তাতেই উম্মতকে অসুবিধায় পড়তে হবে। *(দ্রঃ সিসঃ ২৮৩৭নং)*

বৃষ্টির জন্য জমা কেবল তারাই করতে পারে, যারা জামাআতের লোক। যারা জামাআতে বা মসজিদে হাযির হয় না তাদের জন্য জমা বৈধ নয়। যেমন, রোগী (কষ্ট না হলে) বা মহিলা বাড়িতে জমা করতে পারে না।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মসজিদেই বা মসজিদের শামিল বা পাশাপাশি বাসায় বাস করে তার জন্যও জমা বৈধ। আসল কথা হল জামাআত। আর জামাআতের ফযীলত বেশী। অতএব জামাআত ছেড়ে তাদের যথাসময়ে নামায পড়া উচিত নয়। *(মুমঃ ৪/৫৬০)*

অন্য কোন অসুবিধার কারণে নামায জমা

ভয় বা বৃষ্টি ছাড়াও অন্য কোন বড় অসুবিধার কারণেও দুই নামাযকে জমা করে পড়া বৈধ। উপর্যুক্ত ইবনে আব্বাস ﷺ-এর হাদীস সে কথাই ইঙ্গিত করে।

এ ছাড়া বুখারী ও মুসলিম শরীফের একটি যৌথ বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, মহানবী ﷺ মদীনায় যোহর ও আসর এবং মাগরেব ও এশাকে জমা করে পড়েছেন। *(বুঃ ৫৪৩, মুঃ)*

আব্দুল্লাহ বিন শাকীক বলেন, একদা হযরত ইবনে আব্বাস ﷺ আসরের পর আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখলেন। এই অবস্থায় সূর্য ডুবে গেল এবং আকাশে তারা ফুটে উঠল। আর লোকেরা বলতে লাগল, 'নামাযের সময় হয়ে গেছে, নামাযের সময় হয়ে গেছে।'

বনী তামীমের এক ব্যক্তি 'নামায, নামায' করতে করতে সোজা ইবনে আব্বাসের কাছে এল। তিনি লোকটাকে বললেন, 'তুমি কি আমাকে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সুন্নত শিখাতে এসেছ? আমি নবী ﷺ-কে যোহর ও আসর এবং মাগরেব ও এশার নামাযকে একত্রে জমা করে পড়তে দেখেছি।'

আব্দুল্লাহ বিন শাকীক বলেন, 'তাঁর এ কথায় আমার সন্দেহ হলে আমি আবূ হুরাইরা ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করি। তিনি তাঁর এ কথার সমর্থন করেন।' *(মুঃ ৭০৫নং)*

প্রয়োজনে অসুস্থ অবস্থায়ও বারবার ওযূ করতে বা লেবাস পাল্টে পবিত্রতা অর্জন করতে কষ্ট হলে দুই নামাযকে এক সাথে জমা করে পড়া বৈধ। যেমন মহানবী ﷺ ইস্তিহাযাগ্রস্ত (সর্বদা মাসিক আসে এমন) মহিলাকে এক গোসলে দুই নামাযকে এক সাথে জমা করে পড়ার

নির্দেশ দিয়েছেন। *(আঃ, আদাঃ, তিঃ, মিঃ ৫৬১-৫৬৩নং)* অনুরূপ যার সব সময় প্রস্রাব ঝরার রোগ আছে সেও ২ নামাযকে জমা করে পড়তে পারে।

জমা বিষয়ক অন্যান্য জরুরী মাসায়েল

জ্ঞাতব্য যে, ত্বরান্বিত জমা (তাক্বদীম) অপেক্ষা (কষ্ট না হলে) বিলম্বিত (তা'খীর) জমাই উত্তম। এ ছাড়া যখন যার জন্য যেমন সুবিধা তার জন্য সেই জমাই উত্তম। *(মুমঃ ৪/৪৬১-৫৬৪)* অবশ্য প্রথম অক্তে জমা না করলে সে সময়ে জমার নিয়ত জরুরী। নচেৎ, জমার নিয়ত ছাড়া বিনা ওযরে কোন নামাযকে যথাসময় থেকে পার করে দেওয়া হারাম। *(মুমঃ ৪/৫৭৪)*

বলা বাহুল্য, প্রথম অক্তে জমার নিয়ত না রেখে সময় পার হওয়ার পর পরের অক্তের সাথে জমার নিয়ত সহীহ নয়। বরং এই সময় প্রথম নামায কাযা ও দ্বিতীয় নামায আদায়ের নিয়তে পড়া জরুরী। *(ঐ ৪/৫৭৫)*

প্রকাশ থাকে যে, কোন ওযরে প্রথম অক্তে দুই নামায জমা করে নেওয়ার পর দ্বিতীয় অক্ত্ আসার আগেই যদি সে ওযর দূর হয়ে যায়; যেমন রোগ ভাল হয়ে যায়, মুসাফির ঘরে ফিরে আসে অথবা বৃষ্টি থেমে যায়, তবুও জমা নামায বাতিল হবে না এবং দ্বিতীয় অক্তে ঐ পড়া নামায আর ফিরিয়ে পড়তে হবে না। এমন কি দ্বিতীয় নামায শেষ হওয়ার আগেই যদি ওযর দূর হয়ে যায় তবুও জমা বাতিল নয়। *(ঐ ৪/৫৭৪, মবঃ ১৭/৫৫, ফইঃ ১/২৬১-২৬২)*

মুসাফিরের জন্য জমা ও কসর একই সাথে করা জরুরী নয়। সুতরাং সে জমা না করে কেবল কসর এবং কসর না করে জমাও করতে পারে। *(মবঃ ১২/৮৮)*

বিভিন্ন যানবাহনে নামায

মহানবী ﷺ সওয়ারীর উপর ফরয নামায পড়তেন না। ফরয নামাযের সময় হলে তিনি উট থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়াতেন।

সুতরাং সফরে (মোটর গাড়ি, গরুর গাড়ি, উট, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি) যানবাহনে নামাযের সময় হলে যানবাহন থামিয়ে নামায পড়তে হবে। কিন্তু যে যানবাহনে থামার বা নামার সুযোগ নেই, অথচ সেখানে যথানিয়মে পূর্ণরূপে নামায আদায় সম্ভব, সে যানবাহনে যথা সময়ে নামায পড়তে হবে। পরন্তু সেখানে যদি যথানিয়মে পূর্ণরূপে নামায আদায় করার সুযোগ না থাকে, তাহলে গন্তব্যস্থল পৌঁছনোর আগেই নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে সে যানবাহনের উপরেই যথাসময়ে নামায পড়ে নেওয়া জরুরী। *(আইঃ ৪০১নং)*

অতএব প্লেন, ট্রেন, বাস প্রভৃতি যানবাহনের ভিতরে জামাআত সহকারে নামায সম্ভব

হলে জামাআত সহকারেই পড়তে হবে। ([১])

নচেৎ একাকী নিজ নিজ সিটে বসে সময় পার হওয়ার আগে আগেই নামায পড়ে নিতে হবে। না পড়লে এবং পরে কাযা পড়লেও গোনাহগার হতে হবে।

যথাসম্ভব কিবলামুখ হতে হবে। বিশেষ করে নামায শুরু করার পূর্বে কিবলামুখ হয়ে দাঁড়িয়ে পরে যানবাহন অন্যমুখ হলে যথাসম্ভব কিবলামুখে ঘুরে নামায পড়তে হবে। সম্ভব না হলে যে কোন মুখেই নামায হয়ে যাবে।

সাধ্যমত নামাযের রুক্ন ও ওয়াজেব আদায় করতে হবে। জমার নামায হলে এবং দ্বিতীয় সময় অতিবাহিত হওয়ার আগে গাড়ি গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে না আশঙ্কা হলে প্লেন বা গাড়িতেই নামায আদায় অপরিহার্য। *(মবঃ ৫/ ১৯০)*

নৌকা, পানি-জাহাজ বা স্টিমার প্রভৃতি জলযানেও নামায আদায় করা জরুরী। (কিয়ামের সময়) দাঁড়িয়ে পড়তে অসুবিধা হলে বসে বসে পড়ে নিতে হবে। ইবনে উমার ﵄ বলেন, নবী ﷺ নৌকায় নামায পড়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "ডুবে যাওয়ার ভয় না থাকলে তাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়।" *(বাযঃ, দারাঃ, হাঃ, সিসানঃ ৭৯পৃঃ)*

আব্দুল্লাহ বিন আবী উতবাহ বলেন, 'একদা আমি জাবের বিন আব্দুল্লাহ, আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরাইরা ﷺ-এর সাথে নৌকার সঙ্গী ছিলাম। তাঁরা সকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জামাআত সহকারে নামায পড়লেন। তাঁদের একজন ইমামতি করলেন। আর তাঁরা তীরে আসতে সক্ষমও ছিলেন।' *(সুনান সাঈদ বিন মানসূর, আরাঃ, ইআশাঃ, বাঃ ৩/ ১৫৫)*

মহানবী ﷺ সফরে নিজের সওয়ারীতেই নফল ও বিত্র নামায পড়তেন। উটনী কেবলামুখে দাঁড় করিয়ে তকবীর দিয়ে নামায শুরু করতেন। অতঃপর পূর্ব-পশ্চিম যে মুখে পথ ও উটনী যেত, সে মুখেই তিনি নামায পড়তেন। আর এ ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে মহান আল্লাহর এই বাণী ঃ-

(فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ)

অর্থাৎ, তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও, সেদিকই আল্লাহর চেহারা (দিক বা কিবলাহ)। *(কুঃ ২/ ১১৫) (মুঃ ৭০০নং, আদাঃ, তিঃ)*

রোগীর নামায

রোগী হলেও জ্ঞান বর্তমান থাকা কাল পর্যন্ত কারো জন্য কোন অবস্থায় নামায মাফ নয়। ওযূ-গোসল না করতে পারলে তায়াম্মুম করে, তা না পারলেও বিনা তায়াম্মুমেই নামায পড়া জরুরী। পবিত্র না থাকতে পারলে অপবিত্র অবস্থাতেই, পবিত্র জায়গা না পেলে অপবিত্র

([১]) *প্রকাশ থাকে যে, বিশেষ করে প্লেনে একাধিক ফাঁকা জায়গা আছে; যেখানে জামাআত করে নামায পড়া সম্ভব। খাকসার নিজে বহুবার সেসব জায়গায় জামাআত সহকারে যথানিয়মে পূর্ণরূপে নামায আদায় করেছে।*

জায়গাতেই নামায পড়তে হবে।

রোগী দাঁড়িয়ে নামায না পড়তে পারলে বসে নামায পড়বে। দুই পা-কে গুটিয়ে আড়াআড়িভাবে রেখে হাঁটু ভাঁজ করে (বাবু হয়ে) বসবে। কখনো কখনো প্রয়োজনে মহানবী ﷺ অনুরূপ বসে নামায পড়তেন। *(নাঃ, হাঃ)* আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ অসুবিধার কারণে নামাযে অনুরূপ বসতেন। *(বুঃ ৮২৭নং)* অবশ্য তাশাহহুদের বৈঠকে বসার মতও বসে নামায পড়তে পারে। *(ফিসুঃ আরবী ১/২৪৩)*

বসে না পারলে (ডান) পার্শ্বদেশে শুয়ে, তা না পারলে চিৎ হয়ে শুয়ে, (মাথাটা বালিশ ইত্যাদি দিয়ে একটু উঁচু করে) কেবলার দিকে মুখ ও পা করে নামায পড়বে। দাঁড়াবার সামর্থ্য থাকলে এবং বসতে না পারলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে।

মহান আল্লাহ বলেন,

(فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَاماً وَّقُعُوْداً وَّعَلَى جُنُوْبِكُمْ)

অর্থাৎ, তোমরা দাঁড়িয়ে, বসে ও পার্শ্বদেশে শয়ন করে আল্লাহকে স্মরণ কর। *(কুঃ ৪/১০৩)*

তিনি আরো বলেন, **(فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)**

অর্থাৎ, আল্লাহকে যথাসাধ্য ভয় করে চল। *(কুঃ ৬৪/১৬)*

ইমরান বিন হুসাইন ﷺ বলেন, আমার অর্শ রোগ ছিল। আমি (কিভাবে নামায পড়ব তা) আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়। না পারলে বসে পড়। তাও না পারলে পার্শ্বদেশে শুয়ে পড়।" *(বুঃ, আদাঃ, আঃ, মিঃ ১২৪৮- নং)*

কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যদি রোগী বসে না পড়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়ে, তাহলে তার জন্য রয়েছে ডবল সওয়াব। একদা একদল লোকের নিকট মহানবী ﷺ বের হয়ে দেখলেন, তারা অসুস্থতার কারণে বসে বসে নামায পড়ছে। তা দেখে তিনি বললেন, "বসে নামায পড়ার সওয়াব দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সওয়াবের অর্ধেক।" *(আঃ, ইমাঃ)*

অনুরূপ বসে নামায পড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি আরাম নেওয়ার জন্য রোগী শুয়ে নামায পড়ে তাহলে তার জন্য রয়েছে অর্ধেক সওয়াব। *(বুঃ ১১১৫নং)*

যতটা সম্ভব দাঁড়িয়ে এবং যতটা প্রয়োজন বসেও নামায পড়তে পারে। বৃদ্ধ বয়সে মহানবী ﷺ রাতের নামাযে বসে ক্বিরাআত করতেন। অতঃপর ৩০/৪০ আয়াত ক্বিরাআত বাকী থাকলে তিনি উঠে তা পাঠ করে রুকূ করতেন। *(বুঃ ১১১৮-নং)*

রোগী সাধ্যমত রুকূ-সিজদাহ করবে। না পারলে মস্তক দ্বারা ইঙ্গিত করবে। রুকূর চাইতে সিজদার সময় অধিক ঝুঁকবে। তা সম্ভব না হলে চোখের ইশারায় রুকূ-সিজদাহ করবে। রুকূর চাইতে সিজদার ক্ষেত্রে চক্ষুকে অধিকতর নিমীলিত করবে।

হাত বা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা বিধিসম্মত নয়। কারণ, অনুরূপ নির্দেশ শরীয়তে আসেনি। *(ইবনে বায, ইবনে উষাইমীন)*

চক্ষু দ্বারা ইশারা সম্ভব না হলে অন্তরে (কল্পনায়) কিয়াম, রুকূ ও সিজদা আদির নিয়ত করে তকবীর, কিরাআত ও দুআ-দরূদ পাঠ করবে।

আত্মাকে কষ্ট দিয়ে সাধ্যের অতীত আমল করা শরীয়তে পছন্দনীয় নয়। সিজদাহ মাটিতে না করতে পারলে কোন জিনিস উঁচু করে বা তুলে তাতে সিজদাহ করা বৈধ নয়। একদা মহানবী ﷺ এক রোগীকে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন, সে বালিশের উপর সিজদাহ করছে। তিনি তা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। সে একটি কাঠ নিলে কাঠটাকেও ছুঁড়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন, “যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে মাটিতে নামায পড় (সিজদাহ কর)। তা না পারলে কেবল ইশারা কর। আর তোমার রুকূর তুলনায় সিজদাকে অধিক নিচু কর।” *(ত্বাবঃ, বাযযার, বাঃ, সিসঃ ৩২৩নং)*

অবশ্য দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পড়ে যাওয়ার ভয় হলে দেওয়াল বা খুঁটিতে ভর করে দাঁড়াতে পারে। মহানবী ﷺ যখন বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন এবং স্বাস্থ্য মোটা হয়ে গেল, তখন তাঁর নামাযের জায়গায় একটি খুঁটি বানানো হয়েছিল; যাতে তিনি ভর করে নামায পড়তেন। *(আদাঃ, হাঃ,সিসঃ ৩১৯, ইরঃ ৩৮৩নং)*

রোগী হলেও প্রত্যেক নামায যথাসময়ে পড়বে। না পারলে জমা করার নিয়ম অনুযায়ী ২ অক্তের নামায জমা করে পড়বে।

অসুস্থ অবস্থায় পূর্ণরূপে নামায আদায় করতে সক্ষম না হলেও সুস্থ অবস্থার মত পূর্ণ সওয়াব লাভ হয়ে থাকে রোগীর। মহানবী ﷺ বলেন, “বান্দা যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা সফর করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য সেই সওয়াবই লিখে থাকেন, যে সওয়াব সে সুস্থ ও ঘরে থাকা অবস্থায় আমল করে লাভ করত।” *(আঃ, বুঃ, সজাঃ ৭৯৯নং)*

অসুস্থতার সময় রোগীর বেকার বসে বা শুয়ে থাকার সময়। এ সময়কে মূল্যবান জেনে আল্লাহর যিক্‌র করা উচিত রোগীর। কষ্টের সময়ে কেবল তাঁরই সকাশে আকূল আবেদনের সাথে নফল নামায ও খাস মুনাজাত করার এটি একটি সুবর্ণ সময়। রাত্রে বহু রোগীর ঘুম আসে না। এমন অনিদ্রায় ফালতু রাত্রি অতিবাহিত না করে তাহাজ্জুদ পড়ে রোগী তার পরপারের জন্য সম্বল বৃদ্ধি করতে পারে।

স্বালাতুল খাওফ (ভয়ের নামায)

শত্রুর সামনে খুন হয়ে যাওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও নামায ও জামাআত মাফ নয়। সে অবস্থাতেও জিহাদের ময়দানে যথাসময়ে জামাআত সহকারে নামায পড়তেই হবে মুসলিমকে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

(وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا أَسْلِحَتَهُمْ، فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ، وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَّاحِدَةً، وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ

مَّطَـرٍ أَوْ كُنْـتُمْ مَّرْضَـى أَنْ تَـضَعُوْا أَسْـلِحَتَكُمْ وَخُـذُوا حِـذْرَكُمْ، إِنَّ اللهَ أَعَـدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَاباً مُّهِيْناً)

অর্থাৎ, তুমি যখন তাদের মাঝে অবস্থান করবে ও তাদের নিয়ে নামায পড়বে তখন একদল যেন তোমার সঙ্গে দাঁড়ায়, আর তারা যেন সশস্ত্র থাকে। অতঃপর সিজদাহ করা হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা নামাযে শরীক হয়নি তারা তোমার সাথে যেন নামাযে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফেররা কামনা করে, যেন তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও, যাতে তারা তোমাদের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর অস্ত্র রাখাতে তোমাদের কোন দোষ নেই যদি বৃষ্টি-বাদলের জন্য তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমাদের অসুখ হয়। কিন্তু অবশ্যই তোমরা হুঁশিয়ার থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহ কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। *(কুঃ ৪/ ১০২)*

ভয়ের নামায শুদ্ধ বর্ণনা মতে মোটামুটি ৬ ভাবে পড়া যায়। যা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ-

১। শত্রু কিবলা ছাড়া অন্য দিকে থাকলে ইমাম একদল সৈন্যের সাথে এক রাকআত নামায পড়ে অপেক্ষা করবেন। মুক্তাদীগণ নিজে নিজে আর এক রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরে উঠে গিয়ে শত্রুর সামনে খাড়া হবে। অতঃপর অন্য দল সৈন্য এসে ইমামের সাথে এক রাকআত নামায পড়বে। এরপর ইমাম বসে যাবেন এবং মুক্তাদীগণ নিজে নিজে বাকী এক রাকআত পুরা করে নেবে। পরিশেষে ইমাম তাদেরকে নিয়ে সালাম ফিরবেন। *(বুঃ, মুঃ, আদাঃ, তিঃ, নাঃ)*

২। শত্রু কিবলা ছাড়া অন্য দিকে থাকলে ইমাম একদল সৈন্যের সাথে এক রাকআত নামায পড়ে অপেক্ষা করবেন। মুক্তাদীগণ সালাম ফিরে উঠে গিয়ে শত্রুর সামনে খাড়া হবে। অতঃপর অন্য দল সৈন্য এসে ইমামের সাথে এক রাকআত নামায পড়বে। এরপর ইমাম সালাম ফিরবেন এবং মুক্তাদীরা বাকী এক রাকআত পুরা করে নেবে। অতঃপর এ দল শত্রুর সামনে খাড়া হলে প্রথম দলও তাদের বাকী এক রাকআত কাযা করে নেবে। *(আঃ, বুঃ, মুঃ)*

৩। ইমাম প্রথম দলকে নিয়ে ২ রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরবেন। অতঃপর তারা শত্রুর সামনে গেলে দ্বিতীয় দলকে নিয়ে আবার ২ রাকআত নামায পড়বেন। আর এ ২ রাকআত নামায ইমামের জন্য নফল হবে। *(আঃ, আঃ, নাঃ)*

৪। শত্রু কিবলার দিকে হলে সকলে মিলে নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে। সকলেই এক সঙ্গে রুকূ করবে, অতঃপর মাথা তুলে প্রথম দল (কাতার) ইমামের সাথে সিজদাহ করবে এবং দ্বিতীয় দল (কাতার) শত্রুর মোকাবেলায় খাড়া থাকবে। অতঃপর প্রথম কাতার সিজদাহ শেষ করলে দ্বিতীয় কাতার সিজদায় যাবে। অনুরূপ দ্বিতীয় রাকআত পড়বে এবং সর্বশেষে সকলে এক সাথে সালাম ফিরবে। *(আঃ, মুঃ, নাঃ, ইমাঃ, বাঃ)*

৫। উভয় দলই ইমামের সাথে নামাযে দাঁড়াবে। অতঃপর একদল শত্রুর সামনে খাড়া থাকবে এবং এক দলকে নিয়ে ইমাম এক রাকআত নামায পড়বেন। এরপর এ দল উঠে শত্রুর মোকাবেলায় থাকবে এবং অপর দল এসে নিজে নিজে এক রাকআত নামায পড়ে নেবে, আর এ সময় ইমাম খাড়া থাকবেন। তারপর এই দলকে নিয়ে ইমাম দ্বিতীয় রাকআত

পড়বেন এবং সকলে বসে যাবে। অতঃপর অপর দল এসে নিজে নিজে তাদের বাকী এক রাকআত পড়ে নেবে। সর্বশেষে ইমাম ও মুক্তাদী মিলে এক সাথে সালাম ফিরবে। *(আঃ, আদাঃ নাঃ)*

৬। ইমামের সাথে প্রত্যেক দল এক রাকআত করে নামায পড়বে। ইমামের হবে ২ রাকআত এবং মুক্তাদীদের এক রাকআত। প্রথম দল এক রাকআত পড়ে (সালাম ফিরে) শত্রুর মোকাবেলায় চলে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় দল এসে ইমামের পিছনে শরীক হয়ে মাত্র এক রাকআত পড়বে। পরিশেষে এই দলকে নিয়ে ইমাম সালাম ফিরবেন। *(আঃ, মুঃ, আদাঃ, নাঃ, ইহিঃ)*

মাগরেবের নামায হলে ইমাম প্রথম দলকে নিয়ে ২ রাকআত এবং দ্বিতীয় দলকে নিয়ে এক রাকআত নামায পড়বেন। অথবা প্রথম দলকে নিয়ে এক রাকআত এবং দ্বিতীয় দলকে নিয়ে ২ রাকআত নামায পড়বেন। *(ফিসুঃ আরবী ১/২৪৭)*

ভয় বেশী হলে

ভয় বেড়ে গেলে এবং যুদ্ধ সংঘটিত হলে প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী চলা অবস্থায়, সওয়ার অবস্থায়, কেবলার দিকে মুখ করে অথবা না করে, যেভাবেই হোক, ইঙ্গিতে-ইশারায় রুকূ-সিজদাহ করে নামায সম্পন্ন করবে। ঝুঁকে রুকূ-সিজদাহ করলে রুকূর চেয়ে সিজদার অবস্থায় বেশী ঝুঁকবে। *(বুঃ, মুঃ)* ঝুঁকার সুযোগ না থাকলে কেবল তকবীর বলে মাথার ইশারায় নামায আদায় করতে হবে। *(বাঃ, সিসানঃ ৭৬পৃঃ)*

সুন্নত ও নফল (অতিরিক্ত) নামায

যে নামায পড়া বাধ্যতামূলক নয়, যা ত্যাগ করলে গোনাহ হয় না কিন্তু পড়লে সওয়াব হয় সেই শ্রেণীর নামাযের বড় মাহাত্ম্য রয়েছে শরীয়তে।

রসূল ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট থেকে তার আমলসমূহের মধ্যে যে আমলের হিসাব সর্বাগ্রে নেওয়া হবে, তা হল নামায। নামায ঠিক হলে সে পরিত্রাণ ও সফলতা লাভ করবে। নচেৎ (নামায ঠিক না হলে) ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং (হিসাবের সময়) ফরয নামাযে কোন কমতি দেখা গেলে আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা ফিরিশ্তাদের উদ্দেশ্যে বলবেন, 'দেখ, আমার বান্দার কোন নফল (নামায) আছে কি না।' অতএব তার নফল নামায দ্বারা ফরয নামাযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর আরো সকল আমলের হিসাব অনুরূপ গ্রহণ করা হবে।" *(সআদাঃ ৭৭০, সতিঃ ৩৩৭, সইমাঃ ১১৭নং, সতাঃ ১/ ১৮৫)*

মহানবী ﷺ বলেন, আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আমার অলীর বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব। বান্দা যা কিছু দিয়ে আমার নৈকট্য লাভ করে থাকে তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম হল সেই ইবাদত, যা আমি তার উপর ফরয করেছি। আর সে নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। পরিশেষে আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর আমি তার শোনার কান হয়ে যাই, তার দেখার চোখ হয়ে যাই, তার ধরার হাত হয়ে যাই, তার চলার পা হয়ে যাই! সে আমার কাছে কিছু চাইলে আমি অবশ্যই

তাকে তা দান করি। সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি। আর আমি যে কাজ করি তাতে কোন দ্বিধা করি না -যতটা দ্বিধা করি এজন মুমিনের জীবন সম্পর্কে; কারণ, সে মরণকে অপছন্দ করে। আর আমি তার (বেঁচে থেকে) কষ্ট পাওয়াকে অপছন্দ করি।” *(বুঃ ৬৫০২নং)*

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ বান্দার কান, চোখ, হাত ও পা হওয়ার অর্থ হল, বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টিমতেই এ সবকে ব্যবহার করে। যাতে ব্যবহার করলে তিনি অসন্তুষ্ট, তাতে সে ঐ সকল অঙ্গকে ব্যবহার করে না।

নফল নামায ঘরে পড়া ভাল

ফরয নামায বিধিবদ্ধ হয়েছে দ্বীনের প্রচার ও তার প্রতীকের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে। তাই ফরয নামায প্রকাশ্যভাবে লোক মাঝে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পক্ষান্তরে নফল নামায বিধিবদ্ধ হয়েছে নিছক মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাঁর নৈকট্য লাভ করার লক্ষ্যে। সুতরাং নফল নামায যত গুপ্ত হবে, তত লোকচক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ তথা 'রিয়া' থেকে অধিক দূর ও পবিত্র হবে। *(ফাইযুল ক্বাদীর ৪/২২০)* আর সে জন্যই নফল নামায স্বগৃহে গোপনে পড়া উত্তম।

তাছাড়া নফল নামায ঘরে পড়লে নামাযের তরীকা ও গুরুত্ব পরিবার-পরিজনের কাছে প্রকাশ পায়। আর এ জন্য হুকুম হল, “তোমরা ঘরে নামায পড় এবং তা কবর বানিয়ে নিও না।” *(বুঃ ৪৩২, মুঃ ৭৭৭, আদাঃ ১৪৪৮, তিঃ, নাঃ, সজাঃ ৩৭৮৪নং)* অর্থাৎ, কবরে বা কবরস্থানে যেমন নামায নেই বা হয় না সেইরূপ নিজের ঘরকেও নামাযহীন করে রেখো না।

মহানবী ﷺ আরো বলেন, “তোমরা স্বগৃহে নামায পড় এবং তাতে নফল পড়তে ছেড়ো না।” *(সিসঃ ১৯১০, সজাঃ ৩৭৮৬নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের কেউ যখন মসজিদে (ফরয) নামায সম্পন্ন করে তখন তার উচিত, সে যেন তার নামাযের কিছু অংশ (সুন্নত নামায) নিজের বাড়ির জন্য রাখে। কারণ বাড়িতে পড়া ঐ কিছু নামাযের মধ্যে আল্লাহ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।” *(মুঃ৭৭৮নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, “হে মানবসকল! তোমরা স্বগৃহে নামায আদায় কর। যেহেতু ফরয নামায ছাড়া মানুষের শ্রেষ্ঠতম নামায হল তার স্বগৃহে পড়া নামায।” *(নাঃ, ইখুঃ, সতাঃ ৪৩৭নং)*

নবী মুবাশ্‌শির ﷺ বলেন, “যেখানে লোকে দেখতে পায় সেখানে মানুষের নফল নামায অপেক্ষা যেখানে লোকে দেখতে পায় না সেখানের নামায ২৫ টি নামাযের বরাবর।” *(আবূ য়্যা'লা, সজাঃ ৩৮২১নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “লোকচক্ষুর সম্মুখে (নফল) নামায পড়া অপেক্ষা মানুষের স্বগৃহে নামায পড়ার ফযীলত ঠিক সেইরূপ, যেরূপ নফল নামায অপেক্ষা ফরয নামাযের ফযীলত বহুগুণে অধিক।” *(বাঃ, সতাঃ ৪৩৮নং)*

এমন কি মদীনাবাসীর জন্যও মসজিদে নববীতে নফল নামায পড়ার চাইতে নিজ নিজ

ঘরে পড়া বেশী উত্তম। *(আদাঃ, সজাঃ ৩৮১৪নং)*

নফল নামাযে লম্বা কিয়াম করা উত্তম

নফল নামায সাধারণতঃ একার নামায। তাই তাতে ইচ্ছামত লম্বা ক্বিরাআত করা যায়। বরং এই নামাযে কিয়াম লম্বা করা মুস্তাহাব। মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, সবচেয়ে উত্তম নামায কি? উত্তরে তিনি বললেন, "লম্বা কিয়াম-বিশিষ্ট নামায।" *(আদাঃ ১৪৪৯নং)*

আর এ কথা বিদিত যে, মহানবী ﷺ তাহাজ্জুদের নামাযে এত লম্বা কিয়াম করতেন যে, তাতে তাঁর পা ফুলে যেত। সাহাবাগণ বলেছিলেন, আল্লাহ আপনার আগের-পরের সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন তবুও আপনি কেন অনুরূপ নামায পড়েন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?" *(বুঃ, মুঃ, আঃ, তিঃ, নাঃ ইমাঃ, মিঃ ১২২০নং)*

নফল নামায বিনা ওজরে বসে পড়াও বৈধ

প্রথম খন্ডে (৭৯পৃষ্ঠায়) আলোচিত হয়েছে যে, সক্ষম হলে ফরয নামায দাঁড়িয়ে পড়া ফরয। কিন্তু নফল নামায ক্ষমতা থাকতেও বসে পড়াও বৈধ। যদিও বসে নামায পড়ার সওয়াব দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সওয়াবের অর্ধেক। মহানবী ﷺ বলেন, "বসে নামায পড়ার সওয়াব অর্ধেক নামাযের বরাবর।" *(বুঃ, মিঃ ১২৪৯নং)*

বরং নফল নামায চিৎ হয়ে শুয়েও পড়া যায়। তবে এ অবস্থায় বসে পড়ার অর্ধেক সওয়াব হবে। মহানবী ﷺ বলেন, "আর শুয়ে নামায পড়ার সওয়াব বসে নামায পার অর্ধেক।" *(বুঃ ১১১৬নং, মুমঃ ৪/১১৩-১১৪)*

নফল নামাযের কিছু অংশ দাঁড়িয়ে এবং কিছু অংশ বসে পড়া যায়। বরং একই কিয়ামের কিছু অংশ দাঁড়িয়ে এবং কিছু অংশ বসে ক্বিরাআত করা যায়। তাতে কিয়ামের প্রথম অথবা শেষ অংশ বসে হলেও কোন দোষাবহ নয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'তিনি বসে ক্বিরাআত করতেন। অতঃপর রুকূ করার ইচ্ছা করলে উঠে দাঁড়িয়ে যেতেন।' *(মুঃ ৭৩১নং)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাতের নামাযে আমি নবী ﷺ-কে বসে ক্বিরাআত করতে দেখিনি। অতঃপর তিনি যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেন, তখন তিনি বসে ক্বিরাআত করতেন। পরিশেষে যখন ৪০ বা ৩০ আয়াত বাকী থাকত, তখন তিনি খাড়া হয়ে তা পাঠ করতেন। অতঃপর (রুকূ) সিজদা করতেন।' (*(মুঃ ৭৩১নং,* আঃ, সুআঃ)

সুন্নত নামাযের কাযা

সুন্নত নামায ছুটে গেলে কাযা পড়া সুন্নত, জরুরী নয়। পক্ষান্তরে ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে তার কাযা নেই। পড়লে তা মকবুলও নয়। *(মুমঃ ৪/১০২)*

নফল নামাযের প্রকারভেদ

ফরয নামায ছাড়া অন্যান্য নামায দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হল সেই নামায, যা (সময় ও রাকআত সংখ্যা দ্বারা) নির্দিষ্ট নয়। এ নামায নিষিদ্ধ সময় ছাড়া যে কোন সময়ে অনির্দিষ্ট রাকআতে পড়া যায়। আর দ্বিতীয় প্রকার হল সেই নামায, যা (সময় ও রাকআত সংখ্যা দ্বারা) নির্দিষ্ট। যে নামাযের নির্দিষ্ট সময় ও রাকআত সংখ্যা মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রমাণিত আছে। এই শ্রেণীর নামায আবার দুই প্রকার; সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ও গায়র মুআক্কাদাহ।

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ও গায়র মুআক্কাদাহ

যে সুন্নত ফরয নামাযের আগে-পিছে পড়া হয় তা হল দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হল, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ বা সুন্নাতে রাতেবাহ। আর দ্বিতীয় হল, সুন্নাতে গায়র মুআক্কাদাহ বা গায়র রাতেবাহ। *(ফিসুঃ উর্দু ১৬০পৃঃ দ্রঃ)*

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ বা রাতেবাহ

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ সেই সুন্নত নামায, যা মহানবী ﷺ ফরয নামাযের আগে-পিছে নিজে পড়েছেন এবং উম্মতকে পড়তে তাকীদ, উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে কোন মুসলিম বান্দা প্রত্যহ আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে বারো রাকআত নফল (ফরয ব্যতীত সুন্নত) নামায পড়লেই আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য এক গৃহ নির্মাণ করেন। অথবা তার জন্য জান্নাতে এক ঘর নির্মাণ করা হয়।" *(মুঃ ৭২৮নং, আদাঃ, নাঃ, তিঃ)*

তিরমিযীর বর্ণনায় কিছু শব্দ অধিক রয়েছে, "(ঐ বারো রাকআত নামায;) যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরেবের পরে দুই রাকআত, এশার পরে দুই রাকআত, আর ফজরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাকআত।"

হযরত আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিয়মনিষ্ঠভাবে দিবারাত্রে বারো রাকআত নামায পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; যোহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে (এক সালামে) চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরেবের পর দুই রাকআত, এশার পর দুই রাকআত এবং ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত।" *(নাঃ, এবং শব্দগুলি তাঁরই, তিঃ, ইমাঃ, সতাঃ ৫৭৭নং)*

ফজরের পূর্বে দুই রাকআত সুন্নত

❁ **এই নামাযের ফযীলত ঃ**

হযরত আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "ফজরের দুই রাকআত (সুন্নত) পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম।" *(মুসলিম ৭২৫নং, তিরমিযী)*

মা আয়েশা رضي الله عنها বলেন, 'নবী ﷺ ফজরের সুন্নতের মত অন্য কোন নফল নামাযে তত নিষ্ঠা প্রদর্শন করতেন না।' *(আঃ, বুঃ, মুঃ)*

হযরত আবু উমামা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "(ফজরের সময়) যে ব্যক্তি (স্বগৃহে) ওযু করে। অতঃপর মসজিদে এসে ফজরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়ে। অতঃপর বসে (অপেক্ষা ক'রে) ফজরের নামায (জামাআতে) পড়ে, সেই ব্যক্তির সেদিনকার নামায নেক লোকদের নামাযরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তার নাম পরম করুণাময় (আল্লাহর) প্রতিনিধিদলের তালিকাভুক্ত হয়।" *(ত্বাবঃ, সতাঃ ৪১৩নং)*

۞ এ নামাযকে হাল্কা করে পড়া ঃ

হযরত হাফসা (রাঃ) বলেন, নবী ﷺ ফজরের নামাযের পূর্বে আমার ঘরে দুই রাকআত সুন্নত পড়তেন এবং তা খুবই হাল্কা করে পড়তেন।' *(আঃ, বুঃ, মুঃ)*

হযরত আয়েশা رضي الله عنها বলেন, ' নবী ﷺ ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকআত নামায পড়তেন এবং তা এত সংক্ষেপে পড়তেন যে, আমি সন্দেহ করতাম, তিনি তাতে সূরা ফাতিহা পড়লেন কি না।' *(আঃ)*

۞ এ নামাযের ক্বিরাআত ঃ

এই নামাযের প্রথম রাকআতে নবী মুবাশ্‌শির ﷺ সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস (কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ) পড়তেন। *(মুঃ ৭২৬, আদাঃ ১২৫৬, তিঃ ৪১৭, ইমাঃ ১১৪৯নং)*

তিনি বলতেন, "উত্তম সূরা সে দুটি, যে দুটি ফজরের পূর্বে দুই রাকআতে পড়া হয়; 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ।" *(ইমাঃ ১১৫০, ইহিঃ, বাঃ শুআবুল ঈমান, সিসঃ ৬৪৬নং)*

কখনো কখনো তিনি এই নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা বাক্বারার ১৩৬ নং আয়াত এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আলে ইমরানের ৬৪নং আয়াত পাঠ করতেন। *(মুঃ ৭২৭নং, ইখুঃ, হাঃ, বাঃ)*

আবার কোন কোন সময়ে প্রথম রাকআতে সূরা বাক্বারার ১৩৬নং আয়াত এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা আলে ইমরানের ৫২ নং আয়াত পড়তেন। *(আদাঃ ১২৫৯নং)*

এ ছাড়া ফজরের সুন্নত হাল্কা করে পড়া সুন্নত। অতএব তাতে যদি কেবল সূরা ফাতিহা পড়া যায়, তাহলেও বৈধ। *(ফিসুঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, ফজরের সুন্নত পড়ার পর নির্দিষ্ট কোন দুআ পড়ার হাদীস সহীহ নয়। *(তামিঃ ২৩৮-২৩৯পৃঃ)*

۞ এই নামাযের পর ডানকাতে শয়ন ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নবী ﷺ যখন ফজরের সুন্নত পড়ে নিতেন, তখন ডান কাতে শয়ন করতেন।' *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১১৯০নং)*

তিনি আরো বলেন, ‘নবী ﷺ ফজরের সুন্নত পড়তেন। তারপর যদি আমি ঘুমিয়ে থাকতাম তাহলে তিনি শয়ন করতেন। নচেৎ, আমি জেগে থাকলে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন।’ *(আঃ, বুঃ, মুঃ, সুআঃ, মিঃ ১১৮৯নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের কেউ যখন ফজরের দুই রাকআত সুন্নত পড়ে নেয়, তখন সে যেন ডান কাতে শয়ন করে।” *(আদাঃ, তিঃ, ইহিঃ, ইখুঃ, সজাঃ ৬৪২নং)*

সম্ভবতঃ উক্ত শয়ন যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ পড়বে তার জন্য সুন্নত। যাতে একটানা নামায পড়ার পর ফরয নামায পড়ার আগে একটু জিরিয়ে নিতে পারে। পরন্তু তার জন্য সুন্নত নয়, যে একবার মাটিতে পার্শ্ব রাখলে চট্ করে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তার ফলে ফজরের জামাআতই ছুটে যায়। *(মুমঃ ৪/১০০)*

তদনুরূপ উক্ত শয়ন যে ব্যক্তি বাসায় সুন্নত পড়বে তার জন্য সুন্নত ও মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে যে মসজিদে সুন্নত পড়বে তার জন্য মুস্তাহাব নয়। কারণ, মহানবী ﷺ-এর শয়নের কথা তাঁর বাসায় থাকা অবস্থায় উল্লেখ হয়েছে। মসজিদে সুন্নত পড়ে যে তিনি শয়ন করতেন, তার উল্লেখ নেই। ইবনে উমার উক্ত মত পোষণ করতেন। তাই মসজিদে কেউ ফজরের সুন্নতের পর শয়ন করলে তাকে কাঁকর ছুঁড়ে উঠিয়ে দিতেন। *(ফবাঃ, ইআশাঃ, ফিসুঃ ১/১৬৬)*

এই জন্যই ফজরের সুন্নতের পর মসজিদে শয়নকে অনেকে বিদআত বলে মন্তব্য করেছেন। *(মুবিঃ ৩৩৭পৃঃ)*

এই নামাযের কাযা ঃ

অন্যান্য সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নামাযের তুলনায় উক্ত নামাযের এত বেশী গুরুত্ব যে, মহানবী ﷺ ঘরে-সফরে তা পড়তেন এবং তা ছুটে গেলে কাযা করতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

একদা মহানবী ﷺ সাহাবাবর্গের সাথে এক সফরে ছিলেন। ফজরের নামাযের সময় সকলে গভীরভাবে ঘুমিয়ে থাকলে সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। সূর্যের ছটা তাঁদের মুখে লাগলে চেতন হলেন। অতঃপর একটু সরে গিয়ে মহানবী ﷺ বিলাল رضي الله عنه-কে আযান দিতে বললেন। এরপর ফজরের দুই রাকআত সুন্নত পড়লেন। তারপর ইকামত দিয়ে ফজরের ফরয পড়লেন। *(আঃ, বুঃ, মুঃ ৬৮১নং)*

উক্ত নামায কাযা করার দুটি সময় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ফজরের পর কোন নফল পড়া নিষিদ্ধ হলেও ফজরের আগে ছুটে যাওয়া সুন্নতকে ফরযের পর পড়া যায়। আর এটি হল ব্যতিক্রম নামায। একদা এক ব্যক্তি মসজিদে এসে দেখল আল্লাহর নবী ﷺ ফজরের ফরয পড়ছেন। সে সুন্নত না পড়ে জামাআতে শামিল হয়ে গেল। অতঃপর জামাআত শেষে উঠে ফজরের ছুটে যাওয়া দুই রাকআত সুন্নত আদায় করল। মহানবী ﷺ তার কাছে এসে বললেন, “এটি আবার কোন্ নামায? (ফজরের নামায কি দুইবার?)” লোকটি বলল, ‘ফজরের দুই রাকআত সুন্নত ছুটে গিয়েছিল।’ এ কথা শুনে তিনি আর কিছুই বললেন না (চুপ থাকলেন)। *(আঃ, আদাঃ ১২৬৭, তিঃ, ইমাঃ ১১৫৪, ইখুঃ, ইহিঃ)*

আর এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি ফজরের ২ রাকআত (সুন্নত) না পড়ে থাকে, সে যেন তা সূর্য ওঠার পর পড়ে নেয়।” *(আঃ, তিঃ, হাঃ, ইখুঃ, সিসঃ ২৮৩, সজাঃ ৬৫৪২নং)*

এই নামায বিষয়ক আরো কিছু মাসায়েল ঃ

মসজিদে এসে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়লে পৃথক আর তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কেউ যদি তা পড়ে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়ে তাহলেও কোন ক্ষতি হয় না। তবুও ফজরের সময় উত্তম হল তাহিয়্যাতুল মাসজিদ না পড়ে কেবল ফজরের সুন্নত পড়া। কারণ, মহানবী ﷺ ফজরের সুন্নতই বড় সংক্ষেপে পড়তেন। *(ফাতাজামাঃ ১৭-১৮পৃঃ)* তাছাড়া তিনি বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে যেন পৌঁছে দেয় যে, ফজরের (আযানের) পর দু’ রাকআত (সুন্নত) ছাড়া আর কোন (নফল) নামায পড়ো না।” *(আঃ, আদাঃ ১২৭৮ নং)* “ফজরের পর দুই রাকআত ছাড়া আর কোন নামায নেই।” *(তিঃ, ইগঃ ৪৭৮, সজাঃ ৭৫১১নং)*

যোহরের সুন্নত

নবী মুবাশ্‌শির ﷺ যোহরের সুন্নত কখনো ৪ রাকআত পড়তেন; ২ রাকআত ফরযের পূর্বে এবং ২ রাকআত ফরযের পরে।

ইবনে উমার ؓ বলেন, ‘আমি নবী ﷺ-এর নিকট থেকে ১০ রাকআত নামায স্মরণে রেখেছি; ২ রাকআত যোহরের পূর্বে, ২ রাকআত যোহরের পরে, ২ রাকআত মাগরেবের পরে নিজ ঘরে, ২ রাকআত এশার পরে নিজ ঘরে এবং ২ রাকআত ফজরের নামাযের পূর্বে।’ *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১১৬০নং)*

কখনো ৬ রাকআত পড়তেন; ৪ রাকআত ফরযের পূর্বে এবং ২ রাকআত ফরযের পরে।

আব্দুল্লাহ বিন শাকীক মা আয়েশা (রাঃ)কে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সুন্নত প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বললেন, ‘তিনি যোহরের আগে ৪ রাকআত এবং যোহরের পরে ২ রাকআত নামায পড়তেন।’ *(আঃ, মুঃ, আদাঃ, মিঃ ১১৬২নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “যে কোন মুসলিম বান্দা প্রত্যহ আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে বারো রাকআত নফল (ফরয ব্যতীত সুন্নত) নামায পড়লেই আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য এক গৃহ নির্মাণ করেন। অথবা তার জন্য জান্নাতে এক ঘর নির্মাণ করা হয়। (ঐ বারো রাকআত নামায;) যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরেবের পরে দুই রাকআত, এশার পরে দুই রাকআত, আর ফজরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাকআত।” *(মুঃ, তিঃ, মিঃ ১১৫৯নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি নিয়মনিষ্ঠভাবে দিবারাত্রে বারো রাকআত নামায পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; যোহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরেবের পর দুই রাকআত, এশার পর দুই রাকআত এবং ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত।” *(নাঃ, শব্দগুলি তাঁরই, তিঃ, ইমাঃ, সতাঃ৫৭৭নং)*

তিনি কখনো বা ৮ রাকআত পড়তেন; ৪ রাকআত ফরযের পূর্বে এবং ৪ রাকআত ফরযের পরে।

হযরত উম্মে হাবীবা رضي الله عنها কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ

এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে ৪ রাকআত এবং পরে ৪ রাকআত (সুন্নত নামাযের) প্রতি সবিশেষ যত্নবান হবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।” *(আঃ, সুআঃ, মিঃ ১১৬৭, সতাঃ ৫৮-১নং)*

আব্দুল্লাহ বিন সায়েব বলেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ সূর্য ঢলার পর যোহরের আগে ৪ রাকআত নামায পড়তেন এবং বলতেন, “এটা হল এমন সময়, যে সময়ে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়। আর আমি পছন্দ করি যে, এই সময়ে আমার নেক আমল উত্থিত হোক।” *(তিঃ, মিঃ ১১৬৯নং)*

প্রকাশ থাকে যে, যোহরের পূর্বে বা পরে ঐ ৪ রাকআত করে নামায ২ রাকআত করে পড়ে সালাম ফিরা উত্তম। কারণ, মহানবী ﷺ বলেন, “রাত ও দিনের নামায ২ রাকআত করে।” *(আদাঃ)* তবে একটানা ৪ রাকআত এক সালামে পড়া বৈধ। *(সিসঃ ১/৪৭৭)* অবশ্য পূর্বের ৪ রাকআত এক সালামেই পড়া উত্তম। কেননা, মহানবী ﷺ বলেন, “যোহরের পূর্বে ৪ রাকআত; যার মাঝে কোন সালাম নেই, তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়।” *(আদাঃ ১২৭০, ইমাঃ ১১৫৭, ইখুঃ ১২১৪, সজাঃ ৮৮৫নং)*

আবূ আইয়ুব আনসারী رضي الله عنه বলেন, নবী ﷺ সূর্য ঢলার সময় ৪ রাকআত নামায প্রত্যহ পড়তেন। একদা আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি সূর্য ঢলার সময় এই ৪ রাকআত প্রত্যহ পড়ছেন?’ তিনি বললেন, “সূর্য ঢলার সময় আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং যোহরের নামায না পড়া পর্যন্ত বন্ধ করা হয় না। অতএব আমি পছন্দ করি যে, এই সময় আমার নেক আমল (আকাশে আল্লাহর নিকট) উঠানো হোক।” আমি বললাম, ‘তার প্রত্যেক রাকআতেই কি ক্বিরাআত আছে?’ তিনি বললেন, “হ্যাঁ।” আমি বললাম, ‘তার মাঝে কি পৃথককারী সালাম আছে?’ তিনি বললেন, “না।” *(মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যাহ, আলবানী ২৪৯নং)*

অবশ্য অনেকের মতে ঐ নামায যাওয়ালের সুন্নত। পরন্তু যোহরের পূর্বের ৪ রাকআত দুই সালামেও পড়া যায়।

তবে মসজিদে গিয়ে পড়লে জামাআতের সময় খেয়াল রেখে এক সালাম বা ২ সালামের নিয়ত করতে হয়। যাতে সময় সংকীর্ণ হলে এবং ৩ রাকআত পূর্ণ না হতে হতে ইকামত না হয়ে বসে। নচেৎ, সুন্নত ত্যাগ করে জামাআতে শামিল হতে হলে সবটুকুই বরবাদ যাবে। পক্ষান্তরে ২ রাকআত করে পড়লে নষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না।

এই সুন্নতের কাযা ঃ

সুন্নত কাযা পড়া সুন্নত; জরুরী নয়। কারণবশতঃ যোহরের পূর্বের সুন্নত পড়তে না পারলে ফরযের পরে তা কাযা করা বিধেয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ‘নবী ﷺ যোহরের পূর্বের ৪ রাকআত পড়তে না পারলে (ফরযের) পরে তা পড়ে নিতেন।’ *(তিঃ, তামিঃ ২৪১পৃঃ)*

তদনুরূপ যোহরের পরের সুন্নত পড়তে সময় না পেয়ে যোহরের অক্ত্ অতিবাহিত হলেও আসরের পর (নিষিদ্ধ সময় হলেও) তা কাযা পড়া যায়। উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন,

'একদা আল্লাহর রসূল ﷺ যোহরের (ফরয) নামায পড়লেন। ইতি অবসরে কিছু (সাদকার) মাল এসে উপস্থিত হল। তিনি তা বন্টন করতে বসলেন। এরপর আসরের আযান হয়ে গেল। তিনি আসরের নামায পড়লেন। তারপর আমার ঘরে ফিরে এলেন। সেদিন ছিল আমার (ঘরে তাঁর থাকার পালি)। তিনি এসে ২ রাকআত হাল্কা করে নামায পড়লেন। আমরা বললাম, 'এ ২ রাকআত কোন্ নামায হে আল্লাহর রসূল? আপনি কি তা পড়তে আদিষ্ট হয়েছেন?' তিনি বললেন, "না, আসলে এটা হল সেই ২ রাকআত নামায, যা আমি যোহরের পর পড়ে থাকি। কিন্তু আজ এই মাল এসে গেলে তা বন্টন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে আসরের আযান হয়ে যায়। ফলে ঐ নামায আমার বাদ পড়ে যায়। আর তা ছেড়ে দিতেও আমি অপছন্দ করলাম।" *(আঃ, বুঃ, মুঃ, আদাঃ)*

আর এ কথা বিদিত যে, মহানবী ﷺ যে আমল একবার করতেন, তা নিয়মিত করে যেতেন এবং বর্জন করতে পছন্দ করতেন না। যার জন্য মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ আসরের পর আমার কাছে ২ রাকআত (তাঁর ইন্তিকাল অবধি) কখনো ত্যাগ করেননি।' *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১১৭৮-নং)*

উল্লেখ্য যে, ঐ ২ রাকআত নামায মহানবী ﷺ-এর অনুকরণে আমরাও পড়তে পারি। অবশ্য আসরের পর নিষিদ্ধ সময় হলেও সূর্য হলুদবর্ণ হলে তবেই সে সময় নামায নিষিদ্ধ। *(আদাঃ ১২৭৪নং)* তার আগে নয়। *(বিস্তারিত দ্রঃ সিসঃ ৬/ ১০১০-১০১৪)*

মাগরেবের সুন্নত ঃ

পূর্বের কয়েকটি হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, মাগরেবের পর ২ রাকআত সুন্নত মহানবী ﷺ ত্যাগ করতেন না। তবে এই সুন্নত তিনি ঘরে পড়তেন। একদা মাগরেবের পর তিনি বললেন, "এই ২ রাকআত তোমরা নিজ নিজ ঘরে গিয়ে পড়।" *(আঃ, আদাঃ, তিঃ, নাঃ, মিঃ ১১৮২নং)*

মাগরেবের সুন্নতেও ফজরের সুন্নতের মতই প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়া সুন্নত। হযরত ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'আমি গুনতে পারি না যে, নবী ﷺ মাগরেবের পর ও ফজরের পূর্বের সুন্নতে কতবার সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করেছেন।' *(তিঃ ৪৩১, ইমাঃ ১১৬১নং)*

এশার সুন্নত ঃ

পূর্বের একাধিক হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, এশার পরে মহানবী ﷺ ২ রাকআত সুন্নত নিজের ঘরে পড়তেন। পক্ষান্তরে এশার নামায পর বাড়ি ফিরে তাঁর ৪ অথবা ৬ রাকআত নামায পড়ার হাদীস সহীহ নয়।

প্রকাশ থাকে যে, সুন্নত নামায ঘরে পড়ার সুযোগ না থাকলে অথবা সংসারের ব্যস্ততায় পড়ার অবসর না হলে তা মসজিদেই পড়ে নেওয়া যায়।

সুন্নাতে গায়র মুআক্কাদাহ

কিছু সুন্নত আছে যা পড়া মুস্তাহাব, কিন্তু তাকীদপ্রাপ্ত নয়। এমন কিছু সুন্নত নামায নিম্নরূপঃ-

আসরের পূর্বে ২ অথবা ৪ রাকআত ঃ

হযরত ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি কৃপা করেন যে আসরের পূর্বে ৪ রাকআত নামায পড়ে।” *(আঃ, আদাঃ, তিঃ, ইখুঃ, ইহিঃ, সতাঃ ৫৮৪নং)*

হযরত আলী ﷺ বলেন, ‘নবী ﷺ আসরের পূর্বে ৪ রাকআত নামায পড়তেন এবং প্রত্যেক দুই রাকআতে আল্লাহর নিকটবর্তী ফিরিশ্তা, আম্বিয়া ও তাঁদের অনুসারী মুমিন-মুসলিমদের প্রতি সালাম (তাশাহহুদ) দিয়ে তা পৃথক করতেন। আর সর্বশেষে সালাম ফিরতেন।’ *(আঃ, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ, সিসঃ ২৩৭নং)*

লক্ষণীয় যে, আসরের (দিনের) ৪ রাকআত বিশিষ্ট সুন্নত নামায এক সালামেও পড়া বৈধ।

এ ছাড়া মহানবী ﷺ বলেন, “প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে নামায আছে। (যে পড়তে চায় তার জন্য।) *(বুঃ, মুঃ, সুআঃ, সজাঃ ২৮৫০নং)* আর সে নামায কমপক্ষে ২ রাকআত। যেমন মহানবী ﷺ বলেন, “এমন কোন ফরয নামায নেই, যার পূর্বে ২ রাকআত নামায নেই।” *(ইহিঃ, ত্বাবঃ, সিসঃ ২৩২, সজাঃ ৫৭৩০নং)* অবশ্য হযরত আলী ﷺ কর্তৃক ২ রাকআতের বর্ণনাও আবূ দাঊদে এসেছে। কিন্তু তা সহীহ নয়। *(যআদাঃ ২৩৫নং, তামিঃ ২৪১পৃঃ)*

মাগরেবের আগে ২ রাকআত ঃ

মাগরেবের আযানের পর এবং ফরয নামাযের পূর্বে ২ রাকআত সুন্নত গায়র মুআক্কাদাহ।

মহানবী ﷺ বলেন, “তোমরা মাগরেবের পূর্বে নামায পড়। তোমরা মাগরেবের পূর্বে নামায পড়।” অতঃপর তৃতীয়বারে তিনি বলেন, “যে চায় সে পড়বে।” এ কথা বলার কারণ, তিনি ঐ নামাযকে লোকেদের (জরুরী) সুন্নত মনে করে নেওয়াকে অপছন্দ করলেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১১৬৫নং)*

আনাস ﷺ বলেন, ‘আমরা মদীনায় ছিলাম। মুআয্‌যিন যখন মাগরেবের আযান দিত, তখন লোকেরা প্রতিযোগিতার সাথে মসজিদের খাম্বাগুলোর পশ্চাতে ২ রাকআত নামায পড়তে লেগে যেত। এমনকি যদি কোন অজানা লোক এসে মসজিদে প্রবেশ করত, তাহলে এত লোকের নামায পড়া দেখে সে মনে করত, হয়তো মাগরেবের জামাআত হয়ে গেছে। (এবং ওরা পরের সুন্নত পড়ছে।)’ *(মুঃ, মিঃ ১১৮০ নং)*

এ নামায মহানবী ﷺ পড়েছেন বলে কোন সহীহ প্রমাণ নেই। *(তামিঃ ২৪২পৃঃ)* বরং হযরত আনাস বলেন, ‘আমরা আল্লাহর রসুল ﷺ-এর যুগে সূর্য ডোবার পর মাগরেবের নামাযের আগে ২ রাকআত নামায পড়তাম।’ এ কথা শুনে তাবেয়ী মুখতার বিন ফুলফুল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ কি ঐ ২ রাকআত নামায পড়তেন?’ উত্তরে আনাস ﷺ বললেন, ‘তিনি আমাদেরকে তা পড়তে দেখতেন। কিন্তু সে ব্যাপারে আমাদেরকে কিছু আদেশও করতেন না এবং নিষেধও করতেন না।’ *(মুঃ, মিঃ ১১৭৯নং)*

এশার পূর্বে ২ রাকআত ঃ

মহানবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে নামায আছে।" এইরূপ তিনবার বলার পর শেষে বললেন, "যে চাইবে তার জন্য।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ৬৬২নং)*

তিনি আরো বলেন, "এমন কোন ফরয নামায নেই, যার পূর্বে ২ রাকআত নামায নেই।" *(ইহিঃ, ত্বাবঃ, সিসঃ ২৩২, সজাঃ ৫৭৩০নং)* অর্থাৎ, প্রত্যেক ফরয নামাযের পূর্বে ২ রাকআত নামায আছে। সুতরাং এশার ফরযের পূর্বেও আছে। তবে তা সুন্নাতে গায়র মুআক্কাদাহ।

মহানবী ﷺ এশার পরে ৪ রাকআত নামাযও ঘরে গিয়ে পড়তেন। ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, এক রাত্রে আমার খালা মায়মূনার ঘরে শুলাম। দেখলাম, নবী ﷺ এশার নামায পড়ে এলেন এবং ৪ রাকআত নামায পড়লেন। *(আঃ, বুঃ ১১৭নং, আদাঃ, নাঃ)*

তাহাজ্জুদ নামায

রাতের নিঃঝুম পরিবেশে যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে, নিদ্রার আবেশে মানুষ যখন মহান সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালকের কথা বিস্মৃত হয়, সেই সময় আল্লাহর কিছু খাস বান্দা নিদ্রা, আরাম-আয়েশ ও স্ত্রীর শয্যা ত্যাগ করে আল্লাহকে বিশেষভাবে স্মরণ করার জন্য, তাঁর সাথে মুনাজাতে নিমগ্ন হওয়ার জন্য উঠে ওযূ করে তাহাজ্জুদ পড়েন। আল্লাহর ক্ষমা লাভ করতে প্রয়াস পান। চেয়ে নেন আল্লাহর কাছে অনেক কিছু। নিশ্চয় সে বান্দাগণ বড় ভাগ্যবান, আর নিশ্চয় সে নামায বড় গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যপূর্ণ।

এই নামাযের মাহাত্ম্য

এই নামাযের কথা উল্লেখ করতঃ মহান আল্লাহ তাঁর রসূল মুহাম্মাদ ﷺ-কে সম্বোধন করে বলেন,

(وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، عَسَى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوْداً)

অর্থাৎ, রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ নামায পড়; এ তোমার জন্য একটি অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে মাকামে মাহমূদে (প্রশংসিত স্থানে) প্রতিষ্ঠিত করবেন। *(কুঃ ১৭/৭৯)*

"হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী (নবী)! উপাসনার জন্য রাত্রিতে উঠ (জাগরণ কর); রাত্রির কিছু অংশ বাদ দিয়ে; অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা অল্প। অথবা তদপেক্ষা বেশী। কুরআন তেলাঅত কর ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী। ইবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণ গভীর অভিনিবেশ ও হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে অতিশয় অনুকূল।" *(কুঃ ৭৩/১-৫)*

"রাত্রিতে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হও এবং রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" *(কুঃ ৭৬/২৬)*

এ সম্বোধন মহানবীর জন্য হলেও তাঁর অনুসরণ করতে মুসলিম উম্মাহ অনুপ্রাণিত

হয়েছে।

যাঁরা তাহাজ্জুদ পড়েন, তাঁরা অবশ্যই সৎলোক, মহান আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহের অধিকারী। মহান আল্লাহ বলেন,

(إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ آخِذِيْنَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِيْنَ، كَانُوْا قَلِيْلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ، وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই পরহেযগারগণ বেহেশ্তে ও প্রস্রবণে অবস্থান করবে। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দেবেন তা উপভোগ করবে। কারণ, পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। তারা রাত্রির সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত। রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। *(কুঃ ৫১/১৫-১৮)*

রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করা রহমানের বান্দাগণের গুণ। তিনি বলেন,

(وَعِبَادُ الرَّحْمنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَماً، وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَّقِيَاماً)

অর্থাৎ, রহমানের বান্দা তারা, যারা ভূপৃষ্ঠে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা প্রশান্তভাবে জবাব দেয়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দন্ডায়মান থেকে রাত্রি অতিবাহিত করে। *(কুঃ ২৫/৬৩-৬৪)*

এই শ্রেণীর মানুষদের জন্য আল্লাহ ঈমানের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন,

(إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّداً وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ، تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَّطَمَعاً وَّمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ، فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ)

অর্থাৎ, কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখে, যারা ওর দ্বারা উপদিষ্ট হলে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না। তারা শয্যা ত্যাগ করে আশায় ও আশংকায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের জন্য তাদের কৃতকর্মের নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার রক্ষিত আছে। এ হল তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান। *(সূরা সিজদাহ ১৫- ১৬ আয়াত)*

তারা অবশ্যই তাঁদের মত নয়, যারা তাঁদের মত রাত্রি জাগরণ করে মহান আল্লাহর ইবাদত করে না। তিনি বলেন,

(أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَّقَائِماً يَّحْذَرُ الآخِرَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهِ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ، إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদাবনত হয়ে এবং দন্ডায়মান থেকে ইবাদত করে, পরকালকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান, যে তা করে না?) বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা উভয়ে কি এক সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। *(কুঃ ৩৯/৯)*

হযরত আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন শয়তান তার মাথার শেষাংশে (ঘাড়ে) তিনটি গাঁট মেরে দেয়। প্রত্যেক গাঁটের সময় এই মন্ত্র পড়ে অভিভূত করে দেয়, 'তোমার এখনো লম্বা রাত বাকী। সুতরাং এখনও ঘুমাও।' অতঃপর সে যদি জেগে আল্লাহর যিক্‌র করে, তবে একটি বাঁধন খুলে যায়, অতঃপর ওযু করলে আর একটি বাঁধন খুলে যায়, অতঃপর নামায পড়লে সকল বাঁধনগুলোই খুলে যায়। ফলে ফজরের সময় সে উদ্যম ও স্ফুর্তিভরা মন নিয়ে ওঠে। নতুবা (তাহাজ্জুদ না পড়লে) আলস্যভরা ভারী মন নিয়ে সে ফজরে উঠে।" *(মাঃ, বুঃ ১১৪২নং, মুঃ ৭৭৬নং, আদাঃ, নাঃ, ইমাঃ)*

আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "রমযানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ রোযা হল আল্লাহর মাস মুহার্রামের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হল রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায।" *(মুঃ ১১৬৩নং, আদাঃ, তিঃ, নাঃ, ইখুঃ)*

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ এর বাণী হতে সর্বপ্রথম যা শুনেছি তা হল, "হে মানুষ! তোমরা সালাম প্রচার কর, অন্নদান কর, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখ এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা নামায পড়। এতে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" *(তিঃ, ইমাঃ, হাঃ,সতাঃ ৬১০নং)*

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "জান্নাতের মধ্যে এমন একটি কক্ষ আছে যার বাহিরের অংশ ভিতর থেকে এবং ভিতরের অংশ বাহির থেকে দেখা যাবে।" তা শুনে আবু মালেক আশআরী ﷺ বললেন, 'সে কক্ষ কার জন্য হবে, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি উত্তম কথা বলে, অন্নদান করে ও লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন নামাযে রত হয়; তার জন্য।" *(ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬১১নং)*

হযরত জাবের ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "রাত্রিকালে এমন এক মুহূর্ত রয়েছে যখনই তা লাভ করে মুসলিম ব্যক্তি ইহ-পরকালের কোন কল্যাণ আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে তখনই তিনি তাকে তা প্রদান করে থাকেন। অনুরূপ প্রত্যেক রাত্রিতেই ঐ মুহূর্ত আবির্ভূত হয়ে থাকে।" *(মুঃ ৭৫৭নং)*

হযরত আবু উমামাহ বাহেলী ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, তোমরা তাহাজ্জুদের নামাযে অভ্যাসী হও। কারণ, তা তোমাদের পূর্বতন নেক বান্দাদের অভ্যাস; তোমাদের প্রভুর নৈকট্যদানকারী ও পাপক্ষালনকারী এবং গোনাহ হতে বিরতকারী আমল।" *(তিরমিযী, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬১৮ নং)*

হযরত আবু হুরাইরা ﷺ ও আবু সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কোন ব্যক্তি যখন তার স্ত্রীকে রাত্রে ঘুম থেকে জাগিয়ে উভয়ে

তাহাজ্জুদের নামায পড়ে অথবা দুই রাকাআত নামায পড়ে তখন তাদের প্রত্যেকের নাম (আল্লাহর) যিক্‌রকারী ও যিক্‌রকারিণীদের তালিকাভুক্ত হয়।” *(আদাঃ, নাঃ, ইমাঃ, ইহিঃ, হাঃ সতাঃ ৬২০ নং)*

হযরত আবু দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন, তাদের প্রতি (সন্তুষ্ট হয়ে) হাসেন এবং তাদের কারণে খুশী হন; (প্রথম) সেই ব্যক্তি যার নিকট স্বদলের পরাজয় প্রকাশ পেলে নিজের জান দিয়ে আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার ওয়াস্তে যুদ্ধ করে। এতে সে হয় শহীদ হয়ে যায় নতুবা আল্লাহ তাকে সাহায্য (বিজয়ী) করেন ও তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন। তখন আল্লাহ বলেন, ‘আমার এই বান্দাকে তোমরা লক্ষ্য কর, আমার জন্য নিজের প্রাণ দিয়ে কেমন ধৈর্য ধরেছে?’

(দ্বিতীয়) সেই ব্যক্তি যার আছে সুন্দরী স্ত্রী এবং নরম ও সুন্দর বিছানা। কিন্তু সে (এসব ত্যাগ করে) রাত্রে উঠে নামায পড়ে। এর জন্য আল্লাহ বলেন, ‘সে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করে আমাকে স্মরণ করছে, অথচ ইচ্ছা করলে সে নিদ্রা উপভোগ করতে পারত।’

আর (তৃতীয়) সেই ব্যক্তি যে সফরে থাকে। তার সঙ্গে থাকে কাফেলা। কিছু রাত্রি জাগরণ করে সকলে ঘুমে ঢলে পড়ে। কিন্তু সে শেষরাত্রে উঠে কষ্ট ও আরামের সময় নামায পড়ে।” *(ত্বাবারানী কাবীর, সহীহ তারগীব ৬২৩ নং)*

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি ১০টি আয়াত নামাযে পড়ে সে উদাসীনদের তালিকাভুক্ত হয় না, যে ১০০টি আয়াত নামাযে পড়ে সে আবেদদের তালিকাভুক্ত হয়। আর যে ১০০০টি আয়াত নামাযে পড়ে সে অজস্র সওয়াব অর্জনকারীদের তালিকাভুক্ত হয়।” *(আবু দাঊদ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৬৩৩ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, “আমার কাছে জিবরীল এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যত ইচ্ছা বেঁচে থাকুন, আপনি মারা যাবেনই। যাকে ইচ্ছা ভালো বাসুন, আপনি তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবেন। যা ইচ্ছা তাই আমল করুন, আপনি তার বদলা পাবেন। আর জেনে রাখুন, মুমিনের মর্যাদা হল তাহাজ্জুদের নামাযে এবং তার ইজ্জত হল লোকেদের অমুখাপেক্ষী থাকায়।” *(ত্বাব, হাঃ, বাঃ, সিসঃ ৮৩১নং)*

হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে বলল, ‘অমুক রাত্রে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ে। কিন্তু সকাল হলে (দিনে) চুরি করে!?’ এ কথা শুনে তিনি বললেন, “ঐ নামায তাকে তুমি যা বলছ তাতে (চুরিতে) বাধা দেবে।” *(আঃ, বাঃ শুআবুল ঈমান, মিঃ ১২৩৭নং, সহীহ, সিযঃ ১/৫৭-৫৮ দ্রঃ)*

তাহাজ্জুদের বিভিন্ন আদব

১। ঘুমাবার আগে তাহাজ্জুদের নিয়ত করে ঘুমাতে হবে। এতে সে শেষ রাত্রে ঘুম থেকে জেগে নামায পড়তে সক্ষম না হলেও তার জন্য তাহাজ্জুদের সওয়াব লিখা হবে।

হযরত আবু দারদা ﷺ নবী ﷺ এর নিকট হতে বর্ণনা করে বলেন, তিনি বলেছেন, “রাত্রে

উঠে তাহাজ্জুদ পড়বে এই নিয়ত (সংকল্প) করে যে ব্যক্তি নিজ বিছানায় আশ্রয় নেয়, অতঃপর তার চক্ষুদ্বয় তাকে নিদ্রাভিভূত করে ফেলে এবং যদি এই অবস্থাতেই তার ফজর হয়ে যায় তবে তার আমলনামায় তাই লিপিবদ্ধ হয় যার সে নিয়ত (সংকল্প) করেছিল। আর তার ঐ নিদ্রা তার প্রতিপালকের তরফ হতে সদকাহ (দান) রূপে প্রদত্ত হয়।” *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৫৯৮-নং)*

২। ঘুম থেকে উঠে, চোখ মুছে দাঁতন করা এবং সূরা আলে ইমরানের শেষের ১০ আয়াত পাঠ করা সুন্নত। *(বুঃ ১৮৩নং, মুঃ)*

৩। ওযূ করার পর হাল্কা দুই রাকআত পড়ে তাহাজ্জুদের নামায শুরু করা কর্তব্য। মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের কেউ (তাহাজ্জুদের জন্য) রাত্রে উঠলে সে যেন তার নামায হাল্কা দুই রাকআত দিয়ে শুরু করে।” *(মুঃ)*

৪। তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য নিজের স্ত্রীকে জাগানো মুস্তাহাব। এর জন্য রয়েছে পৃথক মাহাত্ম্য। মহানবী ﷺ বলেন, “আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে রহম করেন, যে ব্যক্তি রাত্রে উঠে নামায পড়ে ও নিজ স্ত্রীকে জাগায় এবং সেও নামায পড়ে। কিন্তু সে যদি উঠতে না চায় তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। আল্লাহ সেই মহিলাকে রহম করেন, যে মহিলা রাত্রে উঠে নামায পড়ে ও নিজ স্বামীকে জাগায় এবং সেও নামায পড়ে। কিন্তু সে যদি উঠতে না চায় তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়।” *(আঃ, আদাঃ ১৩০৮, নাঃ, ইহিঃ, হাঃ, সজাঃ ৩৪৯৪নং)*

তিনি বলেন, “যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রাত্রে উঠিয়ে উভয়ে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়ে অথবা ২ রাকআত নামায পড়ে, তখন তাদের উভয়কে (আল্লাহর) যিক্‌রকারী ও যিক্‌রকারিণীদের দলে লিপিবদ্ধ (শামিল) করা হয়।” *(আদাঃ ১৩০৯নং, প্রমুখ)*

৫। রাত্রে নামায পড়তে পড়তে ঘুম এলে বা ঢুললে নামায ত্যাগ করে ঘুমিয়ে যাওয়া কর্তব্য। মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে পড়তে ঢুলতে শুরু করে, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে; যাতে তার ঘুম দূর হয়ে যায়। নচেৎ, কেউ ঢুলতে ঢুলতে নামায পড়লে সে হয়তো বুঝতে পারবে না, সম্ভবতঃ সে ক্ষমা চাইতে গিয়ে নিজেকে গালি দিয়ে বসবে। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১২৪৫নং)*

তিনি বলেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ রাতে উঠে (নামায পড়তে শুরু করে) তার জিভে কুরআন পড়া জড়িয়ে গেলে এবং সে কি বলছে তা বুঝতে না পারলে, সে যেন শুয়ে পড়ে।” *(মুসলিম)*

তিনি বলেন, “তোমাদের প্রত্যেকে যেন মনে উদ্দীপনা থাকা পর্যন্ত নামায পড়ে। ক্লান্ত হয়ে পড়লে যেন বসে যায়।” *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১২৪৪নং)*

একদা তিনি মসজিদে দুই খুঁটির মাঝে লম্বা হয়ে রশি বাঁধা থাকতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “এটা কি?” সাহাবাগণ বললেন, এটি যয়নাবের। তিনি নামায পড়েন। অতঃপর যখন আলস্য আসে অথবা ক্লান্ত হয়ে পড়েন, তখন ঐ রশি ধরে (দাঁড়ান)। তিনি বললেন, “খুলে ফেল ওটাকে। তোমাদের প্রত্যেকে যেন চাঙ্গা থাকা অবস্থায় নামায পড়ে। আর যখন সে অলস অথবা ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে।” *(বুঃ, মুঃ)*

৬। নিজেকে কষ্ট দিয়ে লম্বা তাহাজ্জুদ পড়া বিধেয় নয়। বরং স্বাভাবিকভাবে ক্ষমতায় যতটা কুলায়, ততটাই নামায পড়া উচিত। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা তত পরিমাণে আমল কর যত পরিমাণে তোমরা করার ক্ষমতা রাখ। আল্লাহর কসম! আল্লাহ (সওয়াব দিতে) ক্লান্ত হবেন না, বরং তোমরাই (আমল করতে) ক্লান্ত হয়ে পড়বে।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১২৪৩)*

৭। অল্প হলেও তা নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত করে যাওয়া উচিত এবং ভীষণ অসুবিধা ছাড়া তা ত্যাগ করা উচিত নয়। মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল যে, 'কোন (ধরনের) আমল আল্লাহর অধিক পছন্দনীয়?' উত্তরে তিনি বললেন, "সেই আমল, যে আমল নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাওয়া হয়; যদিও তা পরিমাণে কম হয়।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১২৪২নং)* মহানবী ﷺ-এর আমল ছিল নিরবচ্ছিন্ন। তিনি একবার যে আমল করতেন, তা বাকী রাখতেন (ত্যাগ করতেন না)।" *(মুঃ)* তিনি আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ-কে বলেন, "হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুকের মত হয়ো না; যে তাহাজ্জুদ পড়ত, পরে সে তা ত্যাগ করে দিয়েছে।" *(বুঃ, মুঃ)*

রসূল ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হল, যে ফজর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থেকেছে। তিনি বললেন, "ও তো সেই লোক, যার উভয় কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে।" *(বুঃ, মুঃ)*

একদা তিনি ইবনে উমারের প্রশংসা করে বললেন, "আব্দুল্লাহ কত ভাল লোক হয়, যদি সে রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে!" এ কথা শোনার পর ইবনে উমার ﷺ রাতে খুব কম ঘুমাতেন। *(বুঃ, মুঃ)*

তাহাজ্জুদের সময়

তাহাজ্জুদ নামাযের সময় শুরু হয় এশার নামাযের পর থেকে এবং শেষ হয় ফজর উদয় হওয়ার সাথে সাথে। রাতের প্রথমাংশে, মধ্য রাতে এবং শেষাংশে যে কোন সময়ে তাহাজ্জুদ পড়া যায়। হযরত আনাস ﷺ বলেন, 'আমরা রাতের যে কোন অংশে নবী ﷺ-কে নামায পড়তে দেখতে চাইতাম, সেই সময়ই দেখতে পেতাম, তিনি নামায পড়ছেন। আবার রাতের যে কোন অংশে আমরা তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে চাইতাম, তখনই আমরা দেখতে পেতাম, তিনি ঘুমিয়ে আছেন।' *(আঃ, বুঃ, নাঃ, মিঃ ১২৪১নং)*

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, এশার পর থেকে নিয়ে ফজর পর্যন্ত সময়ের ভিতরে তাহাজ্জুদের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। অবশ্য আফযল বা উত্তম সময় হল, রাতের শেষ তৃতীয়াংশ।

মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, "কে আমায় ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।" *(বুঃ, মুঃ, সুআঃ, মিঃ ১২২৩নং)*

তিনি বলেন, "শেষ রাতের গভীরে প্রতিপালক নিজ বান্দার সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হন। সুতরাং তুমি যদি ঐ সময় আল্লাহর যিক্‌রকারীদের দলভুক্ত হতে সক্ষম হও, তাহলে তা হয়ে যাও।" *(তিঃ, নাঃ, হাঃ, ইখুঃ, সজাঃ ১১৭৩নং)*

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, কোন্ সময়ের তাহাজ্জুদ সব চাইতে উত্তম? উত্তরে তিনি বললেন, "বাকী (শেষ) রাতের গভীরে (যা পড়া হয়)। আর খুব কম লোকই তা (ঐ সময়) পড়ে থাকে।" *(আঃ)*

সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে ফজর উদয় হওয়ার আগের সময়কে তিন ভাগে ভাগ করলে রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ বুঝা যায়।

রাত্রের শেষাংশে মোরগ যখন বাং দেয় তখন উঠলেও তাহাজ্জুদ পড়া যায়। মহানবী ﷺ কখনো কখনো এই সময় উঠতেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১২০৭নং)*

তাহাজ্জুদের রাকআত-সংখ্যা

রাতের নামাযের কোন নির্দিষ্ট রাকআত সংখ্যা নেই। এক রাকআত পড়লেও রাতের নামায পড়া হয়। ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী ﷺ তাহাজ্জুদের ব্যাপারে বলেন, "(রাতের নামায) অর্ধ রাত্রি, এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ, উট বা ছাগলের দুধ দোয়াবার সময় একবার দুইয়ে দ্বিতীয়বার দুয়ানোর জন্য যতটুকু বিরতি দেওয়া ততটুক (সামান্য) সময়ও।" *(ত্বাবঃ, তামিঃ ২৪৮পৃঃ)*

তবে উত্তম হল প্রত্যেক ২ রাকআতে সালাম ফিরে ৮ রাকআত পড়া। অতঃপর ৩ রাকআত বিত্‌র পড়া। অথবা অনুরূপ ১০ রাকআত পড়ে শেষে ১ রাকআত বিত্‌র পড়া। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য 'রোযা ও রমযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল' তারাবীহর বিবরণ।

তাহাজ্জুদের ক্বিরাআত

তাহাজ্জুদ নামাযের ক্বিরাআত লম্বা হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহানবী ﷺ বলেন, "শ্রেষ্ঠ নামায হল লম্বা কিয়াম।" *(আঃ, মুঃ, মিঃ ৪৬, ৮০০নং)*

ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, এক রাতে নবী ﷺ-এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি কিয়াম করতেই থাকলেন, পরিশেষে আমি মন্দ ইচ্ছা করে ফেলেছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, সে মন্দ ইচ্ছাটি কি? তিনি বললেন, আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বসে যাব! *(বুঃ, মুঃ)*

হুযাইফা বিন ইয়ামান বলেন, এক রাতে নবী ﷺ-এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাক্বারাহ পড়তে শুরু করলেন। আমি ভাবলাম, হয়তো বা তিনি ১০০ আয়াত পাঠ করে সিজদাহ করবেন। কিন্তু তিনি তা অতিক্রম করে গেলেন। ভাবলাম হয়তো বা তিনি সূরাটিকে ২ রাকআতে পড়বেন। কিন্তু তিনি তাও অতিক্রম করে গেলেন। ভাবলাম, তিনি হয়তো সূরাটি শেষ করে রুকূ করবেন। (কিন্তু না, তা না করে) সূরা নিসা শুরু করলেন। তাও পড়ে শেষ করলেন। তারপর সূরা আলে ইমরান ধরলেন এবং তাও পড়ে শেষ করলেন! (১)

---

(১) *উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মুসহাফের তরতীব অনুযায়ী সূরা পড়া জরুরী নয়। জরুরী হলে তিনি সূরা*

তিনি ধীরে-ধীরে আয়াত পাঠ করছিলেন। তসবীহর আয়াত পাঠ করলে তসবীহ পড়ছিলেন। প্রার্থনার আয়াত পাঠ করলে প্রার্থনা করছিলেন। আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত পাঠ করলে আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন। অতঃপর রুকূ করছিলেন। *(মুঃ, নাঃ)*

তিনি এই নামাযে এত দীর্ঘ কিয়াম করতেন যে, তার ফলে তাঁর পা ফুলে যেত। তাঁকে বলা হল যে, আপনার তো আগে-পিছের সকল ত্রুটি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন? (তাও আপনি এত কষ্ট করে ইবাদত করেন কেন?) তিনি বললেন, "আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১২২০নং)*

অবশ্য তিনি এক রাতে কুরআন খতম করতেন না। অবশ্য তিনি তিন রাতে কুরআন খতম করার অনুমতি দিয়েছেন; তার কমে নয়। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি ৩ রাতের কমে কুরআন পড়ে, সে কিছুই বুঝে না।" *(আঃ, তিঃ, দাঃ)*

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি ১০০টি আয়াত পাঠ করে রাতের নামায পড়বে, তার নাম বিশুদ্ধচিত্ত কিয়ামকারীদের তালিকাভুক্ত হবে।" *(দাঃ, হাঃ)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ১০০টি আয়াত পাঠ করে রাতের নামায পড়বে, সে উদাসীনদের তালিকাভুক্ত হবে না।" *(দাঃ, হাঃ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ১০টি আয়াত নামাযে পড়ে সে উদাসীনদের তালিকাভুক্ত হয় না, যে ১০০টি আয়াত নামাযে পড়ে সে আবেদদের তালিকাভুক্ত হয়। আর যে ১০০০টি আয়াত নামাযে পড়ে সে অজস্র সওয়াব অর্জনকারীদের তালিকাভুক্ত হয়।" *(আবু দাঊদ, ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ তারগীব ৬৩৩ নং)*

কখনো তিনি তাহাজ্জুদের নামাযে সূরা বানী ইসরাঈল ও যুমার পড়তেন। *(আঃ)* কখনো প্রায় ৫০ আয়াতের মত বা তার থেকে বেশী আয়াত তেলাঅত করতেন। *(বুঃ, আদাঃ)* কখনো বা সূরা মুয্যাম্মিলের মত লম্বা সূরা পাঠ করতেন। *(আঃ, আদাঃ)* একদা তিনি সূরা মাইদার ১১৮নং আয়াত বারবার পাঠ করতে করতে ফজর করে দিয়েছেন। *(আঃ, নাঃ, ইমাঃ, ইখুঃ, হাঃ, মিঃ ১২০৫নং)*

এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার এক প্রতিবেশী রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে, কিন্তু 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ছাড়া অন্য কিছু পড়ে না; এটাকেই সে বারবার ফিরিয়ে পড়ে এবং এর চাইতে বেশী কিছু পড়ে না। আসলে এ ব্যক্তি তা খুবই কম মনে করল। কিন্তু নবী ﷺ বললেন, "সেই সত্ত্বার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! ঐ সূরা এক তৃতীয়াংশ কুরআনের সমতুল্য।" *(আঃ, বুঃ)*

কখনো সশব্দে, কখনো বা নিঃশব্দে এ ক্বিরাআত করা যায়। সাহাবী গুযাইফ বিন হারেস বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'আল্লাহর রসূল ﷺ প্রথম রাতে নাপাকীর গোসল করতেন, নাকি শেষ রাতে?' তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, 'কোন রাতে তিনি প্রথম ভাগে গোসল করতেন, আবার কোন কোন রাতে শেষ ভাগে।' আমি বললাম, 'আল্লাহু

নিসার আগে আলে ইমরান পড়তেন।

আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।’ অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তিনি বিতরের নামায প্রথম রাত্রিতে পড়তেন, নাকি শেষ রাত্রিতে?’ তিনি বললেন, ‘কখনো তিনি প্রথম রাত্রিতে বিত্‌র পড়তেন, আবার কখনো শেষ রাত্রিতে।’ আমি বললাম, ‘আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।’ পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তিনি (তাহাজ্জুদের নামাযে) সশব্দে ক্বিরাআত পড়তেন, নাকি নিঃশব্দে?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘তিনি কখনো সশব্দে পড়তেন, আবার কখনো নিঃশব্দে।’ আমি বললাম, ‘আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।’ *(মুঃ, সআদাঃ ২০৯, ইমাঃ, মিঃ ১২৬৩নং)*

একদা মহানবী ﷺ রাত্রিকালে বাইরে এলে তিনি দেখলেন, আবূ বাক্‌র নিম্নস্বরে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ছেন। অতঃপর তিনি উমারের কাছে গিয়ে দেখলেন, তিনি উচ্চস্বরে নামায পড়ছেন। অতঃপর যখন তাঁরা উভয়ে তাঁর নিকট জমায়েত হলেন, তখন তিনি বললেন, “হে আবূ বাক্‌র! আমি তোমার কাছ দিয়ে পার হয়ে গেলাম, দেখলাম, তুমি নিম্নস্বরে নামায পড়ছ।” আবূ বাক্‌র বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি কেবল তাঁকে শুনিয়েছি, যাঁর কাছে আমি মুনাজাত করেছি।’ অতঃপর তিনি উমারের উদ্দেশ্যে বললেন, “আর আমি তোমার কাছ দিয়ে পার হয়ে গেলাম, দেখলাম, তুমি উচ্চস্বরে নামায পড়ছ।” উমার বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি তন্দ্রাভিভূত লোকদেরকে জাগিয়ে দিই এবং শয়তান বিতাড়ণ করি।’ নবী ﷺ বললেন, “হে আবূ বাক্‌র! তোমার আওয়াজকে একটু উঁচু কর। আর হে উমার! তোমার আওয়াজকে একটু নিচু কর।” *(আদাঃ, তিঃ, মিঃ ১২০৪নং)*

তাহাজ্জুদ নামাযের কাযা

যে তাহাজ্জুদ-গুযার বান্দার কোন কারণবশতঃ রাতের ১১ রাকআত নামায ছুটে যায় সে তা দিনে বিশেষ করে চাশ্তের সময় ১২ রাকআত কাযা করতে পারে।

মহানবী ﷺ-এর তাহাজ্জুদ ঘুম বা ব্যথা-বেদনার কারণে ছুটে গেলে দিনে ১২ রাকআত কাযা পড়তেন। *(মুঃ)* হযরত উমার বিন খাত্তাব ؓ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি তার (পূর্ণ) অযীফা (তাহাজ্জুদের নামায, কুরআন ইত্যাদি) অথবা তার কিছু অংশ রেখে ঘুমিয়ে যায়, কিন্তু তা যদি ফজর ও যোহরের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে আদায় করে নেয় তবে তার জন্য পূর্ণ সওয়াবই লিপিবদ্ধ করা হয়, যেন সে ঐ অযীফা রাত্রেই সম্পন্ন করেছে।” *(মুঃ ৭৪৭নং, আদাঃ, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ, ইখুঃ)*

তারাবীহ, লাইলাতুল ক্বাদ্‌র বা শবেকদরের নামায ও ঈদের নামায ‘রোযা ও রমযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল’ দ্রষ্টব্য।

বিত্‌র নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। এ নামায আদায় করতে মহানবী ﷺ উম্মতকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতেন। হযরত আলী ﷺ বলেন, 'বিত্‌র ফরয নামাযের মত অবশ্যপালনীয় নয়; তবে আল্লাহর রসূল ﷺ তাকে সুন্নতের রূপদান করেছেন; তিনি বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ বিত্‌র (জোড়হীন), তিনি বিত্‌র (জোড়শূন্যতা বা বেজোড়) পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা বিত্‌র (বিজোড়) নামায পড়, হে আহলে কুরআন!" *(আদাঃ, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ, ইখুঃ, সতাঃ ৫৮৮-নং)*

বনী কিনানার মুখদিজী নামক এক ব্যক্তিকে আনসার গোত্রের আবূ মুহাম্মাদ নামক এক লোক বলল যে, বিত্‌রের নামায ওয়াজেব। এ কথা শুনে সাহাবী উবাদাহ বিন সামেত ﷺ বললেন, 'আবূ মুহাম্মাদ ভুল বলছে।' আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ বান্দাগণের উপর ফরয করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা যথার্থরূপে আদায় করবে এবং তাতে গুরুত্ব দিয়ে তার কিছুও বিনষ্ট করবে না, সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি আছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি তা আদায় করবে না, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন, নচেৎ ইচ্ছা হলে জান্নাতেও দিতে পারেন।" *(মাঃ, আদাঃ, নাঃ, ইহিঃ, সতাঃ ৩৬৩ নং)*

মহানবী ﷺ সওয়ারীর উপর বিতরের নামায পড়েছেন। *(বুঃ, মুঃ, সুআঃ দারাঃ ১৬১৭নং)* অথচ ফরয নামাযের সময় তিনি সওয়ারী থেকে নেমে কিবলামুখ করতেন। *(আঃ, বুঃ)*

বিত্‌রের সময়ঃ

বিতরের সময় এশার পর থেকে নিয়ে ফজরের আগে পর্যন্ত। মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে একটি অতিরিক্ত নামায প্রদান করেছেন। আর তা হল বিত্‌রের নামায সুতরাং তোমরা তা এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে পড়ে নাও।" *(আঃ, সিসঃ ১০৮-নং)*

সাহাবী গুযাইফ বিন হারেস বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, '--- নবী ﷺ বিত্‌রের নামায প্রথম রাত্রিতে পড়তেন, নাকি শেষ রাত্রিতে?' তিনি বললেন, 'কখনো তিনি প্রথম রাত্রিতে বিত্‌র পড়তেন, আবার কখনো শেষ রাত্রিতে।' আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।---' *(মুঃ, সআদাঃ ২০৯, ইমাঃ, মিঃ ১২৬৩নং)*

অবশ্য যে ব্যক্তি মনে করে যে, সে শেষ রাত্রে উঠতে পারবে না, তার জন্য উত্তম হল প্রথম রাত্রে বিত্‌র পড়ে ঘুমানো। পক্ষান্তরে যে মনে করে যে, সে শেষ রাত্রে উঠতে পারবে তার জন্য উত্তম হল শেষ রাত্রে বিত্‌র পড়া।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, সে শেষ রাত্রে উঠতে পারবে না, তার জন্য উত্তম হল প্রথম রাত্রে বিত্‌র পড়ে নেওয়া। পক্ষান্তরে যে ধারণা করে যে, সে শেষ রাত্রে উঠতে পারবে তার জন্য উত্তম হল শেষ রাত্রে বিত্‌র পড়া। কারণ, শেষ রাতের নামাযে ফিরিশ্তা উপস্থিত হন এবং এটাই হল শ্রেষ্ঠতম।" *(আঃ, মুঃ, তিঃ, ইমাঃ, মিঃ ১২৬০নং)*

একদা তিনি হযরত আবূ বাক্‌র ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কখন বিত্‌র পড়?” আবূ বাক্‌র ﷺ বললেন, ‘প্রথম রাত্রে এশার পরে।’ অতঃপর তিনি হযরত উমার ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, “আর উমার তুমি?” উমার ﷺ বললেন, ‘শেষ রাতে।’ পরিশেষে তিনি বললেন, “কিন্তু তুমি হে আবূ বাক্‌র! স্থির-নিশ্চয়তা অবলম্বন করে থাক। আর তুমি হে উমার! (শেষ রাতে উঠার পূর্ণ) আত্মবিশ্বাস গ্রহণ করে থাক।” *(আঃ, আদাঃ, হাঃ)*

শেষ জীবনে মহানবী ﷺ শেষ রাতেই বিত্‌র পড়তেন। কেননা, সেটাই ছিল উত্তম। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তাঁর একাধিক সাহাবীকে স্থির-নিশ্চয়তা অবলম্বন পূর্বক প্রথম রাত্রে বিত্‌র পড়ে নিতে বিশেষ উপদেশ দিতেন। যেমন উপদেশ দিয়েছিলেন হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ-কে। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১২৬২নং)* হযরত সা’দ বিন আবী অক্কাস ﷺ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে এশার নামায পড়ে এক রাকআত বিত্‌র পড়ে নিতেন। তাঁকে বলা হল, ‘আপনি কেবল এক রাকআত বিত্‌র পড়েন, তার বেশী পড়েন না (কি ব্যাপার)?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, “যে ব্যক্তি বিত্‌র না পড়ে ঘুমায় না, সে হল স্থির-নিশ্চিত মানুষ।” *(আঃ)*

বিত্‌র নামাযের রাকআত সংখ্যা ঃ

বিত্‌র নামায একটানা এক সালামে ৯, ৭, ৫, ৩ রাকআত পড়া যায়।

৯ রাকআত বিত্‌রের নিয়ম হল, ৮ রাকআত একটানা পড়ে তাশাহহুদে বসতে হবে। তাতে আত্‌-তাহিয়্যাত ও দরূদ-দুআ পড়ে সালাম না ফিরে উঠে গিয়ে আরো এক রাকআত পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(মুঃ, মিঃ ১২৫৭নং)*

৭ রাকআত বিত্‌রের নিয়ম হল, ৬ রাকআত একটানা পড়ে তাশাহহুদে বসতে হবে। তাতে আত্‌-তাহিয়্যাত ও দরূদ-দুআ পড়ে সালাম না ফিরে উঠে গিয়ে আরো এক রাকআত পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(সুআঃ, আদাঃ ১৩৪২, নাঃ ১৭১৯নং)*

কোন কোন বর্ণনা মতে ষষ্ঠ রাকআতে না বসে একটানা ৭ রাকআত পড়ে সর্বশেষে তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(নাঃ ১৭১৮নং)*

৫ রাকআত বিত্‌রের নিয়ম হল, ৫ রাকআত একটানা পড়ে তাশাহহুদে বসতে হবে। তাতে আত্‌-তাহিয়্যাত ও দরূদ-দুআ পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(বুঃ, মুঃ, নাঃ ১৭১৭, মিঃ ১২৫৬নং)*

৩ রাকআত বিত্‌রের নিয়ম হল দুই প্রকার; (ক) ২ রাকআত পড়ে সালাম ফিরে দিতে হবে। অতঃপর উঠে পুনরায় নতুন করে আরো এক রাকআত পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(ইআশাঃ, ইরঃ ২/১৫০)* ইবনে উমারও এইভাবে বিত্‌র পড়তেন। *(বুখারী)*

(খ) ৩ রাকআত একটানা পড়ে তাশাহহুদে বসতে হবে। তাতে আত্‌-তাহিয়্যাত ও দরূদ-দুআ পড়ে সালাম ফিরতে হবে। *(হাঃ ১/৩০৪, বাঃ ৩/২৮, ৩/৩১)* এ ক্ষেত্রে মাগরেবের নামাযের মত মাঝে (২ রাকআত পড়ে) আত্‌-তাহিয়্যাত পড়া যাবে না। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বিতরকে মাগরেবের মত পড়তে নিষেধ করেছেন। *(ইহিঃ ২৪২০, হাঃ ১/৩০৪, বাঃ ৩/৩১, দারাঃ ১৬৩৪নং)*

এতদ্ব্যতীত ৩ রাকআত বিত্র মাগরেবের মত করে পড়া, *(দারাঃ ১৬৩৭নং)* নতুন করে তাহরীমার তকবীর দেওয়ার মত (উল্টা) তকবীর দিয়ে পুনরায় হাত বেঁধে কুনূত পড়া ইত্যাদি কিছু সলফ কর্তৃক বর্ণনা করা হলেও তা সহীহ নয়। *(ইরঃ ৪২৭নং, তুআঃ ১/৪৬৪)* অতএব তা বিদআত ও পরিত্যাজ্য।

১ রাকআত বিত্র ঃ

বিত্র এক রাকআতও পড়া যায়। খোদ মহানবী ﷺ এক রাকআত বিত্র পড়তেন। তিনি বলেন, "রাতের নামায দু রাকআত দু রাকআত। অতঃপর তোমাদের কেউ যখন ফজর হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে তখন সে যেন এক রাকআত বিত্র পড়ে নেয়।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১২৫৪নং)*

তিনি আরো বলেন, "বিত্র হল শেষ রাতে এক রাকআত।" *(মুঃ, মিঃ ১২৫৫নং)*

তিনি বলেন, "বিত্র হল প্রত্যেক মুসলিমের জন্য হক বা সত্য। সুতরাং যে ৫ রাকআত বিত্র পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক, যে ৩ রাকআত পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক এবং যে এক রাকআত পড়তে পছন্দ করে সে তাই পড়ুক।" *(আদাঃ ১৪২২, নাঃ, ইমাঃ, মিঃ ১২৬৫নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ-কে বলা হল যে, মুআবিয়া ﷺ এশার পরে এক রাকআত বিত্র পড়লেন (সেটা কি ঠিক)? উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি ঠিকই করেছেন। তিনি তো ফকীহ। তাঁকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দাও, তিনি নবী ﷺ-এর সাহাবী।' *(বুঃ, মিঃ ১২৭৭নং)*

এ ছাড়া আরো অন্যান্য বহু সলফ ১ রাকআত বিত্র পড়তেন। *(ইআশাঃ দ্রঃ)*

বিত্র নামাযের মুস্তাহাব ক্বিরাআত ঃ

এ নামাযে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা পড়া যায়। তবে মুস্তাহাব হল, প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়া। *(আঃ, নাঃ, দাঃ, হাঃ, মিঃ ১২৭০-১২৭২নং)*

মহানবী ﷺ কখনো কখনো তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাসের সাথে সূরা নাস ও ফালাকও পাঠ করতেন। *(আদাঃ, তিঃ, হাঃ ১/৩০৫)*

বিত্রের কুনূত ঃ

মহানবী ﷺ হযরত হাসান বিন আলী ﷺ-কে নিম্নের দুআ বিত্র নামাযে ক্বিরাআত শেষ করার পর (রুকূর আগে) পড়তে শিখিয়েছিলেনঃ-

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ لاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ (وَصَلَّى اللّٰهُ عَلى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ).

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাহদিনী ফী মান হাদাইত্। অআ-ফিনী ফীমান আ ফাইত্। অতাওয়াল্লানী ফী মান তাওয়াল্লাইত্। অবা-রিকলী ফী মা আ'ত্বাইত্। অক্বিনী শার্রামা ক্বাযাইত্। ফাইন্নাকা তাক্বযী অলা ইউক্বযা আলাইক্। ইন্নাহু লা য়্যাযিল্লু মাঁউ ওয়া-লাইত্। অলা য়্যাইয্যু মান আ'-দাইত্। তাবা-রাকতা রাব্বানা অতাআ'-লাইত্। লা মানজা মিনকা ইল্লা ইলাইক্। (অ স্বাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ।)

অর্থ - হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হেদায়াত করে তাদের দলভুক্ত কর যাদেরকে তুমি হেদায়াত করেছ। আমাকে নিরাপদে রেখে তাদের দলভুক্ত কর যাদেরকে তুমি নিরাপদে রেখেছ, আমার সকল কাজের তত্ত্বাবধান করে আমাকে তাদের দলভুক্ত কর যাদের তুমি তত্ত্বাবধান করেছ। তুমি আমাকে যা কিছু দান করেছ তাতে বর্কত দাও। আমার ভাগ্যে তুমি যা ফায়সালা করেছ তার মন্দ থেকে রক্ষা কর। কারণ তুমিই ফায়সালা করে থাক এবং তোমার উপর কারো ফায়সালা চলে না। নিশ্চয় তুমি যাকে ভালোবাস সে লাঞ্ছিত হয় না এবং যাকে মন্দ বাস সে সম্মানিত হয় না। তুমি বর্কতময় হে আমাদের প্রভু এবং তুমি সুমহান। তোমার আযাব থেকে তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল নেই। আর আমাদের নবীর উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন। *(আদাঃ, তিঃ, নাঃ, আঃ, বাঃ, ইমাঃ, মিঃ ১২৭৩নং, ইরঃ ২/১৭২)*

প্রকাশ থাকে যে, দুআর শেষে দরূদের উল্লেখ উক্ত হাদীসসমূহে না থাকলেও সলফদের আমল শেষে দরূদ পড়ার কথা সমর্থন করে। আর সে জন্যই দুআর শেষে এখানে যুক্ত করা হয়েছে। *(তামিঃ ২৪৩পৃঃ, সিসানঃ)*

হযরত আলী ﷺ বলেন মহানবী ﷺ তাঁর বিত্রের শেষ (রাকআতের রুকূর আগে কুনূতে) এই দুআ বলতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযু বিরিয়া-কা মিন সাখাত্বিক, অবিমুআফা-তিকা মিন উকূবাতিক, অ আঊযু বিকা মিন্‌কা লা উহ্‌সী যানা-আন আলাইকা আন্তা কামা আসনাইতা আলা নাফসিক্।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার সন্তুষ্টির অসীলায় তোমার ক্রোধ থেকে, তোমার ক্ষমাশীলতার অসীলায় তোমার শাস্তি থেকে এবং তোমার সত্তার অসীলায় তোমার আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তোমার উপর তোমার প্রশংসা গুনে শেষ করতে পারি না, যেমন তুমি নিজের প্রশংসা নিজে করেছ। *(সুআঃ, মিঃ ১২৭৬নং, ইরঃ ২/১৭৫)*

প্রকাশ থাকে যে, অনেকে বলেছেন, উক্ত দুআটি বিতরের নামাযের শেষে অর্থাৎ, সালাম ফিরার পর পড়া মুস্তাহাব। *(আমাঃ ৪/২১৩, তুআঃ ১০/৯, ফিসুঃ আরবী ১/১৭৪, ফিসুঃ উর্দু ১৮৫পৃঃ দ্রঃ)*

পক্ষান্তরে মানারুস সাবীল *(১/১০৮)* আস্‌সালসাবীল *(১/১৬২)* প্রভৃতি ফিকহের কিতাবে উক্ত দুআকে দুআয়ে কুনূত বলেই প্রথমোক্ত দুআর পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থের পরিচ্ছেদের শিরোনাম বাঁধার

ভাবধারায় বুঝা যায় যে, এ দুআ বিত্‌রের কুনূতে পঠনীয়। নাসাঈ শরীফের উক্ত হাদীসের টীকায় আল্লামা সিন্ধী বলেন, 'হতে পারে তিনি উক্ত দুআ কিয়ামের শেষাংশে (রুকূর আগে) বলতেন। সুতরাং ওটাও একটি দুআয়ে কুনূত; যেমন গ্রন্থকার (নাসাঈর) কথা দাবী করে। আবার এও হতে পারে যে, তিনি (বিত্‌রের) তাশাহহুদের বৈঠকে (সালাম ফিরার পূর্বে) উক্ত দুআ পড়তেন। আর শব্দের বাহ্যিক অর্থও তাই।' *(নাঃ ১৭৪৬নং, ২/২৭৫)* অল্লাহু আ'লাম।

বিত্‌রের কুনূতকে কুনূতে গায়র নাযেলাহ বলা হয়। আর তা সব সময় প্রত্যেক রাত্রে বিত্‌র নামাযে পড়া হয়। অবশ্য কুনূতের দুআ পড়া মুস্তাহাব; জরুরী নয়। সুতরাং কেউ ভুলে ছেড়ে দিয়ে সিজদায় গেলে সহু সিজদা লাগে না। যেমন প্রত্যেক রাত্রে তা নিয়মিত না পড়ে মাঝে মাঝে ত্যাগ করা উচিত। *(সিসানঃ ১৭৯পৃঃ, মুমঃ ৪/২৭)*

প্রকাশ থাকে যে, বিত্‌রের কুনূত (দুআ) মুখস্থ না থাকলে তার বদলে তিনবার 'ক্বুল' বা 'রাব্বানা আতেনা' পড়ে কাজ চালানো শরীয়ত-সম্মত নয়। মুখস্থ না থাকলে করতে হবে। আর ততদিন কুনূত না পড়ে এমনিই কাজ চলবে।

বিত্‌রের দুআয় ইমাম সাহেব বহুবচন শব্দ ব্যবহার করবেন। এরূপ করা বিধেয়। এটা নিষিদ্ধ নববী শব্দ পরিবর্তনের আওতাভুক্ত নয়। কারণ, এটা কেবলমাত্র শব্দের বচন পরিবর্তন। পক্ষান্তরে হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় বিত্‌রের দুআ বহুবচন শব্দেও বর্ণিত হয়েছে। *(ত্বাবঃ কাবীর ২৭০০নং, শাসুঃ ৩/১২৯, সাতাঃ ইবনে বায ৪১পৃঃ, মুমুত্বাসাঃ ১৭১পৃঃ দ্রঃ)*

কুনূতের স্থান ও নিয়ম

কুনূতের দুআ (শেষ রাকআতের) রুকুর আগে বা পরে যে কোন স্থানে পড়া যায়। হুমাইদ বলেন, আমি আনাস ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কুনূত রুকূর আগে না পরে? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমরা রুকূর আগে ও পরে কুনূত পড়তাম।' *(ইমাঃ, মিঃ ১২৯৪নং)*

অনুরূপ (দুআর মত) হাত তোলা ও না তোলা উভয় প্রকার আমলই সলফ কর্তৃক বর্ণিত আছে। *(তুআঃ ১/৪৬৪)*

অবশ্য দুআর পরে মুখে হাত বুলানো সুন্নত নয়। কারণ, এ ব্যাপারে যত হাদীস এসেছে সবগুলোই দুর্বল। *(ইরঃ ২/১৮১, মুমঃ ৪/৫৫)* বলা বাহুল্য, দুর্বল হাদীস দ্বারা কোন সুন্নত প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তাই কিছু উলামা স্পষ্টভাবে তা (অনুরূপ বুকে হাত ফিরানোকে) বিদআত বলেছেন। *(ইরঃ ২/১৮১, মুবিঃ ৩২২পৃঃ)*

ইয্য্ বিন আব্দুস সালাম বলেন, 'জাহেল ছাড়া এ কাজ অন্য কেউ করে না।' পক্ষান্তরে দুআয় হাত তোলার ব্যাপারে অনেক সহীহ হাদীস এসেছে। তার মধ্যে কোন হাদীসেই মুখে হাত ফিরানোর কথা নেই। আর তা এ কথারই দলীল যে, উক্ত আমল আপত্তিকর ও অবিধেয়। *(ইরঃ ২/১৮২, সিসানঃ ১৭৮পৃঃ)*

বিতরের নামাযের সালাম ফিরে দুআ

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ، (সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস।)

অর্থ- আমি পবিত্রময় বাদশাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।

এই দুআটি তিনবার পড়তে হয়। তন্মধ্যে তৃতীয় বারে উচ্চস্বরে পড়া কর্তব্য। *(আদাঃ, নাঃ, মিঃ ১২৭৪-১২৭৫নং)*

এক রাতে দুইবার বিত্‌র নিষিদ্ধ

রাত্রের সর্বশেষ নামায হল বিত্‌রের নামায। বিত্‌রের পর আর কোন নামায নেই। অতএব যদি কেউ শেষ রাত্রে উঠতে পারবে না মনে করে এশার পর বিত্‌র পড়ে নেয় অতঃপর শেষ রাত্রে উঠতে সক্ষম হয়, সে তাহাজ্জুদ পড়বে কিন্তু আর দ্বিতীয় বার বিত্‌র পড়বে না। কারণ, মহানবী ﷺ বলেন, "এক রাতে দুটি বিত্‌র নেই।" *(আঃ, আদঃ, তিঃ, নাঃ, ইহিঃ, বাঃ, সজাঃ ৭৫৬৭নং)* "তোমরা বিত্‌র নামাযকে রাতের শেষ নামায কর।" *(বুঃ, মুঃ, আদাঃ, ইরঃ ৪২২নং)*

বিত্‌রের পর নফল ২ রাকআত

অবশ্য এ ব্যাপারে একটি ব্যতিক্রম নামায হল, বিত্‌রের পরে ২ রাকআত সুন্নত বসে বসে পড়া। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রসূল ﷺ (বিত্‌র নামাযের) সালাম ফিরার পর বসে বসে ২ রাকআত নামায পড়তেন। *(মুঃ)* হযরত উম্মে সালামাহ বলেন। 'তিনি বিত্‌রের পর বসে বসে (হাল্কা করে) ২ রাকআত নামায পড়তেন।' *(আঃ, আদাঃ, তিঃ, মিঃ ১২৮৪নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় এই (সফর) রাত্রি জাগরণ ভারী ও কষ্টকর। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন বিত্‌র পড়বে তখন সে যেন ২ রাকআত পড়ে নেয়। অতঃপর সে যদি রাত্রে উঠতে পারে তো উত্তম। নচেৎ, ঐ ২ রাকআত তার (রাতের নামায) হয়ে যাবে।" *(দাঃ, মিঃ ১২৮৬, সিসঃ ১৯৯৩নং দ্রঃ)*

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ঐ ২ রাকআত আমাদেরও পড়া উচিত। আর তা মহানবী ﷺ-এর জন্য খাস নয়।

আবূ উমামাহ বলেন, 'নবী ﷺ ঐ ২ রাকআত নামায বিত্‌রের পর বসে বসে পড়তেন। আর তার প্রথম রাকআতে সূরা যিলযাল ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরূন পাঠ করতেন।' *(আঃ, মিঃ ১২৮৭নং)*

বিত্‌রের কাযা

বিত্‌র নামায যথা সময়ে না পড়া হলে তা কাযা পড়া বিধেয়। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বিত্‌র না পড়ে ঘুমিয়ে যায় অথবা তা পড়তে ভুলে যায় সে ব্যক্তি যেন তা স্মরণ হওয়া মাত্র তা পড়ে নেয়।" *(আঃ, সুআঃ, হাঃ, সজাঃ ৬৫৬২নং)* তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে

থেকে বিত্‌র না পড়তে পারে সে ব্যক্তি যেন ফজরের সময় তা পড়ে নেয়।” *(তিঃ, ইরঃ ৪২২, সজাঃ ৬৫৬৩নং)*

খোদ মহানবী ﷺ-এর কোন রাত্রে বিত্‌র না পড়ে ফজর হয়ে গেলে তখনই বিত্‌র পড়ে নিতেন। *(আঃ ৬/২৪৩, বাঃ ১/৪৭৯, ত্বাবঃ, মাযাঃ ২/২৪৬)*

একদা এক ব্যক্তি মহানবীর দরবারে এসে বলল, ‘হে আল্লাহর নবী! ফজর হয়ে গেছে অথচ আমি বিত্‌র পড়তে পারিনি।’ তিনি বললেন, “বিত্‌র তো রাত্রেই পড়তে হয়।” লোকটি পুনরায় বলল, ‘হে আল্লাহর নবী! ফজর হয়ে গেছে অথচ আমি বিত্‌র পড়তে পারিনি।’ এবারে তিনি বললেন, “এখন পড়ে নাও।” *(ত্বাবঃ, সিসঃ ১৭১২নং)*

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয় যে, ফজর হয়ে গেলেও বিতর নামায বিত্‌রের মতই কাযা পড়া যাবে। *(সিসঃ ৪/২৮৯ দ্রঃ)*

বিত্‌র নামাযে জামাআত

মহানবী ﷺ যে কয় রাত তারাবীহর নামায পড়েছিলেন সে কয় রাতে জামাআত সহকারে বিত্‌র পড়েছিলেন। অনুরূপ সাহাবীগণও রমযান মাসে জামাআত সহকারে তারাবীহর সাথে বিত্‌র পড়েছেন।

পাঁচ-অক্ত্‌ নামাযে কুনূত

মুসলিমদের প্রতি কাফেরদের অত্যাচারের সময় পাঁচ-অক্ত্‌ নামাযের শেষ রাকআতের রুকূ থেকে মাথা তুলে কুনূত পড়া বিধেয়। *(আদাঃ, মিঃ ১২৯০নং)* এই কুনূতকে কুনূতে নাযেলাহ্‌ বলা হয়। এই কুনূতে মুসলিমদের জন্য দুআ এবং অত্যাচারী কাফেরদের বিরুদ্ধে বদ্দুআ করা বিধেয়। দুই হাত তুলে দুআ করবেন ইমাম এবং ‘আমীন-আমীন’ বলবে মুক্তাদীগণ। এই কুনূতের দুআর ভূমিকা নিম্নরূপঃ-

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَنَشْكُرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ، اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّيْ وَ نَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعى وَنَحْفِدُ، نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসতাঈনুকা অ নাসতাগফিরুক, অনুষনী আলাইকাল খায়রা কুল্লাহ, অনাশকুরুকা অলা নাকফুরুক, অনাখলাউ অনাতরুকু মাঁই য়্যাফজুরুক, আল্লা-হুম্মা ইয়্যাকা না’বুদ, অলাকা নুসাল্লী অনাসজুদ, অইলাইকা নাসআ অ নাহফিদ, নারজু রাহমাতাকা অনাখশা আযা-বাক, ইন্না আযা-বাকা বিল কুফফা-রি মুলহাক্ব।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং ক্ষমা

ভিক্ষা করছি, তোমার নিমিত্তে যাবতীয় কল্যাণের প্রশংসা করছি, তোমার কৃতজ্ঞতা করি ও কৃতঘ্নতা করি না, তোমার যে অবাধ্যতা করে তাকে আমরা ত্যাগ করি এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি, তোমার জন্যই নামায পড়ি এবং সিজদা করি, তোমার দিকেই আমরা ছুটে যাই। তোমার রহমতের আশা রাখি এবং তোমার আযাবকে ভয় করি, নিশ্চয় তোমার আযাব কাফেরদেরকে পৌঁছবে।

এরপর অত্যাচারিতদের জন্য দুআ এবং অত্যাচারীদের উপর বদ্দুআ করতে হয়। যেমন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ،

اَللّٰهُمَّ عَذِّبِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ، وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ، وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَاءَكَ، اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِيْ لاَ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ.

উচ্চারণ ঃ- আল্লা-হুম্মাগফির লিল মু’মিনীনা অল মু’মিনা-ত, অলমুসলিমীনা অলমুসলিমাত, অ আল্লিফ বাইনা কুলূবিহিম, অ আসলিহ যা-তা বাইনিহিম, অনসুরহুম আলা আদুউবিকা অ আদুউবিহিম।

আল্লা-হুম্মা আয্‌যিবিল কাফারাতাল্লাযীনা য়্যাসুদ্দূনা আন সাবীলিক, অয়্যুকাযযিবূনা রুসুলাক, অয়্যুক্বা-তিলূনা আউলিয়া-আক। আল্লাহুম্মা খা-লিফ বাইনা কালিমাতিহিম, অযালযিল আক্বদামাহুম, অআনযিল বিহিম বা’সাকাল্লাযী লা তারুদ্দুহু আনিল ক্বাউমিল মুজরিমীন।□

অর্থ ঃ- হে আল্লাহ! তুমি মুমিন ও মুসলিম নারী-পুরুষদেরকে ক্ষমা করে দাও। তাদের হৃদয়ে হৃদয়ে মিল দাও। তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি কর। তাদেরকে তোমার ও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর।

হে আল্লাহ! যে কাফেররা তোমার পথে বাধা সৃষ্টি করছে, তোমার রসূলদেরকে মিথ্যা মনে করছে এবং তোমার বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে তাদেরকে তুমি আযাব দাও। হে আল্লাহ! তুমি ওদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি কর। ওদেরকে বিক্ষিপ্ত ও বিচলিত কর এবং ওদের উপর তোমার সেই আযাব অবতীর্ণ কর, যা অপরাধী জাতি থেকে তুমি রদ করো না। *(বাইহাকী, ২/২১১, ইবনে আবী শাইবাহ প্রমুখ, ইরওয়াউল গলীল ২/ ১৬৪- ১৭০)*

রমযানের কুনূতে উক্ত দুআ, অর্থাৎ কাফেরদের উপর বদদুআ এবং মুমিনদের জন্য দুআ ও ইস্তেগফার করার কথা সাহাবীদের আমলে প্রমাণিত। *(সহীহ ইবনে খুযাইমা ১১০০ নং)*

যেমন এরূপ দুআও করা বিধেয়ঃ-

اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى الطُّغَاةِ الظَّالِمِيْنَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ.

প্রকাশ থাকে যে, সাধারণ দিনসমূহে কেবল ফজরের নামাযে কুনূত বিধেয় নয়; বরং তা

বিদআত। আবূ মালেক আশজাঈ বলেন, আমার আব্বা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর পিছনে এবং আবূ বাকর, উমার ও উসমানের পিছনে নামায পড়েছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁরা কি ফজরে কুনূত পড়তেন? তিনি উত্তরে বললেন, 'না, বেটা! এটা বিদআত।' *(আঃ, নাঃ, তিঃ, ইমাঃ, বুলূগুল মারাম ৩০৩নং, মবঃ ১৭/৬৮)*

হযরত আনাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ কোন সম্প্রদায়ের জন্য দুআ অথবা বদ্দুআ করা ছাড়া ফজরের নামাযে এমনি কুনূত পড়তেন না। *(ইহিঃ, ইখুঃ, বুলূগুল মারাম ৩০২নং)*

পক্ষান্তরে যে হাদীস দ্বারা ফজরের নামাযে কুনূত প্রমাণ করা হয়, তা হয় দুর্বল, না হয় সে কুনূত হল নাযেলার কুনূত; যা ৫ অক্ত্‌ নামাযেই বিধেয়। *(তামিঃ ২৪৩পৃঃ)*

চাশ্তের নামায

চাশ্তের নামায মুস্তাহাব নফল। এই নামাযের রয়েছে বিরাট মাহাত্ম্য ও সওয়াব।

হযরত আবু যার্র ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "প্রত্যহ সকালে তোমাদের প্রত্যেক অস্থি-গ্রন্থির উপর (তরফ থেকে) দাতব্য সদকাহ রয়েছে; সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ হল সদকাহ প্রত্যেক তাহমীদ (আল হামদু লিল্লা-হ পাঠ) সদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ পাঠ) সদকাহ, প্রত্যেক তকবীর (আল্লা-হু আকবার পাঠ) সদকাহ, সৎকাজের আদেশকরণ সদকাহ, এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধকরণও সদকাহ। আর এসব থেকে যথেষ্ট হবে চাশ্তের দুই রাকআত নামায।" *(মুসলিম ৭২০ নং)*

হযরত বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "মানবদেহে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ঐ প্রত্যেক গ্রন্থির তরফ থেকে দেয় সদকাহ রয়েছে।" সকলে বলল, 'এত সদকাহ দিতে আর কে সক্ষম হবে, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "মসজিদ হতে কফ (ইত্যাদি নোংরা) দূর করা, পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা-পাথর প্রভৃতি) দূর করা এক একটা সদকাহ। যদি তাতে সক্ষম না হও তবে দুই রাকআত চাশ্তের নামায তোমার সে প্রয়োজন পূর্ণ করবে।" *(আহমদ, ও শব্দগুলি তাঁরই, আবু দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৬৬১ নং)*

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এক যোদ্ধাবাহিনী প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধ সফরে তারা বহু যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ ক'রে খুব শীঘ্রই ফিরে আসে। লোকেরা তাদের যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তিতা, লব্ধ সম্পদের আধিক্য এবং ফিরে আসার শীঘ্রতা নিয়ে সবিস্ময় বিভিন্ন আলোচনা করতে লাগল। তা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে ওদের চেয়ে নিকটতর যুদ্ধক্ষেত্র, ওদের চেয়ে অধিকতর লব্ধ সম্পদ এবং ওদের চেয়ে শীঘ্রতর ফিরে আসার কথার সন্ধান বলে দেব না? যে ব্যক্তি সকালে ওযু করে চাশ্তের নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যায় সে ব্যক্তি ওদের চেয়ে নিকটতর যুদ্ধক্ষেত্রে যোগদান করে, ওদের চেয়ে অধিকতর সম্পদ লাভ করে এবং ওদের চেয়ে অধিকতর শীঘ্র ঘরে ফিরে আসে।" *(আহমদ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৬৬৩ নং)*

হযরত উক্ববাহ বিন আমের জুহানী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল্‌ বলেন, 'হে আদম সন্তান! দিনের প্রথমাংশে তুমি আমার জন্য চার রাকআত নামায পড়তে অক্ষম হয়ো না, আমি তার প্রতিদানে তোমার দিনের শেষাংশের জন্য যথেষ্ট হব।" *(আহমদ, আবু য়্যালা, সহীহ তারগীব ৬৬৬ নং)*

প্রকাশ থাকে যে, যুহার নামায পড়ে 'বাবুয যুহা' দিয়ে জান্নাতে যাওয়ার হাদীস সহীহ নয়। *(দেখুনঃ যামাঃ ১/৩৪৯ টীকা নং ১)*

এই নামাযের সময়

স্বালাতুয-যুহা বা চাশ্তের নামাযের সময় শুরু হয় সূর্য যখন দর্শকের চোখে এক বর্শা (এক মিটার) পরিমাণ উপরে ওঠে। অর্থাৎ সূর্য ওঠার মোটামুটি ১৫ মিনিট পরে এই নামায পড়া যায়। *(মুমঃ ৪/১২২)* আর শেষ হয় সূর্য ঢলার আগে। তবে উত্তম হল, সূর্য পূর্বাকাশে উঁচু হওয়ার পর যখন মাটি গরম হতে শুরু করবে তখন এই নামায পড়া। মহানবী ﷺ বলেন, "সূর্য উঠে গেলে তারপর নামায পড়। কারণ, এই (সূর্য মাথার উপর আসার আগে পর্যন্ত) সময় নামায কবুল হয় এবং তাতে ফিরিশ্তা উপস্থিত থাকেন।" *(আঃ, ইমাঃ, হাঃ, সজাঃ ৬৬৩নং)*

যায়দ বিন আরকাম বলেন, একদা মহানবী ﷺ কুবাবাসীর নিকটে এসে দেখলেন, তারা চাশ্তের নামায পড়ছে। তিনি বললেন, "আওয়াবীনের (আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের) নামায যখন উটের বাচ্চার পা বালিতে গরম অনুভব করে।" *(আঃ, মুঃ তিঃ, মিঃ ১৩১২নং)*

উক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, এই চাশ্তের নামাযকেই বলে আওয়াবীনের নামায। বলা বাহুল্য, মাগরেবের পর ৬ রাকআত নামাযের ঐ নাম দেওয়া ভিত্তিহীন।

প্রকাশ থাকে যে, এই নামাযকে তার প্রথম অক্তে (সূর্য এক বর্শা বরাবর উপরে উঠার পর) পড়লে ইশরাকের নামায বলা হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে, অতঃপর সূর্যোদয় অবধি বসে আল্লাহর যিক্‌র করে তারপর দুই রাকআত নামায পড়ে, সেই ব্যক্তির একটি হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ হয়।" বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ।" অর্থাৎ কোন অসম্পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব নয় বরং পূর্ণ হজ্জ-উমরার সওয়াব। *(তিঃ, সতাঃ ৪৬১নং)*

এই নামায কত রাকআত?

চাশ্তের নামাযের কমপক্ষে ২ রাকআত এবং ঊর্ধ্বপক্ষের কোন নির্দিষ্ট রাকআত সংখ্যা নেই। অবশ্য মহানবী ﷺ নিজে এই নামায ৮ রাকআত পড়তেন বলে প্রমাণিত। পক্ষান্তরে তাঁর কথায় প্রমাণিত ১২ রাকআত।

উম্মে হানী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর ঘরে চাশ্তের সময় ৮ রাকআত নামায পড়েছেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১৩০৯নং)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, মহানবী ﷺ ৪ রাকআত চাশ্তের নামায পড়তেন এবং আল্লাহর তওফীক অনুসারে আরো বেশী পড়তেন। *(আঃ, মুঃ, ইমা, মিঃ ১৩১০নং)*

তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি চাশ্তের ৪ রাকআত এবং প্রথম নামায (যোহরের) পূর্বে ৪ রাকআত পড়বে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে।” *(ত্বাব আওসাত্ব, সিসঃ ২৩৪৯নং)*

মা আয়েশা (রাঃ) ৮ রাকআত চাশ্ত্ পড়তেন আর বলতেন, যদি আমার মা-বাপকেও জীবিত করে দেওয়া হয় তবুও আমি তা ছাড়ব না। *(মাঃ, মিঃ ১৩১৯নং)*

হযরত আবু দারদা ﷻ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি চাশতের দু রাকআত নামায পড়বে সে উদাসীনদের তালিকাভুক্ত হবে না। যে ব্যক্তি চার রাকআত পড়বে সে আবেদগণের তালিকাভুক্ত হবে। যে ব্যক্তি ছয় রাকআত পড়বে তার জন্য ঐ দিনে (আল্লাহ তার অমঙ্গলের বিরুদ্ধে) যথেষ্ট হবেন। যে ব্যক্তি আট রাকআত পড়বে আল্লাহ তাকে একান্ত অনুগতদের তালিকাভুক্ত করবেন। যে ব্যক্তি বারো রাকআত পড়বে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন। এমন কোন দিন বা রাত্রি নেই যাতে আল্লাহর কোন অনুগ্রহ নেই; তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা দানস্বরূপ উক্ত অনুগ্রহ দান করে থাকেন। আর তাঁর যিক্‌রে প্রেরণা দান করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে কোন বান্দার প্রতিই করেননি।” *(ত্বাবারানীর কাবীর, সতাঃ ৬৭১ নং)*

সলফ কর্তৃক ১২ রাকআতের বেশী পড়ার কথাও প্রমাণিত। অতএব কেউ পড়লে বেশী পড়তে পারে। *(ফিসুঃ আরবী ১/ ১৮৬)*

উল্লেখ্য যে, ২ রাকআতের অধিক চাশ্ত্ পড়লে প্রত্যেক ২ রাকআতে সালাম ফিরাই উত্তম।

প্রকাশ থাকে যে, এই নামাযে কোন নির্দিষ্ট ক্বিরাআত নেই। সূরা শাম্‌স ও যুহা পড়ার হাদীসটি জাল। *(সিযঃ ৩৭৭৪নং)*

চাশ্তের নামায মসজিদে পড়ার পৃথক ফযীলত

হযরত আবু উমামা ﷻ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহ রসূল ﷺ বলেন “যে ব্যক্তি কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে স্বগৃহে থেকে ওযূ করে (মসজিদের দিকে) বের হয় সেই ব্যক্তির সওয়াব হয় ইহরাম বাঁধা হাজীর ন্যায়। আর যে ব্যক্তি কেবলমাত্র চাশ্তের নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই বের হয়, তার সওয়াব হয় উমরাকারীর সমান। এক নামাযের পর অপর নামায; যে দুয়ের মাঝে কোন অসার (পার্থিব) ক্রিয়াকলাপ না থাকে তা এমন আমল যা ইল্লিয়্যীনে (সৎলোকের সৎকর্মাদি লিপিবদ্ধ করার নিবন্ধ গ্রন্থে) লিপিবদ্ধ করা হয়।” *(আদাঃ, সতাঃ ৩১৫নং)*

যাওয়াল (সূর্য ঢলার) পূর্বে নামায

চাশ্তের নামায পড়ার পর ঠিক মাথার উপর সূর্য হওয়ার পূর্বে ৪ রাকআত নফল পড়া সুন্নত। এ নামায মহানবী ﷺ পড়তেন। *(আঃ, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ, সিসঃ ২৩৭নং)*

অনেকের মতে যাওয়ালের পরেও নির্দিষ্ট ৪ রাকআত নামায রয়েছে।

আবূ আইয়ুব আনসারী ؓ বলেন, নবী ﷺ সূর্য ঢলার সময় ৪ রাকআত নামায প্রত্যহ পড়তেন। একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি সূর্য ঢলার সময় এই ৪ রাকআত প্রত্যহ পড়ছেন?' তিনি বললেন, "সূর্য ঢলার সময় আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয় এবং যোহরের নামায না পড়া পর্যন্ত বন্ধ করা হয় না। অতএব আমি পছন্দ করি যে, এই সময় আমার নেক আমল (আকাশে আল্লাহর নিকট) উঠানো হোক।" আমি বললাম, 'তার প্রত্যেক রাকআতেই কি ক্বিরাআত আছে?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" আমি বললাম, 'তার মাঝে কি পৃথককারী সালাম আছে?' তিনি বললেন, "না।" *(মুখতাসারুশ শামাইলিল মুহাম্মাদিয়্যাহ, আলবানী ২৪৯নং)*

আব্দুল্লাহ বিন সায়েব বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ সূর্য ঢলার পর যোহরের আগে ৪ রাকআত নামায পড়তেন এবং বলেছেন, এটা হল সেই সময়, যে সময় আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়। অতএব আমি পছন্দ করি যে, এই সময় আমার নেক আমল (আকাশে আল্লাহর নিকট) উঠানো হোক।" *(ঐ ২৫০নং)*

কিন্তু অনেকের মতে ঐ নামায যোহরের পূর্বের সুন্নত। অল্লাহু আ'লাম।

ইস্তিখারার নামায

কোন বৈধ বিষয় বা কাজে (যেমন ব্যবসা, সফর, বিবাহের ব্যাপারে) ভালো মন্দ বুঝতে না পারলে, মনে ঠিক-বেঠিক, উচিত-অনুচিত বা লাভ-নোকসানের দ্বন্দ্ব হলে আল্লাহর নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করতে দুই রাকআত নফল নামায পড়ে নিম্নের দুআ পাঠ করা সুন্নত।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا الأَمْرَ(.......) خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ وَعَاجِلِهِ آجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ وَعَاجِلِهِ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِيْ بِهِ.

উচ্চারণ- "আল্লা-হুম্মা আস্তাখীরুকা বিইলমিকা অ আস্তাক্বদিরুকা বি ক্বুদরাতিকা অ আসআলুকা মিন ফায্বলিকাল আযীম, ফাইন্নাকা তাক্বদিরু অলা আক্বদিরু অতা'লামু অলা আ'লামু অ আন্তা আল্লা-মুল গুয়ূব। আল্লা-হুম্মা ইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা (--

--) খাইরুল লী ফী দীনী অ মাআ'শী অ আ'-ক্বিবাতি আমরী অ আ'-জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফাক্বদুরহু লী, অ য়্যাসসিরহু লী, সুম্মা বা-রিক লী ফীহ। অইন কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শার্রুল লী ফী দীনী অ মাআ'শী অ আ'-কিবাতি আমরী অ আ'-জিলিহী অ আ-জিলিহ, ফাস্বরিফহু আন্নী অস্বরিফনী আনহু, অক্বদুর লিয়াল খাইরা হাইসু কা-না সুম্মা রায্যিনী বিহ।

অর্থ- হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট তোমার ইলমের সাথে মঙ্গল প্রার্থনা করছি। তোমার কুদরতের সাথে শক্তি প্রার্থনা করছি এবং তোমার বিরাট অনুগ্রহ থেকে ভিক্ষা যাচনা করছি। কেননা, তুমি শক্তি রাখ, আমি শক্তি রাখি না। তুমি জান, আমি জানি না এবং তুমি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। হে আল্লাহ! যদি তুমি এই (---) কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে ভালো জান, তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত ও সহজ করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বর্কত দান কর। আর যদি তুমি এই কাজ আমার জন্য আমার দ্বীন, দুনিয়া, জীবন এবং কাজের বিলম্বিত ও অবিলম্বিত পরিণামে মন্দ জান, তাহলে তা আমার নিকট থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকে ওর নিকট থেকে সরিয়ে দাও। আর যেখানেই হোক মঙ্গল আমার জন্য বাস্তবায়িত কর, অতঃপর তাতে আমার মনকে পরিতুষ্ট করে দাও।

প্রথমে **هذا الأمر** 'হা-যাল আমরা' এর স্থলে বা পরে কাজের নাম নিতে হবে অথবা মনে মনে সেই জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করতে হবে।

মহানবী ﷺ এই দুআ সাহাবীগণকে শিখাতেন, যেমন কুরআনের সূরা শিখাতেন। আর এখান থেকেই ছোট-বড় সকল কাজেই ইস্তিখারার গুরুত্ব প্রকাশ পায়।

সে ব্যক্তি কর্মে কোনদিন লাঞ্ছিত হয় না যে আল্লাহর নিকট তাতে মঙ্গল প্রার্থনা করে, অভিজ্ঞদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করে এবং ভালো-মন্দ বিচার করার পর কর্ম করে। *(বুঃ, আদাঃ, তিঃ, আঃ ৩/৩৪৪)*

জ্ঞাতব্য যে, ইস্তিখারার পূর্বে কাজের ভালো-মন্দের কোন একটা দিকের প্রতি অধিক প্রবণতা থাকলে চলবে না। বরং এই প্রবণতা আল্লাহর তরফ থেকে সৃষ্টি হবে ইস্তিখারার পরেই। আর তা একবার করলেই হবে। ৭ বার করার হাদীস সহীহ নয়। *(ইবনুস সুন্নী ৫৯৮নং-এর টীকা দ্রঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, সুনানে রাতেবাহ অথবা তাহিয়্যাতুল মাসজিদ অথবা যে কোন ২ রাকআত সুন্নতের পর রাতের অথবা দিনের (নিষিদ্ধ সময় ছাড়া) যে কোন সময়ে উক্ত দুআ পড়া যায়। উক্ত নামাযের নিয়ম সাধারণ সুন্নত নামাযের মতই।

এ নামাযের প্রত্যেক রাকআতে কোন নির্দিষ্ট পঠনীয় সূরা নেই। যে কোন সূরা পড়লেই চলে।

এই নামায অন্য দ্বারা পড়ানো যায় না। যেমন স্বপ্নযোগে স্পষ্ট কিছু দেখাও জরুরী নয়।

স্বালাতুত তাসবীহ

মহানবী ﷺ থেকে বর্ণিত করা হয়ে থাকে যে, একদা তিনি তাঁর চাচা আব্বাস ﷛-কে বললেন, "হে আব্বাস, হে চাচা! আমি কি আপনাকে দেব না? আমি কি আপনাকে দান করব না? আমি কি বিশেষভাবে আপনাকে একটি জিনিস দান করব না? আমি কি আপনাকে এমন জিনিস শিখিয়ে দেব না, যা আপনার ১০ প্রকার পাপ খন্ডন করে দিতে পারে? যদি আপনি তা করেন তাহলে আল্লাহ আপনার প্রথম ও শেষের, পুরাতন ও নূতন, অনিচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাকৃত, ছোট ও বড়, গুপ্ত ও প্রকাশ্য এই ১০ প্রকার পাপ মাফ করে দেবেন।

সেটা হল এই যে, আপনি ৪ রাকআত নামায পড়বেন। প্রত্যেক রাকআতে আপনি সূরা ফাতিহার পর একটি সূরা পড়বেন। অতঃপর প্রথম রাকআতে সূরা পড়া শেষ হলে আপনি দাঁড়িয়ে থেকেই ১৫ বার বলবেন,

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

সুবহানাল্লাহি অলহামদু লিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার।

এরপর আপনি রুকূ করবেন। রুকূ অবস্থায় (তসবীহর পর) ১০ বার ঐ যিক্র বলবেন। অতঃপর রুকূ থেকে মাথা তুলবেন। (রাব্বানা লাকাল হাম্দ বলার পর) ঐ যিক্র ১০ বার বলবেন। অতঃপর আপনি সিজদায় যাবেন। (সিজদার তসবীহ পড়ে) ঐ যিক্র ১০ বার বলবেন। অতঃপর সিজদা থেকে মাথা তুলে (দুআ বলার পর) ঐ যিক্র ১০ বার বলবেন। তারপর পুনরায় সিজদায় গিয়ে (তসবীহর পর) ঐ যিক্র ১০ বার বলবেন। অতঃপর সিজদা থেকে মাথা তুলে (ইস্তিরাহার বৈঠকে) ঐ যিক্র ১০ বার বলবেন। এই হল প্রত্যেক রাকআতে ৭৫ বার পঠনীয় যিক্র। (৪ রাকআতে সর্বমোট ৩০০ বার।)

এইভাবে আপনি প্রত্যেক রাকআতে পাঠ করে ৪ রাকআত নামায পড়েন। পারলে প্রত্যেক দিন ১বার পড়েন। তা না পারলে প্রত্যেক জুমআয় ১বার পড়েন। তা না পারলে প্রত্যেক মাসে ১বার। তা না পারলে প্রত্যেক বছরে ১বার। তাও না পারলে সারা জীবনেও ১বার পড়েন। *(আদাঃ, নাঃ, ইমাঃ, ইখুঃ, হাঃ, ত্বাবঃ, সতাঃ ৬৭৪নং, সজাঃ ৭৯৩৭নং)*

এক বর্ণনায় আছে, "আপনার গোনাহ যদি সমুদ্রের ফেনা বা জমাট বাঁধা বালির মত অগণিত হয় তবুও আল্লাহ আপনার জন্য সমস্তকে ক্ষমা করে দেবেন।" *(তিঃ, ইমাঃ, দারাঃ, বাঃ, ত্বাবঃ, সতাঃ ৬৭৫নং)*

প্রকাশ যে, তাশাহহুদের বৈঠকে তসবীহ তাশাহহুদ পড়ার আগে পড়তে হবে। *(নানঃ ২৩৮পৃঃ)*

এই নামাযের সময়

আব্দুল্লাহ বিন আম্র অথবা আব্দুল্লাহ বিন উমার অথবা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস বলেন, একদা নবী ﷺ আমাকে বললেন, "তুমি আগামী কাল আমার নিকট এস। আমি তোমাকে কিছু দান করব, কিছু প্রতিদান দেব, কিছু দেব।" আমি ভাবলাম, হয়তো তিনি আমাকে

কোন জিনিস উপহার দেবেন। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, “দিন (সূর্য) ঢলে গেলে (যোহরের পূর্বে) ওঠ এবং ৪ রাকআত নামায পড়।” *(আমাঃ ৪/১২৭, তুআঃ ২/৪৯১)*

অতঃপর আব্দুল্লাহ পূর্বোক্ত হাদীসের মত উল্লেখ করলেন। পরিশেষে মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন, “যদি তুমি পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড় পাপীও হও তবুও ঐ নামাযের অসীলায় আল্লাহ তোমাকে মাফ করে দেবেন।”

আব্দুল্লাহ বলেন, আমি যদি ঐ সময় ঐ নামায পড়তে না পারি? তিনি বললেন, “রাতে দিনে যে কোন সময়ে পড়।” *(আদাঃ ১২৯৮-নং)*

প্রকাশ থাকে যে, এই নামাযে ভুল হলে সহু সিজদায় ঐ যিক্র পাঠ করতে হবে না। *(আমাঃ ৪/১২৬, তুআঃ ২/৪৯০)*

জ্ঞাতব্য যে জামাআত করে এ নামায পড়া বিধেয় নয়। আরো সতর্কতার বিষয় যে, এ নামাযকে অনেকে বিদআত বলে উল্লেখ করেছেন। শায়খ ইবনে উষাইমীন বলেন,

‘দুর্বল হাদীসকে ভিত্তি করে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার একটি উদাহরণ ‘স্বালাতুত তাসবীহ।’ এ নামায কিছু উলামার নিকট মুস্তাহাব। এর পদ্ধতি হল এই যে, চার রাকআত নামাযে নামাযী সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং তারপর ১৫ বার তাসবীহ পড়বে। অনরূপ রুকূ ও সিজদায় (১০ বার) তাসবীহ পাঠ করবে---। এইভাবে শেষ রাকআত পর্যন্ত যে নিয়ম-পদ্ধতি আছে, যার বর্ণনা আমি সঠিকভাবে দিতে পারছি না। কারণ, উক্ত নামাযের হাদীসকে শরীয়তের হাদীস বলে আমার বিশ্বাস হয় না।

অন্যান্য উলামাগণ মনে করেন যে, ‘স্বালাতুত তাসবীহ’ নামায অপছন্দনীয় বিদআত এবং তার হাদীস সহীহ নয়। এঁদের মধ্যে একজন হলেন ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ)। তিনি বলেছেন, ‘নবী ﷺ থেকে এ হাদীস সহীহ সূত্রে বর্ণিত নয়।’

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, ‘উক্ত নামাযের হাদীসটি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা।’

প্রকৃতপ্রস্তাবে যে ব্যক্তি এ নামাযটি (হাদীসটি) নিয়ে বিচার-বিবেচনা করবে, সে দেখতে পাবে যে, এতে রয়েছে একাধিক উদ্ভট্টি। এমনকি নামাযটি বিধিবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারেও উদ্ভট্টি লক্ষণীয়। কেননা, ইবাদত হয় হৃদয়ের জন্য উপকারী হবে। আর তা হলে ঐ ইবাদত সর্বকাল ও সর্বস্থানের জন্য বিধিবদ্ধ হবে। নচেৎ তা উপকারী হবে না। আর তা হলে তা বিধিবদ্ধই নয়। বলা বাহুল্য, উক্ত হাদীসে যে নামাযের কথা বলা হয়েছে যে, তা প্রত্যেক দিন অথবা প্রত্যেক সপ্তাহ অথবা প্রত্যেক মাস অথবা প্রত্যেক বছরে একবার। আর তা না পারলে জীবনেও একবার পড়বে -এমন কথার নযীর শরীয়তে মিলে না। সুতরাং উক্ত হাদীসটি তার সনদ ও মতন (বর্ণনা-সূত্র ও বক্তব্য) উভয় দিক দিয়েই যে উদ্ভট, তা স্পষ্ট হয়। আর যিনি হাদীসটিকে মিথ্যা বলেছেন -যেমন শায়খুল ইসলাম বলেছেন -তিনি ঠিকই বলেছেন। এ জন্য শায়খুল ইসলাম আরো বলেছেন, ‘ইমামগণের কেউই এই নামাযকে মুস্তাহাব মনে করেননি।’

এখানে ‘স্বালাতুত তাসবীহ’ দিয়ে উদাহরণ দেওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, নারী-পুরুষ

অনেকেই এ নিয়ে প্রশ্ন করে থাকে। যাতে আমার ভয় হয় যে, এই নামাযের বিদআতটি বিধেয় (শরয়ী) বিষয়ে পরিণত হয়ে যাবে। আর যদিও কিছু মানুষের নিকট ভারী, তবুও আমি এই নামাযকে বিদআত এই কারণে বলছি যে, আমরা বিশ্বাস করি, মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে কোন ইবাদতের বর্ণনা কিতাব অথবা তাঁর রসূলের (সহীহ) সুন্নায় না থাকলে তা বিদআত।' *(লেখক কর্তৃক অনূদিত উলামার মতানৈক্য ২৪-২৫পৃঃ)*

পক্ষান্তরে ইবনে হাজার, শায়খ আহমাদ শাকের ও আল্লামা মুবারকপুরী প্রমুখ উক্ত হাদীসকে হাসান বলেন। ইমাম হাকেম ও যাহাবীও হাদীসটিকে শক্তিশালী বলে মন্তব্য করেন। খতীব বাগদাদী, ইমাম নওবী, ইবনে স্বালাহ এবং মুহাদ্দেস আল্লামা আলবানী (রঃ) প্রমুখ উলামাগণ উক্ত নামাযের হাদীসকে সহীহ বলেন। *(দ্রঃ মিঃ ১৩২৮-নং, ১/৪১৯, ১নং টীকা)* অতএব আল্লাহই ভালো জানেন।

স্বালাতুল হা-জাহ

স্বালাতুল হা-জাহ বা প্রয়োজন পূরণের নামায অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ কিছু চাইতে ২ রাকআত এই নফল নামায বিধেয়। মহানবী ﷺ যখন কোন কঠিন বিপদে বা সমস্যায় পড়তেন, তখন নামায পড়তেন। *(আঃ, আদাঃ ১৩১৯, নাঃ, মিঃ ১৩২৫নং)* আর মহান আল্লাহ বলেন,

(يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহর কাছে) সাহায্য প্রার্থনা কর। *(কুঃ ২/৪৫, ১৫৩)*

এক অন্ধ ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আপনি আল্লাহর নিকট দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করেন।' তিনি বললেন, "যদি তুমি চাও তোমার জন্য দুআ করব। নচেৎ যদি চাও ধৈর্য ধর এবং সেটাই তোমার জন্য শ্রেয়।" লোকটি বলল, 'বরং আপনি দুআ করুন।'

সুতরাং তিনি তাকে ওযু করতে বললেন এবং ভালোরূপে ওযু করে দু' রাকআত নামায পড়ে এই দুআ করতে আদেশ দিলেনঃ-

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। তোমার নবী, দয়ার নবীর সাথে তোমার অভিমুখ হচ্ছি। হে মুহাম্মদ! আমি আপনার সাথে আমার প্রতিপালকের প্রতি আমার এই প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে অভিমুখী হয়েছি। হে আল্লাহ! আমার ব্যাপারে তুমি এঁর সুপারিশ গ্রহণ কর এবং এঁর ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।'

বর্ণনাকারী বলেন যে, অতঃপর ঐ ব্যক্তি ঐরূপ করলে সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। *(তিঃ, নাঃ, ইমাঃ, ইখুঃ, হাঃ, সতাঃ ৬৭৮-নং)*

প্রকাশ থাকে যে, অভাব মোচনের নামায ও লম্বা দুআর হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। *(তিঃ ৪৭৯, ইমাঃ, মিঃ ১৩২৭নং, টীকা দ্রঃ)*

স্বালাতুত তাওবাহ

স্বালাতুত তাওবাহ বা তওবা করার সময় বিশেষ ২ অথবা রাকআত নামায পড়া বিধেয়। মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি কোন গোনাহ করে ফেলে অতঃপর উঠে ওযূ করে ২ রাকআত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ মাফ করে দেন।” অতঃপর মহানবী ﷺ এই আয়াত তেলাঅত করেনঃ-

(وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ، وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ الله، وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ، أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا)

অর্থাৎ, আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে (পাপ করে) ফেলে অতঃপর সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরণ করে নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; আর আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবে? আর তারা জেনে-শুনে নিজেদের অপরাধের উপর হঠকারিতা করে না। ঐ সকল লোকেদের পুরস্কার হল তাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা এবং সেই বেহেশ্ত্ যার পাদদেশে নদীমালা প্রবাহিত; সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। *(কুঃ ৩/ ১৩৫- ১৩৬) (আদাঃ ১৫২ ১, তিঃ, নাঃ, ইমাঃ, ইহিঃ, ইখুঃ, বাঃ, সতাঃ ৬৭৭নং)*

তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে অতঃপর উঠে ২ রাকআত অথবা ৪ রাকআত ফরয অথবা অফরয (সুন্নত বা নফল) নামায উত্তমরূপে রুকূ ও সিজদা করে পড়ে, অতঃপর সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।” *(ত্বাবঃ)*

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নামায

স্বালাতুল কুসূফ অল-খুসূফ বা চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নামায ৪ রুকূতে ২ রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। এই নামাযের নিয়ম নিম্নরূপ ঃ-

চন্দ্রে অথবা সূর্যে গ্রহণ লাগা শুরু হলে ‘আস্-স্বালা-তু জামেআহ’ বলে আহবান করতে হবে মুসলিমদেরকে।

জামাআতে কাতার বাঁধা হলে ইমাম সাহেব নামায শুরু করবেন। সশব্দে সূরা ফাতিহার পর লম্বা ক্বিরাআত করবেন এবং তারপর রুকূতে যাবেন। লম্বা রুকূ থেকে মাথা তুলে পুনরায় বুকে হাত রেখে (সূরা ফাতিহা পড়ে) আবার পূর্বাপেক্ষা কম লম্বা ক্বিরাআত করবেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার অপেক্ষাকৃত কম লম্বা রুকূ করে বাকী রাকআত সাধারণ নামাযের মত শেষ করে দ্বিতীয় রাকআতেও অনুরূপ ২ বার ক্বিরাআত ও ২ বার রুকূ করে নামায সম্পন্ন করবেন। এ নামাযের সিজদাও হবে খুব লম্বা। প্রথম রাকআতের চেয়ে দ্বিতীয় রাকআত অপেক্ষাকৃত ছোট হবে। মুক্তাদীগণ যে নিয়মে ইমামের অনুসরণ করতে হয়, সেই নিয়মে অনুসরণ করবে। এই নামায এত লম্বা হওয়া উচিত যে, যেন নামায শেষ হয়ে দেখা

যায়, সূর্য বা চন্দ্রের গ্রহণ ছেড়ে গেছে।

অনুরূপভাবে নামায শেষ করে দাঁড়িয়ে মহানবী ﷺ খুতবা দিয়েছিলেন। হাম্দ ও সানার পর বলেছিলেন, "সূর্য ও চন্দ্র মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার অন্যতম নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের জন্য উভয়ে গ্রহণ লাগে না। অতএব তাতে গ্রহণ লাগতে দেখলে তোমরা আতঙ্কিত হয়ে নামাযে মগ্ন হও।" *(বুঃ ১০৪৭নং, মুঃ)*

নামাযের সাথে সাথে এই সময় দুআ, তকবীর, ইস্তিগফার ও সদকাহ করা মুস্তাহাব। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "সূর্য ও চন্দ্র মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার অন্যতম বড় নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের জন্য উভয়ে গ্রহণ লাগে না। অতএব তাতে গ্রহণ লাগতে দেখলে তোমরা আল্লাহর কাছে দুআ কর, তকবীর পড়, সদকাহ কর এবং নামায পড়।" *(বুঃ ১০৪৪নং, মুঃ, মিঃ ১৪৮৩নং)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা আতঙ্কিত হয়ে আল্লাহর যিক্র, দুআ ও ইস্তিগফারে মগ্ন হও।" *(ঐ, মিঃ ১৪৮৪নং)*

এই সময় তিনি ক্রীতদাস মুক্ত করতে *(বুঃ ১০৫৪নং)* এবং কবরের আযাব থেকে পানাহ চাইতেও আদেশ করেছেন। *(বুঃ ১০৫০নং)*

উল্লেখ্য যে, কারো যদি দুই রুকুর একটিও ছুটে যায়, তাহলে রাকআত গণ্য করবে না। কারণ, একটি রুকূ ছুটে গেলে রাকআত হবে না। ইমামের সালাম ফিরার পর ২টি রুকূ বিশিষ্ট ১ রাকআত নামায কাযা পড়তে হবে। *(ফিক্বঃ ১/৩৫০, মবঃ ১৩/৯৮, ২৩/৯৩, মুমুত্বাসাঃ ১২৯-১৩০পৃঃ)*

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। কিন্তু এর তুলনায় যে নামাযের গুরুত্ব বেশী সেই নামাযের সময়ে এই নামাযের সময় হলে অধিক গুরুত্বপূর্ণ নামাযই পড়তে হবে। যেমন, জুমআহ বা ঈদের সময় সূর্যগ্রহণ শুরু হলে, অথবা তারাবীহর সময় চন্দ্রগ্রহণ শুরু হলে গ্রহণের নামাযের উপর ঐ সকল নামায প্রাধান্য পাবে।

নিষিদ্ধ সময়ের মধ্যে; যেমন ফজর ও আসরের পর গ্রহণ লাগলেও ঐ নামায পড়া যায়। ফরয নামাযের সময় এসে গেলে ঐ নামায হাল্কা করে পড়তে হবে। নামাযের পরও গ্রহণ বাকী থাকলে দ্বিতীয়বার ঐ নামায পড়া বিধেয় নয়।

যেমন গ্রহণ প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত কেবল পঞ্জিকার হিসাবের উপর নির্ভর করে ঐ নামায পড়া বিধেয় নয়। অনুরূপ বিধেয় নয় গ্রহণ দৃশ্য না হলে।

ভূমিকম্প, ঝড়, নিরবচ্ছিন্ন বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্‌গিরণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ও গ্রহণের মত নামায পড়ার কথা হযরত আলী, ইবনে আব্বাস ও হুযাইফা সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত আছে। *(মুমঃ ৫/২৫৫)*

প্রকাশ থাকে যে, সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের সময় গর্ভবতীকে এ করতে নেই, সে করতে নেই, শুয়ে থাকতে হয় বা তার এই করলে সেই হয় প্রভৃতি কথা শরীয়তে নেই। সুতরাং বিজ্ঞান যদি তা সমর্থন না করে তাহলে তা অমূলক ধারণাপ্রসূত কথা। পরন্তু শরীয়তে আছে মনে করে এ কথা বলা ও মানা হলে তা বিদআত। অবশ্য খালি চোখে গ্রহণ দেখলে চোখ খারাপ হতে পারে, সে কথা সত্য।

স্বালাতুল ইস্তিসকা

স্বালাতুল ইস্তিসকা বা বৃষ্টি প্রার্থনার নামায অনাবৃষ্টির সময় মহান প্রতিপালকের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে পড়া সুন্নত।

বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার কারণ, মানুষের পাপ ও বিশেষ করে যাকাত বন্ধ করে দেওয়া। মহানবী ﷺ বলেন, "হে মুহাজিরদল! পাঁচটি কর্ম এমন রয়েছে যাতে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়লে (উপযুক্ত শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে)। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, যাতে তোমরা তা প্রত্যক্ষ না কর।

যখনই কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক হবে তখনই সেই জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন মহামারী ব্যাপক হবে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না।

যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে।

যে জাতিই তার মালের যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে সে জাতির জন্যই আকাশ হতে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যদি অন্যান্য প্রাণীকুল না থাকত তাহলে তাদের জন্য আদৌ বৃষ্টি হত না।

যে জাতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে সে জাতির উপরেই তাদের বিজাতীয় শত্রুদলকে ক্ষমতাসীন করা হবে; যারা তাদের মালিকানা-ভুক্ত বহু ধন-সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করবে।

আর যে জাতির শাসকগোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর কিতাব (বিধান) অনুযায়ী দেশ শাসন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব অবস্থায়ী রাখবেন।" *(বাইহাকী, ইবনে মাজাহ ৪০১৯নং, সহীহ তারগীব ৭৫৯নং)*

হযরত ইবনে আব্বাস رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি কি কি?' তিনি বললেন, "যে জাতিই (আল্লাহর) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে সেই জাতির উপরেই তাদের শত্রুকে ক্ষমতাসীন করা হবে। যে জাতিই আল্লাহর অবতীর্ণকৃত সংবিধান ছাড়া অন্য দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে সেই জাতির মাঝেই দরিদ্রতা ব্যাপক হবে। যে জাতির মাঝে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ পাবে সে জাতির মাঝেই মৃত্যু ব্যাপক হবে। যে জাতিই যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে সেই জাতির জন্যই বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে জাতি দাঁড়ি-মারা শুরু করবে সে জাতি ফসল থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবে।" *(ত্বাবঃ, সতাঃ ৭৬০নং)*

বলা বাহুল্য, বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য তওবা ও ইস্তিগফার জরুরী। মহান আল্লাহ হযরত নূহ عليه السلام-এর কথা উল্লেখ করে বলেন,

(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَّيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً)

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা

(ইস্তিগফার) কর। তিনি তো মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত করবেন। তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন। আর তোমাদের জন্য বাগান তৈরী করে দেবেন এবং প্রবাহিত করে দেবেন নদী-নালা। *(কুঃ ৭১/১০-১২)*

একান্ত বিনয়ের সাথে, সাধারণ আটপৌরে বা কাজের (পুরাতন) কাপড় পরে, ধীর ও শান্তভাবে কাকুতি-মিনতির সাথে সকালে ঈদগাহে বের হয়ে এই নামায পড়তে হয়।

এই নামায ঈদের নামাযের মতই আযান ও ইকামত ছাড়া ২ রাকআত। প্রত্যেক রাকআতে সশব্দে সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা পড়া যায়। নামাযের আগে অথবা পরে হবে খুতবা। খুতবায় ইমাম সাহেব বেশী বেশী ইস্তিগফার ও দুআ করবেন। মুক্তাদীগণ সে দুআয় 'আমীন' বলবে। এই দুআয় বিশেষ করে ইমাম (এবং সকলে) খুব বেশী হাত তুলবেন। মাথা বরাবর হাত তুলে দুআ করবেন। *(আদাঃ ১১৬৮, ইহিঃ, মিঃ ১৫০৪নং)* এমন কি চাদর গায়ে থাকলে তাতে বগলের সাদা অংশ দেখা যাবে। *(বুঃ ১০৩১, মুঃ ৮৯৫নং)*

বৃষ্টি প্রার্থনার সময় উল্টা হাতে দুআ করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ, সাধারণ প্রার্থনার করার সময় হাতের তেলো বা ভিতর দিকটা হবে আকাশের দিকে এবং বৃষ্টি প্রার্থনার সময় হবে মাটির দিকে; আর হাতের বাহির দিকটা হবে আকাশের দিকে। হযরত আনাস ﷺ বলেন, 'একদা নবী ﷺ বৃষ্টি প্রার্থনা করলে তিনি তাঁর হাতের পিঠের দিকটা আকাশের দিকে তুলে ইঙ্গিত করলেন।' *(মুঃ ৮৯৫-৮৯৬নং)*

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ প্রমুখ উলামাগণ বলেন, কোন কিছু চাওয়া হয় হাতের ভিতরের অংশ দিয়েই, বাইরের অংশ দিয়ে নয়। আসলে আল্লাহর নবী ﷺ হাত দুটিকে মাথার উপরে খুব বেশী উত্তোলন করলে দেখে মনে হয়েছিল যে, তিনি হাতের বাইরের অংশ আকাশের দিকে করেছিলেন। *(আল-ইনসাফ ২/৪৫৮, মুমঃ ৫/২৮৩)*

অতঃপর কিবলামুখ হয়ে চাদর উল্টাবেন; অর্থাৎ, চাদরের ডান দিকটাকে বাম দিকে, বাম দিকটাকে ডান দিকে করে নেবেন এবং উপর দিকটা নিচের দিকে ও নিচের দিকটা উপর দিকে করবেন। মুক্তাদীগণও অনুরূপ করবে। এরপর সকলে পুনরায় (একাকী) দুআ করে বাড়ি ফিরবে।

চাদর উল্টানো এবং দুআর সময় উল্টা হাত করা আসলে এক প্রকার কর্মগত দুআ। অর্থাৎ, হে মওলা! তুমি আমাদের এই চাদর ও হাত উল্টানোর মত আমাদের বর্তমান দুরবস্থাও পাল্টে দাও। আমাদের অনাবৃষ্টির অবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে দাও। *(নানঃ ২৩৪পৃঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, ইস্তিসকার জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন নেই। যে কোন একটি দিন ঠিক করে সেই দিনে নামায পড়া যায়। রোযা রাখা, পশু নেওয়া ইত্যাদির কথাও হাদীসে নেই। *(মুমঃ ৫/২১১-২১২)*

বৃষ্টি প্রার্থনার দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ

জুমআর খুতবায় ইমাম সাহেব হাত তুলে দুআ করবেন এবং মুক্তাদীরাও হাত তুলে 'আমীন-আমীন' বলবে।

একদা মহানবী ﷺ জুমআর খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক মরুবাসী (বেদুঈন) উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! মাল-ধন ধ্বংস হয়ে গেল আর পরিবার পরিজন (খাদ্যের অভাবে) ক্ষুধার্ত থেকে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন।' তখন নবী ﷺ নিজের দুই হাত তুলে দুআ করলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে দুআর জন্য হাত তুলল। ফলে এমন বৃষ্টি শুরু হল যে পরবর্তী জুমআতে উক্ত (বা অন্য এক) ব্যক্তি পুনরায় খাড়া হয়ে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! ঘর-বাড়ি ভেঙে গেল এবং মাল-ধন ডুবে গেল। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দুআ করুন!' মহানবী ﷺ তখন নিজের হাত তুলে পুনরায় বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দুআ করলেন এবং বৃষ্টিও থেমে গেল। *(বুঃ ৯৩২, ৯৩৩, ১০১৩, ১০২৯, মুঃ ৮৯৭নং, নাঃ, আঃ ৩/২৫৬, ২৭১)*

বৃষ্টি প্রার্থনার তৃতীয় পদ্ধতি ঃ

শুরাহবীল বিন সিম্‌ত একদা কা'ব বিন মুর্রাহকে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করতে বললে তিনি বললেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আপনি মুযার (গোত্রের) জন্য বৃষ্টি প্রার্থনা করুন।' তিনি বললেন, "তুমি তো বেশ দুঃসাহসিক! (কেবল) মুযারের জন্য (বৃষ্টি)?" লোকটি বলল, 'আপনি আল্লাহ আযযা অজাল্লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন, তিনি আপনাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহ আযযা অজাল্লার কাছে দুআ করেছেন, তিনি তা কবুল করেছেন।' এ কথা শোনার পর মহানবী ﷺ দুই হাত তুলে বৃষ্টি প্রার্থনার দুআ করলেন এবং এত বৃষ্টি হল যে, তা বন্ধ করার জন্য পুনরায় তিনি দুআ করলেন। *(আঃ, ইমাঃ ১২৬৯নং, বাঃ, ইআশাঃ, হাঃ)*

বৃষ্টি প্রার্থনার চতুর্থ পদ্ধতি ঃ

ইমাম শা'বী কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা উমার رضي الله عنه বৃষ্টি প্রার্থনা করতে বের হয়ে কেবল ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে ফিরে এলেন। লোকেরা বলল, 'আমরা তো আপনাকে বৃষ্টি চাইতে দেখলাম না?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি সেই নক্ষত্রের মাঝে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছি, যাতে বৃষ্টি হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

(اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً)

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) কর। তিনি তো মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত করবেন। *(কুঃ ৭১/১০-১১)*

(اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَاراً وَّيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَ تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ)

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) কর। অতঃপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর; তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদেরকে আরো শক্তি দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে

নিও না। *(কুঃ ১১/৫২) (সুনানু সাঈদ বিন মানসূর, আরাঃ, বাঃ, ইআশাঃ ৮৩৪৩নং)*

বৃষ্টি-প্রার্থনার কতিপয় দুআ

১- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اَللّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَّبَلاَغاً إِلى حِيْنٍ.

উচ্চারণঃ- আলহামদু লিল্লা-হি রাব্বিল আ-লামীন আর রাহমা-নির রাহীম, মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু য়্যাফআলু মা য়্যুরীদ, আল্লা-হুম্মা আন্তাল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত, আন্তাল গানিইয়্যু অনাহনুল ফুক্বারা-', আনযিল আলাইনাল গাইসা অজ্‌আল মা আনযালতা লানা ক্বুউওয়াতাঁউ অ বালা-গান ইলা-হীন।

অর্থঃ- সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর নিমিত্তে। যিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। যিনি অসীম করুণাময়, দয়াবান। বিচার দিবসের অধিপতি। আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন সত্য আরাধ্য নেই। তুমিই অভাবমুক্ত এবং আমরা অভাবগ্রস্ত। আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ কর এবং যা বর্ষণ করেছ তা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত শক্তি ও যথেষ্টতার কারণ বানাও। *(আদাঃ ১১৭৩নং)*

২- اَللّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً مُّغِيْثاً مَّرِيْئاً مَّرِيْعاً نَافِعاً غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাসক্বিনা গাইষাম মুগীষাম মারীআম মারীআ'ন না-ফিআন গাইরা য্বা-র্রিন আ'-জিলান গাইরা আ-জিল।

অর্থ- আল্লাহ গো! আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর, প্রয়োজন পূর্ণকারী স্বাচ্ছন্দ্য ও উর্বরতা আনয়নকারী, লাভদায়ক ও হিতকর, এবং বিলম্বে নয় অবিলম্বে বর্ষণশীল বৃষ্টি। *(আদাঃ ১১৬৯নং)*

৩- اَللّهُمَّ أَغِثْنَا ، اَللّهُمَّ أَغِثْنَا ، اَللّهُمَّ أَغِثْنَا.

উচ্চারণ- আল্লা-হুম্মা আগিষনা, আল্লা-হুম্মা আগিষনা, আল্লা-হুম্মা আগিষনা।

অর্থ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য পানি বর্ষণ কর। *(বুঃ, মুঃ ৮৯৭নং)*

৪- اَللّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মাসক্বি ইবা-দাকা অবাহা-ইমাকা অনশুর রাহমাতাকা অআহয়ি বালাদাকাল মাইয়্যিত।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! তোমার বান্দাদের ও প্রাণীদের উপর পানি বর্ষণ কর এবং তোমার রহমত ছড়িয়ে দাও। আর তোমার মৃত দেশকে জীবিত কর। *(আদাঃ ১১৭৬নং)* (৪)

---

(৪) *প্রকাশ থাকে যে, বৃষ্টি-প্রার্থনার জন্য ব্যাঙের বিয়ে দেওয়া, গোবর-কাদা বা রঙ ছিটাছিটি করে খেল খেলা, কারো চুলো ভেঙ্গে দেওয়া ইত্যাদি প্রথা শির্কী তথা বিজাতীয় প্রথা।*

অতিবৃষ্টি হলে

اَللهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اَللّٰهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَ بُطُوْنِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লাইনা অলা আলাইনা, আল্লা-হুম্মা আলাল আ-কামি অয্যিরা-বি অবুতূনিল আউদিয়াতি অমানা-বিতিশ শাজার।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমাদের আশে-পাশে বর্ষাও, আমাদের উপরে নয়। হে আল্লাহ! পাহাড়, টিলা, উপত্যকা এবং বৃক্ষাদির উদ্গত হওয়ার স্থানে বর্ষাও। *(বুঃ, মুঃ ৮৯৭নং)*

জানাযার নামায সম্পর্কে লেখক কর্তৃক প্রণীত 'জানাযা দর্পণ' দ্রষ্টব্য।

কুরআন তিলাঅতের সিজদাহ

কুরআন মাজীদের সিজদার আয়াত তিলাঅত করলে অথবা শুনলে তকবীর দিয়ে একটি সিজদাহ করা এবং তকবীর দিয়ে মাথা তোলা মুস্তাহাব। এই সিজদার পর কোন তাশাহহুদ বা সালাম নেই। তকবীরের ব্যাপারে মুসলিম বিন য়্যাসার, আবূ কিলাবাহ ও ইবনে সীরীন কর্তৃক আষার বর্ণিত হয়েছে। *(ইআশাঃ, আরাঃ, বাঃ, তামিঃ ২৬৯পৃঃ)*

এই সিজদাহ করার বড় ফযীলত ও মাহাত্ম্য রয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন, "আদম সন্তান যখন সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদাহ করে, তখন শয়তান দূরে সরে গিয়ে কেঁদে কেঁদে বলে, 'হায় ধ্বংস আমার! ও সিজদাহ করতে আদেশ পেয়ে সিজদাহ করে, ফলে ওর জন্য রয়েছে জান্নাত। আর আমি সিজদার আদেশ পেয়ে তা অমান্য করেছি, ফলে আমার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।" *(আঃ, মুঃ ৮৯৫নং, ইমাঃ)*

তিলাঅতের সিজদা কুরআন তেলাঅতকারী ও শ্রোতার জন্য সুন্নত। একদা হযরত উমার ؓ জুমআর দিন মিম্বরের উপরে সূরা নাহল পাঠ করলেন। সিজদার আয়াত এলে তিনি মিম্বর থেকে নেমে সিজদাহ করলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে সিজদাহ করল। অতঃপর পরবর্তী জুমআতেও তিনি ঐ সূরা পাঠ করলেন। যখন সিজদার আয়াত এল, তখন তিনি বললেন, 'হে লোক সকল! আমরা (তিলাঅতের সিজদাহ করতে) আদিষ্ট নই। সুতরাং যে সিজদাহ করবে, সে ঠিক করবে। আর যে করবে না, তার কোন গোনাহ হবে না।'

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, 'আল্লাহ আমাদের উপর (তিলাঅতের) সিজদাহ ফরয করেন নি। আমরা চাইলে তা করতে পারি।' *(বুঃ ১০৭৭নং)*

যায়দ বিন সাবেত ؓ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে সূরা নাজ্ম পাঠ করলাম। তিনি সিজদাহ করলেন না।' *(বুঃ ১০৭৩, মুঃ, মিঃ ১০২৬নং)*

সিজদার স্থানসমূহ

কুরআন মাজীদে মোট ১৫ জায়গায় সিজদাহ করা সুন্নত। তা যথাক্রমে নিম্নরূপঃ-

১। সূরা আ'রাফ ২০৬ নং আয়াত।
২। সূরা রা'দ ১৫নং আয়াত।
৩। সূরা নাহল ৫০নং আয়াত।
৪। সূরা ইসরা' (বানী ইসরাঈল) ১০৯নং আয়াত।
৫। সূরা মারয়্যাম ৫৮নং আয়াত।
৬। সূরা হাজ্জ ১৮নং আয়াত।
৭। সূরা হাজ্জ ৭৭নং আয়াত।
৮। সূরা ফুরক্বান ৬০নং আয়াত।
৯। সূরা নাম্‌ল ২৬নং আয়াত।
১০। সূরা সাজদাহ ১৫নং আয়াত।
১১। সূরা স্বা-দ ২৪নং আয়াত।
১২। সূরা ফুস্‌স্বিলাত (হা-মিম সাজদাহ) ৩৮নং আয়াত।
১৩। সূরা নাজম ৬২নং আয়াত।
১৪। সূরা ইনশিক্বাক্ব ২১নং আয়াত।
১৫। সূরা আলাক্ব ১৯নং আয়াত।

সিজদার জন্য ওযূ জরুরী কি?

তিলাঅতের সিজদার জন্য ওযূ শর্ত নয়। শরমগাহ ঢাকা থাকলে কেবলামুখে এই সিজদাহ করা যায়। যেহেতু ওযূ শর্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। *(নাআঃ, মুমঃ ৪/১২৬, ফিসুঃ আরবী ১/১৯৬)*

তিলাঅতের সিজদার দুআ

১- سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

উচ্চারণ- সাজাদা অজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু অশাক্ক্বা সামআহু অবাস্বারাহু বিহাউলিহী অক্বুউওয়াতিহ।

অর্থ- আমার মুখমন্ডল তাঁর জন্য সিজদাবনত হল যিনি ওকে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতায় ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্‌গত করেছেন। *(আদাঃ, সঃতিঃ৪৭৪নং, আহমদ ৬/৩০)*

আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে, এই দুআ সিজদায় একাধিকবার পাঠ করতে হয়।

اَللّٰهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْراً ، وَّضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْراً ، وَّاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ -২
ذُخْراً ، وَّتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُوْدَ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাকতুব লী বিহা ইন্দাকা আজরা, অযা’ আন্নী বিহা বিযরা, অজ্‌আলহা লী ইন্দাকা যুখরা, অতাক্বাব্বালহা মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতাহা মিন আবদিকা দাঊদ।

অর্থ- হে আল্লাহ! এর (সিজদার) বিনিময়ে তোমার নিকট আমার জন্য পুণ্য লিপিবদ্ধ কর, পাপ মোচন কর, তোমার নিকট এ আমার জন্য জমা রাখ এবং এ আমার নিকট হতে গ্রহণ কর যেমন তুমি তোমার বান্দা দাউদ (আঃ) থেকে গ্রহণ করেছ। *(সঃ তিঃ ৮৭নং, হাকেম ১/২ ১৯, ইবনে মাজাহ ১০৫৩নং)*

নামাযের ভিতরে তিলাঅতের সিজদাহ

একাকী বা ইমাম সকলের জন্য নামাযে সিজদার আয়াত তেলাঅত করা বৈধ এবং সকলের জন্য সিজদাহ করা সুন্নত। অবশ্য সির্রী নামাযে ইমামের জন্য সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা না করাই উত্তম। *(তামিঃ ১/২৭০পৃঃ)* কারণ, এতে মুক্তাদীদের মাঝে গোলমাল সৃষ্টি হয়। *(ফইঃ ১/৩২৯, মবঃ ৫/৩০০)* মুক্তাদীর জন্য ইমামের ইক্তিদায় ঐ সিজদাহ করা জরুরী। যেমন, সিজদার আয়াত তিলাঅত করতে শুনলেও যদি ইমাম সিজদাহ না করেন, তাহলে মুক্তাদী সিজদাহ করতে পারে না।

প্রকাশ থাকে যে, একই সঙ্গে কয়েকটি সিজদার আয়াত পড়লে সবশেষে একটি সিজদাই যথেষ্ট। যেমন হিফ্য করার সময় সিজদার আয়াত বারবার পড়লেও সবশেষে একটি সিজদাহ করে নেওয়া যথেষ্ট।

সিজদার আয়াত পাঠ বা শ্রবণ করার পর সিজদাহ করার সুযোগ না হলে সামান্য ক্ষণ পরে সিজদাহ কাযা করে নেওয়া যায়। দেরী লম্বা হয়ে গেলে কাযা করা যাবে না। *(ফিসুঃ আরবী ১/ ১৯৮)*

প্রকাশ থাকে যে, এই সিজদার পর হাত তুলে মুনাজাত করা বিদআত। *(মুবিঃ ২৮০পৃঃ)*

শুক্‌রের সিজদাহ

মহান প্রতিপালক আল্লাহ আমাদেরকে কত নেয়ামত দান করেছেন, তা গুনে শেষ করা যায় না। এই সকল নেয়ামতের শুক্‌র আদায় করা বান্দার জন্য ফরয। শুক্‌র আদায়ের নিয়ম হল, প্রথমতঃ অন্তরে এই স্বীকার করা যে, এই নেয়ামত আল্লাহর তরফ থেকে আগত। দ্বিতীয়তঃ মুখে তার শুক্‌র আদায় করা। তৃতীয়তঃ কাজেও শুক্‌র প্রকাশ করা। অর্থাৎ, সেই নেয়ামত তাঁরই সন্তুষ্টির পথে খরচ করা। অন্যথা নাশুক্‌রী বা কৃতঘ্নতা হবে।

হঠাৎ কোন সুসংবাদ, সুখের খবর বা সম্পদ লাভের খবর পেলে অথবা বড় বিপদ দূর

হওয়ার সংবাদ শুনলে মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে শুক্‌রানার (একটি) সিজদাহ মুস্তাহাব।

মহানবী ﷺ কোন আনন্দদায়ক সংবাদ শুনলে অথবা শুভ সংবাদ পেলে আল্লাহ তাআলাকে শুকরিয়া জানানোর জন্য সিজদায় পতিত হতেন। *(আদাঃ, তিঃ, মিঃ ১৪৯৪নং)*

হযরত আলী ﷺ যখন মহানবী ﷺ-কে হামাযান গোত্রের লোকেদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কথা লিখলেন, তখন তিনি সিজদাহ করলেন এবং উঠে বললেন, "হামাযানের উপর সালাম, হামাযানের উপর সালাম।" *(বাঃ)*

আব্দুর রহমান বিন আওফ ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বের হয়ে এক খেজুর বাগানে প্রবেশ করে সিজদায় গেলেন। তিনি এত লম্বা সময় ধরে সিজদায় থাকলেন যে, আমি আশঙ্কা করলাম, হয়তো বা আল্লাহ তাঁর প্রাণ হরণ করে নিয়েছেন। আমি নিকটে উপস্থিত হয়ে দেখতে গেলাম। তিনি মাথা তুলে বললেন, "আব্দুর রহমান! কি ব্যাপার তোমার?" আমি ঘটনা খুলে বললে তিনি বললেন, "জিবরীল ﷺ আমাকে বললেন, আমি কি আপনাকে সুসংবাদ দেব না? আল্লাহ আয্‌যা জাল্ল্‌ আপনাকে বলেন, 'যে ব্যক্তি তোমার প্রতি দরূদ পড়বে, আমি তার প্রতি রহমত বর্ষণ করব। আর যে ব্যক্তি তোমার প্রতি সালাম জানাবে, আমি তাকে শান্তি দান করব।' এ খবর শুনে আমি আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে সিজদাহ করলাম।" *(আঃ, হাঃ)*

তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ এলে কা'ব বিন মালেক সিজদাহ করেছিলেন। *(বুঃ)*

শুকরানার সিজদার জন্য ওযূ জরুরী নয়। জরুরী নয় তকবীরও।

সহু সিজদাহ

সহু সিজদা বা সিজদা-এ সাহ্‌ও (ভুলের সিজদাহ) ফরয বা নফল নামাযে ভুল করে কোন ওয়াজেব অংশ ত্যাগ করলে ঐ ভুলের খেসারত স্বরূপ এবং ভুল আনয়নকারী শয়তানের প্রতি চাবুক স্বরূপ দুটি সিজদাহ করতে হয়। ভুল অনুপাতে সিজদার আগে বা পরে হাদীসে বর্ণিত নিয়মানুসারে সিজদাহ করা জরুরী।

নামায কম পড়ে সালাম ফিরে দিলে ঃ

ভুলবশতঃ ১ বা ২ রাকআত নামায কম পড়ে সালাম ফিরে থাকলে যদি অল্প (৫/৭ মিনিট) সময়ের মধ্যে মনে পড়ে, তাহলে (মাঝে কথা বলে থাকলেও) নামাযী বাকী নামায সম্পন্ন করে সালাম ফিরার পর তকবীর ও তসবীহ সহ দুটি সিজদাহ করে পুনরায় সালাম ফিরবে।

এ ব্যাপারে যুল-য়্যাদাইনের হাদীস প্রসিদ্ধ। একদা মহানবী ﷺ যোহর কিংবা আসরের নামায ভুল করে ২ রাকআত পড়ে সালাম ফিরে উঠে অন্য জায়গায় বসলেন। লোকেরা ভাবল, নামায সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। আবূ বাক্‌র, উমার কেউই ভয়ে তাঁর সাথে কথা বললেন

না। অবশেষে যুল-য়্যাদাইন বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন, নাকি নামায কম হয়ে গেল?' তিনি বললেন, "আমি ভুলিও নি, নামায কমও হয় নি।" অতঃপর সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, "যুল-য়্যাদাইন যা বলছে তা কি ঠিক?" সকলে বলল, 'জী হ্যাঁ।' সুতরাং তিনি অগ্রসর হয়ে বাকী নামায পূরণ করে সালাম ফিরলেন। অতঃপর তকবীর দিয়ে অনুরূপ অথবা তার চেয়ে লম্বা সিজদা দিলেন। তারপর আবার তকবীর দিয়ে মাথা তুললেন। পুনরায় তকবীর দিয়ে অনুরূপ অথবা তার চেয়ে লম্বা আরো একটি সিজদাহ করলেন। তারপর আবার তকবীর দিয়ে মাথা তুলে সালাম ফিরলেন। *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১০১৭নং)*

অবশ্য দীর্ঘ সময়ের পর মনে পড়লে নূতন করে পুরো নামাযটাই পুনরায় ফিরিয়ে পড়তে হবে।

নামাযের কোন রুক্ন (যেমন কিয়াম, রুকূ, সিজদাহ প্রভৃতি) ভুলে ত্যাগ করলে নামাযই হবে না। যে রাকআতের রুক্ন ত্যক্ত হবে, সে রাকআত বাতিল গণ্য হবে। ঐ ভুল নামাযের মধ্যে প্রথম রাকআতের রুক্ন ছেড়ে দ্বিতীয় রাকআতে মনে পড়লে, দ্বিতীয়কে প্রথম রাকআত গণ্য করে বাকী নামায সম্পন্ন করবে নামাযী। অতঃপর সালাম ফিরার পর দুই সিজদা করে পুনরায় সালাম ফিরবে। *(মবঃ ২৭/৩৯)* পক্ষান্তরে নামাযের সালাম ফিরার পর মনে পড়লে এক রাকআত নামায পড়ে ঐরূপ সিজদাহ করবে।

নামায বেশী পড়লে ঃ

নামাযে ভুলবশতঃ ১ রাকআত বা ১টি সিজদাহ বা বৈঠক অতিরিক্ত হয়ে গেলে সালাম ফিরার পর ২টি সহু সিজদা করে পুনরায় সালাম ফিরবে নামাযী।

একদা মহানবী ﷺ ৫ রাকআত নামায পড়ে সালাম ফিরলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, নামায কি বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন, "ব্যাপার কি?" লোকেরা বলল, 'আপনি ৫ রাকআত নামায পড়লেন।' এ কথা শুনে তিনি দুটি সিজদাহ করলেন। (অতঃপর সালাম ফিরলেন।) *(বুঃ, মুঃ, সুআঃ, মিঃ ১০১৬নং)*

রাকআতে সন্দেহ হলে ঃ

নামায পড়তে পড়তে কয় রাকআত হল -এই সন্দেহ হলে যেদিকের সঠিকতার ধারণা অধিক প্রবল হবে, তার উপর ভিত্তি করে নামায শেষ করে সালাম ফিরার পর ২টি সিজদাহ করে পুনরায় সালাম ফিরবে।

যদি দুই দিকের মধ্যে কোন দিকেরই সঠিকতার ধারণা প্রবল না হয়, তাহলে দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর আমল করবে নামাযী। অর্থাৎ, কম সংখ্যার উপর ভিত্তি করলে নামায অসম্পূর্ণ হওয়ার আশংকা থাকবে না। সুতরাং সেই প্রত্যয়ের সাথে বাকী নামায সম্পন্ন করে সালাম ফিরার পূর্বে দুটি সিজদা-এ সাহ্ও করে সালাম ফিরবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যখন তোমাদের কেউ নামাযে সন্দেহ করে এবং বুঝতে পারে না যে, সে কয় রাকআত পড়েছে; ৪ রাকআত, না ৩ রাকআত? তখন তার উচিত, সন্দেহ দূর করে দিয়ে যা একীন (দৃঢ় প্রত্যয়) হয় তার উপর ভিত্তি করা। অতঃপর সালাম ফিরার পূর্বে দুটি

সিজদাহ করা। এতে সে যদি ৫ রাকআত পড়ে থাকে তাহলে ঐ সিজদাহ মিলে তার নামায জোড় হয়ে যাবে। অন্যথা যদি পূর্ণ ৪ রাকআত পড়ে থাকে, তাহলে ঐ সিজদাহ শয়তানের জন্য লাঞ্ছনাকর হবে।” *(আঃ, মুঃ, মিঃ ১০১৫নং)*

প্রথম তাশাহহুদ ত্যাগ করলে ঃ

নামাযী নামাযের প্রথম তাশাহহুদের বৈঠকে বসতে ভুলে গেলে যদি অর্ধেক উঠে খাড়া না হয়ে যায়, (হাঁটুদ্বয় মাটি ত্যাগ না করে) তাহলে মনে পড়লে পুনরায় বসে ‘আত্-তাহিয়্যাত’ পড়ে নেবে। আর এতে সাহ্ও সিজদার প্রয়োজন নেই। অর্ধেকের বেশী উঠে খাড়া হয়ে গেলে এবং সম্পূর্ণ খাড়া না হয়ে মনে পড়লে পুনরায় বসে ‘আত্-তাহিয়্যাত’ পড়ে নেবে এবং শেষে সহু সিজদাহ করবে। কিন্তু যদি সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে যায়, তাহলে আর পুনরায় না বসে বাকী নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরার পূর্বে দুই সিজদা করে সালাম ফিরবে।

অবৈধ জানার পরেও সম্পূর্ণ খাড়া হওয়ার পর পুনরায় বসে তাশাহহুদ পড়লে নামায বাতিল নয়। কিন্তু ক্বিরাআত শুরু করার পর বসলে নামায বাতিল গণ্য হবে। *(মুমঃ ৩/৫১১-৫১৩)*

একদা মহানবী ﷺ নামাযে প্রথম বৈঠকে না বসে উঠে পড়েন। লোকেরা তসবীহ্ বললেও তিনি না বসে নামায শেষে দুই সিজদাহ করে সালাম ফিরেন। *(বুঃ, মুঃ, সুআঃ, মিঃ ১০১৮-নং)*

তিনি বলেন, “ইমাম ভুলে গিয়ে (তাশাহহুদ না পড়ে) সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে গেলে তাকে ২টি সহু সিজদাহ করতে হবে। অবশ্য সম্পূর্ণ খাড়া না হলে সহু সিজদাহ করতে হবে না।” *(ত্বাবঃ সজাঃ ৬২৩নং)*

প্রকাশ যে, ৪ রাকআত পড়ে ৫ রাকআতের জন্য ভুলে উঠে সম্পূর্ণ খাড়া হয়ে গেলেও স্মরণ হওয়া বা করানোর সাথে সাথে নামাযী বসে যাবে। কিন্তু প্রথম বৈঠকের জন্য স্মরণ হওয়া বা করানোর পরেও বসবে না।

সহু সিজদার আনুষঙ্গিক মাসায়েল ঃ

ভুলবশতঃ যে কোনও ওয়াজেব (যেমন রুকূ বা সিজদার তসবীহ ইত্যাদি মূলেই) ত্যাগ করলে ঐ একই নিয়মে সিজদাহ করতে হবে।

ইমাম সহু সিজদাহ করলে মুক্তাদী ভুল না করলেও তাঁর অনুসরণে তাঁর সাথে সিজদাহ করতে বাধ্য। ইমামের পশ্চাতে মুক্তাদী ভুল করলে যদি সে প্রথম রাকআত থেকেই ইমামের সাথে থাকে, তাহলে তাকে পৃথকভাবে সিজদাহ করতে হবে না। কারণ, তার এ ভুল ইমাম বহন করে নেবে। অবশ্য মসবূক (জামাআতে পিছিয়ে পড়া মুক্তাদী) হলে, ইমামের সালাম ফিরার পর তার বাকী নামায আদায় করতে উঠলে শেষে ভুল অনুসারে যথানিয়মে সিজদাহ করবে।

কিন্তু যদি ইমাম সালাম ফিরার পর সিজদাহ করেন, তাহলে তাঁর সাথে মসবূকের সহু সিজদাহ করা সম্ভব নয়। কারণ সে সালাম ফিরতে পাবে না। তাই সে উঠে বাকী নামায আদায় করে শেষে যথানিয়মে একাকী সিজদাহ করে নেবে। অবশ্য সে যদি ইমামের ভুলের পর জামাআতে শামিল হয়ে থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তাকে সিজদাহ করতে হবে না।

ইমাম ভুল করে এক রাকআত নামায বেশী পড়লে এক রাকআত ছুটে গেছে এমন মসবূক (পিছে পড়ে যাওয়া) নামাযী সেই রাকআত গণ্য করতে পারে না। সে রাকআত যেহেতু ইমামের বাতিল, সেহেতু তারও বাতিল। তাকে নিয়ম মত উঠে বাকী এক রাকআত কাযা পড়তে হবে। *(ফইঃ ১/৩০৯)*

সতর্কতার বিষয় যে, ভুল করে নামাযের কোন রুক্ন ছুটে গেলে নামাযই হয় না। কোন ওয়াজেব ছুটে গেলে সিজদা-এ সাহ্ও দ্বারা পূরণ হয়ে যায় এবং কোন সুন্নত ছুটে গেলে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না তথা সহু সিজদারও প্রয়োজন হয় না।

ক্বিরাআত করতে করতে ভুলে গেলে অথবা কাশিতে ধরলে যদি পরিমাণ মত পড়া হয়ে থাকে, তাহলে ইমাম তখনই রুকূতে চলে যাবেন। অবশ্য ক্বিরাআত ছোট মনে হলে অন্য সূরাও পড়তে পারেন। আটকে যাওয়ার পর সূরা ইখলাস পড়েও রুকূ যেতে পারেন। অবশ্য ক্বিরাআত ভুল পড়লে শেষে ঐ সূরা পড়তে হয় -এ কথা মনে করা ঠিক নয়।

কতিপয় বিদআতী নামায

এ কথা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে কোন ইবাদত কবুল হওয়ার মূল ভিত্তি হল তওহীদ। আর তা শুদ্ধ হওয়ার মৌলিক শর্ত হল ২টি; ইখলাস ও মুহাম্মাদী তরীকা। সুতরাং যে নামায মুহাম্মাদী তরীকায় নেই, তাতে পূর্ণ ইখলাস থাকলেও তা বিদআত। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) ব্যাপারে নতুন কিছু উদ্ভাবন করবে যা তার পর্যায়ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(বুঃ, মুঃ, মিঃ ১৪০নং)* "যে ব্যক্তি এমন আমল করে, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" *(মুঃ ১৭১৮-নং)* "আর নবরচিত কর্মসমূহ থেকে দূরে থেকো। কারণ, নবরচিত কর্ম হল বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।" *(আঃ, আদাঃ, তিঃ, ইমাঃ, মিঃ ১৬৫নং)* "আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই হল জাহান্নামে।" *(সনাঃ ১৪৮৭নং)*

সাধারণ নফল নামায নিষিদ্ধ সময় ছাড়া যে কোন সময়ে ইচ্ছামত সংখ্যায় পড়া যায়। কিন্তু সেই সাধারণ নামাযকে নিজের তরফ থেকে সময়, সংখ্যা, পদ্ধতি, স্থান, গুণ (ফযীলত) বা কারণ দ্বারা নির্দিষ্ট করলে তা বিদআত বলে পরিগণিত হয়।

যে নামাযের কথা কেবল যয়ীফ বা দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং কোন হাসান বা সহীহ হাদীসে তার বর্ণনা নেই, সে নামায বিদআত।

উপরোক্ত পটভূমিকায় নিম্নে এমন কতিপয় নামাযের কথা আলোচনা করব, যা বিদআত। আর তা কেবল জানার জন্যই; যাতে কেউ অজান্তে সেই বিদআত না করে বসে।

মা-বাপের জন্য নামায

প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়ে বসে বসে ২ রাকআত নফল। মা-বাপের উদ্দেশ্যে এমন নামায বিদআত। *(মুবিঃ ৩৪৫পৃঃ)*

ঈদের রাতের নামায

উভয় ঈদের রাতে বিশেষ নামায *(যজাঃ ৫৩৫৮, ৫৩৬১)* এবং এই রাত্রি জেগে ইবাদত বিদআত। *(মুবিঃ ৩৩২পৃঃ)* ঈদুল ফিতরের রাতের ১০০ রাকআত এবং ঈদুল আযহার রাতের ২ রাকআত নামাযও বিদআত। *(ঐ ৩৪৪পৃঃ)*

যে হাদীসে বলা হয়েছে যে, "যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর ও আযহার রাত্রি জাগরণ (ইবাদত) করবে, তার হৃদয় সেদিন মারা যাবে না, যেদিন সমস্ত হৃদয় মারা যাবে।" *(ত্বাবঃ)* সে হাদীসটি জাল ও গড়া হাদীস। *(সিযঃ ৫২০, যজাঃ ৫৩৬১নং দ্রঃ)*

কাযা উমরী

এই পুস্তকের প্রথম খন্ডের ১৮১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাযা উমরী বা উমরী কাযা নামাযের অস্তিত্ব শরীয়তে নেই। বিধায় তা বিদআত।

বিদআতীরা বলে, যদি কোন লোকের বহু সময়ের নামায কাযা হয়ে থাকে এবং সে তার সংখ্যা জানে না, তবে সে জুমআর দিন ফরয নামাযের পূর্বে ৪ রাকআত নফল নামায এক সালামে আদায় করবে। এই নামাযে প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী ৭ বার এবং সূরা কাওসার ১৫ বার পড়বে। এই নামায পড়লে নামাযী ও তার পিতা-মাতার (?) অসংখ্য কাযা নামায নাকি আল্লাহ মাফ করে দিবেন!

স্বালাতুল আওয়াবীন

আওয়াবীনের নামায আসলে চাশ্তের নামাযের অপর নাম। মহানবী ﷺ বলেন, "চাশ্তের নামায হল আওয়াবীনের নামায।" *(সজাঃ ৩৮২৭নং)* আর এ হাদীস এ কথারই দলীল যে, মাগরেবের পর উক্ত নামের নামাযটি ভিত্তিহীন ও বিদআত। যেমন এই নামাযের খেয়ালী উপকার বর্ণনায় বলা হয়ে থাকে যে, সৃষ্টিজগৎ ঐ নামাযীর অনুগত হয়ে যায় এবং ১২ বছরের কবুল হওয়া ইবাদতের সওয়াব লিখা হয়।

যে হাদীসে মাগরেব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ের নামাযকে আওয়াবীনের নামায বলা হয়েছে, তা সহীহ নয়; যয়ীফ। *(সিযঃ ৪৬১৭, যজাঃ ৫৬৭৬নং)*

তিরমিযী ও ইবনে মাজাতে যে ৬ রাকআত নামায মাগরেবের পর পড়লে ১২ বছর ইবাদতের সমান হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা সহীহ নয়। বরং তা খুবই দুর্বল হাদীস। *(যতিঃ ৬৬, সিযাঃ ৪৬৯, যজাঃ ৫৬৬১নং)* যেমন ৫০ বছরের গোনাহ মাফ হওয়ার হাদীসও দুর্বল। *(সিযঃ ৪৬৮, যজাঃ ৫৬৬৫নং)*

তদনুরূপ এই সময়ে ২০ রাকআত নামাযে বেহেশ্তে একটি গৃহ লাভের হাদীসটিও জাল ও মনগড়া। *(সিযঃ ৪৬৭, যজাঃ ৫৬৬২নং)*

অবশ্য সাধারণভাবে নফল নামায যেমন নিষিদ্ধ সময় ছাড়া যে কোন সময়ে পড়া যায়, তেমনি মাগরেব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে সাধারণ নফল অনির্দিষ্টভাবে পড়া যায়। মহানবী

ﷺ এই সময়ে নফল নামায পড়তেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। *(সজাঃ ৪৯৬২নং)*

এহতিয়াতী যোহর

জুমআর নামাযের পর অনেকে যোহরের নিয়তে ৪ রাকআত নামায পড়ে থাকে। যা ভিত্তিহীন, মনগড়া ও বিদআত। *(আনাঃ ৭৪পৃঃ, মুবিঃ ১২০, ৩২৭পৃঃ)*

স্বালাতুল হিফ্য

কুরআন হিফ্য সহজ হওয়ার উদ্দেশ্যে জুমআর রাতে ৪ রাকআত এই নামায পড়া হয়। এর প্রথম রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইয়াসীন, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা দুখান, তৃতীয় রাকআতে ফাতিহার পর সূরা সাজদাহ এবং চতুর্থ রাকআতে ফাতিহার পর সূরা মুল্ক পড়া হয়। আর এর শেষে লম্বা দুআ করা হয়। এ আমলের জন্য যে হাদীস বর্ণনা করা হয় তা জাল ও গড়া হাদীস। *(যতিঃ ৭১৯, সিযঃ ৩৩৭৪নং)* বিধায় তা বিদআত। *(মুবিঃ ৩৩৯পৃঃ)*

মৃতের জন্য ঈসালে সওয়াবের নামায

মৃতব্যক্তির কল্যাণের জন্য সওয়াব পৌঁছবার উদ্দেশ্যে নামায পড়া এবং তার সওয়াব তার নামে বখশে দেওয়া বিদআত। *(মুবিঃ ৩৪০পৃঃ)*

মনগড়া প্রাত্যহিক নামায ও তার খেয়ালী সওয়াব

শুক্রবারঃ

❁ শুক্রবারে যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে (?) ২ রাকআত; প্রথম রাকআতে আয়াতুল কুরসী ১ বার ও সূরা ফালাক্ব ২৫ বার এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস ১ বার এবং সূরা ফালাক্ব ২০ বার পড়া।

◌ ফযীলতঃ মরার পূর্বে স্বপ্নে আল্লাহর ও বেহেশ্তে নিজের জায়গার দর্শন লাভ!

❁ এই দিনে মাগরেব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে ১২ রাকআত নামায।

◌ ফযীলতঃ বেহেশ্তে মহল লাভ, সমগ্র মুসলিম জাতির তরফ থেকে সদকাহ দেওয়ার সওয়াব লাভ এবং পাপ নাশ হবে।

❁ এই দিনে চাশ্তের সময় নির্দিষ্ট সূরার সাথে ৪ অথবা ১০ রাকআত নামায পড়া। *(মুবিঃ ৩৪১পৃঃ)*

◌ ফযীলতঃ নবীর সুপারিশে বেহেশ্ত্ লাভ, মা-বাপেরও গোনাহ মাফ!

❁ মহানবী ﷺ-কে দেখার উদ্দেশ্যে অনেকে জুমআর রাতে ২ রাকআত নামায পড়ে। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২৫ বার, সালামের পর নবীর প্রতি দরূদ ১০০০ বার। *(মুবিঃ ৩৪৩পৃঃ)*

শনিবার ঃ

۞ শনিবারের যে কোন সময়ে ৪ রাকআত এক সালামে; প্রত্যেক রাকআতে ৩ বার সূরা কাফিরূন এবং নামায শেষে ১ বার আয়াতুল কুরসী।

◌ ফযীলতঃ ১ বছরের রোযা ও রাতের ইবাদতের এবং শহীদের সওয়াব লাভ, প্রত্যেক হরফের বদলে এক হজ্জ ও ওমরার সওয়াব লাভ, কিয়ামতে নবী ও শহীদানের সাথে আরশের ছায়া লাভ!!!

۞ শনিবার দিনগত রাতের ২০ রাকআত নামায; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৫০ বার, সুরা ফালাক্ব একবার এবং সূরা নাস একবার। তারপর নানান দুআ ১০০ বার।

◌ ফযীলতঃ পৃথিবীর সকল মানুষের সংখ্যার সমান (প্রায় ৬০০ কোটি) সওয়াব লাভ, কিয়ামতে নিরাপত্তা লাভ এবং নবীদের সাথে বেহেশ্ত্ প্রবেশ!!!

রবিবার ঃ

۞ রবিবার যে কোন সময়ে ৪ রাকআত ১ সালামে, প্রত্যেক রাকআতে সূরা বাক্বারারা শেষ ২ আয়াত পড়া।

◌ ফযীলতঃ নাসারাদের নর-নারীর সংখ্যার সমান নেকী লাভ, নবীর সওয়াব লাভ, হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ, প্রত্যেক রাকআতের বদলে ১০০০ নামাযের সওয়াব লাভ এবং প্রত্যেক হরফের বদলে বেহেশ্তে মিস্কের শহর লাভ!!!

۞ রবিবার দিনগত রাত্রে যে কোন সময়ে ৪ রাকআত ১ সালামে, প্রথম রাকআতে সূরা ইখলাস ১০ বার, দ্বিতীয় রাকআতে ২০ বার, তৃতীয় রাকআতে ৩০ বার এবং চতুর্থ রাকআতে ৪০ বার পড়া। নামাযের পর নির্দিষ্ট অযীফা ৭৫ বার করে।

◌ ফযীলতঃ দোযখী হলেও বেহেশ্ত্ লাভ হবে! সমস্ত জাহেরী গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে হজ্জ ও উমরার সওয়াব লাভ এবং আগামী সোমবারের ভিতরে মরলে শহীদ হবে।

সোমবার ঃ

۞ সোমবার চাশ্তের সময় ২ রাকআত নামায, প্রত্যেক রাকআতে আয়াতুল কুরসী ১ বার, সূরা ইখলাস ১ বার, সূরা ফালাক্ব ১ বার এবং সূরা নাস ১ বার পড়া।

◌ ফযীলতঃ সমস্ত গোনাহ মাফ হবে।

۞ এই দিনে আরো ১২ রাকআত নামায।

ফযীলতঃ কিয়ামতে এক হাজার বেহেশ্তী যেওর ও তাজ পরানো হবে, ১ লক্ষ ফিরিশ্তা এই নামাযীকে নিয়ে যাবে এবং প্রত্যেক ফিরিশ্তার অসংখ্য উপহার থাকবে!

۞ সোমবার দিবাগত রাত্রে ১২ রাকআত এবং প্রত্যেক রাকআতে সূরা নাস্র ৫ বার করে পড়া।

◌ ফযীলতঃ বেহেশ্তে ৭ পৃথিবীর সমান বিরাট ঘর তৈরী হবে!

মঙ্গলবার ঃ

❁ মঙ্গলবার দিনে চাশ্তের সময় অথবা সূর্য ঢলার সঙ্গে সঙ্গে ১০ রাকআত এবং প্রত্যেক রাকআতে আয়াতুল কুরসী ১ বার ও সূরা ইখলাস ৩ বার পড়া।

◌ ফযীলতঃ ৭০ দিন কোন লিখা হবে না! ৭০ বছরের গোনাহ মাফ। আর ঐ দিনে মরলে সে শহীদ হবে!

❁ মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে ২ রাকআত; প্রথম রাকআতে ১০ বার সূরা ফালাক্ব এবং দ্বিতীয় রাকআতে ১০ বার সূরা নাস পড়া।

◌ ফযীলতঃ ৭০ হাজার ফিরিশ্তা আসমান থেকে নাজেল হয়ে এই নামাযীর জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সওয়াব লিখতে থাকবে !!!

বুধবার ঃ

❁ বুধবার দিনে সকালে ১২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে আয়াতুল কুরসী ১ বার, সূরা ইখলাস ৩ বার, সূরা ফালাক্ব ৩ বার এবং সূরা নাস ৩ বার পড়া।

◌ ফযীলতঃ সমস্ত গোনাহ মাফ, কবরের আযাব, সংকীর্ণতা ও অন্ধকার দূর হবে, নবীদের মত আমল নিয়ে কিয়ামতে উঠবে (?!) এবং কিয়ামতের কষ্ট দূর হবে।

❁ বুধবার মাগরেব ও এশার মাঝে ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে আয়াতুল কুরসী ৫ বার, সূরা ইখলাস ৫ বার, সূরা ফালাক্ব ৫ বার এবং সূরা নাস ৫ বার পড়া।

◌ ফযীলতঃ মা-বাপের নামে বখশালে মা-বাপের হক আদায় হয়ে যাবে; যদিও দুনিয়াতে তারা তার উপর নারাজ ছিল (?!) সিদ্দীক ও শহীদগণের সওয়াব লাভ হবে!

বৃহস্পতিবার ঃ

❁ বৃহস্পতিবার দিনে যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে (?) ২ রাকআত; প্রথম রাকআতে আয়াতুল কুরসী ১০০ বার এবং দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস ১০০ বার পড়া। সালামের পর দরূদ শরীফ ১০০ বার।

◌ ফযীলতঃ রজব, শা'বান ও রমযান মাসের রোযাদারদের মত, কা'বা শরীফের হাজীদের মত এবং মুমিনদের সংখ্যা অনুপাতে সওয়াব লাভ হয়!

❁ বৃহস্পতিবার মাগরেব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে ১২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১০ বার পড়া।

◌ ফযীলতঃ ১২ বছরের দিনের রোযার এবং রাতের ইবাদত করার সওয়াব লাভ হয়!

মনগড়া মাসিক নামায ও তার খেয়ালী সওয়াব

মহর্রম মাসের খেয়ালী নামায ঃ

মহরম মাসের প্রথম তারীখের রাতে ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১১ বার।

এই রাতে আরো ৬ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১০ বার। এতে বেহেশ্তে

২০০০ মহল লাভ হবে; প্রত্যেক মহলে ইয়াকূতের ১০০০ দরজা এবং প্রত্যেক দরজায় সবুজ রঙের তখতার উপর হুর বসে থাকবে। ৬০০০ বালা দূর হবে এবং ৬০০০ সওয়াব লাভ হবে!

এই তারীখে দিনে ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৩ বার। এতে দু জন ফিরিশ্তা বডিগার্ড পাওয়া যায় এবং সারা বছর শয়তান থেকে নিরাপত্তা লাভ।

আশুরার রাতে ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৩ বার। এতে কিয়ামত পর্যন্ত রৌশন থাকবে।

এই রাতে আরো ৪ রাকআত। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৫০ বার। এতে ৫০ বছরের আগের ও পরের গোনাহ মাফ হয়!

আশুরার দিনে ৪ রাকআত নামায; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৫০ বার। এতে ৫০ বছরের আগের ও পরের গোনাহ মাফ হয়! বেহেশ্তে ১০০০ নূরের মহল তৈরী হয়। এই দিনে রয়েছে আরো ৪ রাকআত খেয়ালী নামায।

অথবা যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে ফাতিহার পর আয়াতুল কুরসী ১০ বার, সূরা ইখলাস ১১ বার এবং নাস ও ফালাক্ব ৫ বার। নামায শেষে ইস্তিগফার ৭০ বার। এ নামাযও বিদআত। *(মুবিঃ ৩৪০-৩৪১পৃঃ)*

এই মাসের ১ থেকে ১০ তারীখ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন যোহরের পর ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১৫ বার। এ নামায হযরত হাসান-হোসেনের রূহের উপর বখশে দিলে কিয়ামতে তাঁদের সুপারিশ (!) লাভ হবে।

সফর মাসের খেয়ালী নামায ঃ

প্রথম তারীখের রাতে এশার পর ৪ রাকআত; প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন ১৫ বার। দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস ১৫ বার। তৃতীয় রাকআতে সূরা ফালাক্ব ১৫ বার এবং চতুর্থ রাকআতে সূরা নাস ১৫ বার। এতে সমস্ত বালা থেকে রেহাই পাওয়া যায় এবং খুব বেশী সওয়াব লাভ হয়।

এই মাসের শেষ বুধবার বা আখেরী চাহার শোম্বার চাশ্তের সময় ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১১ বার।

এ মাসের ১ম সপ্তাহের জুমআর রাতে এশার পরে ৪ রাকআত নফল এবং তার খেয়ালী সওয়াবের কথার উল্লেখ রয়েছে অনেক কিতাবে।

রবিউল আওয়াল মাসের খেয়ালী নামায ঃ

এই মাসের প্রথম হতে ১২ তারীখ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন ২০ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২১ বার। এই নামায নবী ﷺ-এর নামে বখশে দিলে তিনি নামাযীকে বেহেশ্তের সুসংবাদ দেবেন!

অনেকের মতে এ মাসে নিয়মিত দরূদ পড়লে ধনী হওয়া যায়।

রবিউস্-সানী মাসের বিদআতী নামায ঃ

এই মাসের ১, ১৫ ও ২৯ তারীখে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ৫ বার। এতে ১০০০ সওয়াব লাভ, ১০০০ পাপ মাফ এবং ৪টি হুর লাভ হবে।

অনেকের খেয়াল মতে এ মাসের ১৫ তারীখে মাগরেবের পর ৪ রাকআত নামায পড়লে উভয়কালে কামিয়াবী লাভ হয়। এ মাসের শেষ রাতে ৪ রাকআত নামায পড়লে কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

জুমাদাল আওয়াল মাসের খেয়ালী নামায ঃ

এই মাসের প্রথম তারীখের রাতে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১১ বার। এতে ৯০,০০০ বছরের নেকী লাভ হবে এবং ৯০,০০০ বছরের গোনাহ মোচন হয়ে যাবে!

কারো খেয়াল মতে এ মাসের প্রথম তারীখে ২০ রাকআত নামায পড়তে হয়।

জুমাদাস সানী মাসের খেয়ালী নামায ঃ

এই মাসের প্রথম তারীখের রাতে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১৩ বার। এতে ১ লাখ নেকী লাভ হবে এবং ১ লাখ গোনাহ মোচন হবে!

এ রাতে ১২ রাকআত নামাযের কথাও বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

রজব মাসের খেয়ালী নামায ঃ

এই মাসে ১, ১৫, ও শেষ তারীখে গোসল করলে (গঙ্গাজলে স্নান করার মত) প্রথম দিনকার শিশুর মত নিষ্পাপ হওয়া যায়! এই মাসে ৩০ রাকআত নামায এবং তার ৫টি রাত ইবাদত করার খেয়ালী ফযীলত বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

কারো মতে এ মাসের ১৫ তারীখে এশার পরে ৭০ রাকআত নামায পড়লে পৃথিবীর বৃক্ষরাজি পরিমাণ সওয়াব লাভ হয়। *(মুবিঃ ৩৪১পৃঃ দ্রঃ)*

স্বালাতুর রাগায়েব ঃ

এই মাসে জুমআর রাতে এশার পরে ১২ রাকআত নামায পড়া হয়ে থাকে। ৬ সালামে প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ক্বাদ্র ৩ বার এবং সূরা ইখলাস ১২ বার পড়তে হয়। নামায শেষে ৭০ বার দরূদ শরীফ এবং আরো অন্যান্য দুআ ও সিজদাহ। এ সবই বিদআত। *(বিশেষ দ্রঃ তাবয়ীনুল আজাব, বিমা অরাদা ফী ফাযলি রাজাব, মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ ২/২, মুবিঃ ৩৩৮-৩৩৯, ৩৪২পৃঃ)*

শবেমি’রাজের নামায ঃ

এই মাসের ২৭ তারীখে এশা ও বিতরের মাঝে ৬ সালামে ১২ রাকআত নামায। আর নামাযের পর ১০০ বার কলেমায়ে তামজীদ (?) এবং নির্দিষ্ট দুআ পাঠ। এই দিন দান করতে হয়। ঐ দিনের রোযা এবং ঐ রাতের ইবাদত ১০০ বছর রোযা এবং ১০০ রাত ইবাদত করার সমান! *(মুবিঃ ৩৪১ ও ৩৪৫পৃঃ)*

শা’বান মাসের খেয়ালী নামায ঃ

এই মাসের ১ তারীখের রাতে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ১৫ বার। এতে বেশুমার সওয়াব লাভ হয়।

এই মাসে যে কোন রাতে ১ সালামে ৮ রাকআত নামায পড়ে হযরত ফাতেমার নামে বখ্‌শে দিলে তিনি ঐ নামাযীর জন্য শাফাআত না করে বেহেশ্তে এক পা-ও দিবেন না!

শবেবরাতের নামায ঃ

শবেবরাত আসলে শবেকদরের ভ্রান্ত রূপ। শবেকদরের আসল ছেড়ে শবেবরাতের নকল ইবাদত নিয়ে মাতামাতি করে ভাল বরাত বা ভাগ্য লাভের জন্য লোকে ১০০ রাকআত নামায পড়ে থাকে। আর প্রত্যেক রাকআতে ১০ বার সূরা ইখলাস পড়ে থাকে। এ নামাযও মনগড়া বিদআত। *(মুবিঃ ৩৪১-৩৪২পৃঃ)* শবেবরাতের নামায পড়লে নাকি ২০টি হজ্জের এবং ২০ বছর একটানা ইবাদতের সওয়াব পাওয়া যায়! আর ১৫ তারীখে রোযা রাখলে নাকি অগ্র-পশ্চাৎ ২ বছর রোযা রাখার সওয়াব পাওয়া যায়।

এ রাতে নামায আদায়ের পূর্বে নাকি গোসলও করতে হয়। আর সে গোসলের সওয়াবও রয়েছে নাকি খেয়ালী; এ গোসলের প্রতি ফোঁটার পানির বিনিময়ে ৭০০ রাকআত নফল নামায আদায়ের সওয়াব আমল-নামায় লিখা হয়ে থাকে!!!

এ রাতে বালা দূর করা, আয়ু বৃদ্ধি করা এবং অভাবমুক্ত হওয়ার নিয়তে ৬ রাকআত নামায পড়া হয়। পড়া হয় সূরা ইয়াসীন সহ আরো মনগড়া দুআ। *(মুবিঃ ৩৪২পৃঃ)* ঘরে ঘরে জ্বালানো হয় দীপাবলী। বানানো হয় নানা রকম খাবার। আর এ সবের পশ্চাতে এক একটি মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়।

এ ছাড়া আরো কত শত খেয়ালী ইবাদত ও সওয়াবের কথা পাওয়া যায় একাধিক বাজারী বই-পুস্তকে; যার সবগুলোই বিদআত এবং সে সবের একটিও সহীহ দলীল নেই।

রমযান মাসের খেয়ালী শবেকদরের নামায ঃ

শবেকদরের সারা রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করতে হয়, নামায পড়তে হয়। কিন্তু কেবল ২৭ তারীখের রাতে তারাবীহর পর খাস শবেকদরের নামায পড়ে বিদআতীরা। তাতে তারা প্রত্যেক রাকআতে সূরা ক্বাদ্‌র এত এত বার এবং সূরা ইখলাস এত এত বার পড়ে থাকে। যার কোন দলীল ও ভিত্তি নেই। *(মুবিঃ ৩৪৫পৃঃ)*

শওয়াল মাসের খেয়ালী নামায ঃ

এই মাসের ১ তারীখের রাতে অথবা ঈদের নামাযের পর ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২১ বার। এতে বেহেশ্তের ৮টি দরজা খোলা এবং দোযখের ৭টি দরজা বন্ধ হয়ে যায়। মরার পূর্বে বেহেশ্তে নিজের স্থান দেখা যায়।

এ ছাড়া দিনে অথবা রাতে আরো ৮ রাকআত নামাযের কথা বলা হয়।

যুলক্বা’দাহ মাসের খেয়ালী নামায ঃ

এই মাসের ১ তারীখের রাতে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২৩ বার। এতে বেহেশ্তে ৪০০০ লাল ইয়াকূতের ঘর তৈরী হয়! প্রত্যেক ঘরে জওহারের সিংহাসন থাকবে!! প্রত্যেক সিংহাসনে হুর বসা থাকবে; তাদের কপাল সূর্য অপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল হবে!!!

এ ছাড়া এই মাসের প্রত্যেক রাতে ২ রাকআত নামায পড়লে ১ জন শহীদ ও ১ হজ্জের সওয়াব লাভ হবে! আর এই মাসের প্রত্যেক শুক্রবার ৪ রাকআত নামায পড়লে ১টি হজ্জ ও ১টি উমরার সওয়াব হবে!!

যুলহজ্জ মাসের খেয়ালী নামায ঃ

এই মাসের ১ তারীখের রাতে ৪ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা ইখলাস ২৫ বার। এতে বেশুমার সওয়াব লাভ হয়।

এ মাসের প্রথম ১০ দিনের বিতরের নামাযের পর ২ রাকআত; প্রত্যেক রাকআতে সূরা কাওসার ৩ বার এবং সূরা ইখলাস ৩ বার পড়লে ‘মাকামে ইল্লীন’ (?) লাভ হবে, প্রত্যেক কেশের বদলে ১০০০ নেকী এবং ১০০০ দীনার সদকা করার সওয়াব লাভ হবে!

এ ছাড়া আরো কত মনগড়া নামাযের কথা রয়েছে অনেক বই-পুস্তকে। আসলে সওয়াব তাদের নিজের পকেট থেকে বলেই এত এত সওয়াব অর্জনের ব্যাপারে আশ্চর্য ও অবাক হওয়ার কোন কারণ নেই। প্রাত্যহিক ও মাসিক ঐ শ্রেণীর নির্দিষ্ট নামায যে বিদআত, সে প্রসঙ্গে উলামাদের স্পষ্ট উক্তি রয়েছে। *(মুবিঃ ৩৪২পৃঃ দ্রঃ)*

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

যত দিন যায়, তত নতুন কথা জানা হয়, নতুন বহু কিছু শেখা হয়। বাতিল হয় পুরাতন বহু কিছু। তার মানে এই নয় যে, এগুলো নতুন হাদীস। বরং আমাদের জানা নতুন। আর পূর্বে যা করা হয়েছে, তা বরবাদ নয়। তা সঠিক জেনে করলে তাতেও সওয়াব পেয়ে থাকে নেক নিয়তের মুসলিম। কিন্তু সত্য জানার পর আর নয়। সত্য জানার পর সত্যকে মেনেই সওয়াব পাওয়া যাবে। অন্যথা জেনেশুনে অসত্যের অনুসরণ করলে ক্ষতিও আছে। সুতরাং উদার হলে ভয় থাকে না কিছুর। মহান আল্লাহ বলেন, আমার সেই বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও, যারা কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, অতঃপর উত্তমের অনুসরণ করে। তারাই হল এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত করেছেন এবং তারাই হল জ্ঞানসম্পন্ন।” *(কুঃ ৩৯/১৭-১৮)* অতএব আপনিও সেই সুসংবাদ গ্রহণ করুন। সহীহ হাদীসের উপরে আমল করুন। সহীহ হাদীসই আমলের জন্য যথেষ্ট।

সংকেত-সূচী ও প্রমাণপঞ্জী

কুঃ= কুরআন মাজীদ
আঃ= আহমাদ, মুসনাদ
আইঃ = আহকামুল ইমামাতি অল-ই'তিমামি ফিস্সালাত, আব্দুল মুহসিন আল-মুনীফ
আদাঃ= আবূদাঊদ, সুনান
আনাঃ = আল-আজবিবাতুন নাফেআহ, আন আসইলাতি লাজনাতি মাসজিদিল জামেআহ, মুহাদ্দিস আলবানী
আমাঃ= আউনুল মা'বূদ
আয়াঃ = আবূ য়্যা'লা
আরাঃ= আব্দুর রায্যাক, মুসান্নাফ
ইখুঃ= ইবনে খুযাইমাহ, সহীহ
ইগঃ= ইরওয়াউল গালীল, আলবানী
ইমাঃ= ইবনে মাজাহ, সুনান
ইহিঃ= ইবনে হিব্বান, সহীহ
ত্বাঃ= ত্বাহাবী
ত্বাবঃ বা ত্বাবাঃ= ত্বাবারানী, মু'জাম
তামিঃ= তামামুল মিন্নাহ, আলবানী
তিঃ= তিরমিযী, সুনান
তুআঃ = তুহফাতুল আহওয়াযী
তুইঃ= তুহফাতুল ইখওয়ান, ইবনে বায
দাঃ= দারেমী, সুনান
দারাঃ= দারাক্বুত্বনী, সুনান
নাঃ= নাসাঈ, সুনান
নাআঃ= নাইলুল আউতার, শাওকানী
নানঃ = নামাযে নববী, সাইয়েদ শাফীকুর রহমান, লাহোর ছাপা
ফইঃ= ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ, সঊদী উলামা-কমিটি
ফউঃ= ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন
ফবাঃ= ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার
ফাখুঃ= ফাতাওয়া ফিল মাসহি আলাল খুফ্ফাইন, ইবনে উসাইমীন
ফাতাজামাঃ = ফাতাওয়া তাতাআল্লাকু বিজামাআতিল মাসজিদ
ফামুসাঃ = ফাতাওয়া মুহিম্মাহ তাতাআল্লাকু বিস্-স্বালাহ, ইবনে বায
ফিসুঃ= ফিকহুস সুন্নাহ
বুঃ= বুখারী, সহীহ

মবঃ= মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ
মাঃ= মালেক, মুঅত্তা
মাতাহাআঃ = মা-যা তাফআলু ফিল হা-লা-তিল আ-তিয়াহ, মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
মাযাঃ= মাজমাউয যাওয়াইদ, হাইষামী
মারাসাঃ= মাজমূআতু রাসাইল ফিস স্বালাহ
মাসাইঃ= মাজমূউস স্বালাওয়াতি ফিল-ইসলাম, ডঃ শওকত উলাইয়ান
মুঃ= মুসলিম, সহীহ
মুত্বাসাঃ= মুখালাফাত ফিত্ত্বাহারাতি অসস্বালাহ
মুবিঃ = মু’জামুল বিদা’
মুমুত্বাসাঃ = মুখতাসারু মুখালাফাতু ত্বাহারাতি অসস্বালাহ, আব্দুল আযীয সাদহান
মুমঃ= আলমুমতে’, শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাইমীন
যঃ= যয়ীফ
যামাঃ= যাদুল মাআদ, ইবনুল কাইয়েম
রাফিঃ= রাসাইল ফিকহিয়্যাহ, ইবনে উসাইমীন
লিবামাঃ= লিকাউ বাবিল মাফতূহ, ইবনে উষাইমীন
লিমাঃ= লিকাউ বাবিল মাফতূহ, ইবনে উসাইমীন
লিকাঃ= লিকাউ বাবিল মাফতূহ, ইবনে উসাইমীন
শাসুঃ = শারহুস সুন্নাহ, বাগবী
সঃ= সহীহ
সাজাঃ = সালাতুল জামাআতি হুকমুহা অআহকামুহা, ডক্টর সালেহ সাদলান
সিআনুঃ = সিয়ারু আ’লামুন নুবালা’, ইমাম যাহাবী
সিযঃ= সিলসিলাহ যায়ীফাহ, আলবানী
সিসঃ= সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী
সিসানঃ= সিফাতু স্বালাতিন নাবী ﷺ, আলবানী
সুআঃ = সুনানু আরবাআহ (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)
হাঃ= হাকেম, মুস্তাদ্রাক